

মুহাম্মাদ আলি আল-হাশিমি রচিত
আদর্শ মুসলিম

মুফতি তারেকুজ্জামান
অনূদিত



আদর্শ মুসলিম

বইটি পড়ে ভালো
লাগলে এক কপি
হার্ডকপি কিনে
সংগ্রহে রাখুন

বই
মূল
অনুবাদ
প্রকাশক

আদর্শ মুসলিম
মুহাম্মাদ আলি হাশিমি
মুফতি তারেকুজ্জামান
রফিকুল ইসলাম

আদর্শ মুসলিম

মুহাম্মাদ আলি হাশিমি



RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

আদর্শ মুসলিম
মুহাম্মাদ আলি হাশিমি

গ্রন্থস্বত্ব © রুহামা পাবলিকেশন

প্রথম প্রকাশ
মুহাররম ১৪৪০ হিজরি / সেপ্টেম্বর ২০১৯ ইসাযি

বইমেলা পরিবেশক
ইতি প্রকাশন

অনলাইন পরিবেশক
ruhamashop.com
rokomari.com
wafilife.com

মূল্য : ৬২০ টাকা



RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

+৮৮ ০১৮৫০৭০৮০৭৬

ruhamapublication1@gmail.com

www.fb.com/ruhamapublicationBD

www.ruhamapublication.com

অনুবাদের কথা

মুসলিম মানে আত্মসমর্পণকারী। যে নিজের সকল কামনা-বাসনাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিধানের সামনে কুরবান করে, সে-ই প্রকৃত মুসলিম। কথাটি সংক্ষিপ্ত ও সহজ হলেও এর পরিসর অনেক ব্যাপক ও গভীর। শুধু মুখে ইসলামের স্বীকৃতি দিয়ে চলা মুসলমানদের সংখ্যা বর্তমান বিশ্বে স্বল্প নয়; বরং খুঁজতে গেলে দেখা যাবে শতকরা ৯৯% লোকই বাপ-দাদা সূত্রে মুসলমান, যাদের প্রকৃত ইসলামের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। এজন্যই আজ বিশ্বে মুসলমানদের সংখ্যা প্রায় দুইশ কোটি বলা হলেও সর্বত্র কেবল এরাই জুলুম-নির্যাতন ও নিগ্রহের শিকার; অথচ এর প্রতিবাদে এদের কিছুই করার নেই। এ নামসর্বস্ব ইসলাম নিয়ে না দুনিয়ার জীবন সুন্দর হয়, আর না আখিরাতে মুক্তির আশা করা যায়।

ইসলামের বিধান বিস্তৃত ও সুবিশাল। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে এর সুস্পষ্ট নির্দেশনা। ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই রয়েছে নিখুঁত বিধিবিধান। এত সমৃদ্ধ, বিগুহ ও সুন্দর জীবনব্যবস্থা থাকতেও মানুষ কেন যে তা মেনে চলতে চায় না, তা বড় আশ্চর্যের! বস্তুত মানুষ সর্বদা স্বাধীনভাবে চলতে চায়। স্বীয় নফসের বিরোধিতা করে ইসলাম অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা অনেকের জন্য মুসিবতের মনে হয়। সবাইকে পরিশোধিত হিসেবে দেখতে চাইলেও নিজে পরিশোধিত হওয়ার চিন্তা করে না। গতানুগতিক ধারায় জীবন পরিচালনাকেই যথেষ্ট মনে করে। চারপাশের গুনাহের পরিবেশ তার হৃদয়-মনকে ইচ্ছেমতো চলতে আরও উদ্বেলিত করে তোলে। এভাবেই সে সাধারণদের সাথে মিশে লক্ষ্যহীন জীবন পার করতে থাকে।

সমাজে আজ চারিদিকে কেবলই হাহাকার ধ্বনি। অশান্তি আর কষ্টের ধোঁয়ায় আঁধার এ ধরনি। মারামারি, হানাহানি আর কোন্দলে পর্যুদস্ত মানবজীবন। সাম্য, উদারতা ও ক্ষমা—এসব তো কবেই বিদায় নিয়েছে সমাজ থেকে! স্বার্থ

আর সুবিধাভোগই হয়ে গেছে মানুষের মূললক্ষ্য। সহযোগিতা, পরোপকারিতা ও উত্তম আচরণের আশা সুদূর পরাহত। চারিদিকে কেবল জুলুম, অত্যাচার, অনাচার আর অশ্লীলতার চিত্র দৃশ্যমান। কোথাও নেই এক ফোঁটা শান্তির ছোঁয়া। এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পেছনে মূলত সকল দায়ভার আমাদেরই। আমরা যদি ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান মেনে চলতাম, আল্লাহর ইবাদত যথাযথভাবে পালন করতাম, নিজের সাথে সৎ থাকার চেষ্টা করতাম, পরিবারের হক আদায় করতাম, প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার ও সদাচরণ করতাম, তাহলে এ দুনিয়াই হয়ে উঠত আমাদের কাছে এক টুকরো জান্নাতসদৃশ।

ইসলামের সব বিধান মেনে চলার মধ্যেই রয়েছে একমাত্র শান্তির গ্যারান্টি—এ কথাটি সবাই মুখে স্বীকার করলেও অনেকেই জানে না, কীভাবে চলতে হবে ইসলামের পথে, কীভাবে আসতে হবে শান্তির পথে। পরিবেশের কুপ্রভাবে অনেকে ভুলের জগতে থাকলেও অন্তরের গভীর থেকে চায় সত্য ও আলোর পথে চলতে। এমন মুসলিমদের পথনির্দেশিকা তৈরি করতেই এগিয়ে এসেছেন সিরিয়ার প্রখ্যাত শাইখ ড. মুহাম্মাদ আলি হাশিমি রহ.। কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফের আমলের আলোকে রচনা করেছেন কালজয়ী গ্রন্থ ‘শাখসিয়াতুল মুসলিম’ বা ‘আদর্শ মুসলিম’। গ্রন্থটির প্রতিটি বাক্যে রয়েছে ইসলামি জীবনযাপনের সরল দিকনির্দেশনা। দরদের সাথে বলা কথাগুলো ইসলামপ্রিয় যেকোনো পাঠককেই আকৃষ্ট করবে বলে আমাদের ধারণা। বইটি মুসলিম সমাজের চিত্র পরিবর্তন করতে বড় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। ব্যক্তি থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি স্তরের কদর্যতা দূর করতে এ বইটি হতে পারে একটি যুগান্তকারী মাইলফলক। এমনটিই আমাদের বিশ্বাস, এমনটিই আমাদের ধারণা; ইনশাআল্লাহ।

‘উসওয়াতুন হাসানাহ’ ও ‘ইসলামি জীবনব্যবস্থা’-সহ বেশ কয়েকটি মৌলিক গ্রন্থ রচনার সুযোগ হলেও আরবি বইয়ের এটাই আমার প্রথম অনুবাদ। ইতিপূর্বে অবশ্য ‘গুনাহময় জীবনে তাওবার পরশ’ নামে উরদু একটি বইয়ের অনুবাদ করার সুযোগ হয়েছিল। বাঙালি মুসলিমদের জন্য এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বই অনুবাদ করতে পেরে বেশ ভালো লাগছে। সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলারই। বইটি অনুবাদের ক্ষেত্রে আমরা যথাসম্ভব সরল ভাষা ব্যবহার করার চেষ্টা করেছি। বানানরীতির ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছি

প্রথম আলো ও বাংলা একাডেমি প্রণীত বানানরীতি । তবে আরবি শব্দের প্রতিবর্ণায়নের ক্ষেত্রে রুহামা প্রণীত স্বতন্ত্র রীতি অনুসরণ করেছি । ভাষা ও বানান সুন্দর করার ক্ষেত্রে আমরা চেষ্টার কোনো ক্রটি করিনি । এরপরও এতে কোনো ভুল থেকে গেলে সেটা আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেব ইনশাআল্লাহ ।

আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রচেষ্টায় বারাকাহ দান করুন এবং গুরুত্বপূর্ণ এ গ্রন্থ, এর লেখক, অনুবাদক, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবুল করুন । আমিন, ইয়া রাব্বাল আলামিন ।

বিনীত
তারেকুজ্জামান
২৩/০৭/২০১৯ খ্রি.

সূচি পত্র

প্রারম্ভিকা : ১৭

আল্লাহর সাথে মুসলমানের সম্পর্ক

সচেতন মুমিন : ২৩

আল্লাহর একান্ত আনুগত্যশীল : ২৪

অধীনস্থদের জিম্মাদারি অনুভবকারী : ২৫

আল্লাহর ফয়সালা ও ব্যবস্থাপনার প্রতি সম্ভ্রষ্ট : ২৫

প্রত্যাবর্তনকারী : ২৬

সর্বদা আল্লাহর সম্ভ্রষ্ট অর্জনের ফিকির করে : ২৭

ফরজ, ওয়াজিব ও নফলসমূহ যত্ন সহকারে আদায় করে : ২৯

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যথাযথভাবে আদায় করে : ২৯

মসজিদে নামাজের জামাআতে হাজির হয় : ৩২

সুন্নাতে মুআক্কাদা ও নফলসমূহ গুরুত্ব সহকারে পড়ে : ৩৮

উত্তমরূপে নামাজ পড়ে : ৪০

জাকাত আদায় করে : ৪১

রমজান মাসে রোজা রাখে এবং রাতে কিয়াম করে : ৪২

নফল রোজা রাখে : ৪৭

হজ আদায় করে : ৪৯

উমরা পালন করে : ৫০

আল্লাহর দাসত্বের বাস্তবায়ন করে : ৫১

অধিকহারে কুরআন তিলাওয়াত করে : ৫২

নিজের সাথে মুসলমানের সম্পর্ক

ভূমিকা : ৫৫

একজন প্রকৃত মুসলমান দেহ, বিবেক ও আত্মা—এ তিনটির মাঝে যেভাবে ভারসাম্য রক্ষা করে চলে : ৫৬

ক. দেহ : ৫৬

তার খানাপিনা সুষম ও পরিমিত : ৫৬

নিয়মিত ব্যায়াম করে : ৫৮

শরীর ও কাপড়চোপড় পরিচ্ছন্ন রাখে : ৫৮

তার বাহ্যিক অবয়ব সুন্দর : ৬৫

খ. বিবেক : ৭১

ইলম বা জ্ঞান মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক ও সম্মানের বিষয় : ৭১

মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ করে : ৭৩

মুসলমানকে যেসব বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে হবে : ৭৬

নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞান লাভ করে : ৭৬

দৃষ্টিভঙ্গির বাতায়ন উন্মুক্ত রাখে : ৭৭

ভিনদেশি ভাষা শিক্ষা করে : ৭৭

গ. আত্মা : ৭৯

ইবাদতের মাধ্যমে আত্মাকে শাণিত করে : ৭৯

ভালো মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করে এবং

ইমানের মজলিসে যোগদান করে : ৮০

হাদিসে বর্ণিত আজকার ও দুআসমূহ যথাস্থানে পাঠ করে : ৮২

পিতা-মাতার সাথে মুসলমানের সম্পর্ক

তাদের সাথে সদ্যবহার করে : ৮৩

তাদের মর্যাদা এবং তাদের প্রতি

সন্তানের দায়িত্বের ব্যাপারে সজাগ থাকে : ৮৩

পিতা-মাতা অমুসলিম হলেও তাদের সাথে সদ্যবহার করে : ৯০

তাদের অবাধ্য হতে ভয় করে ॥ ৯১

সদ্যবহারের ক্ষেত্রে মাতাকে পিতার ওপর প্রাধান্য দেয় ॥ ৯১

পিতা-মাতার বন্ধুদের সাথে সদ্যবহার করে ॥ ৯৫

পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহারের পদ্ধতি ॥ ৯৭

স্ত্রীর সাথে মুসলমানের সম্পর্ক

বিয়ে ও স্ত্রীর ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ॥ ১০২

প্রকৃত মুসলমান কোন প্রকারের মেয়েকে স্ত্রী হিসাবে চায় ॥ ১০৩

দাম্পত্য জীবনে ইসলামের নির্দেশনা মেনে চলে ॥ ১০৬

প্রকৃত মুসলমান একজন আদর্শ স্বামী ॥ ১১২

সফল স্বামী ॥ ১২২

স্ত্রীর সাথে জীবনযাপনে বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা অবলম্বন করে ॥ ১২২

স্ত্রীর ত্রুটি সংশোধন করে দেয় ॥ ১২৩

মা ও স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখার মাঝে সুষ্ঠু ভারসাম্য বজায় রাখে ॥ ১২৩

স্ত্রীর ওপর আল্লাহপ্রদত্ত কর্তৃত্বকে উত্তম পন্থায় ব্যবহার করে ॥ ১২৩

সন্তান-সন্ততির সাথে মুসলমানের সম্পর্ক

ভূমিকা ॥ ১৩৩

হৃদয়ে লালন করে পিতৃত্বের দায়িত্ববোধ ॥ ১৩৪

সন্তানের লালনপালনে শ্রেষ্ঠতম ও কৌশলগত পন্থা অবলম্বন করে ॥ ১৩৭

সন্তানদের প্রতি ভালোবাসা ও মমতা অনুভব করে ॥ ১৩৯

সন্তানদের জন্য উদারচিত্তে ব্যয় করে ॥ ১৪৩

মায়া-মমতা ও খরচের ক্ষেত্রে ছেলে ও

মেয়েদের মাঝে পার্থক্য করে না ॥ ১৪৬

সন্তানদের ওপর কড়া নজর রাখে ॥ ১৪৮

সন্তানদের মাঝে সমতা বিধান করে ॥ ১৫১

সন্তানদের উন্নত আখলাক-চরিত্র শিক্ষা দেয় ॥ ১৫২

আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মুসলমানের সম্পর্ক

আত্মীয়তা-সম্পর্ক কী? : ১৫৫

ইসলামে আত্মীয়তা-সম্পর্কের গুরুত্ব : ১৫৫

মুসলমান ইসলামের দিক-নির্দেশনা

অনুযায়ী আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করে : ১৬৪

অমুসলিম আত্মীয়দের সাথেও সুসম্পর্ক রাখে : ১৬৯

আত্মীয়তা-সম্পর্কের ব্যাপক অর্থ অনুধাবন করে : ১৭১

আত্মীয়-স্বজনরা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন

করলেও তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখে : ১৭২

প্রতিবেশীদের সাথে মুসলমানের সম্পর্ক

প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার-সম্পর্কিত

ইসলামি নির্দেশনা অনুসরণ করে : ১৭৫

প্রকৃত মুসলমান প্রতিবেশীর প্রতি উদার হয় : ১৭৮

নিজের জন্য যা পছন্দ করে, প্রতিবেশীর জন্যও তাই পছন্দ করে : ১৭৮

বর্তমান মানবতার করুণ পরিণতির

কারণ ইসলামি আখলাকের অনুপস্থিতি : ১৮০

সাধ্যানুযায়ী প্রতিবেশীর উপকার করে : ১৮২

মুসলিম ও অমুসলিম উভয় প্রকার

প্রতিবেশীর সাথে সে সদ্যবহার করে : ১৮৪

সদ্যবহার ও উপকারের ক্ষেত্রে নিকটতম প্রতিবেশীকে এগিয়ে রাখে : ১৮৫

প্রকৃত মুসলমান একজন উত্তম প্রতিবেশী হয়ে থাকে : ১৮৬

খারাপ প্রতিবেশী ইমানের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত : ১৮৮

খারাপ প্রতিবেশীর আমল বিনষ্ট হয়ে যায় : ১৮৯

প্রতিবেশীর সাথে পাপকর্মে লিপ্ত হয় না : ১৯০

প্রতিবেশীর উপকার করতে অবহেলা করে না : ১৯৩

প্রতিবেশীর পক্ষ থেকে পাওয়া কষ্টের ওপর ধৈর্যধারণ করে : ১৯৪

প্রতিবেশীর মন্দ আচরণের মোকাবেলায় মন্দ আচরণ করে না : ১৯৫

প্রতিবেশীর অধিকার আদায়ে সচেষ্ট : ১৯৬

ভাই-বন্ধুদের সাথে মুসলমানের সম্পর্ক

- আল্লাহর জন্য তাদের ভালোবাসে : ১৯৭
- আল্লাহর জন্য পরস্পর মহাবতকারীদের মর্যাদা : ১৯৮
- মুসলমানদের জীবনে আল্লাহর জন্য ভালোবাসার প্রভাব : ২০৪
- ভাই-বন্ধুদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ এবং
তাদের সাথে কথা বলা বন্ধ করে না : ২০৬
- তাদের প্রতি উদার এবং দোষত্রুটি ক্ষমা করে দেয় : ২১২
- দেখা-সাক্ষাৎ করার সময় হাস্যমুখ থাকে : ২১৪
- তাদের কল্যাণ কামনা করে : ২১৬
- তাদের সাথে সদ্যবহার করে এবং কৃত অঙ্গীকার পালন করে : ২১৯
- ভাই-বন্ধুদের সাথে বিনম্র আচরণ করে : ২২৩
- তাদের গিবত করে না : ২২৫
- তাদের সাথে অহেতুক বিতর্ক ও
মশকরা করে না এবং ওয়াদা ভঙ্গ করে না : ২২৭
- নিজের ওপর ভাইদের অগ্রাধিকার দেয় : ২২৮
- তাদের অগোচরে তাদের জন্য দুআ করে : ২৩৮

সমাজের সাথে মুসলমানের সম্পর্ক

- ভূমিকা : ২৪২
- সত্যবাদী : ২৪৩
- প্রতারক নয় : ২৪৩
- হিংসুক নয় : ২৪৬
- কল্যাণকামী : ২৫০
- ওয়াদা রক্ষাকারী : ২৫২
- তার চরিত্র সুন্দর : ২৫৫
- তার ভেতর লজ্জাবোধ আছে : ২৬১
- মানুষের সাথে কোমল আচরণ করে : ২৬৩

দয়ালু : ২৬৮

ক্ষমাশীল : ২৭৩

উদারচিত্তের অধিকারী : ২৮০

সদা হাস্যোজ্জ্বল : ২৮১

রসিক : ২৮২

সহনশীল : ২৮৭

গালিগালাজ ও অশ্লীল কথা থেকে বিরত থাকে : ২৯১

যাকে তাকে ফাসিক ও কাফির আখ্যা দেয় না : ২৯৫

লাজুক ও দোষ গোপনকারী : ২৯৬

অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় না : ৩০১

গিবত ও চোগলখোরি থেকে দূরে থাকে : ৩০২

মিথ্যা বলে না : ৩০৫

নেতিবাচক ধারণা থেকে বেঁচে থাকে : ৩০৬

গোপনীয়তা রক্ষাকারী : ৩১০

তৃতীয় জনের উপস্থিতিতে দুজনে কানে কানে কথা বলে না : ৩১৩

অহংকারী নয় : ৩১৫

বিনয়ী : ৩১৮

কারও সাথে বিদ্রূপ করে না : ৩২১

বড় ও মর্যাদাবান লোকদের সম্মান করে : ৩২২

ভালো মানুষদের সান্নিধ্যে থাকে : ৩২৮

মানুষের উপকার করতে এবং তাদের কষ্ট লাঘব করতে সচেষ্ট থাকে : ৩৩২

মুসলমানদের মাঝে মীমাংসা করে দেওয়ার চেষ্টা করে : ৩৪১

সত্যের দিকে আহ্বান করে : ৩৪৪

সৎ কাজের আদেশ করে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে : ৩৪৮

দাওয়াতের সময় চতুরতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয় : ৩৫৩

শঠতা করে না : ৩৫৮

রিয়া ও অহংকার থেকে দূরে থাকে : ৩৬২

দৃঢ়সংকল্প ও অটল : ৩৬৭

অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যায় : ৩৭১

জানাজায় অংশগ্রহণ করে : ৩৭৯

উপকারের বিনিময় প্রদান করে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে : ৩৮৮

মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকে এবং

তাদের থেকে কষ্ট পেলে সবর করে : ৩৯০

লোকদের আনন্দ দেয় : ৩৯৩

কল্যাণের পথ দেখায় : ৩৯৪

সহজ করে, কঠিন করে না : ৩৯৫

ন্যায়বিচারক : ৩৯৭

অন্যায় করে না : ৩৯৯

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ পছন্দ করে : ৪০২

অতিরিক্ত গুরু উচ্চারণ ও অধিক সাহিত্য সহকারে কথা বলে না : ৪০২

অন্যের বিপদে খুশি হয় না : ৪০৩

উদারচিত্ত ও দানশীল : ৪০৪

দান করার পর খোঁটা দেয় না : ৪২৫

অতিথিপরায়ণ : ৪২৭

নিজের ওপর অন্যকে অগ্রাধিকার দেয় : ৪৩৩

অভাবগ্রস্তকে সময় দেয় : ৪৩৫

যাচনা ও ভিক্ষাবৃত্তি করে না : ৪৩৯

সে মানুষের সাথে অন্তরঙ্গ, আর মানুষও তার সাথে অন্তরঙ্গ : ৪৪০

ইসলামি রীতির সামনে ব্যক্তিগত স্বভাব বিসর্জন দেয় : ৪৪৩

ইসলামি আদব ও শিষ্টাচার অনুযায়ী পানাহার করে : ৪৫০

সালামের প্রসার করে : ৪৬১

অনুমতি ছাড়া অন্যের গৃহে প্রবেশ করে না : ৪৬৯

মজলিসের যেখানে জায়গা পায়, সেখানেই বসে পড়ে : ৪৭৬

মজলিসে যথাসম্ভব হাই তোলা থেকে বিরত থাকে : ৪৭৯

হাঁচি দেওয়ার সময় ইসলামি শিষ্টাচার মেনে চলে ॥ ৪৮০

অন্যের ঘরে উঁকি দেয় না ॥ ৪৮৩

বিপরীত লিঙ্গের সাদৃশ্য অবলম্বন করে না ॥ ৪৮৩

পরিশিষ্ট ॥ ৪৮৭



প্রারম্ভিকা

হামদ ও সালাতের পর, প্রায় দশ বছর ধরে ‘ইসলামের আলোকে আদর্শ মুসলিমের পরিচয়’ শীর্ষক বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে আসছি। এর কারণ হলো, বর্তমান সময়ে অধিকাংশ মুসলমানকে দেখা যায়, তারা দ্বীনের এক বিষয়ে বাড়াবাড়ি করছে তো আরেক বিষয়ে ছাড়াছাড়ি করছে। কিছু বিষয়ে গুরুত্ব দেয় আর কিছু বিষয়ে শিথিলতা দেখায়। যেমন : কোনো কোনো মানুষকে দেখা যায়, তারা প্রথম কাতারে নামাজ পড়তে তো খুবই আগ্রহী, কিন্তু তার মুখ বা শরীর থেকে যে অসহ্য দুর্গন্ধ বের হয়, সেদিকে তার কোনো খেয়াল নেই! কাউকে দেখা যায়, সে বিনম্রচিত্তে আল্লাহভীতির সহিত ইবাদত করে, কিন্তু আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার ক্ষেত্রে অবহেলা করে। অনেককে দেখা যায়, তারা ইবাদত ও ইলমের প্রতি খুব গুরুত্ব দেয়, কিন্তু সন্তানদের সুষ্ঠু লালনপালনের ক্ষেত্রে টিলেমি করে। তারা কী পড়ছে, কার সাথে মেলামেশা করছে, সে ব্যাপারে চরম উদাসীন থাকে। অনেক মানুষ আছে, তারা সন্তানদের প্রতি খুব যত্নশীল হয়, কিন্তু পিতা-মাতার অবাধ্য হয় এবং তাদের সাথে কঠোর আচরণ করে। আবার অনেক মানুষকে দেখা যায়, তারা পিতা-মাতার সাথে খুব সদাচরণ করে, কিন্তু স্ত্রীর ওপর জুলুম করে এবং তার জীবন দুর্বিষহ করে তোলে। অথবা স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে ভালো ব্যবহার করে, কিন্তু প্রতিবেশীর সাথে খারাপ আচরণ করে। অনেক মানুষ আছে, যারা নিজেদের ব্যক্তিগত বিষয়ের প্রতি খুব যত্নবান হয়, কিন্তু সামাজিক বিষয় ও মুসলমানদের সামগ্রিক বিষয় নিয়ে তেমন একটা মাথা ঘামায় না। আরেক ধরনের মানুষ আছে, যারা খুব দ্বীনদার ও নেককার, কিন্তু তাদের মাঝে ইসলামের বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যেমন : সালাম, পানাহার এবং মানুষের সাথে মেলামেশা ও কথাবার্তা ইত্যাদিতে ইসলামি আদব ও শিষ্টাচার পাওয়া যায় না। বড় আশ্চর্যের বিষয় হলো, উল্লিখিত



ক্রটিগুলো এমন অনেক ব্যক্তির মাঝেও দেখা যায়, যাদেরকে ইসলামের জন্য বিভিন্ন অবদান থাকার কারণে আলাদা বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা হয়। তারা অলসতাবশত ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এ ভুলগুলো করে থাকেন।

‘ইসলামের আলোকে আদর্শ মুসলিমের পরিচয়’ শীর্ষক বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য আমি মুসলমানদের জীবনসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আয়াত ও হাদিস নিয়ে গবেষণা করেছি। যাতে মুসলমানদের সামনে; বিশেষ করে প্র্যাক্টিসিং মুসলমানদের সামনে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় এবং নিজেদের ভুল ও ক্রটিগুলো উপলব্ধি করে ইসলামের অনুপম সুন্দর চরিত্রে নিজেদের ভূষিত করতে পারে।

গবেষণার পর আমি দেখতে পেলাম, ইসলাম মুসলমানদের থেকে যা চায় আর মুসলমানরা নিজেদের জন্য যা চায়—এ দুইয়ের মাঝে রয়েছে বিস্তর তফাত। অবশ্য অল্পসংখ্যক লোক, যাদের আকিদা বিশুদ্ধ, ইসলাম সুন্দর, অন্তর পরিশুদ্ধ ও মানসিকতা উন্নত—তারা ইসলামের দাবি ও চাওয়া অনুযায়ী জীবনযাপন করে থাকেন।

অতীব আশ্চর্যের বিষয় হলো, মানুষের জীবনের প্রতিটি অংশ নিয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ কথা বলেছেন। ছোট বা বড় কোনো বিষয়ই বাদ দেওয়া হয়নি। প্রভুর সাথে মানুষের সম্পর্ক কী হবে, নিজের সাথে সম্পর্ক কী হবে, চারপাশের মানুষের সাথে সম্পর্ক কেমন হতে হবে—সব বিষয় কুরআন ও হাদিসে বিস্তারিতভাবে উঠে এসেছে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, ইসলাম মানুষের আদর্শ ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক জীবনের পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা তৈরি করে দিয়েছে।

সুতরাং ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মুসলমানকে এমনই হতে হবে, যেমনটি ইসলাম কামনা করে। এর জন্য কুরআন ও হাদিসে যেসব উত্তম স্বভাব-চরিত্র ও গুণাবলির প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে, সেগুলো অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিতে আমি এ বিষয়সম্পর্কিত আয়াত ও হাদিস একত্র করেছি এবং সেগুলোকে বিষয়ভিত্তিক অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি। অধ্যায়গুলো হলো :

- প্রভুর সাথে মুসলমানের সম্পর্ক



- নিজের সাথে মুসলমানের সম্পর্ক
- পিতা-মাতার সাথে মুসলমানের সম্পর্ক
- স্ত্রীর সাথে মুসলমানের সম্পর্ক
- সন্তানদের সাথে মুসলমানের সম্পর্ক
- আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মুসলমানের সম্পর্ক
- ভাই-বন্ধুদের সাথে মুসলমানের সম্পর্ক
- সমাজের সাথে মুসলমানের সম্পর্ক

এ বিষয়গুলোর ব্যাপারে কুরআন ও হাদিস নিয়ে গবেষণা করার সময় প্রতি মুহূর্তে আমি অনুভব করেছি যে, বান্দার জন্য আল্লাহর দয়া অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। তিনি বান্দাদের গোমরাহির অতল গহ্বর থেকে তুলে হিদায়াতের শীর্ষ চূড়ায় আরোহণের ব্যবস্থা করেছেন। এর জন্য তিনি যুগে যুগে নবি-রাসুল প্রেরণ করেছেন। জীবনযাপনের নীতি ও রীতি প্রণয়ন করে দিয়েছেন। যেন মানুষ সব সময় উজ্জ্বল ও আলোকিত পথে পথ চলতে পারে; কখনো পতিত না হয় অন্ধকার গর্তে এবং কখনো পরিচালিত না হয় ভুল পথে।

আমি অনুভব করেছি, হিদায়াত, তারবিয়াত এবং আদব-শিষ্টাচারের প্রতি বর্তমান মানবজাতি খুব মুখাপেক্ষী। এ বিষয়গুলো ব্যতীত তাদের মানবতা পূর্ণতা পাবে না। এ বিষয়গুলো যদি না থাকে, তাদের মনে বাসা বাঁধবে স্বার্থপরতা ও আত্মসন্ত্রিস্ততা। মানুষকে কষ্ট দিতে, তাদের প্রতি জুলুম করতে এবং তাদের প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করতে বিবেক বাধা দেবে না। এ ছাড়াও অন্যান্য খারাপ অভ্যাস ও চরিত্র তাদের ভেতর জায়গা করে নেবে।

হিদায়াত, তারবিয়াত, আদব-শিষ্টাচারের প্রতি মানুষ শিশুকাল থেকেই মুখাপেক্ষী থাকে। একজন শিশু যখন তার বাবা-মার সামনে বড় হতে থাকে, তখন নিজের কাজের যথার্থতা প্রমাণ করা এবং ভাইয়ের ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য চেষ্টা করে। নিজের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলে ভাইকে লজ্জা দিতেও ছাড়ে না সে। তখন সব বিষয়ে অন্যান্য ভাই-বোনের চেয়ে নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার সহজাত একটা প্রবণতা কাজ করে সব শিশুর মনে।

এ প্রবণতা সহজাত ও প্রাকৃতিক। এটাকে পুঁজি করেই শিশু বেড়ে ওঠে। পার্থিব বিষয়ের যথার্থতা ও সফলতা এর ওপরই নির্ভর করে। তবে তা হতে হবে পরিমিত পর্যায়ে। তখন এ প্রবণতাই তাকে ভালো কর্মের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। কিন্তু এ বিষয়ে সে যখন সীমালঙ্ঘন করে, তখন তার ভেতর সৃষ্টি হয় অহংকার ও আত্মতুষ্টির মতো আত্মিক সব মহামারি। তখন সে নিজেকে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম দাবি করলেও আসলে সে শ্রেষ্ঠত্ব ও উত্তমতার পথ থেকে অনেক দূরে সরে পড়ে।

এখানেই দীন, তারবিয়াত ও আদব-শিষ্টাচারের প্রয়োজনীয়তা প্রকট হয়ে ওঠে। এগুলোই মানুষের উক্ত সহজাত প্রবণতাকে সীমার ভেতর আবদ্ধ করে রাখে। কারণ, এ জীবনে সকল শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মানের মূল উৎস হলো দীন। সুষ্ঠু তারবিয়াত ও উত্তম চরিত্র দ্বীনেরই শাখা-প্রশাখা। যুগ যুগ ধরে মানবতার মুক্তি ও সফলতা দ্বীনের কারণেই হয়ে আসছে।

মানুষের জীবন-সম্পর্কিত একটি চিরসত্য বিষয় হলো, তারা উন্নতির চেয়ে অবনতির দিকেই বেশি ধাবিত হয়। পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষা করার চেয়ে সম্পর্ক ছিন্ন করতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে। কারণ, উন্নতির চেয়ে অবনতি সহজ এবং সম্পর্ক রক্ষা করার চেয়ে সম্পর্ক ছিন্ন করতে মজা বেশি। মোটকথা, মানুষ ভ্রান্ত পথ বেছে নেওয়ার দিকেই বেশি লালায়িত থাকে। এজন্য তাদের অন্তরে যখন গাফিলতির মরিচা ধরে এবং তাদের পা সिरাতে মুসতাকিম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে, তখন তাদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য নিয়ন্ত্রণকারীর প্রয়োজন পড়ে। আল্লাহ কর্তৃক প্রণীত দীনই হলো সে নিয়ন্ত্রণকারী।

এজন্য যুগে যুগে প্রত্যেক ইসলামি গবেষক ও কলমসৈনিক এ দীনকে মানুষের সামনে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতে এবং তাদের জীবনের সাথে দ্বীনের সহজাত সম্পর্ক তুলে ধরার চেষ্টা করে আসছেন। আল্লাহ মানুষের জীবনকে কীভাবে পরিচালিত হতে দেখতে চান, তার রূপরেখা তুলে ধরেছেন তাদের লেখনীতে।

এ দীন সাত আসমানের ওপর থেকে আল্লাহ তাআলা নিছক একটি মতবাদ হিসাবে প্রেরণ করেননি, যা নিয়ে মানুষ কেবল গবেষণা ও পড়াশোনা করবে। কিংবা এটাকে নিছক একটি পবিত্র কালাম হিসাবেও অবতীর্ণ করেননি, যা

তীলাওয়াত করে মানুষ শুধু বরকত হাসিল করবে, কিন্তু তার নির্দেশনা ও মর্ম বুঝতে চাইবে না; বরং এ দ্বীনকে আল্লাহ তাআলা এজন্যই অবতীর্ণ করেছেন, যেন ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষ এ দ্বীন অনুযায়ী জীবনযাপন করে। তিনি এ দ্বীন এজন্যই প্রণয়ন করেছেন, যেন এর মাধ্যমে মানুষ অন্ধকারের পথ থেকে আলোর পথে ফিরে আসতে পারে।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ-يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ
سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

‘অবশ্যই আল্লাহর নিকট থেকে তোমাদের কাছে একটি জ্যোতি ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ এসেছে। যারা তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ এর দ্বারা তাদেরকে শান্তির পথে পরিচালিত করেন, তাদেরকে স্থায়ী অনুমতিক্রমে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে যান এবং দান করেন তাদের সরল পথের দিশা।’

এ দ্বীনি নির্দেশনার তত্ত্বাবধানে জীবন অনেক সুন্দর ও আলোকিত হয়ে ওঠে। এমন সুন্দর ও আলোকিত জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম পদক্ষেপ হলো প্রকৃত ও আদর্শ মুসলিম হওয়া। ইসলামকে নিজের মাঝে এমনভাবে ফিট করা, যেন তার মাঝেই মানুষ ইসলাম দেখতে পায়। তার সাথে বসবাস করলে তাদের ইমানে যেন প্রবৃদ্ধি ঘটে এবং ইসলামের প্রতি আগ্রহ প্রবল হয়।

দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ এমনটাই করেছিলেন। কেননা, ইসলামের সুদীর্ঘ যাত্রার প্রথম পদক্ষেপে যদি এমন কিছু ব্যক্তি তৈরি করা হয়, যাদের মাঝে ইসলাম পূর্ণাঙ্গরূপে বিদ্যমান, তখন তারা হয়ে যান একেকটি ভ্রাম্যমাণ কুরআন। তারা পৃথিবীর অলিগলি দিয়ে বিচরণ করবেন আর মানুষ তাদের মাঝে দেখতে পাবে মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যখন মানুষ জানতে

পারবে, একটি সুন্দর জীবনব্যবস্থা এ লোকগুলোর জীবনকে এত সুন্দর ও মহান করেছে, তখন তারাও সে জীবনব্যবস্থার প্রতি ধাবিত হবে। এভাবে দলে দলে মানুষ যোগদান করবে আল্লাহর মনোনীত দ্বীনে।

আজকের মানবজাতি; বিশেষ করে মুসলমানরা এমন আদর্শ মানবের কাঙাল। তারা এমন প্রকৃত মুসলিমের কাঙাল, যার ভেতর পরিপূর্ণ ইসলাম বিদ্যমান। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি আপনাদের দেবে সেই আদর্শ মুসলমানের পরিচয়।

পরিশেষে আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমার এ প্রয়াস কবুল করে নেন, এর মাধ্যমে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করেন। এবং এটিকে সেদিনের পাথেয় করে দেন, যেদিন পরিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে উপস্থিত হওয়া ছাড়া সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না।

মুহাম্মাদ আলি হাশিমি

রিয়াদ,

২৭ জুমাদাল উখরা, ১৪০১ হিজরি

১ মে ১৯৮১ ইংরেজি।

আল্লাহর সাথে মুসলমানের সম্পর্ক

সচেতন মুমিন

একজন মুসলমানের প্রতি ইসলামের প্রথম দাবি হলো, সে আল্লাহর প্রতি পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ ইমান রাখবে, তাঁর সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক রাখবে, সর্বদা তাঁর জিকির করবে এবং তাঁর ওপরই ভরসা করবে। উপায় ও উপকরণ অবলম্বনের পাশাপাশি আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকবে। আর অন্তরে এ ধারণা বদ্ধমূল রাখবে যে, সে যতই চেষ্টা করুক এবং যতই উপায়-উপকরণ অবলম্বন করুক না কেন, সব সময় সে আল্লাহর কুদরত, সাহায্য ও সহযোগিতার মুখাপেক্ষী।

প্রকৃত মুসলমানের হৃদয় জাগ্রত এবং তার চোখ খোলা থাকে। বিশাল সৃষ্টিজগতে আল্লাহর কুদরতি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সচেতন থাকে সে। সে বিশ্বাস করে, সৃষ্টিজগতের সকল ব্যবস্থাপনা এবং মানুষের সকল বিষয় আল্লাহর ইচ্ছায় সংঘটিত হয়। ফলে সে সর্বদা আল্লাহর জিকির করে এবং জীবনের প্রতিটি স্তরে ও সৃষ্টিজগতের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর অসীম কুদরতের নিদর্শন দেখতে পায়। এতে আল্লাহর প্রতি তার ইমান ও তাওয়াক্কুল বৃদ্ধি পায় এবং সে বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করতে থাকে।

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ
لِّأُولِي الْأَلْبَابِ - الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا
سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

‘নিশ্চয় আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্যে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা-গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে। (তারা বলে) হে আমাদের রব,



এসব আপনি অনর্থক সৃষ্টি করেননি। সকল পবিত্রতা আপনারই।
অতএব, আমাদের আপনি জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।”^২

আল্লাহর একান্ত আনুগত্যশীল

সত্যিকারের মুসলমানের জন্য সকল বিষয়ে আল্লাহর আনুগত্যশীল হওয়া, তাঁর ভয়ে ভীত হওয়া, তাঁর সকল আহকাম মেনে চলা একান্ত আবশ্যিক; যদিও এ ক্ষেত্রে মন তার বিরোধিতা করুক। আপন স্বভাবের বিরোধী হলেও আল্লাহর সকল আদেশ মান্য করতে হবে। ছোট বড় সকল বিষয়ে কোনোরূপ বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি ব্যতীত আল্লাহ ও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিরঙ্কুশ আনুগত্যই হলো মুসলমানের ইমানের মানদণ্ড।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন :

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِّمَا جِئْتُ بِهِ

‘তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত (পূর্ণাঙ্গ) ইমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমার আনীত শরিয়তের অনুগত হবে।’^৩

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي
أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

‘অতএব, আপনার পালনকর্তার কসম, তারা ইমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তারা আপনাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে করে, অতঃপর আপনার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোনো রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।’^৪

২. সূরা আলি ইমরান : ১৯০-১৯১

৩. শারহুস সুন্নাহ : ১০৪

৪. সূরা আন-নিসা : ৬৫

এটাই হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ-এর হুকুমের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ। এটাকে আল্লাহ ও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ ও নিরঙ্কুশ আনুগত্যও বলে। এটা ছাড়া ইমান পূর্ণ হয় না এবং ইসলাম পূর্ণাঙ্গরূপে বাস্তবায়িত হয় না। এজন্যই প্রকৃত মুসলমানের ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন ও রাষ্ট্রীয় জীবনের কোনো বিষয়ে আল্লাহর বিধান ও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

অধীনস্থদের জিম্মাদারি অনুভবকারী

মুসলমানের পরিবারের কোনো সদস্য বা অধীনস্থ কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ-এর বিধানে কোনো অবহেলা বা শিথিলতা করে, তাহলে ওই মুসলমানকে জবাবদিহি করতে হবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

‘তোমাদের প্রত্যেকই জিম্মাদার এবং প্রত্যেকই নিজের অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।’^৫

সত্যিকারের মুসলমান এ জিম্মাদারি ও জবাবদিহি সম্পর্কে সচেতন থাকে। তাই অধীনস্থদের মধ্যে কেউ যদি দ্বীনের ব্যাপারে কোনোরূপ শিথিলতা দেখায়, তখন সে ধৈর্য ধরতে পারে না; বরং খুব দ্রুতই তা দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সুতরাং কেউ যদি এ জিম্মাদারি ও দায়িত্ব আদায় করার ক্ষেত্রে কালক্ষেপণ করে, বুঝতে হবে তার ইমান, দ্বীন এমনকি তার পুরুষত্বেও দুর্বলতা আছে।

আল্লাহর ফয়সালা ও ব্যবস্থাপনার প্রতি সন্তুষ্ট

প্রকৃত মুসলমান আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদিরের প্রতি পূর্ণ সন্তুষ্ট থাকে। তার দৃষ্টিভঙ্গি এমনই হয়, যেমনটি রাসুলুল্লাহ ﷺ হাদিসে ইরশাদ করেছেন।

৫. সহিহুল বুখারি : ৫২০০, সহিহ মুসলিম : ১৮২৯

তিনি বলেন :

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا
لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَاءٌ،
صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ

‘মুমিনের ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক! তার সকল বিষয়ই কল্যাণকর।
যদি তার সুসময় আসে, তখন গুণকরিয়া আদায় করে; এটা তার জন্য
কল্যাণকর। আর যদি তার খারাপ সময় আসে, তখন সবর করে;
এটাও তার জন্য কল্যাণকর।’^৬

এর কারণ হলো, সত্যিকার মুসলমান দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর
ফয়সালা ও তাকদিরের প্রতি সম্ভ্রষ্ট থাকা ইমানের অন্যতম রুকন বা
আবশ্যকীয় বিষয়। সে বিশ্বাস করে, তাকদিরে যা লেখা আছে, তা ঘটবেই
ঘটবে, তাকে বাধা দেওয়ার বা প্রতিহত করার সাধ্য কারও নেই। সে এটাও
বিশ্বাস করে যে, আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদিরের প্রতি সম্ভ্রষ্টি প্রকাশ করলে
আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় সাওয়াব অর্জিত হয় এবং আনুগত্যশীল ও সফলকাম
বান্দাদের তালিকাভুক্ত হওয়া যায়।

এই বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তার সকল বিষয় কল্যাণকর হয়ে ওঠে।
যখন তার সুসময় চলে, তখন সে মহান নিয়ামতদাতা আল্লাহর গুণকরিয়া
আদায় করতে থাকে। আর যখন দুর্দিন চলে, তখন আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে
ধৈর্যধারণ করে এবং আল্লাহর ফয়সালার প্রতি সম্ভ্রষ্টি প্রকাশ করে। এভাবে
উভয় অবস্থা তার জন্য কল্যাণকর হয়ে ওঠে।

প্রত্যাবর্তনকারী

মুমিনের কলবেও কখনো কখনো অলসতা ও গাফিলতির ধুলোবালি জমে,
ফলে তার পদস্থলন হয়। তখন বিচক্ষণ, আনুগত্যশীল, নম্র ও আল্লাহভীরু
মুমিন দ্রুতই সতর্ক হয়ে যায়। গাফিলতির নিদ থেকে গা ঝাড়া দেয়।

৬. সহিহ মুসলিম : ২৯৯৯

অবহেলার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। এভাবে সে লজ্জিত, বিনম্র ও ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে আল্লাহর নিরাপত্তা ও হিফাজতের বেষ্টনীতে পুনরায় ফিরে আসে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ

‘যাদের মনে ভয় রয়েছে, তাদের ওপর শয়তানের আগমন ঘটায় সাথে সাথেই তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের বিবেচনাশক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে।’^৭

তাই যে অন্তঃকরণ আল্লাহর ভালোবাসা ও তাকওয়া দ্বারা ভরপুর থাকে, সে অন্তঃকরণে গাফিলতি ও অবহেলা দেখা যায় না। পক্ষান্তরে যে অন্তঃকরণ আল্লাহর বিধান ও হিদায়াত থেকে বিমুখ থাকে, সে অন্তঃকরণে ছেয়ে থাকে গাফিলতির কালো আবরণ। প্রকৃত মুসলমানের অন্তঃকরণ সর্বদা ইসতিগফার ও তাওবায় মাশগুল থাকে এবং ইবাদত, হিদায়াত, তাকওয়া ও সম্ভৃষ্টির স্নিগ্ধতায় সিক্ত থাকে।

সর্বদা আল্লাহর সম্ভৃষ্টি অর্জনের ফিকির করে

প্রকৃত মুসলমান তার সকল কাজে আল্লাহর সম্ভৃষ্টি তালাশ করে। তার সকল পদক্ষেপ ও কর্মে একমাত্র আল্লাহর সম্ভৃষ্টি অর্জনই উদ্দেশ্য থাকে। মানুষের সম্ভৃষ্টি অর্জনের ফিকির তার থাকে না; বরং অনেক সময় আল্লাহকে সম্ভৃষ্ট করতে গিয়ে মানুষের অসম্ভৃষ্টি খুশিমনে বরণ করে নেয়।

এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

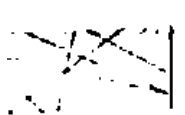
مَنِ التَّمَسَّ رِضَاءَ اللَّهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللَّهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنِ التَّمَسَّ رِضَاءَ النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَّهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ

৭. সূরা আল-আরাফ : ২০১

‘যে ব্যক্তি মানুষকে অসম্ভব করে আল্লাহর সম্ভব অর্জন করে, মানুষের (অসম্ভবের কারণে) ক্ষতিপূরণের জন্য আল্লাহ-ই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসম্ভব করে মানুষের সম্ভব অর্জন করে, আল্লাহ তাআলা তাকে মানুষের কাছে সোপর্দ করে দেন।’^৮

এজন্য আল্লাহ তাআলা বান্দার আমলসমূহ তাঁর সম্ভবের মানদণ্ডে যাচাই করেন। যে সকল আমল তাঁর সম্ভবের জন্য করা হয়, সেগুলোর প্রতি তিনি সম্ভব হন এবং কবুল করে নেন। আর যে সকল আমলে তাঁর সম্ভব উদ্দেশ্য ছিল না, সেগুলো কবুল করেন না। সকল আমলের ক্ষেত্রে এটাই মুসলমানের মানদণ্ড হওয়া চাই। অর্থাৎ তার সকল কথা ও কাজে একমাত্র আল্লাহর সম্ভব অর্জনই উদ্দেশ্য হতে হবে। তখন সে কিছু বিষয়ে আল্লাহর আনুগত্য, কিছু বিষয়ে তাঁর নাফরমানি করতে পারবে না এবং কোনো বিষয়কে এক সময় হালাল, আরেক সময় হারাম মনে করবে না। কেননা, তার নিয়ত ও উদ্দেশ্যের মাঝে যখন কোনোরূপ স্ববিরোধিতা থাকবে না, তখন তার কথা ও কাজেও স্ববিরোধিতা থাকবে না।

বর্তমান সময়ে অনেক লোককে দেখা যায়, তারা মসজিদে এসে তাকওয়া ও খুশু-খুজুর সাথে নামাজ আদায় করে, কিন্তু অন্যদিকে বাজারে গিয়ে সুদি কাজ-কারবার করে; ঘর, রাস্তাঘাট, মাদরাসা, সভা-সমিতি ইত্যাদিতে নিজেদের মাঝে, স্ত্রীদের মাঝে এবং সন্তান-সন্ততি ও অধীনস্থদের মাঝে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করে না। তারা দ্বীনের আসল উদ্দেশ্য (আল্লাহর সম্ভব অর্জন) অনুধাবন করতে অবহেলা করছে বা ব্যর্থতার শিকার হচ্ছে। ফলে সকল বিষয়ে সে নিজের ইচ্ছা ও সম্ভবিকেই বিচারক মানছে। এভাবে মুসলমানরা দ্বীন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। যেতে যেতে এক সময় মুসলমান নামটাই কেবল বাকি থাকে। এই যে দ্বিমুখী কর্মতৎপরতা, অর্থাৎ দ্বীনের কিছু বিষয় গুরুত্ব সহকারে পালন করা আর বাকি বিষয়ের প্রতি চরম অবহেলা করা—এটাই বর্তমান সময়ে মুসলমানদের সবচেয়ে মারাত্মক রোগ।



ফরজ, ওয়াজিব ও নফলসমূহ যত্ন সহকারে আদায় করে

প্রকৃত মুসলমান ইসলামের সকল ফরজ বিধান ও রুকনসমূহ পরিপূর্ণরূপে সুন্দরভাবে আদায় করে। এ ক্ষেত্রে কোনোরূপ শিথিলতা ও গড়িমসি করে না।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যথাযথভাবে আদায় করে

সে সময়মতো পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে। ‘কেননা, নামাজ হলো দ্বীনের খুঁটি। যে সেটাকে কায়েম রাখে, সে দ্বীনকে কায়েম রাখে। আর যে তা পরিত্যাগ করে, সে দ্বীনকে পরিত্যাগ করে।’^৯ তা ছাড়া নামাজ হলো সবচেয়ে মর্যাদা ও ফজিলতপূর্ণ আমল। হাদিস শরিফে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ‘আমি রাসুলুল্লাহ স-কে জিজ্ঞেস করলাম, কোন আমল সর্বোত্তম?’ রাসুলুল্লাহ স বললেন, ‘সময়মতো নামাজ আদায় করা।’ আমি বললাম, ‘তারপর কোন আমল?’ তিনি বললেন, ‘মা-বাবার সাথে সদ্যবহার করা।’ আমি বললাম, ‘তারপর কোন আমল?’ তিনি বললেন, ‘আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।’^{১০}

নামাজ সর্বোত্তম আমল হওয়ার কারণ হলো, এটি আল্লাহ ও বান্দার মাঝে সম্পর্ক স্থাপন করে। জীবনের বিভিন্ন ব্যস্ততা থেকে মানুষকে মুক্ত রেখে পূর্ণ মনোযোগ আল্লাহর দিকে নিবদ্ধ করে। এর মাধ্যমে আল্লাহর হিদায়াত ও সহযোগিতা লাভ করা যায় এবং গুনাহ থেকে বিরত থাকা যায়। এ ছাড়াও নামাজের মধ্যে সিরাতে মুসতাকিমের ওপর অটল থাকার প্রার্থনা করা হয়।

নামাজ যে সবচেয়ে উত্তম ও সর্বাধিক ফজিলতপূর্ণ আমল, এ ব্যাপারে কোনো ধরনের সন্দেহ নেই। কেননা, নামাজ এমন এক জলপূর্ণ ঘাট, যেখান থেকে মুসলমান সহজেই তার পাথেয় তথা তাকওয়া অর্জন করে নিতে পারে। এমন এক স্বচ্ছ পানির ঝরনা, যার প্রবাহে গুনাহসমূহ ভাসিয়ে দেওয়া যায়।

এ সম্পর্কে আবু হুরাইরা রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ স ইরশাদ করেছেন :

৯. ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন : ১/১৪৭

১০. সহিহুল বুখারি : ৭৫৩৪



أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلُّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ. قَالَ: فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَ الْخَطَايَا.

‘যদি তোমাদের কারও দরজার সামনে একটি নদী থাকে আর সে ওই নদীতে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তার শরীরে কি কোনো ময়লা থাকবে?’ সাহাবায়ে কিরাম ৷ বললেন, ‘না, কোনো ময়লা থাকবে না।’ রাসুলুল্লাহ ৷ বললেন, ‘পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের উদাহরণ এমনই। এগুলো দ্বারা আল্লাহ তাআলা (বান্দার) গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেন।’^{১১}

জাবির ৷ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ৷ ইরশাদ করেছেন :

مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَلِ نَهْرٍ جَارٍ، غَمْرٌ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلُّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ

‘পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের দৃষ্টান্ত তোমাদের কারও দরজার সামনে অবস্থিত প্রবহমান নদীর ন্যায়, যাতে সে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে।’^{১২}

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ৷ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنْ امْرَأَةٍ قُبْلَةً، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {أَقِمِ الصَّلَاةَ [ص: ১১২] طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ، إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: ১১৬] فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلِي هَذَا؟ قَالَ: لِجَمِيعِ أُمَّتِي كُلِّهِمْ

‘এক ব্যক্তি একটি মেয়েকে চুমু খেয়ে বসল। তখন সে নবিজি ৷-এর নিকট এসে এ ব্যাপারে অবহিত করল। অতঃপর আল্লাহ তাআলা এ আয়াতটি অবতীর্ণ করলেন, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ (অর্থ : আর দিনের দুই

১১. সুনানুত তিরমিজি : ২৮৬৮

১২. সহিহ মুসলিম : ৬৬৮

প্রান্তেই নামাজ কায়েম করো এবং রাতের প্রান্তভাগে। নিশ্চয় পুণ্য কাজ পাপসমূহ দূর করে দেয়। [সূরা হুদ : ১১৪]) লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আয়াতের বিধান কি আমার জন্যও প্রযোজ্য হবে? রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, সকল উম্মতের জন্য প্রযোজ্য হবে।”^{১৩}

আবু হুরাইরা র. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

الصَّلَاةُ الْحُمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، مَا لَمْ تُغَشَّ
الْكَبَائِرُ

‘পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এক ওয়াক্ত থেকে অপর ওয়াক্তের মাঝের গুনাহসমূহের জন্য এবং এক জুমআর নামাজ থেকে অপর জুমআর নামাজের মাঝখানের গুনাহসমূহের জন্য কাফফারা, যতক্ষণ না সে কবির গুনাহে লিপ্ত হয়।’^{১৪}

উসমান বিন আফফান র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

مَا مِنْ أَمْرٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضوءَهَا وَخُشوعَهَا
وَرُكُوعَهَا، إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يَأْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ
الدَّهْرَ كُلَّهُ

‘কোনো ফরজ নামাজের সময় আসার পর যে মুসলিম উত্তমরূপে অজু করে, আল্লাহভীরুতার সহিত উত্তমরূপে রুকু আদায় করে (নামাজ আদায় করবে), ওই নামাজ তার পূর্ববর্তী সময়ের কবির গুনাহ ব্যতীত সকল গুনাহের জন্য কাফফারা হবে। এভাবে সারাজীবন হতে থাকবে।’^{১৫}

নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে এগুলো ছাড়াও আরও অসংখ্য হাদিস রয়েছে। সীমিত কলেবরে সবগুলো একত্র করা সম্ভবপর নয়।

১৩. সহিহল বুখারি : ৫২৬

১৪. সহিহ মুসলিম : ২৩৩

১৫. সহিহ মুসলিম : ২২৮

মসজিদে নামাজের জামাআতে হাজির হয়

প্রকৃত পরহেজগার মুসলমান যথাসম্ভব মসজিদের প্রথম জামাআতে হাজির থাকার জন্য লালায়িত থাকে। কেননা, রাসুলুল্লাহ ﷺ হাদিস শরিফে ইরশাদ করেছেন :

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

‘জামাআত সহকারে নামাজ একাকী নামাজের চেয়ে সাতাশগুণ বেশি উত্তম।’^{১৬}

অন্য হাদিসে ইরশাদ করেছেন :

إِذَا تَوَضَّأَ، فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَمْ يَحْطْ خَطْوَةً، إِلَّا رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإِذَا صَلَّى، لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ، مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلَا يَزَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَهَرَ الصَّلَاةَ

‘মুসলমান যখন উত্তমরূপে অজু করে নামাজ পড়ার জন্য মসজিদের উদ্দেশে বের হয়, তখন প্রতি কদমে একটি করে দরজা বুলন্দ হয় এবং একটি করে গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।’^{১৭} নামাজ শেষ করার পর যতক্ষণ পর্যন্ত নামাজের জায়গায় অবস্থান করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতারা এ বলে দুআ করতে থাকেন, “হে আল্লাহ, এ ব্যক্তির ওপর রহমত বর্ষণ করুন, তার প্রতি দয়া করুন।” আর (মসজিদে প্রবেশ করার পর) যতক্ষণ পর্যন্ত নামাজের অপেক্ষায় থাকবে, সে সময়টাও নামাজের অন্তর্ভুক্ত ধরা হবে।’^{১৮}

জামাআত সহকারে নামাজ পড়তে আগ্রহী ব্যক্তির জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

১৬. সহিহ মুসলিম : ৬৫০

১৭. এজন্যই আব্দুল্লাহ বিন উমর ﷺ মসজিদে গমন করার সময় ছোট ছোট কদম ফেলতেন, যেন কদম বেশি হয়ে সাওয়াবও বৃদ্ধি পায়। (অনুবাদক)

১৮. সহিহল বুখারি : ৬৪৭

তিনি ইরশাদ করেছেন :

مَنْ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ، أَوْ رَاحَ، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نَزْلًا، كُلَّمَا غَدَا،
أَوْ رَاحَ

‘যে ব্যক্তি (জামাআত সহকারে নামাজ পড়ার জন্য) সকাল বা সন্ধ্যায় মসজিদে গমন করে, যে যতবারই গমন করে, প্রতিবারেই আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি করে বিশ্রামাগার নির্মাণ করেন।’^{১৯}

এজন্যই সাহাবায়ে কিরাম ৷ জামাআত সহকারে নামাজ পড়ার প্রতি বেশি আগ্রহী ও লালায়িত ছিলেন।

এ সম্পর্কে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ৷ বলেন :

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ
حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
سُنَنَ الْهُدَى، وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي
بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ، لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ،
وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ... وَلَقَدْ رَأَيْنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا
إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النَّفَاقِ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ
الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ

‘যে ব্যক্তি চায় যে, সে আগামীকাল মুসলিম অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সে যেন আজানের পরপরেই (মসজিদে) নামাজের প্রতি ধাবিত হয়। কেননা, আল্লাহ তাআলা তোমাদের নবি ৷-এর জন্য সুনানে হুদা^{২০} প্রবর্তন করেছেন। আর আজানের পর (মসজিদে)

১৯. সহিহ মুসলিম : ৬৬৯, সহিহল বুখারি : ৬৬২

২০. সুনানে হুদা অর্থ, রাসুলুল্লাহ ৷ যেসব কাজ ইবাদত হিসাবে পালন করেছেন এবং উম্মতের জন্যও তা পালনের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছেন। এটাকে আমাদের পরিভাষায় সুন্নাতে মুআক্কাদাও বলে, যা ওয়াজিবের নিকটবর্তী স্তর। (অনুবাদক)

নামাজের প্রতি ধাবিত হওয়া সেই সুনানে হুদার অন্তর্ভুক্ত। তোমরা যদি ঘরে একাকী নামাজ পড়া এই ব্যক্তির ন্যায় ঘরের মধ্যে একাকী নামাজ পড়ো, তাহলে তোমরা নবি ﷺ-এর আদর্শ ত্যাগকারী হবে। আর যদি তোমরা তোমাদের নবি ﷺ-এর আদর্শ পরিত্যাগ করো, তাহলে তোমরা গোমরাহ হয়ে যাবে। ...জামাআতে নামাজ পড়া থেকে যারা দূরে থাকে, তাদের আমি পরিষ্কার মুনাফিক মনে করি। রাসুলুল্লাহ ﷺ (দুর্বল ও অসুস্থ হয়ে যাওয়ার পরেও) দুজন ব্যক্তির কাঁধে ভর করে জামাআতের কাতারে দাঁড়িয়ে যেতেন।’^{২১}

এ ছাড়াও রাসুলুল্লাহ ﷺ জামাআত পরিত্যাগকারী লোকদের ঘর পুড়িয়ে দেওয়ার ইচ্ছে ব্যক্ত করেছেন।

তিনি ইরশাদ করেছেন :

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ بِحَطَبٍ، فَيُحْطَبَ، ثُمَّ أَمُرَّ
بِالصَّلَاةِ، فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ أَمُرَّ رَجُلًا فَيَوْمَّ النَّاسِ، ثُمَّ أَخَالَفَ إِلَى
رَجَالٍ، فَأَحْرَقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ

‘সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! আমার ইচ্ছে হয় যে, আমি লাকড়ি একত্র করার নির্দেশ দিই। তারপর নামাজের জন্য আজান দিতে বলি। তারপর একজনকে লোকজন নিয়ে (জামাআত সহকারে) নামাজ পড়াতে বলি। তারপর যেসব লোক জামাআতে শরিক হয়নি, তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিই।’^{২২}

জামাআতের প্রতি এত গুরুত্বারোপের কারণেই তো সাইদ বিন মুসাইরিব ﷺ-এর মতো ব্যক্তি ত্রিশ বছর পর্যন্ত আজানের পূর্বে মসজিদে উপস্থিত হয়ে প্রথম কাতারে জামাআত সহকারে নামাজ আদায় করেছেন! ইসলামের ইতিহাসে সাইদ বিন মুসাইরিব ﷺ-এর মতো লোক আরও অনেক আছেন।

২১. সহিহ মুসলিম : ৬৫৪

২২. সহিহল বুখারি : ৬৪৪

ঘর থেকে মসজিদের দূরত্ব সাহাবায়ে কিরাম  -কে জামাআতে উপস্থিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা দিতে পারত না। দূরত্ব বেশি হলে তাঁরা বরং খুশিই হতেন। কেননা, তখন মসজিদ অভিমুখে কদম বেশি হওয়ার কারণে আমলনামায় সাওয়াবও বেশি হয়।

উবাই বিন কাব   বলেন :

كَانَ رَجُلٌ لَا أَعْلَمُ رَجُلًا أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ، وَكَانَ لَا تُحْطِئُهُ صَلَاةٌ، قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: أَوْ قُلْتُ لَهُ: لَوْ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِي الظُّلُمَاءِ، وَفِي الرَّمْضَاءِ، قَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ مَنَزِلِي إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ يُكْتَبَ لِي مَمْشَايَ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَرُجُوعِي إِذَا رَجَعْتُ إِلَى أَهْلِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَكَ ذَلِكَ كُلَّهُ

‘জনৈক আনসারি সাহাবি—আমার জানামতে তার ঘর মসজিদ থেকে সবচেয়ে দূরে ছিল—তিনি কখনো জামাআত পরিত্যাগ করতেন না। তিনি বলেন, তাকে বলা হলো, অথবা (উবাই   নাকি অন্য কেউ, সে ব্যাপারে পরবর্তী একজন বর্ণনাকারীর সন্দেহ) আমি বললাম, আপনি একটা গাধা কিনছেন না কেন? যাতে অন্ধকার রাতে এবং প্রখর রোদের সময় তার ওপর সওয়ার হওয়া যেত। তিনি উত্তর দিলেন, আমার ঘর মসজিদের পাশে হোক, তা আমি চাই না। আমি চাই, মসজিদ অভিমুখে এবং মসজিদ থেকে বাড়ির উদ্দেশে ফেরার পথে আমার কদম বেশি লিপিবদ্ধ করা হোক। তখন রাসুলুল্লাহ   বললেন, আল্লাহ তোমার জন্য সবকিছু একত্র করে দিয়েছেন।’^{২৩}

সাহাবিদের মধ্যে যাদের বাড়ি মসজিদ থেকে দূরে ছিল, তাদেরকে রাসুলুল্লাহ   মসজিদের নিকট ঘর স্থানান্তর না করার পরামর্শ দিতেন। মসজিদের পথ দূরে হওয়ায় তাদের আমলনামায় মসজিদ অভিমুখে কদমের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এগুলো বিনষ্ট হবে না—এ কথা তাদের স্মরণ করিয়ে দিতেন।

২৩. সহিহ মুসলিম : ৬৬৩

জাবির ؓ বর্ণনা করেন :

خَلَّتِ الْبِقَاعُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ، فَأَرَادَ بَنُو سَلَمَةَ أَنْ يَنْتَقِلُوا إِلَى قُرْبِ
الْمَسْجِدِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُمْ:
«إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ»، قَالُوا: نَعَمْ،
يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَرَدْنَا ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا بَنِي سَلَمَةَ دِيَارُكُمْ تُكْتَبُ
آثَارُكُمْ، دِيَارُكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ. فِي رَوَايَةٍ بَعْدَهَا : فَقَالُوا: مَا
كَانَ يَسْرُنَا أَنَّا كُنَّا نَحْوَلُنَا.

‘মসজিদের আশপাশের কিছু জমি যখন খালি হলে বনি সালামা গোত্রের লোকেরা মসজিদের নিকট চলে আসার ইচ্ছা করলেন। রাসুলুল্লাহ ؓ-এর নিকট এ খবর পৌঁছলে তিনি বললেন, আমি খবর পেয়েছি যে, তোমরা নাকি মসজিদের নিকট চলে আসতে চাও? তারা বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসুল, আমরা তাই ইচ্ছা করেছি। তিনি বললেন, হে বনি সালামা গোত্রের লোকেরা, তোমরা তোমাদের বর্তমান স্থানেই থাকো; (মসজিদের দিকে) তোমাদের কদমের চিহ্নগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়। তোমরা তোমাদের বর্তমান স্থানেই থাকো; (মসজিদের দিকে) তোমাদের কদমের চিহ্নগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়।’^{২৪} এরপরের বর্ণনায় আছে, তখন তারা বললেন, (রাসুলুল্লাহ ؓ-এর এ কথায় যে আনন্দ আমরা পেয়েছি) এ আনন্দ জায়গা পরিবর্তন করলে পেতাম না।’^{২৫}

আবু মুসা ؓ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ؓ ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَشْيًى، فَأَبْعَدُهُمْ
وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ أَكْثَرُ أَجْرًا مِنَ الَّذِي
يُصَلِّيَهَا ثُمَّ يَنَامُ

২৪. সহিহ মুসলিম : ৬৬৫

২৫. প্রাণ্ড

‘যার হাঁটার পথ মসজিদ থেকে বেশি দূরে সে নামাজের অধিক সাওয়াব লাভের হকদার। আর যে ব্যক্তি নামাজের জন্য অপেক্ষা করে ইমামের সাথে (জামাআত সহকারে) নামাজ পড়ে, সে ওই ব্যক্তির চেয়ে বেশি সাওয়াবের হকদার, যে একাকী নামাজ পড়ে ঘুমিয়ে পড়ে।’^{২৬}

ফজর ও ইশার জামাআতে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে একাধিক হাদিসে আলাদাভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে এবং এ দুই নামাজের জামাআতে যারা শরিক হয়, তাদের জন্য বড় সাওয়াবের কথা বর্ণিত হয়েছে। এখানে দুটি হাদিস উল্লেখ করা হলো :

এক. উসমান বিন আফফান رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى اللَّيْلَ كُلَّهُ

‘যে ব্যক্তি জামাআতের সাথে ইশার নামাজ পড়ল, সে যেন অর্ধেক রাত পর্যন্ত নামাজ পড়ল। আর যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাআতের সাথে পড়ল, সে যেন সারারাত নামাজ পড়ল।’^{২৭}

দুই. আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

لَيْسَ صَلَاةٌ أَثْقَلُ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبَوًّا

‘ইশা ও ফজরের নামাজ মুনাফিকদের জন্য সর্বাপেক্ষা কঠিন। তারা যদি জানত যে, এ দুটি নামাজের পুরস্কার বা সাওয়াব কত বেশি, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে বা বুক হেঁচড়ে হলেও তারা এ দুই ওয়াক্তে জামাআতে হাজির হতো।’^{২৮}

২৬. সহিহ মুসলিম : ৬৬২

২৭. সহিহ মুসলিম : ৬৫৬

২৮. সহিহুল বুখারি : ৬৫৭

সুন্নাতে মুআক্কাদা ও নফলসমূহ গুরুত্ব সহকারে পড়ে

আখিরাতের সফলতা-প্রত্যাশী প্রকৃত মুসলমান কখনো সুন্নাতে মুআক্কাদাসমূহ ছেড়ে দেয় না। রাতে ও দিনে যতটুকু সম্ভব নফল নামাজ পড়ার চেষ্টা করে। কেননা, অধিক নফল ইবাদত বান্দাকে আল্লাহর নৈকট্যশীল করে দেয় এবং আল্লাহর সম্ভ্রুষ্টি ও ভালোবাসার স্তরে নিয়ে যায়। বান্দা যখন সে মাকাম বা স্তরে উন্নীত হয়, তখন আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন এবং বিশেষ শক্তি দান করেন। তখন আল্লাহ তার কান হয়ে যান, যা দিয়ে সে শোনে; তার চোখ হয়ে যান, যা দিয়ে সে দেখে; তার হাত হয়ে যান, যার সাহায্যে সে স্পর্শ করে। নিম্নের হাদিসে কুদসিতে এটাই বর্ণিত হয়েছে :

وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالتَّوَّافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ

‘বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে, এমনকি একসময় তাকে আমি ভালোবেসে ফেলি। আর আমি যখন তাকে ভালোবেসে ফেলি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শ্রবণ করে; তার চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দর্শন করে; তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে স্পর্শ করে এবং তার পা হয়ে যাই যার সাহায্যে সে পথ চলে। যখন সে আমার কাছ থেকে কিছু চায়, আমি তা প্রদান করি। আর যখন আমার নিকট (শয়তান থেকে) পানাহ চায়, আমি তাকে পানাহ দান করি।’^{২৯}

আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন আসমান ও জমিনের সকল মাখলুকও তাকে ভালোবাসতে শুরু করে। এর প্রমাণ হলো, আবু হুরাইরা রা বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সা ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبَّهُ، قَالَ: فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ فَيَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا

২৯. সহিহুল বুখারি : ৬৫০২

فَأَجْبُوهُ، فَيُجِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، قَالَ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ،
وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولُ: إِنِّي أَبْغِضُ فَلَانًا فَأَبْغِضْهُ، قَالَ
فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ يُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ فَلَانًا
فَأَبْغِضُوهُ، قَالَ: فَيُبْغِضُونَهُ، ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ

‘আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন জিবরাইল ﷺ-কে ডেকে বলেন, আমি অমুক বান্দাকে ভালোবাসি, তুমিও তাকে ভালোবাসো। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, তখন জিবরাইল ﷺ তাকে ভালোবাসতে শুরু করেন। তারপর তিনি আসমানে ঘোষণা দেন যে, আল্লাহ তাআলা অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন, তোমরাও তাকে ভালোবাসো। তখন আসমানবাসীরা তাকে ভালোবাসতে শুরু করে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, তারপর তার এ গ্রহণযোগ্যতা জমিনেও নেমে আসে। আর যখন কোনো বান্দাকে আল্লাহ অপছন্দ করেন, তখন জিবরাইল ﷺ-কে ডেকে বলেন, অমুককে আমি অপছন্দ করি, তুমিও তাকে অপছন্দ করো। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, তখন জিবরাইল ﷺ তাকে অপছন্দ করতে শুরু করেন। তারপর তিনি আসমানে ঘোষণা দেন যে, অমুককে আল্লাহ তাআলা অপছন্দ করেন, তোমরাও তাকে অপছন্দ করো। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, তখন আসমানবাসীরাও তাকে অপছন্দ করতে শুরু করেন। তারপর তার প্রতি এ ঘৃণাবোধ জমিনেও নেমে আসে।’^{৩০}

এজন্যই রাসুলুল্লাহ ﷺ রাতে এত বেশি নফল নামাজ পড়তেন যে, দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার কারণে তাঁর পা ফুলে যেত। একদিন উম্মুল মুমিনিন আয়িশা ﷺ বললেন, ‘আপনি এমন কেন করেন? আপনার তো আগে-পরের সব গুনাহই ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে! প্রত্যুত্তরে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?’^{৩১}

৩০. সহিহ মুসলিম : ২৬৩৭

৩১. সহিহল বুখারি : ৪৮৩৭, সহিহ মুসলিম : ২৮২০

উত্তমরূপে নামাজ পড়ে

প্রকৃত মুসলমান তার সকল নামাজ উত্তমরূপে আদায় করে। নামাজের সকল শর্ত পুরোপুরিভাবে আদায় করে। মনোযোগ অন্যদিকে রেখে কোনোমতে শুধু কিয়াম, রুকু ইত্যাদি করে নামাজ শেষ করে দেয় না।

নামাজ শেষ করার সাথে সাথে সে পার্থিব কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে না; বরং হাদিস শরিফে নামাজের পরে যেসব ইসতিগফার, আজকার ও তাসবিহাত নির্ধারিত আছে, সেগুলো গুরুত্ব সহকারে পাঠ করে। তারপর আল্লাহর দরবারে কায়মনোবাক্যে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও হিদায়াতের জন্য দুআ করে। এজন্য নামাজ তার অন্তরের প্রশান্তি ও পরিশুদ্ধির কারণ হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

‘নামাজের মাঝে আমার চোখের স্নিগ্ধতা রাখা হয়েছে।’^{৩২}

এ কারণে প্রকৃত নামাজি ব্যক্তিগণ আল্লাহর নিরাপত্তার চাদরে বেষ্টিত থাকেন। তাঁর বিশেষ তত্ত্বাবধানে থাকেন। ফলে তাদের যখন অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন অস্থির হন না এবং যখন কল্যাণপ্রাপ্ত হন, তখন কৃপণ হয়ে যান না।

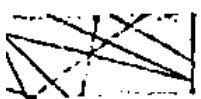
আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا
إِلَّا الْمُصَلِّينَ

‘যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে হা-হুতাশ করে। আর যখন কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তখন কৃপণ হয়ে যায়। তবে তারা স্বতন্ত্র, যারা নামাজ আদায়কারী।’^{৩৩}

৩২. সুনানুন নাসায়ি : ৩৯৪০, মুসনাদু আহমাদ : ১৪০৩৭

৩৩. সূরা আল-মাআরিজ : ১৯-২১



জাকাত আদায় করে

প্রকৃত মুসলমানের ওপর যখন জাকাত ওয়াজিব হয়, তখন পূর্ণ আমানতদারিতা ও তাকওয়ার সহিত শরিয়ত কর্তৃক নির্ধারিত খাতে জাকাত আদায় করে দেয়। জাকাতের পরিমাণ যদি মিলিয়ন-বিলিয়ন সম্পদও হয়, তবুও জাকাত আদায় করতে কোনো ধরনের গড়িমসি করে না।

এর কারণ হলো, জাকাত প্রদান করা সম্পদভিত্তিক ফরজ ইবাদত। সত্যিকারের কোনো মুসলমান এ ফরজ ইবাদত আঞ্জাম না দিয়ে থাকতে পারে না। কোনো মুসলমান যদি জাকাত আদায় করতে গড়িমসি করে, তাহলে বুঝতে হবে তার দ্বীনের মধ্যে ক্রটি আছে। তার মনে কার্পণ্যের বিষবাম্প আছে। জাকাত প্রদান করা কত যে গুরুত্বপূর্ণ ফরজ ইবাদত, তা জাকাত দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী লোকদের বিরুদ্ধে কিতাল বা যুদ্ধের বিধান থেকে সহজে অনুমান করা যায়। তাদের সম্পর্কে আবু বকর রাঃ বলেছিলেন, ‘আল্লাহর কসম! নামাজ ও জাকাতের মধ্যে যারা পার্থক্য করে, তাদের বিরুদ্ধে আমি অবশ্যই কিতাল করব।’^{৩৪}

আবু বকর রাঃ-এর শপথ প্রমাণ করে, ইসলামে জাকাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত এবং প্রকাশ্যে কায়েম করার ক্ষেত্রে নামাজের সাথে তার দৃঢ় সম্পর্ক রয়েছে। এজন্যই হয়তো পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় জাকাতের আলোচনা নামাজের সাথে একত্রে এসেছে।

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন :

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ

‘যারা নামাজ কায়েম করে এবং জাকাত আদায় করে।’^{৩৫}

অন্য আয়াতে তিনি বলেন :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

‘আর নামাজ কায়েম করো এবং জাকাত প্রদান করো।’^{৩৬}

৩৪. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৬/৩১৫

৩৫. সূরা আল-মায়িদা : ৫৫

৩৬. সূরা আল-বাকারা : ৪৩

অন্যত্র তিনি বলেন :

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ

‘আর তারা নামাজ কায়েম করেছে এবং জাকাত প্রদান করেছে।’^{৩৭}

রমজান মাসে রোজা রাখে এবং রাতে কিয়াম করে

প্রকৃত মুসলমান পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত সাওয়াব পাওয়ার আশা নিয়ে রমজান মাসে রোজা রাখে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

‘যে ব্যক্তি ইমানের সহিত সাওয়াবের আশায় রমজানের রোজা রাখবে, তার পূর্ববর্তী সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।’^{৩৮}

এ ছাড়াও সে রোজার সকল হুক যথাযথ আদায় করে। অর্থাৎ জিহ্বার হিফাজত করার সাথে সাথে অন্য সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে রোজাবিধ্বংসী বা রোজার সাওয়াব বিনষ্টকারী সকল কর্ম থেকে বিরত রাখে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، فَإِنْ سَاءَ أَحَدٌ
أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ

‘আর যখন তোমাদের কারও রোজার দিন আসে, তখন যেন সে অশ্লীল কথাবার্তা না বলে এবং অনর্থক শোরগোল না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা তার সাথে বিবাদ করতে চায়, সে যেন বলে, আমি একজন রোজাদার।’^{৩৯}

৩৭. সূরা আল-বাকারা : ২৭৭

৩৮. সহিহুল বুখারি : ৩৮, সহিহ মুসলিম : ৭৬০

৩৯. সহিহুল বুখারি : ১৯০৪, সহিহ মুসলিম : ১১৫১



অন্য হাদিসে তিনি ইরশাদ করেছেন :

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

‘যে (রোজা রাখার পরেও) মিথ্যা কথা বা মিথ্যা কর্ম ছাড়তে পারেনি, আল্লাহ তাআলার জন্য তার খানাপিনা ত্যাগ করার কোনো প্রয়োজন নেই।’^{৪০}

প্রকৃত রোজাদার মুসলমান রমজান মাসটিকে অন্য এগারো মাসের মতো কাটায় না। কারণ, এটা যে রোজার মাস, যে রোজার বদলা আল্লাহ নিজেই প্রদান করবেন! আর মহাধনী ও মহান নিয়ামতদাতা আল্লাহ তাআলা যে প্রতিদান নিজেই প্রদান করবেন, সেটা যে কত উত্তম হবে, তা কল্পনাশীত ব্যাপার!

হাদিস শরিফে ইরশাদ হচ্ছে :

كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِينَ مِائَةً، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِ الصَّائِمِ فَرِحَتَانِ: فَرَحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرَحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلِخُلُوفٍ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

‘মানবসন্তানের প্রতিটি নেক কাজের সাওয়াব দশ গুণ থেকে সাতশ গুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়। মহান আল্লাহ বলেন, “কিন্তু রোজা আমারই জন্য এবং আমি নিজেই এর প্রতিফল দান করব। বান্দা আমারই জন্য নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং পানাহার পরিত্যাগ করেছে।” রোজাদারের জন্য দুটি আনন্দ রয়েছে। একটি তার ইফতারের সময় এবং অপরটি তার প্রতিপালক আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের সময়। রোজাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ তাআলার কাছে মিশকের সুগন্ধির চেয়েও অধিক সুগন্ধময়।’^{৪১}

৪০. সহিহুল বুখারি : ১৯০৩

৪১. সহিহ মুসলিম : ১১৫১

এজন্য সচেতন মুসলমানের জন্য এ পবিত্র মাসটিকে অধিক মূল্যায়ন করা অপরিহার্য। পুরো মাসটিকে নেক আমল দ্বারা পরিপূর্ণ করা চাই। দিনে রোজা, নামাজ, তিলাওয়াত, সদকাসহ বিভিন্ন ইবাদতে লেগে থাকা এবং রাতে তারাবিহ, তাহাজ্জুদ ও দুআয় মশগুল থাকা চাই।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

‘যে ব্যক্তি পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সহিত সাওয়াবের আশা নিয়ে রমজানে কিয়াম করবে (অর্থাৎ রাতে তারাবিহ নামাজ আদায় করবে), তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।’^{৪২}

রাসুলুল্লাহ ﷺ অন্যান্য মাসের তুলনায় রমজান মাসে বেশি ইবাদত করতেন। বিশেষ করে রমজানের শেষ দশকে অধিক হারে নেক আমল করতেন।

আয়িশা সিদ্দিকা ؓ বলেন :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ، مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ

‘রাসুলুল্লাহ ﷺ রমজান মাসে ইবাদতের জন্য যে কঠোর সাধনা করতেন, অন্য মাসসমূহে এতটা করতেন না। আর রমজানের শেষ দশকে ইবাদতের জন্য যে কঠোর সাধনা করতেন, (রমজানের) অন্যান্য দিনে এতটা করতেন না।’^{৪৩}

অপর হাদিসে আয়িশা ؓ থেকে বর্ণিত আছে :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، أَحْيَا اللَّيْلَ، وَأَيَّقُظْ أَهْلَهُ، وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ

৪২. সহিহুল বুখারি : ৩৭, সহিহ মুসলিম : ৭৫৯

৪৩. সহিহ মুসলিম : ১১৭৫

‘রমজানের শেষ দশক শুরু হলে রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজে সারারাত ইবাদতে কাটাতেন এবং পরিবারের লোকদেরও ঘুম থেকে তুলে দিতেন। (ইবাদতের জন্য) এ সময় তিনি কঠোর মেহনত করতেন এবং কোমর বেঁধে নিতেন। (অর্থাৎ ইবাদতে একদম মগ্ন হয়ে যেতেন।)’^{৪৪}

রাসুলুল্লাহ ﷺ রমজানের শেষ দশকে লাইলাতুল কদর অন্বেষণ করার এবং সে রাতে ইবাদত করার নির্দেশ দিতেন।

রাসুলুল্লাহ ইরশাদ করেছেন :

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

‘তোমরা রমজানের শেষ দশকে লাইলাতুল কদর অন্বেষণ করো।’^{৪৫}

অপর হাদিসে তিনি ইরশাদ করেছেন :

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوَيْثْرِ، مِنَ الْعَشْرِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

‘তোমরা রমজানের শেষ দশকের বেজোড় রাতসমূহে লাইলাতুল কদর অন্বেষণ করো।’^{৪৬}

লাইলাতুল কদরে ইবাদত করা সম্পর্কে তিনি ইরশাদ করেছেন :

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

‘যে ব্যক্তি পূর্ণ ইমানের সাথে সাওয়াবের আশা নিয়ে লাইলাতুল কদরে ইবাদত করবে, তার পূর্বের সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।’^{৪৭}

আসলে এ মুবারক মাসটি হলো খালিস ইবাদতের মাস। সত্যিকারের মুসলমানের জন্য এ মাসের কোনো একটি রাতও খেলাধুলা বা অহেতুক

৪৪. সহিহ মুসলিম : ১১৭৪

৪৫. সহিহল বুখারি : ২০২০, সহিহ মুসলিম : ১১৬৯

৪৬. সহিহল বুখারি : ২০১৭ ;

৪৭. সহিহল বুখারি : ১৯০১

গল্পগুজবে কাটিয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই। অনেক সময় গল্প করতে করতে সাহরির সময় হয়ে যায়, তখন দুয়েক লুকমা খানা খেয়ে যেই বিছানায় গা এলিয়ে দেয়, অমনি চোখজুড়ে নেমে আসে রাজ্যের ঘুম। অথচ এদিকে ফজরের নামাজটি যে কাজা হয়ে যাচ্ছে, তার কোনো খবরই থাকে না! কিন্তু দ্বীনি জ্ঞানসম্পন্ন মুত্তাকি মুসলমান তারাবিহ নামাজের পর গল্পগুজবে লিপ্ত না হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ ঘুমানোর পর উঠে তাহাজ্জুদ পড়ে এবং সাহরি খায়। তারপর ফজরের নামাজ আদায় করতে মসজিদে চলে যায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ সাহরি খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কেননা, তাতে অনেক কল্যাণ রয়েছে। তিনি ইরশাদ করেছেন :

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَهً

‘তোমরা সাহরি খাও। কেননা, সাহরির মধ্যে বরকত রয়েছে।’^{৪৮}

সাহরির মধ্যে বরকত থাকার কারণ হলো, এর কারণে তাহাজ্জুদ পড়ার সুযোগ হয় এবং ফজরের নামাজ মসজিদে গিয়ে জামাআত সহকারে আদায় করার জন্য মন প্রস্তুত থাকে। তা ছাড়া সাহরি রোজা রাখার জন্য শরীরে শক্তি সঞ্চার করে। এজন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবায়ে কিরাম ﷺ সাহরি খেতেন।

জাইদ বিন সাবিত ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً

‘আমরা নবিজি ﷺ-এর সাথে সাহরি খেলাম, তারপর নামাজে দাঁড়ালাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমি তাকে বললাম, সাহরি আর নামাজের মাঝে কী পরিমাণ সময় ছিল? তিনি বললেন, পঞ্চাশ আয়াত পড়ার সময় পরিমাণ।’^{৪৯}

৪৮. সহিহুল বুখারি : ১৯২৩, সহিহ মুসলিম : ১০৯৫

৪৯. সহিহুল বুখারি : ১৯২১, সহিহ মুসলিম : ১০৯৭

নফল রোজা রাখে

সচেতন ও মুত্তাকি মুসলমান রমজানের রোজা ছাড়া অন্যান্য নফল রোজাও গুরুত্ব সহকারে রাখে। যেমন : আরাফাত দিবসের রোজা, আশুরার (মুহাররমের দশম তারিখের) রোজা, তাসুআর (মুহাররমের নবম তারিখের) রোজা ইত্যাদি। হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী এ রোজাগুলো রাখলে গুনাহ ক্ষমা করা হয়।

আবু কাতাদা ؓ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে আরাফাত দিবসের রোজা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন :

يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ

‘এটি বিগত ও চলমান বছরের গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়।’^{৫০}

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ؓ বর্ণনা করেন :

صَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاشُورَاءَ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

‘নবিজি ﷺ আশুরার দিনে রোজা রেখেছেন এবং (সাহাবিদেরও) রোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।’^{৫১}

আবু কাতাদা ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ؟ فَقَالَ: يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ

‘রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে আশুরার রোজা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, এটি বিগত বছরের গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়।’^{৫২}

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ؓ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأُصُومَنَّ التَّاسِعَ

৫০. সহিহ মুসলিম : ১১৬২

৫১. সহিহল বুখারি : ১৮৯২, সহিহ মুসলিম : ১১২৫

৫২. সহিহ মুসলিম : ১১৬২

‘আমি যদি আগামী বছর বেঁচে থাকি, তাহলে (আশুরার রোজার সাথে) মুহাররমের নবম তারিখেও রোজা রাখব।’^{৫৩}

নফল রোজার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রোজা হলো, শাওয়ালের ছয় রোজা। এ রোজার ফজিলত সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

‘যে ব্যক্তি রমজানের রোজা রাখল, অতঃপর শাওয়ালের ছয়টি রোজা রাখল, সে যেন পুরো বছর রোজা রাখল।’^{৫৪}

এ ছাড়াও প্রতিমাসে তিনটি রোজা রাখা মুসতাহাব।

আবু হুরাইরা ﷺ বলেন :

أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ: صِيَامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرُكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أُنَامَ

‘আমার বন্ধু রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে তিনটি বিষয়ের অসিয়ত করেছেন। এক. প্রতিমাসে তিনটি রোজা রাখা, দুই. চাশতের সময় দুই রাকআত নামাজ পড়া, তিন. ঘুমানোর পূর্বে বিতর পড়ে নেওয়া।’^{৫৫}

আবু দারদা ﷺ বলেন :

أَوْصَانِي حَبِيبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ، لَنْ أَدْعَهُنَّ مَا عِشْتُ: بِصِيَامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَبِأَنْ لَا أُنَامَ حَتَّى أُوتِرَ

‘আমার বন্ধু রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে তিনটি বিষয়ের অসিয়ত করেছেন, যা আমি জীবনেও ছাড়িনি। সেগুলো হলো, প্রতিমাসে তিনটি রোজা রাখা, চাশতের সময় নামাজ পড়া এবং বিতর পড়ার পূর্বে না ঘুমানো।’^{৫৬}

৫৩. সহিহ মুসলিম : ১১৩৪

৫৪. সহিহ মুসলিম : ১১৬৪

৫৫. সহিহুল বুখারি : ১৯৮১

৫৬. সহিহ মুসলিম : ৭২২

আব্দুল্লাহ বিন আমর ؓ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ

‘প্রতিমাসে তিনটি রোজা রাখা সারা বছর রোজা রাখার সমান।’^{৫৭}

মাসের কোন তিনদিন রোজা রাখবে, এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদিসে ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের কথা উল্লেখ আছে। এ দিনগুলোকে আইয়ামে বিজ বা উজ্জ্বল দিনসমূহ বলা হয়।

আবার বিভিন্ন হাদিস থেকে বুঝা যায়, রাসুলুল্লাহ ﷺ অনির্দিষ্টভাবে মাসের যেকোনো তিনদিন রোজা রাখতেন।

যেমন মুআজা ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি আয়িশা ؓ-কে জিজ্ঞেস করলেন :

أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟
قَالَتْ: نَعَمْ، فَقُلْتُ لَهَا: مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ؟ قَالَتْ: لَمْ
يَكُنْ يُبَالِي مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ

‘রাসুলুল্লাহ ﷺ কি প্রতিমাসে তিনদিন রোজা রাখতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন মুআজা ؓ প্রশ্ন করলেন, মাসের কোন তিনদিন তিনি রোজা রাখতেন? আয়িশা ؓ উত্তর দিলেন, মাসের কোন দিনে রোজা রাখছেন, তার কোনো পরোয়া করতেন না (অর্থাৎ যেকোনো তিন দিন রোজা রাখতেন)।’^{৫৮}

হজ আদায় করে

প্রকৃত মুসলমান সামর্থ্য থাকলে হজ আদায় করে। হজে যাওয়ার পূর্বে হজের ছোট বড় সকল বিধান জেনে নেয়। হজের মর্যাদা ও তাৎপর্য অনুধাবন করে হজ পালন করে। ফলে তার হজ পূর্ণাঙ্গ ও সহিহ-শুদ্ধ হয় এবং সদ্য জন্ম নেওয়া

৫৭. সহিহুল বুখারি : ১৯৭৯, মুসনাদু ইবনিল জাদ : ৫৪৩

৫৮. সহিহ মুসলিম : ১১৬০

শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে ঘরে ফিরে আসে। হজ্জ জাতি-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠ মিলনমেলা। মুসলিম উম্মাহর সমন্বরে তাহলিল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা), তাকবির (আল্লাহু আকবার বলা), তাসবিহ (সুবহানাল্লাহ বলা), তাহমিদ (আল-হামদুলিল্লাহ বলা) এবং তালবিয়া (লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক...) এর মধুময় ধ্বনিতে মুখরিত থাকে এ ধর্মীয় সম্মেলন। তাই সত্যিকারের মুসলমান হজ্জ করে যখন ফেরে, তখন তার অন্তর মুসলিম উম্মাহর প্রতি ইমানি ভ্রাতৃত্ববোধ ও সৌহার্দ্যে টইটম্বর থাকে।

উমরা পালন করে

আনুগত্যশীল মুসলমান সামর্থ্য থাকলে হজের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে, বিশেষ করে রমজান মাসে উমরা পালন করে। কেননা, রমজান মাসে উমরা করলে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে হজ করার সাওয়াব পাওয়া যায়। সহিহ বুখারিতে আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ؓ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন :

لَمَّا رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَجَّتِهِ قَالَ لِأُمِّ سِنَانٍ الْأَنْصَارِيَّةِ: مَا مَنَعَكَ مِنَ الْحَجِّ؟ قَالَتْ: أَبُو فَلَانٍ، تَغْنِي زَوْجَهَا، كَانَ لَهُ نَاضِحَانِ حَجَّ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَالْآخَرُ يَسْقِي أَرْضًا لَنَا، قَالَ: فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً أَوْ حَجَّةً مَعِي

‘যখন নবিজি ﷺ হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন, তখন উম্মে সিনান আনসারি ؓ-কে বললেন, তুমি হজে যাওনি যে? তিনি বললেন, অমুকের আব্বুর (স্বামীর প্রতি ইঙ্গিত করে) দুটা উট ছিল। একটাতে সওয়ার হয়ে তিনি হজে গেলেন, আরেকটা জমি সিঞ্চনের কাজে জড়িত ছিল। (এজন্য আমি হজে যেতে পারিনি।) তখন নবিজি ﷺ বললেন, রমজান মাসে উমরা করা একটি হজ্জ করার সমান অথবা বলেছেন, আমার সাথে হজ্জ আদায় করার সমান।’^{৫৯}

৫৯. সহিহল বুখারি : ১৮৬৩

আল্লাহর দাসত্বের বাস্তবায়ন করে

প্রকৃত মুসলমান দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, তাকে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

‘আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।’^{৬০}

মানুষের সকল কর্মতৎপরতা ইবাদত হতে পারে, যদি তা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হয়। প্রকৃত মুসলমান সেটাই করে থাকে। সে তার সকল কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করে। তাই তার সকল কাজ ইবাদতে পরিণত হয়।

এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে উত্তম ও ব্যাপক উপকারী আমল হলো, জমিনে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়নের সংগ্রাম করা। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করা।

আপনি যদি প্রকৃত মুসলমান হওয়ার দাবি করেন, তাহলে আপনাকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে, আপনার ইবাদতে ঘাটতি আছে। কেননা, আপনি আপনার সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সংগ্রাম করছেন না। আপনাকেসহ সকল জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহর পরিপূর্ণ ইবাদত কায়েম করা। আর তা তখনই পূর্ণতা লাভ করবে, যখন আল্লাহর জমিনে আল্লাহর শরিয়ত বা শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে।

এখান থেকে বুঝা গেল, প্রকৃত মুসলমান হতে হলে জীবনের প্রতিটি শাখায় ইসলামকে বাস্তবায়ন করতে হবে। আল্লাহ তাআলা যে মানবজাতিকে অন্যান্য মাখলুকের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তার কারণও এটাই।

৬০. সূরা আল-জারিয়াত : ৫৬

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

‘নিশ্চয় আমি আদম-সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি, আমি তাদের স্থলে
ও জলে চলাচলের বাহন দান করেছি। তাদের উত্তম জীবনোপকরণ
প্রদান করেছি এবং তাদের অনেক সৃষ্ট বস্তুর ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান
করেছি।’^{৬১}

প্রকৃত মুসলমান হওয়ার দাবি করলে এ আয়াতের অর্থ ভালোভাবে অনুধাবন
করতে হবে। আমাদের কেন এ শ্রেষ্ঠত্ব ও ফজিলত দান করেছেন, তার সঠিক
কারণ নির্ণয় করে সে অনুযায়ী নিজের জীবনকে পরিচালিত করতে হবে।

অধিক হারে কুরআন তিলাওয়াত করে

প্রকৃত মুসলমান সব সময় কুরআনের সুশীতল ও সুগন্ধিময় ছায়াতলে অবস্থান
করে। সেখান থেকে হিদায়াতের স্নিগ্ধতা উপভোগ করে। তাই সে প্রতিদিন
নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করে। একাত্তিভে আল্লাহর কালাম পড়ে।
কুরআনের মর্ম তার ভেতর সংক্রমিত হয়ে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে দেয়।
হৃদয়ে ইমান ও প্রশান্তি অর্জিত হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

‘জেনে রাখো, আল্লাহর জিকির দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।’^{৬২}

কুরআন তিলাওয়াত সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْأُتْرَجَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا
طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الثَّمَرَةِ، لَا رِيحَ

৬১. সূরা বনি ইসরাইল : ৭০

৬২. সূরা আর-রাদ : ২৮



لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ،
 رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ
 الْحَنْظَلَةِ، لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ

‘যে মুমিন কুরআন তিলাওয়াত করে তার উদাহরণ হলো কমলা ফল, যা স্বাদে ও গন্ধে উত্তম। আর যে মুমিন কুরআন তিলাওয়াত করে না, তার উদাহরণ হলো খেজুর, যার সুগন্ধি না থাকলেও স্বাদে মিষ্ট। আর যে মুনাফিক কুরআন তিলাওয়াত করে, তার উদাহরণ হলো ফুল, যার সুগন্ধি আছে বটে, তবে স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন তিলাওয়াত করে না, তার উদাহরণ হলো মাকাল ফল, যার কোনো সুগন্ধি নেই এবং স্বাদও খুব তিক্ত।’^{৬৩}

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

اقْرَأُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ

‘তোমরা কুরআন পাঠ করো। কেননা, কিয়ামতের দিন কুরআন তার পাঠকারীদের জন্য সুপারিশ করবে।’^{৬৪}

অন্য হাদিসে তিনি ইরশাদ করেছেন :

الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ
 وَيَتَتَعَتُعُ فِيهِ، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ، لَهُ أَجْرَانِ

‘কুরআন সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তি মহাসম্মানিত পুণ্যবান লিপিকার ফেরেশতাদের সাথে থাকবে। আর যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তার জন্য কষ্টকর হওয়া সত্ত্বেও বারবার পড়ে, তার জন্য রয়েছে দুটি পুরস্কার।’^{৬৫}

৬৩. সহিহুল বুখারি : ৫৪২৭, সহিহ মুসলিম : ৭৯৭

৬৪. সহিহ মুসলিম : ৮০৪

৬৫. সহিহ মুসলিম : ৭৯৮

কুরআনের তিলাওয়াত-সম্পর্কিত এতসব ফজিলতের হাদিস থাকার পর সত্যিকারের মুসলমান কুরআনের তিলাওয়াত ও তার অর্থ নিয়ে গবেষণা না করে কি থাকতে পারে!?

সারকথা হলো, আল্লাহর সাথে প্রকৃত মুসলমানের সম্পর্ক হলো, সে আল্লাহর প্রতি দৃঢ় ইমান রাখে, নিয়মিত সৎকর্ম করে, সবকিছুতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে। সর্বোপরি, আল্লাহর দাসত্ব ও বন্দেগিতে নিজেকে সঁপে দেয়, যে দাসত্বের জন্য জিন ও ইনসানকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

‘আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।’^{৬৬}



নিজের সাথে মুসলমানের সম্পর্ক

ভূমিকা

মুসলমানদের প্রতি ইসলামের দাবি হলো, তারা মানুষের মাঝে উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে বসবাস করবে। যেন তারা জনগণের জন্য উত্তম আদর্শ হতে পারে এবং লোকেরা তাদের দেখে ইসলামের সত্যতা ও সৌন্দর্যের বার্তা লাভ করে।

এ সম্পর্কে ইবনুল হানজালিয়া رحمہ اللہ থেকে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ এক সফর থেকে ফেরার পথে সাহাবিদের উদ্দেশে বলেন :

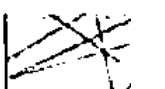
إِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ، فَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ، وَأَصْلِحُوا
لِبَاسَكُمْ، حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْفُحْشَ، وَلَا التَّفَحُّشَ

‘তোমরা তোমাদের ভাইদের নিকট যাচ্ছ, কাজেই তোমাদের বাহনগুলো ঠিকঠাক করে নাও এবং কাপড়চোপড় পরিপাটি করো; তোমরা যেন সমাজের কেন্দ্রবিন্দু। কেননা, আল্লাহ তাআলা কদর্য ও অশ্লীলতা পছন্দ করেন না।’^{৬৭}

আরবিতে ‘রিহাল’ (رحال) ওই চাদরকে বলে, যা সওয়ার হওয়ার সময় উটের পিঠে রাখা হয়। আর ‘ফুহশ’ (فحش) ও ‘তাফাহুশ’ (تفحش) বলা হয় খুবই খারাপ ও অশ্লীল বিষয়কে। হাদিস শরিফে রাসুলুল্লাহ ﷺ পোশাক-আশাকের এলোমেলো অবস্থা ও অসৌন্দর্যকে অশ্লীলতা বলেছেন। এজন্য ইসলামে এ ধরনের অসৌন্দর্য অপছন্দনীয় ও নিষিদ্ধ।

প্রকৃত মুসলমান নিজের যত্ন নেয়। শরীর, বিবেক ও আত্মার মাঝে সুষ্ঠু ভারসাম্য বজায় রাখে। এগুলোর প্রত্যেকটির যথাযথ হক আদায় করে। কোনো বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করে না।

৬৭. সুনানু আবি দাউদ : ৪০৮৯



আব্দুল্লাহ বিন আমর ؓ থেকে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন তার (আব্দুল্লাহ বিন আমর ؓ-এর) ইবাদতে সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে জানতে পারলেন, তখন তাকে বললেন :

أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟ فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ
قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ
لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرِزْوَاجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرِزْوَرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا.

‘শুনলাম, তুমি নাকি প্রতিদিন রোজা রাখো, আর প্রতিরাতে সারারাত ধরে নফল নামাজ পড়ো? তিনি বললেন, জি, হে আল্লাহর রাসুল। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, এমন কোরো না; বরং (মাঝেমাঝে) রোজা রাখবে, আবার (মাঝেমাঝে) রোজা রাখবে না। রাতের কিছু অংশ ঘুমাবে, কিছু অংশে ইবাদত করবে। কেননা, তোমার ওপর তোমার শরীরের অধিকার রয়েছে, চোখের অধিকার রয়েছে, স্ত্রীর অধিকার রয়েছে এবং মেহমানের অধিকার রয়েছে।’^{৬৮}

একজন প্রকৃত মুসলমান দেহ, বিবেক ও আত্মা—এ তিনটির মাঝে যেভাবে ভারসাম্য রক্ষা করে চলে

ক. দেহ

তার খানাপিনা সুষম ও পরিমিত

প্রকৃত মুসলমান নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্নবান থাকে। তাই সে সুষম ও পরিমিত খাবার গ্রহণ করে। অধিক খাবার খেয়ে স্বাস্থ্যকে ঝুঁকির মধ্যে নিক্ষেপ করে না।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা এ নির্দেশই দিয়েছেন :

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

‘খাও, পান করো এবং অপব্যয় কোরো না। নিশ্চয় তিনি অপব্যয়কারীদের পছন্দ করেন না।’^{৬৯}

৬৮. সহিহুল বুখারি : ১৯৭৫, সহিহ মুসলিম : ১১৫৯

৬৯. সূরা আল-আরাফ : ৩১

সুষম ও পরিমিত খাবার গ্রহণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءَ شَرًّا مِنْ بَطْنٍ. بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكْلَاتُ يُقْمَنَ صَلْبَهُ،
فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَتُلْكُ لِمَطْعَامِهِ وَتُلْكُ لِمَشْرَابِهِ وَتُلْكُ لِنَفْسِهِ.

‘মানুষ নিজের পেটের চেয়ে খারাপ কোনো পাত্র পূর্ণ করে না। তবে একান্তই যদি পেট পূর্ণ করতে হয়, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ খাবার ও এক-তৃতীয়াংশ পানি দ্বারা পূর্ণ করবে; আর বাকি এক-তৃতীয়াংশ খালি রাখবে।’^{৭০}

উমর বিন খাত্তাব ﷺ বলেন :

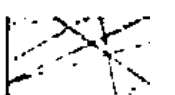
إياكم والبطنة في الطعام والشراب فإنها مفسدة للجسد مورثة
للسقم مكسلة عن الصلاة وعليكم بالقصد فيها فإنه أصلح
للجسد وأبعد من السرف وإن الله تعالى ليبغض الحبر السمين وإن
الرجل لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه

‘পেটভর্তি খাবার থেকে বিরত থাকো। কেননা, তা শরীরের জন্য ক্ষতিকর। এটা নানাবিধ রোগ সৃষ্টি করে এবং নামাজের ব্যাপারে উদাসীন করে রাখে। খানাপিনার ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করো। কেননা, তা শরীরের জন্য উপকারী, পাশপাশি তা অপব্যয় থেকেও বাঁচায়। তা ছাড়া আল্লাহ তাআলা অতিরিক্ত মোটা শরীরকে অপছন্দ করেন। মানুষ তখনই ধ্বংস হয়, যখন তার চাহিদা দ্বীনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে।’^{৭১}

প্রকৃত মুসলমান মাদকদ্রব্য সেবন করা থেকে বেঁচে থাকে। হারাম খাদ্য ও পানীয় থেকে দূরে থাকে। সকাল সকাল ঘুমায় এবং সকাল সকাল জেগে ওঠে। অসুস্থ না হলে কোনো ওষুধ সেবন করে না। কারণ, রুটিনমাসিক জীবনযাপনই তার স্বাস্থ্যের ভারসাম্য ধরে রাখে।

৭০. সুনানুত তিরমিজি : ২৩৮০, মুস্তাদরাকুল হাকিম: ৭১৩৯

৭১. কানজুল উম্মাল : ৮/৪৭, আত-তিব্বুন নববি, ইবনু আবি নুআইম : ১২৭



মুসলমান জানে যে, আল্লাহর নিকট দুর্বল মুমিনের চেয়ে শক্তিশালী মুমিন অধিক প্রিয়। তাই সে বিভিন্ন উপায়ে শরীরকে শক্তিশালী করা ও তা ধরে রাখার চেষ্টা করে।

নিয়মিত ব্যায়াম করে

প্রকৃত মুসলমান সুস্থ ও শক্তিশালী শরীরের অধিকারী হয়ে থাকে। কারণ, সে নেশা ও মাদকজাতীয় হারাম পদার্থ থেকে নিজেকে দূরে রাখে এবং স্বাস্থ্য ও মনোযোগ বিনষ্টকারী বিভিন্ন খারাপ অভ্যাস থেকে বিরত থাকে। তবুও সে আরও অধিক শক্তি অর্জনের জন্য চেষ্টা-মেহনত করে। নিয়মিত শারীরিক ব্যায়াম করে। এটাই যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর সকল জায়গায় প্রকৃত মুসলমানদের অভ্যাস।

শরীর ও কাপড়চোপড় পরিচ্ছন্ন রাখে

প্রকৃত মুসলমান, যে মানুষের সামনে আদর্শ ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হতে চায়, তার শরীর সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। প্রতিদিন সে গোসল করে। শরীরে সুগন্ধি মাখে। জুমআর দিনে এবং অন্যান্য বিশেষ দিনে উত্তমরূপে গোসল করে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

اغْتَسِلُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ، وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا
وَأَصِيبُوا مِنَ الطَّيِّبِ

‘তোমরা জুন্সুবি বা অপবিত্র না হলেও জুমআর দিনে গোসল করবে, মাথা ধোঁত করবে এবং শরীরে সুগন্ধি মাখবে।’^{৭২}

গোসলের মাধ্যমে শরীর পরিষ্কার রাখার প্রতি রাসুলুল্লাহ ﷺ শক্তভাবে উদ্বুদ্ধ করার কারণে অনেক ইমাম জুমআর দিন গোসল করাওয়াজিব বলেছেন।

৭২. সহিছল বুখারি : ৮৮৪

আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সঃ ইরশাদ করেছেন :

حَقُّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ فِيهِ
رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ

‘প্রত্যেক মুসলমানের জন্য প্রতি সপ্তাহে একদিন মাথাসহ পুরো
শরীর ধৌত করে গোসল করা আবশ্যিক।’^{৭৩}

প্রকৃত মুসলমান পোশাক-পরিচ্ছদ ও জুতা-স্যান্ডেল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে।
শরীর ও কাপড়ে সুগন্ধি লাগায়। তা অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধময় হতে দেয় না।

উমর রাঃ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলতেন, যে ব্যক্তি তার এক-তৃতীয়াংশ
সম্পদ শুধু সুগন্ধির পেছনে ব্যয় করে, তাকে আমি অপচয়কারী বলি না।

প্রকৃত মুসলমান তার মুখ খুব পরিচ্ছন্ন রাখে। তার মুখ থেকে কষ্টদায়ক
দুর্গন্ধ ছড়ায় না। এর জন্য সে প্রতিদিন মিসওয়াক ও ব্রাশের সাহায্যে দাঁত
পরিষ্কার করে। দাঁতের আরও যত্ন নিতে বছরে অন্তত একবার দন্তবিশেষজ্ঞের
শরণাপন্ন হয়। এ ছাড়াও মুখ, দাঁত ও শ্বাস-প্রশ্বাস ফ্রেশ রাখতে যথাসময়ে
যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

আয়িশা সিদ্দিকা রাঃ বলেন :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرْقُدُ لَيْلًا وَلَا نَهَارًا فَيَسْتَيْقِظُ
إِلَّا تَسَوَّكَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ

‘নবিজি সঃ দিনে বা রাতে যখনই ঘুম থেকে উঠতেন, অজুর পূর্বে
মিসওয়াক করে নিতেন।’^{৭৪}

মুখ ও দাঁত পরিষ্কার রাখা কতটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ, তা রাসুলুল্লাহ সঃ-এর
আরেকটি হাদিস থেকেও বুঝা যায়।

৭৩. সহিহুল বুখারি : ৮৯৭, সহিহ মুসলিম : ৮৪৯

৭৪. মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবা : ১৭৯১

তিনি বলেন :

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ - وَفِي حَدِيثٍ زُهَيْرٍ عَلَى أُمَّتِي - لَأَمَرْتُهُمْ
بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

‘আমি যদি আমার উম্মতের জন্য কঠিন হওয়ার ভয় না করতাম,
তাহলে প্রতি নামাজের পূর্বে মিসওয়াক করা আবশ্যিক করে
দিতাম।’^{৭৫}

শুরাইহ  থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

سَأَلْتُ عَائِشَةَ، قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: بِالسَّوَاكِ

‘আমি আয়িশা -কে জিজ্ঞাসা করলাম, নবিজি  ঘরে প্রবেশ
করে প্রথমে কোন কাজটি করেন? তিনি উত্তর দিলেন, মিসওয়াক।’^{৭৬}

বর্তমান সময়ে অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো, পরিচ্ছন্নতা ইসলামের
গুরুত্বপূর্ণ অংশ হওয়া সত্ত্বেও অনেক মুসলমানই এ বিষয়টিকে মোটেও গুরুত্ব
দেয় না। তারা মুখ, শরীর, কাপড় কোনো কিছুই পরিষ্কার রাখে না। তারা
মসজিদে, ওয়াজ-মাহফিলে এবং জিকিরের হালকায় সোৎসাহে যোগদান
করে, কিন্তু তাদের শরীর থেকে ছড়ানো পচা দুর্গন্ধ উপস্থিত লোকদের পীড়া
দেয় এবং এসব পবিত্র স্থান থেকে ফেরেশতাদের তাড়িয়ে দেয়। আশ্চর্যের
বিষয় হলো, তারা আবার পেঁয়াজ, রসুন খেয়ে মসজিদে না আসার হাদিসটিও
খুব গুরুত্ব সহকারে বয়ান করে!

রাসুলুল্লাহ  বলেন :

مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالْثُومَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ
الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ

৭৫. সহিহুল বুখারি : ৮৮৭, সহিহ মুসলিম : ২৫২ (ইবারত মুসলিমের)

৭৬. সহিহ মুসলিম : ২৫৩

‘যে ব্যক্তি পেঁয়াজ, রসুন বা গো-রসুন (এক প্রকার বন্য পেঁয়াজ বা রসুন) খাবে, সে যেন আমার মসজিদের কাছেও না আসে। কেননা, মানুষ যেসব জিনিস দ্বারা কষ্ট পায়, ফেরেশতারাও সেসব জিনিস দ্বারা কষ্ট পায়।’^{৭৭}

রাসুলুল্লাহ ﷺ কতিপয় দুর্গন্ধযুক্ত সবজি খেয়ে মসজিদে আসতে বারণ করেছেন, যেন ফেরেশতা ও মানুষদের কষ্ট না হয়। অথচ এগুলোর দুর্গন্ধ পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে উদাসীন লোকদের মুখ, শরীর ও কাপড় থেকে যে দুর্গন্ধ ছড়ায় তার চেয়ে অনেক কম। তাহলে এসব দুর্গন্ধ নিয়ে মসজিদে আসা কী করে একজন মুসলমানের শান হতে পারে?

মুসনাদে আহমাদ ও সুনানে নাসায়িতে জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন :

أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرًا فِي مَنْزِلِنَا، فَرَأَى رَجُلًا شَعِيئًا، فَقَالَ: أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ رَأْسَهُ، وَرَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَسِخَةٌ، فَقَالَ: أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يَغْسِلُ بِهِ ثِيَابَهُ

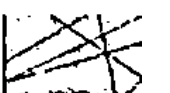
‘একদিন রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের দেখতে বাসায় এলেন। সেখানে আলুথালু কেশবিশিষ্ট এক ব্যক্তিকে দেখে বললেন, তার চুলগুলো পরিপাটি করে রাখার মতো কি কিছুই নেই? আর ময়লাযুক্ত কাপড় পরিহিত আরেকজনকে দেখে বললেন, তার কাপড় ধোয়ার জন্য কি কিছুই নেই!?’^{৭৮}

ধোয়া ও পরিষ্কার করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ময়লাযুক্ত কাপড় পরিধান করে লোকসমক্ষে আসাকে রাসুলুল্লাহ ﷺ অপছন্দ করেছেন। তাই প্রকৃত মুসলমান হতে হলে অবশ্যই কাপড়-চোপড় পরিষ্কার থাকা চাই।

মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

৭৭. সহিহ মুসলিম : ৫৬৪

৭৮. মুসনাদু আহমাদ : ১৪৮৫০



مَا عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ وَجَدَ - أَوْ مَا عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ وَجَدْتُمْ - أَنْ
يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، سِوَى ثَوْبَيْنِ مِهْنَتِهِ

‘তোমাদের কেউ বা তোমরা যদি সচরাচর পরিহিত কাপড় ছাড়া
জুমআর দিন পরার জন্য পৃথক একজোড়া কাপড় সংগ্রহ করতে
পারো, তবে তাই করো।’^{৭৯}

একাধিক হাদিসে ইসলাম তার অনুসারীদের দেহ ও কাপড় পরিচ্ছন্ন ও
সুগন্ধময় করে রাখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। মুসলমানের শরীর ও কাপড়
পরিষ্কার থাকবে এবং সুগন্ধি ছড়াবে—এটাই ইসলামের চাওয়া। রাসুলুল্লাহ
ﷺ এমনই ছিলেন।

সহিহ মুসলিমে আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন :

مَا شَمَمْتُ عَنَبْرًا قَطُّ، وَلَا مِسْكًَا، وَلَا شَيْئًا أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

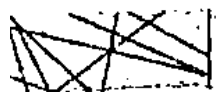
‘আমি রাসুলুল্লাহ সঃ-এর ঘ্রাণের মতো সুগন্ধি আশ্বর ও মিশকেও
পাইনি।’^{৮০}

রাসুলুল্লাহ সঃ-এর শরীর ও কাপড়ের পরিচ্ছন্নতা এবং শরীরের সুগন্ধি-
সম্পর্কিত হাদিসের সংখ্যা অনেক। যেমন এক হাদিসে আছে, তিনি কারও
সাথে মুসাফাহা করলে সারাদিন তার হাতে রাসুলুল্লাহ সঃ-এর সুগন্ধি লেগে
থাকত। কোনো বাচ্চার মাথায় হাত রাখলে অন্যান্য বাচ্চার মাঝে ওই
বাচ্চাকে সুন্দর সুগন্ধির কারণে আলাদাভাবে পার্থক্য করা যেত।

ইমাম বুখারি রাঃ তাঁর ‘আত-তারিখুল কাবির’-এ জাবির রাঃ থেকে বর্ণনা
করেন যে, রাসুলুল্লাহ সঃ কোনো রাস্তা দিয়ে হাঁটলে সে রাস্তা সুগন্ধময় হয়ে
থাকত। তাঁর যাওয়ার পরে ওই রাস্তা দিয়ে কেউ হাঁটলে সুগন্ধির কারণে
বুঝতে পারত, এখান দিয়ে রাসুলুল্লাহ সঃ হেঁটে গেছেন।

৭৯. সুনানু আবি দাউদ : ১০৭৮

৮০. সহিহ মুসলিম : ২৩৩০



আনাস ؓ বলেন :

دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عِنْدَنَا، فَعَرِقَ، وَجَاءَتْ
أُمِّي بِقَارُورَةٍ، فَجَعَلْتُ تَسْلِيْتُ الْعَرِقَ فِيهَا، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا هَذَا الَّذِي تَصْنَعِينَ؟ قَالَتْ: هَذَا
عَرَقُكَ نَجَعَلُهُ فِي طَيِّبِنَا، وَهُوَ مِنْ أَطْيَبِ الطَّيِّبِ

‘একদিন নবিজি আমাদের বাড়িতে এসে দুপুরের বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। তাঁর ঘাম বের হলে আমার মা এসে সে ঘাম একটি বোতলে ভরতে লাগলেন। নবিজি ؓ জাগ্রত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হে উম্মে সুলাইম, এ তুমি কী করছ? তিনি উত্তরে বললেন, এই যে আপনার ঘাম, এটা আমরা সুগন্ধি হিসাবে ব্যবহার করব। আর এটা হলো সর্বোত্তম সুগন্ধি।’^{৮১}

রাসুলুল্লাহ ؓ ইসলাম-নির্দেশিত পন্থায় চুলের যত্ন নিতে এবং পরিপাটি করে রাখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন।

সুনানে আবু দাউদে আবু হুরাইরা ؓ থেকে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ ؓ ইরশাদ করেছেন :

مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ

‘যার চুল আছে, সে যেন চুলের যত্ন নেয়।’^{৮২}

ইসলামে চুলের যত্ন নেওয়ার অর্থ হলো, পরিষ্কার, পরিপাটি, সুগন্ধযুক্ত এবং দেখতে সুন্দর লাগে—এমন করে রাখা।

চুল এলোমেলো করে রাখাকে রাসুলুল্লাহ ؓ অপছন্দ করতেন। শয়তানের সদৃশ বলে অভিহিত করতেন।

৮১. সহিহ মুসলিম : ২৩৩১

৮২. সুনানু আবু দাউদ : ৪১৬৩

ইমাম মালিক   আতা বিন ইয়াসার   থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেন :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ ثَائِرَ
الرَّأْسِ وَاللَّحْيَةِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ أَنْ
اخْرُجْ - كَأَنَّهُ يَغْنِي إِصْلَاحَ شَعْرِ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ - فَفَعَلَ الرَّجُلُ، ثُمَّ
رَجَعَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَيْسَ هَذَا خَيْرًا مِنْ أَنْ
يَأْتِيَ أَحَدُكُمْ ثَائِرَ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ

‘রাসুলুল্লাহ   মসজিদে ছিলেন। এমন অবস্থায় এলোমেলো চুল-
দাড়িওয়ালা এক ব্যক্তি প্রবেশ করলেন। রাসুলুল্লাহ   হাতের
ইশারায় চুল-দাড়ি ঠিক করে আসতে বললেন। লোকটি ফিরে গিয়ে
ঠিক করে আসলো। তখন রাসুলুল্লাহ   বললেন, শয়তানের মতো
এলোমেলো চুল নিয়ে আসার চেয়ে এমন (পরিপাটি) অবস্থায় আসা
উত্তম নয় কি?’^{৮৩}

শয়তানের সাথে উপমা দেওয়া থেকে বুঝা গেল, উত্তম ও সুন্দর বেশভূষা
নিয়ে থাকা ইসলামের শিক্ষা ও দাবি। রাসুলুল্লাহ   বাহ্যিক সৌন্দর্য ও
বেশভূষার প্রতি খুব গুরুত্ব দিতেন। দেখতে অসুন্দর ও এলোমেলো চুলের
কাউকে দেখলে ঠিক করে নেওয়ার নির্দেশ দিতেন।

মুসনাদে আহমাদ ও সুনানে নাসায়িতে জাবির   থেকে বর্ণিত আছে, তিনি
বলেন :

أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرًا فِي مَنْزِلِنَا، فَرَأَى رَجُلًا
شَعِثًا، فَقَالَ: أَمَا كَانَ يَجِدُ هَذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ رَأْسَهُ

‘একদিন রাসুলুল্লাহ   আমাদের দেখতে বাসায় এলেন। এখানে
আলুথালু কেশবিশিষ্ট এক ব্যক্তিকে দেখে বললেন, এই ব্যক্তির
চুলগুলো পরিপাটি করে রাখার মতো কি কিছুই নেই!?’^{৮৪}

৮৩. মুয়াত্তা মালেক : ৭

৮৪. মুসনাদু আহমাদ : ১৪৮৫০

তার বাহ্যিক অবয়ব সুন্দর

প্রকৃত মুসলমান পোশাক-আশাক ও বাহ্যিক অবয়ব সুন্দর রাখার প্রতি খুবই যত্নবান থাকে। এজন্য সাজগোজে কোনোরূপ সীমালঙ্ঘন ও অপচয় করা ছাড়াই তাকে দেখলে চোখ জুড়ায় এবং মনে এক ধরনের প্রশান্তি অনুভব হয়। দেখতে অসুন্দর এবং বিস্ত্রী বেশভূষা নিয়ে সে মানুষের সামনে আসে না। সুন্দর ও পরিপাটি বেশ নিয়ে ঘর থেকে বের হয়। কেননা, রাসুলুল্লাহ ﷺ ঘরের ভেতর তো উত্তম বেশভূষা নিয়ে থাকতেনই, সাহাবিদের সামনে আসার সময় আরও উত্তম বেশে বের হতেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ

‘আপনি বলুন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্তু ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, তা কে হারাম করেছে!’^{৮৫}

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম কুরতুবি رحمه বলেন :

كَانَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُونَهُ عَلَى الْبَابِ، فَخَرَجَ يُرِيدُهُمْ، وَفِي الدَّارِ رَكْوَةٌ فِيهَا مَاءٌ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ فِي الْمَاءِ وَيُسَوِّي لِحْيَتَهُ وَشَعْرَهُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَأَنْتَ تَفْعَلُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى إِخْوَانِهِ فَلْيُهَيِّئْ مِنْ نَفْسِهِ فَإِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ.

‘মাকহুল رحمه আয়িশা رحمه থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কয়েকজন সাহাবি দরজার সামনে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তাদের কাছে আসার সময় তিনি একটি পানিভর্তি পাত্রে চেহারা দেখে চুল ও দাড়ি ঠিক করে নিলেন। আমি বললাম, আপনিও এমন করতে গেলেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, মানুষ যখন তার



বন্ধুদের নিকট যাওয়ার ইচ্ছা করে, তখন নিজের বেশভূষা একটু সুন্দর করে নেওয়া উচিত। কেননা, আল্লাহ তাআলা সুন্দর এবং সৌন্দর্যকে তিনি ভালোবাসেন।^{৮৬}

উল্লিখিত সকল বিষয়ে মুসলমান মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে। অর্থাৎ ইফরাত (সীমালঙ্ঘন) ও তাফরিত (শিথিলতা) এর মাঝামাঝি থাকে। যেমনটি কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

‘আর তারা (মুমিনরা) যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না এবং কৃপণতাও করে না; বরং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী।’^{৮৭}

ইসলাম সাধারণভাবে তার সকল অনুসারী থেকে এবং বিশেষভাবে দায়ীদের থেকে কামনা করে যে, তারা যেন সমাজে এমনভাবে চলে, যাতে লোকজন তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। দেখতে অসুন্দর লাগে এবং মন খারাপ হয়ে যায়— এমন বেশে চলাচল করতে নিষেধ করে। বুজুর্গি ও বিনম্রতার নাম দিয়ে জীর্ণশীর্ণ ও বিস্ত্রী পোশাকে চলাচল করা ইসলাম সমর্থন করে না। কেননা, বুজুর্গদের সর্দার এবং নম্রতার মূর্তপ্রতীক রাসুলুল্লাহ ﷺ সুন্দর পোশাক পরিধান করতেন। ঘরে ও বাইরে সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। তা ছাড়া সুন্দর বেশে থাকা মানে আল্লাহর নিয়ামত প্রকাশ করা।

হাদিস শরিফে আছে :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ

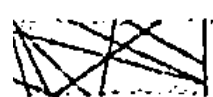
‘নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বান্দার মাঝে তাঁর নিয়ামতের চিহ্ন দেখতে ভালোবাসেন।’^{৮৮}

তাবাকাতে ইবনে সাদে জুনদুব বিন মাকিস ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন :

৮৬. তাফসিরুল কুরতুবি : ৭/১৯৭

৮৭. সূরা আল-ফুরকান : ৬৭

৮৮. সুনানুত তিরমিযি : ২৮১৯ ;



كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ الْوَفْدُ لِبِسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، وَأَمَرَ عَلَيْهِ أَصْحَابِهِ بِذَلِكَ. فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قَدِمَ وَفْدُ كِنْدَةَ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ يَمَانِيَّةٌ، وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ مِثْلُ ذَلِكَ

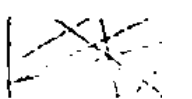
‘রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কোনো প্রতিনিধিদল আসলে তিনি সর্বোত্তম পোশাক পরতেন এবং শীর্ষস্থানীয় সাহাবিদেরকেও তা পরার আদেশ করতেন। কিন্দার প্রতিনিধিদল যেদিন এসেছিল, সেদিন রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে আমি ইয়ামানি কাপড় পরা অবস্থায় দেখেছি। আবু বকর ﷺ ও উমর ﷺ-ও সেদিন অনুরূপ ইয়ামানি পোশাক পরেছিলেন।’^{৮৯}

ইবনে মুবারক ﷺ, তাবারানি ﷺ, হাকিম ﷺ প্রমুখ মুহাদ্দিসিনে কিরাম বর্ণনা করেন :

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَا بِقَمِيصٍ لَهُ جَدِيدٍ فَلَبِسَهُ فَلَا أَحْسَبُ بَلَغَ تَرَاقِيَهُ حَتَّى قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي» ثُمَّ قَالَ: أَتَذَرُونَ لِمَ قُلْتُ هَذَا؟ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا بِثِيَابٍ جُودٍ فَلَبِسَهَا قَالَ: فَلَا أَحْسَبُهَا بَلَغَتْ تَرَاقِيَهُ حَتَّى قَالَ مِثْلَ مَا قُلْتُ

‘উমর ﷺ নতুন একটি জামা এনে পরতে লাগলেন। আমার ধারণা, যখন জামা গলার হাড় পর্যন্ত আসলো, তখন বললেন : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي (অর্থাৎ সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে এমন পোশাক পরিধান করিয়েছেন, যা দ্বারা আমার সতর আবৃত করি এবং আমার চলাফেরায় সৌন্দর্য অবলম্বন করি।) এরপর বললেন, তোমরা জানো, আমি কেন এটা বললাম? আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে নতুন কাপড় এনে পরতে দেখেছি। কাপড়

৮৯. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৪/৩৪৬



যখন তাঁর গলা মুবারকের হাড় পর্যন্ত আসলো, তখন তিনি আমি যে দুআটি পড়লাম, সে দুআটি পড়লেন।”^{৯০}

তাবাকাতে ইবনে সাদে বর্ণিত হয়েছে :

كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَلْبَسُ الْبُرْدَ أَوْ الْحُلَّةَ تُسَاوِي خَمْسِمِائَةَ
أَوْ أَرْبَعُمِائَةَ

‘আব্দুর রহমান বিন আওফ رضي الله عنه ডোরাকাটা চাদর পরিধান করতেন, যার মূল্য ছিল চারশ বা পাঁচশ দিরহাম।’^{৯১}

উসমান বিন আবু সুলাইমান رضي الله عنه বর্ণনা করেন :

أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ اشْتَرَى ثَوْبًا بِأَلْفٍ دِرْهَمٍ فَلَبِسَهُ

‘আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رضي الله عنه এক হাজার দিরহাম দিয়ে একটি কাপড় ক্রয় করে পরিধান করেছিলেন।’^{৯২}

সৌন্দর্য ও সাজগোজ যতক্ষণ পর্যন্ত শরিয়া-নির্ধারিত সীমানা ক্রস করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত তা বৈধ ও উত্তম। কারণ, আল্লাহ তাআলা সৌন্দর্য অবলম্বন করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন।

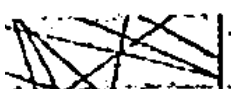
আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ - قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ
وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفْصَلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

৯০. মুসতাদরাকুল হাকিম : ৭৪১০

৯১. তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/১৩১

৯২. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ১/৩২১



‘হে বনি-আদম, তোমরা প্রত্যেক নামাজের সময় সাজসজ্জা গ্রহণ করো। খাও, পান করো এবং অপব্যয় কোরো না। নিশ্চয় তিনি অপব্যয়কারীদের পছন্দ করেন না। আপনি বলুন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য যেসব শোভার বস্তু ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, তা কে হারাম করেছে!? আপনি বলুন, এসব নিয়ামত আসলে পার্থিব জীবনে মুমিনদের জন্য এবং কিয়ামতের দিন বিশেষভাবে কেবল তাদের জন্যই নির্ধারিত। এমনভাবে আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আয়াতসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করি।’^{৯৩}

সহিহ মুসলিমে ইবনে মাসউদ রাঃ থেকে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ সঃ ইরশাদ করেছেন :

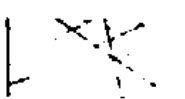
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبَرُ بَطْرُ الْحَقِّ، وَغَمَطُ النَّاسِ

‘যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার আছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এক ব্যক্তি বললেন, কোনো ব্যক্তি এটা পছন্দ করে যে, তার পোশাক সুন্দর হোক এবং জুতোজোড়াও খুব সুন্দর হোক! (তাহলে সেটাও কি অহংকার বলে বিবেচিত হবে?) তিনি বললেন, আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। প্রকৃতপক্ষে অহংকার হচ্ছে, সত্য ও ন্যায়কে উপেক্ষা করা এবং মানুষকে তুচ্ছ মনে করা।’^{৯৪}

সাহাবায়ে কিরাম রাঃ এবং তাঁদের অনুসারীগণ ইসলামের এ নির্দেশনা যথাযথ ভাবে মেনে চলেছেন। ইমাম আবু হানিফা রাঃ উত্তম ও সুন্দর পোশাক পরিধান করতেন। তাঁর শরীর থেকে আতরের সুরভি ছড়াত। ছাত্র ও ভক্তদেরও তিনি উত্তম ও সুন্দর পোশাক পরিধান করে সুন্দর বেশে থাকার নির্দেশ দিতেন।

৯৩. সূরা আল-আরাফ : ৩১-৩২

৯৪. সহিহ মুসলিম : ৯১



একদিন ইমাম আবু হানিফা   তাঁর দরসে এক লোককে জীর্ণ পোশাকে বসতে দেখলে তিনি তাকে এক হাজার দিরহাম দান করলেন, যেন সে তার বেশভূষা ঠিক ও সুন্দর করে নিতে পারে। লোকটি তাঁকে বলল, আমি সচ্ছল। আল্লাহ আমাকে নিয়ামত দান করেছেন। আমার এই টাকার প্রয়োজন নেই। তখন আবু হানিফা   তাকে ভৎসনা করে বললেন, তাহলে তুমি কি এ হাদিস শোনোনি যে, “আল্লাহ তাআলা বান্দার মাঝে তাঁর নিয়ামতের নিদর্শন দেখতে ভালোবাসেন?” তোমার অবশ্যই এ জীর্ণ বেশ পরিবর্তন করা উচিত। যেন তোমাকে দেখে তোমার সাথীদের মন খারাপ হয়ে না যায়।

আল্লাহর পথে যারা আহ্বান করে, তাদের বেশভূষা অন্য সাধারণ মুসলমানের চেয়ে উত্তম ও সুন্দর হওয়া বাঞ্ছনীয়। যাতে লোকেরা তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাদের দাওয়াতি কথা তাদের অন্তরে ভালোভাবে গেঁথে যায়।

আল্লাহর দ্বীনের দায়ীদের অবশ্যই বাহ্যিক অবয়ব সুন্দর করার প্রতি যত্নবান হতে হবে। তাদের শরীর, পোশাক, নখ, চুল সব সময় পরিষ্কার থাকা চাই। একাকী থাকাবস্থায়ও এগুলোর প্রতি যত্নবান হতে হবে। কেননা, এটাই সুস্থ মানসিকতা ও পরিচ্ছন্ন রুচির দাবি।

রাসুলুল্লাহ   ইরশাদ করেছেন :

“الْفِطْرَةُ خَمْسٌ - أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ - الْحِثَانُ، وَالْإِسْتِحْدَادُ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ”

‘পাঁচটি বিষয় স্বভাবজাত অভ্যাসের অন্তর্ভুক্ত। খতনা করা, নাভির নিচের চুল মুগানো, বগলের নিচের চুল উপড়ে ফেলা, নখ কাটা ও গোঁফ কাটা।’^{৯৫}

তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে, সাজসজ্জা বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করা যাবে না। অতিরিক্ত ফ্যাশনপ্রিয়তা ও প্রয়োজনাতিরিক্ত সাজসজ্জার পেছনে জীবনের মূল্যবান সময় ব্যয় করে ফেলা ইসলামে নিষিদ্ধ।

৯৫. সহিহুল বুখারি : ৫৮৮৯, সহিহ মুসলিম : ২৫৭

এ সম্পর্কে হাদিসে ইরশাদ হয়েছে :

تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَالدَّرْهَمِ، وَالْقَطِيفَةِ، وَالْحَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ،
وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ

‘দিনার, দিরহাম, মখমলের কাপড় ও চাদরের গোলাম (অর্থাৎ পার্থিব সম্পদ ও বিলাসিতা কামনাকারী ব্যক্তি) ধ্বংস হোক! তাকে দেওয়া হলে সন্তুষ্ট হয়, আর না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়।’^{৯৬}

যারা আল্লাহর দ্বীনের প্রতি লোকদের দাওয়াত দেয়, তাদের বিশেষভাবে উল্লিখিত সকল বিষয়ে ইসলাম-নির্দেশিত মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হবে।

খ. বিবেক

ইলম বা জ্ঞান মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক ও সম্মানের বিষয়

প্রকৃত মুসলমান বিশ্বাস করে, তার আকল বা বুদ্ধিকে ইলম অনুযায়ী পরিচালনা করতে হবে। এজন্যই প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ইলম অর্জন করা ফরজ করা হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

‘ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ।’^{৯৭}

মুসলমানের সকল পদক্ষেপ ও কাজ ইলম ও বুদ্ধির সমন্বয়ে হওয়া চাই। তাই তাকে অবশ্যই ইলম অর্জন করতে হবে। তা ছাড়া আল্লাহ তাআলার নিকট ইলমওয়ালাদের অনেক মর্যাদা রয়েছে। আল্লাহভীতি ও তাকওয়ার জন্য তাদের বিশেষায়িত করা হয়েছে।

৯৬. সহিহুল বুখারি : ২৮৮৬

৯৭. সুনানু ইবনি মাজাহ : ২২৪

তিনি ইরশাদ করেছেন :

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

‘আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁকে ভয় করে।’^{৯৮}

আল্লাহকে যারা যথাযথ ভয় করে, তাদের ফিকির ও দৃষ্টিভঙ্গি উন্নত হয়। বিশাল সৃষ্টিজগৎ ও জীবনের মাঝে তারা আল্লাহর কুদরত ও বড়ত্ব অনুধাবন করতে পারে। আর এরাই হলো প্রকৃত আলিম।

অন্য আয়াতে অন্যদের ওপর জ্ঞানীদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে তিনি ইরশাদ করেন :

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

‘যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান হতে পারে? চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান।’^{৯৯}

সাফওয়ান বিন আসসাল মুরাদি  বলেন :

أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ مُتَّكِئٌ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى بُرْدٍ لَهُ فَقُلْتُ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي جِئْتُ أَطْلُبُ الْعِلْمَ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِطَالِبِ الْعِلْمِ، طَالِبُ الْعِلْمِ لَتَحُفُّهُ الْمَلَائِكَةُ وَتُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتَيْهَا، ثُمَّ يَرْكَبُ بَعْضُهُ بَعْضًا حَتَّى يَبْلُغُوا السَّمَاءَ الدُّنْيَا مِنْ حُبِّهِمْ لِمَا يَطْلُبُ.

‘আমি নবিজি -এর নিকট আসলাম। তখন নবিজি  মসজিদে চাদরাবৃত হয়ে বসে ছিলেন। এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমি ইলম শিখতে এসেছি। তিনি বললেন, স্বাগতম হে তালিবে ইলম। তালিবে ইলমের সম্মানে ফেরেশতারা তাদের পাখা বিছিয়ে দেয় এবং পাখা দিয়ে তাকে ছায়া দান করে। তারপর ইলম

৯৮. সূরা ফাতির : ২৮

৯৯. সূরা আজ-জুমার : ৯

অন্বেষণকারীর ইলমের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শনার্থে তারা একে
অপরের ওপর সওয়ার হয়ে দুনিয়ার আসমান পর্যন্ত পৌঁছে যায়।^{১০০}

আরও অসংখ্য হাদিসে ইলমের ফজিলতের কথা বিবৃত হয়েছে এবং ইলম
তলব করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। তাই সত্যিকারের মুসলমান হতে হলে
তাকে অবশ্যই দ্বীনি জ্ঞানসম্পন্ন বা দ্বীনি জ্ঞান অন্বেষণকারী হতে হবে। এ দুই
শ্রেণির বাইরে তৃতীয় প্রকারের কেউ হওয়া যাবে না।

মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ করে

সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করা, যা অর্থনৈতিক সচ্ছলতা এবং উন্নত জীবনমান
নিশ্চিত করে, প্রকৃত জ্ঞানার্জন নয়। আমৃত্যু অধ্যয়ন করতে থাকা এবং
দিনদিন জ্ঞানের পরিধি সমৃদ্ধি করা-ই হলো প্রকৃত জ্ঞানার্জনের স্বরূপ।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

‘আর আপনি বলুন, হে আমার পালনকর্তা, আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।’^{১০১}

ইলমের দিক দিয়ে অনেক ওপরে ওঠা সত্ত্বেও আমাদের সালাফ আরও অধিক
ইলম অর্জন করার সাধনা থেকে বিরত থাকেননি। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত
তারা ইলম শিক্ষা করেছেন। তারা বিশ্বাস করতেন, চর্চা করতে থাকলে ইলম
জীবন্ত থাকে। ইলমের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে ইলম হ্রাস পেতে থাকে।
এজন্য তারা ধারাবাহিক ইলমের চর্চার গুরুত্ব সম্পর্কে অনেক মূল্যবান বাণী
উচ্চারণ করেছেন। এখানে তার কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

ইমাম ইবনে আব্দুল বার ۞ ইবনে আবু গাসসান ۞ থেকে বর্ণনা করেন,
তিনি বলেন :

لَا تَزَالُ عَالِمًا مَا كُنْتَ مُتَعَلِّمًا فَإِذَا اسْتَغْنَيْتَ كُنْتَ جَاهِلًا

১০০. আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি : ৭৩৪৭

১০১. সূরা তহা : ১১৪



‘তুমি যতক্ষণ শিখতে থাকবে, ততক্ষণ জ্ঞানী থাকবে। অতএব যখন অর্জিত জ্ঞানকে তুমি যথেষ্ট মনে করবে, তখন তুমি অজ্ঞ মানুষে পরিণত হবে।’^{১০২}

ইমাম মালিক رحمہ اللہ বলেন :

لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ يَكُونُ عِنْدَهُ الْعِلْمُ أَنْ يَتْرُكَ التَّعَلَّمَ

‘যার ইলম আছে, তার জন্য (আরও অধিক) ইলম অর্জনের পথ পরিত্যাগ করা সমীচীন নয়।’^{১০৩}

ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারক رحمہ اللہ-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে :

قِيلَ لِابْنِ الْمُبَارَكِ، إِلَى مَتَى تَطْلُبُ الْعِلْمَ؟ قَالَ: حَتَّى الْمَمَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

‘আব্দুল্লাহ বিন মুবারক رحمہ اللہ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, কতদিন পর্যন্ত আপনি ইলম শিখবেন? তিনি উত্তর দিলেন, মৃত্যু পর্যন্ত।’^{১০৪}

তাঁর ব্যাপারে আরও বর্ণিত হয়েছে :

وَقِيلَ لَهُ مَرَّةً أُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ فَقَالَ: لَعَلَّ الْكَلِمَةَ الَّتِي تَنْفَعُنِي لَمْ أَكْتُبْهَا بَعْدُ

‘তাঁকে আরেকবার এমন প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, আর আমার মনে হয়, যে ইলম দ্বারা আমি উপকৃত হব, তা এখন পর্যন্ত (পুরোপুরি) অর্জন করতে পারিনি।’^{১০৫}

ইবনে মানাজির رحمہ اللہ বলেন :

سَأَلْتُ أَبَا عَمْرٍو بْنَ الْعَلَاءِ حَتَّى مَتَى يَحْسُنُ بِالْمَرْءِ أَنْ يَتَعَلَّمَ؟ فَقَالَ:
مَا دَامَ تَحْسُنُ بِهِ الْحَيَاةَ

১০২. জামিউ বায়ানিল ইলম : ১/৪০৮

১০৩. জামিউ বায়ানিল ইলম : ১/৪০১

১০৪. জামিউ বায়ানিল ইলম : ১/৪০৬

১০৫. প্রাণ্ড

‘আমি ইমাম আবু আমর বিন আলা ؓ-কে প্রশ্ন করলাম, কতদিন পর্যন্ত ইলম শিক্ষা করা উচিত? তিনি উত্তর দিলেন, যতদিন জীবন থাকে।’^{১০৬}

বর্ণিত হয়েছে :

سُئِلَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ مَنْ أَخْوَجُ النَّاسِ إِلَى طَلَبِ الْعِلْمِ؟ قَالَ:
أَعْلَمُهُمْ، إِنَّ الْخُطَأَ مِنْهُ أَقْبَحُ

‘সুফইয়ান বিন উয়াইনা ؓ-কে প্রশ্ন করা হলো, ইলম অর্জন করার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি কার? তিনি উত্তরে বললেন, যে সবচেয়ে বড় আলিম। কারণ, তার ভুল সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও ক্ষতিকর হয়।’^{১০৭}

‘তাফসিরে কাবির’-সহ অসংখ্য গ্রন্থপ্রণেতা ইমাম ফখরুদ্দিন রাজি ؓ (মৃত্যু : ৬০৬ হি.) তার সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ আলিম ও ইমাম ছিলেন। ইলমে কালামসহ অন্য সকল অধিবিদ্যায় (metaphysics) ছিল তার অদ্বিতীয় পাণ্ডিত্য। তার ইলমের খ্যাতি ছিল বিশ্বজোড়া। দূর-দূরান্ত থেকে জ্ঞানপিপাসুরা তার কাছে জ্ঞানের তৃষ্ণা নিবারণ করতে আসত। তিনি যখন মারভ শহরে সফর করেন, তখন সেখানকার আলিম ও শিক্ষার্থীরা তার সাক্ষাৎলাভে ধন্য হতে এবং তার জ্ঞানভান্ডার থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য সমবেত হলো। তাদের মধ্যে ইলমুল আনসাব বা কুলুজি বিদ্যায় পারদর্শী এক ছাত্রও আসলো। তার বয়স এখনো বিশ অতিক্রম করেনি। ইমাম রাজি ؓ কুলুজি বিদ্যা তেমন ভালো পারতেন না। যখন এই ছাত্রের মাঝে কুলুজি বিদ্যার পাণ্ডিত্য দেখতে পেলেন, তখন তার কাছ থেকে এই বিদ্যা শেখার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তারপর যথারীতি সে ছাত্রকে শিক্ষকের আসনে বসিয়ে এবং তিনি তার সামনে বিনয়ের সাথে বসে ওই বিদ্যা শিখলেন। ইলম শিক্ষা করার জন্য ইমাম রাজির এ বিনম্রতা তাকে ছোট করেনি; বরং তার মর্যাদাকে আরও বৃদ্ধি করেছে।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও ইতিহাসবিদ আল্লামা ইয়াকুত হামাবি ؓ তার বিখ্যাত গ্রন্থ ‘মুজামুল উদাবা’-এ আজিজুদ্দিন ইসমাইল বিন হাসান সূত্রে উপরোক্ত

১০৬. জামিউ বায়ানিল ইলম : ১/৪০৭

১০৭. প্রাপ্ত

ঘটনাটি বিস্তারিত বর্ণনা করার পর লেখেন, ‘ইলমের প্রতি এত সম্মান তাঁর মতো মহান ব্যক্তিরাই দেখাতে পারেন।’

আহ! ইলমের প্রতি কত ভালোবাসা ছিল সালাফের অন্তরে! কত মর্যাদা দিতেন তারা ইলমকে! ইলমের জন্য কতকিছুই না করতেন তারা!

মুসলমানকে যেসব বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে হবে

একজন মুসলমানের জন্য প্রথমে কুরআন মাজিদের জ্ঞানার্জন করা আবশ্যিক। তিলাওয়াত, তাজবিদ, অর্থ, তাফসিরসহ সবকিছু। তারপর শিখতে হবে হাদিসের জ্ঞান। এ ছাড়াও সিরাত, সাহাবা ও তাবিয়ীদের জীবনচরিত ইত্যাদি ইসলামি জ্ঞানও শিখতে হবে। ইবাদত ও লেনদেনের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়িলও শিখতে হবে। এটা সাধারণ মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে যারা দ্বীনি ইলম অর্জন করেছে, দ্বীনের সকল খুঁটিনাটি বিষয়ের মাসআলা-মাসায়িল ও আহকামও তাদের শিখে নিতে হবে। আরবি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করাও মুসলমানের জন্য জরুরি।

নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞান লাভ করে

সত্যিকারের প্র্যাগ্টিসিং মুসলমান সাধারণভাবে দ্বীনের ইলম অর্জন করার পর নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য অর্জন করার প্রতি আগ্রহী হয়। সেটা দ্বীনি কোনো জ্ঞান হতে পারে, আবার দুনিয়াবি কোনো জ্ঞানও হতে পারে। যেমন : গণিতশাস্ত্র, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, মহাকাশবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান ইত্যাদি। ব্যবসা কিংবা কোনো হস্তশিল্পও হতে পারে। যে বিষয়েই পড়াশোনা করুক, পুরো বিষয়টাকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে নিয়ে আসতে হবে। যে ভাষার সাথে উক্ত জ্ঞানের সম্পর্ক আছে, কঠোর মেহনত করে সে ভাষা শিখে নিতে হবে। উক্ত জ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কার সম্পর্কে ধারণা রাখতে হবে। কঠোর অধ্যবসায় ও অত্যধিক অধ্যয়ন করে উদ্ভাবনের যোগ্যতা অর্জন করে নিতে হবে। তখনই বর্তমান সময়ে মুসলমানরা জ্ঞানের জগতে সফলতা লাভ করতে সক্ষম হবে। পৃথিবীর বুকে মুসলমানদের মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। তবে সবকিছু করতে হবে একমাত্র দ্বীনের স্বার্থে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে। আমাদের সালাফ তাদের যুগের সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানে



পারদর্শী ছিলেন। তবে তারা এগুলো একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই শিখেছিলেন। দুনিয়াবি স্বার্থ হাসিল করা কখনো তাদের উদ্দেশ্য ছিল না।

দৃষ্টিভঙ্গির বাতায়ন উন্মুক্ত রাখে

প্রকৃত মুসলমান নির্দিষ্ট একটি সাবজেট নিয়েই পড়ে থাকে না। বরং দৃষ্টিভঙ্গি ও বুদ্ধিকে আরও প্রসারিত করার চেষ্টা করে। এজন্য বিভিন্ন বই, গবেষণা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক ম্যাগাজিন ইত্যাদি অধ্যয়ন করে। বিশেষ করে তার সাবজেটের জন্য সহায়ক বিষয়গুলো অধ্যয়নের প্রতি মনোযোগী হয়। এতে তার জ্ঞান, বুদ্ধি ও ইলমি যোগ্যতা শাণিত হয়।

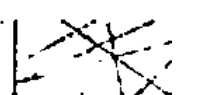
ভিনদেশি ভাষা শিক্ষা করে

প্রকৃত মুসলমান গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ভিনদেশি ভাষাও আয়ত্ত করে। কেননা, ইসলামি সংস্কৃতি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য ও আধুনিক যুগে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা বিশ্বের সকল মানুষের সামনে স্পষ্ট করার জন্য ভিনদেশি ভাষা আয়ত্ত করার বিকল্প নেই। পনেরো শতাব্দী পূর্বে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ﷺ ভিনদেশি ভাষা শেখার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, যেন বিভিন্ন জাতি ও ভাষার লোকদের সাথে মুসলমানরা যোগাযোগ করতে পারে এবং সত্য দ্বীনের প্রতি তাদের আহ্বান করতে পারে।

এ সম্পর্কে জাইদ বিন সাবিত ؓ বর্ণনা করেন :

أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَعَلَّمَ لَهُ كَلِمَاتٍ مِنْ كِتَابِ يَهُودَ قَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابٍ قَالَ: فَمَا مَرَّ بِِي نِصْفُ شَهْرٍ حَتَّى تَعَلَّمْتُهُ لَهُ قَالَ: فَلَمَّا تَعَلَّمْتُهُ كَانَ إِذَا كَتَبَ إِلَى يَهُودَ كَتَبْتُ إِلَيْهِمْ، وَإِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ قَرَأْتُ لَهُ كِتَابَهُمْ.

‘রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে ইহুদিদের চিঠিপত্রের ভাষা শেখার জন্য আদেশ করলেন। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি চিঠিপত্রের ব্যাপারে ইহুদিদের কথার ওপর পূর্ণ আস্থা রাখতে পারছি না। জাইদ ؓ বলেন, অতঃপর আমি তা পনেরো দিন যেতে না যেতেই পুরো



ভাষা শিখে ফেললাম। ভাষা শেখার পর থেকে যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ ইহুদিদের নিকট কোনো পত্র পাঠাতে চাইতেন, আমি তা লিখে দিতাম এবং তাদের পক্ষ থেকে কোনো পত্র আসলে তা তাঁকে পড়ে বুঝিয়ে দিতাম।’^{১০৮}

অন্য বর্ণনায় এসেছে :

قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتُحْسِنُ السَّرْيَانِيَّةَ؟» فَقُلْتُ: لَا. قَالَ: «فَتَعَلَّمَهَا، فَإِنَّهُ يَأْتِينَا كُتُبٌ» فَتَعَلَّمْتُهَا فِي سَبْعَةِ عَشَرَ

‘রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, তুমি কি সুরিয়ানি ভাষা জানো? আমি বললাম, না, জানি না। তিনি বললেন, তাহলে শিখে নাও। কারণ, আমার নিকট এ ভাষার অনেক পত্র আসে। এরপর আমি সতেরো দিনের মধ্যে সুরিয়ানি ভাষা শিখে নিলাম।’^{১০৯}

আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর ﷺ অনেক ভাষার পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর একশজন গোলাম ছিল। প্রত্যেকই আলাদা আলাদা ভাষায় কথা বলত। ইবনে জুবাইর ﷺ প্রত্যেকের সাথে তাদের ভাষায় কথা বলতেন। এই ভাষাগুলো শিখতে গিয়ে তাঁর দ্বীনের কোনো রূপ ক্ষতি হয়নি। আপনি হয়তো বলতে পারেন, এ লোকটার পুরো জীবন হয়তো বিদেশি ভাষা শেখার পেছনেই ব্যয়িত হয়েছে। আখিরাতের জন্য হয়তো কিছুই করার সময় পাননি। কিন্তু যখন তাঁর জীবনী খুলে দেখবেন, তখন দেখতে পাবেন, এ মহান মনীষী তাঁর পুরো জীবন আখিরাতের কাজে ব্যয় করেছেন। তাঁর জীবনের একটি সেকেন্ডও দুনিয়ার জন্য ব্যয়িত হয়নি।’^{১১০}

আধুনিক যুগের মুসলমানদের জন্য প্রয়োজনীয় কয়েকটি ভিনদেশি ভাষা শিখে নেওয়া খুবই প্রয়োজন। কারণ, ভিনদেশি ভাষার বিভিন্ন বই-পুস্তকে অনেক খারাপ খারাপ কথা লেখা হচ্ছে। সে একই ভাষায় এসবের প্রতিরোধ করতে হলে মুসলমানদের ভিনদেশি ভাষা শেখার বিকল্প নেই।

১০৮. সুনানুত তিরমিজি : ২৭১৫

১০৯. মুসতাদরাকুল হাকিম : ৫৭৮১

১১০. মুসতাদরাকুল হাকিম : ৬৩৩৫ ; হিলইয়াতুল আওলিয়া ১/৩৩৪

গ. আত্মা

প্রকৃত মুসলমান বিশ্বাস করে, সে শুধু শরীর আর আকল-বুদ্ধি দ্বারা গঠিত নয়। তার মাঝে একটি স্পন্দিত হৃদয় আছে, একটি অনুভূতিশীল আত্মা আছে, যা তাকে ইবাদতের জগতে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা জোগায় এবং জান্নাতের নিয়ামত লাভের আশ্রয় ও জাহান্নামের কঠিন শাস্তির ভয় সৃষ্টি করে।

ইবাদতের মাধ্যমে আত্মাকে শাণিত করে

এজন্য প্রত্যেক মুসলমানকে আত্মার প্রতি যত্নশীল হতে হবে। দিনরাত আল্লাহর ইবাদত ও একান্ত ধ্যানের মাধ্যমে তাকে শাণিত করতে হবে, যাতে শয়তান গ্রাস করে নিতে না পারে। আর যদি মানবিক দুর্বলতার কারণে শয়তান আক্রমণ করে বসে, তখন যেন সাথে সাথে তাওবা করে তার কবল থেকে মুক্তি লাভ করতে পারে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ

‘যাদের মনে ভয় রয়েছে, তাদের ওপর শয়তানের আগমন ঘটায় সাথে সাথেই তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের বিবেচনাশক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে।’^{১১১}

এজন্যই রাসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের উদ্দেশে বলেন :

جَدِّدُوا إِيمَانَكُمْ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ نُجَدِّدُ إِيمَانَنَا؟ قَالَ:
أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

‘তোমাদের ইমান নবায়ন করো। সাহাবিগণ বললেন, আমরা কীভাবে আমাদের ইমান নবায়ন করব? তিনি বললেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বেশি বেশি পড়ো।’^{১১২}

১১১. সূরা আল-আরাফ : ২০১

১১২. মুসনাদু আহমাদ : ৮৭১০

প্রকৃত মুসলমান আত্মাকে সুস্থ ও সবল রাখার জন্য বিভিন্ন ইবাদতের সাহায্য নিয়ে থাকে। যেমন : কুরআন তিলাওয়াত করা, জিকির করা, একাত্তিঙ্গে সহিহ-শুদ্ধভাবে নামাজ পড়া ইত্যাদি। এভাবে তার আত্মা ও অনুভূতিশক্তি জীবন্ত থাকে। আল্লাহর বড়ত্বের অনুধাবন ও তাঁর ভয় অন্তরে সদা জাগরুক থাকে। ফলে সে কখনো দ্বীন থেকে বিচ্যুত হয় না। সিরাতে মুসতাকিম থেকে সরে যায় না।

ভালো মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করে এবং ইমানের মজলিসে যোগদান করে আত্মা ও কলবকে সুস্থ রাখার জন্য প্রকৃত মুসলমান ভালো ও সৎকর্মশীল মানুষের সাথে বন্ধুত্ব করে। ইমান ও জিকিরের মজলিসসমূহে যোগদান করে, যেখানে ইসলামি আদর্শ অনুযায়ী ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ গঠনের নির্দেশনা দেওয়া হয়। এ ধরনের মজলিসে উপস্থিত হলে রুহ, নফস ও কলব পবিত্র, জংমুক্ত ও পরিচ্ছন্ন হয় এবং মানুষ ইমানি নুরে নুরান্বিত হয়ে ওঠে।

এজন্যই আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা   কোনো সাহাবির সাথে সাক্ষাৎ হলে বলতেন :

تَعَالَ نُؤْمِنُ بِرَبِّنَا سَاعَةً

‘আসুন, কিছুক্ষণ আমাদের প্রতিপালকের প্রতি ইমানকে মজবুত করে নিই।’

এ ব্যাপারে যখন রাসুলুল্লাহ   অবগত হলেন, তখন বললেন :

يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ رَوَاحَةَ، إِنَّهُ يُحِبُّ الْمَجَالِسَ الَّتِي تَتَبَاهَى بِهَا الْمَلَائِكَةُ

‘আল্লাহ তাআলা রাওয়াহার পুত্র আব্দুল্লাহর ওপর রহমত বর্ষণ করুন। সে এমন মজলিস ভালোবাসে, যা নিয়ে ফেরেশতারা পরস্পর গর্ব করে।’^{১১৩}

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা উমর   যখন খিলাফতের দায়িত্ব শেষ করে একটু অবসর পেতেন, তখন দুয়েকজন ব্যক্তির হাত ধরে বলতেন, এসো, কিছুক্ষণ ইমান বৃদ্ধি করি। অতঃপর তারা আল্লাহর জিকির করতেন।^{১১৪}

১১৩. মুসনাদু আহমাদ : ১৩৭৯৬

১১৪. হায়াতুস সাহাবা : ৩/৩২৯

উমর রাঃ-এর মতো পূর্ণাঙ্গ মুত্তাকি ও ভালো মানুষও অবসর সময়ে ইমান বৃদ্ধি করার জন্য জিকিরের মজলিস কায়েম করতেন। আমাদের মতো গুনাহগার বান্দাদের জন্য তা কতটুকু প্রয়োজন, তা সহজেই অনুমেয়।

একইভাবে মুআজ বিন জাবাল রাঃ পথচারী লোকদের বলতেন, আমাদের সাথে বসুন, কিছুক্ষণ ইমান তাজা করি।’’^{১১৫}

তা ছাড়া আত্মাকে পরিশুদ্ধ ও পরিষ্কার রাখার ব্যাপারে বান্দাকে জিজ্ঞাসা করা হবে। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে :

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۘ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا
ۙ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۚ ১০

‘শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন তাঁর। অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয় এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।’’^{১১৬}

এজন্য প্রকৃত মুসলমান সব সময় উত্তম ও সৎকর্মশীল বন্ধু নির্ণয় করতে এবং ইমানি ও আমলি পরিবেশে থাকতে চেষ্টা করে। খারাপ বন্ধু, মনুষ্য শয়তান, পাপাচার ও অশ্লীলতাদূষিত সমাজ ও পরিবেশ থেকে দূরে থাকতে চায়। কারণ, তা অন্তর ও মননকে মারাত্মক রোগে আক্রান্ত করে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا وَلَا تُطِيعْ مَنْ
أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

‘আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে।

১১৫. হায়াতুস সাহাবা : ৩/৩৩৯

১১৬. সূরা আশ-শামস : ৭-১০

আর আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। আর যার মনকে আমার স্মরণ থেকে উদাসীন করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আপনি তার অনুগত্য করবেন না।^{১১৭}

হাদিসে বর্ণিত আজকার ও দুআসমূহ যথাস্থানে পাঠ করে

বিভিন্ন কাজ ও সময়ে পড়ার জন্য যেসব দুআ হাদিসে বর্ণিত আছে, প্রকৃত মুসলমান সেসব দুআ যথাস্থানে ও যথাসময়ে নিয়মিত পাঠ করে। যেমন : ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পঠিতব্য দুআ, ঘরে প্রবেশ করতে দুআ, মুসাফিরকে বিদায় জানাতে দুআ, মুসাফিরকে স্বাগতম জানানোর দুআ, নতুন কাপড় পরার সময় পঠিতব্য দুআ, ঘুমানোর দুআ, ঘুম থেকে জাগার সময় পঠিতব্য দুআ। এভাবে প্রতিটি কাজের জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ উম্মতকে দুআ শিখিয়ে গিয়েছেন এবং আমল করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। তাই প্রকৃত মুসলমান এগুলোর ওপর খুব গুরুত্ব দিয়ে আমল করে। তা ছাড়া এ দুআগুলোর মাধ্যমে কলব পরিশুদ্ধ হয়, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গাঢ় হয়।

বস্তুত, এ দুআগুলো অন্তরের ব্যায়াম ও অনুশীলন। এগুলোর কারণে অন্তর থেকে হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার ইত্যাকার আত্মিক রোগসমূহ দূর হয়ে অন্তর সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। তাই প্রকৃত মুসলমান যেমন শরীরচর্চা ও বিভিন্ন শারীরিক অনুশীলনের মাধ্যমে শরীরের যত্ন নেয় এবং ফিট রাখে, তেমনই এ দুআগুলো নিয়মিত পড়ার মাধ্যমে অন্তরাত্মাকে সুস্থ ও পরিশুদ্ধ রাখে।

পিতা-মাতার সাথে মুসলমানের সম্পর্ক

তাদের সাথে সদ্যবহার করে

প্রকৃত মুসলমানের প্রকাশ্য একটি গুণ হলো, পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করা। কেননা, এটি এমন এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যার প্রতি ইসলাম গুরুত্বারোপ করেছে এবং শরিয়তের অকাট্য নুসুস তথা কুরআনে এর প্রতি তাগিদ দেওয়া হয়েছে। যে মুসলমান কুরআন-হাদিসের নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালনা করে, যে নির্দেশনা তাকে পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার ও উত্তম আচরণের পথ দেখায়, তার মাঝে অবশ্যই এ গুণটি আছে। এটি তার অন্যতম বৈশিষ্ট্যও বটে।

তাদের মর্যাদা এবং তাদের প্রতি সন্তানের দায়িত্বের ব্যাপারে সজাগ থাকে

ইসলাম পিতা-মাতাকে এমন উচ্চ মর্যাদার আসনে আসীন করেছে, যা অন্য কোনো ধর্ম বা জীবনব্যবস্থায় কল্পনাও করা যায় না। কেননা, ইসলামে পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করাকে আল্লাহর প্রতি ইমান আনয়ন ও তাঁর দাসত্বের পরেই স্থান দেওয়া হয়েছে। পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করাকে মানবজাতির ফজিলত হিসাবে গণনা করা হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে ইমানের ঠিক পরেই তার অবস্থান রাখা হয়েছে।

যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَاَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

‘আর আল্লাহর উপাসনা করো, তাঁর সাথে অপর কাউকে শরিক কোরো না। আর পিতা-মাতার সাথে সদয় ব্যবহার করো।’^{১১৮}

এজন্যই জগতে যত মানুষ বসবাস করে, তাদের মধ্যে একজন প্রকৃত মুসলমানই পিতা-মাতার সাথে সবচেয়ে সদাচারী ও উত্তম ব্যবহারকারী হয়ে থাকে।

১১৮. সূরা আন-নিসা : ৩৬

পিতা-মাতার মর্যাদা ও সম্মানের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক উন্নত। এমনকি তাদের উভয়জন বা একজন যখন বার্ষিক্যে উপনীত হবে, তখন তাদের প্রতি কীরূপ আচরণ করতে হবে, কুরআন তা-ও বলে দিয়েছে। পিতা-মাতার প্রতি এমন সম্মান ও দায়িত্ববোধের এমন স্বচ্ছ রূপরেখা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে কোথাও দেখা যায়নি।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا - إِمَّا يَبُلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ
ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

‘তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত কোরো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ষিক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে “উহ” শব্দটিও বলো না এবং তাদের ধমক দিয়ো না এবং তাদের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বলো। আর তাদের জন্য সদয়ভাবে নম্রতার বাহু প্রসারিত করে দাও এবং বলো, হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম করুন, যেমনিভাবে তারা আমাকে শৈশবকালে লালনপালন করেছেন।’^{১১৯}

আল্লাহ তাআলার এ আদেশ একটি বাধ্যতামূলক পালনীয় আদেশ। আয়াতটিতে আবার লক্ষ্য করুন। তিনি বলেছেন : وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا (তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত কোরো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করো)। শুধু তাই নয়, আল্লাহর ইবাদত ও পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহারের মাঝে একটি স্পষ্ট মিলরেখাও টানা হয়েছে। এভাবেই ইসলাম পিতা-মাতার মর্যাদাকে এমন উচ্চ স্তরে উন্নীত করেছে, যা কোনো যুগের দার্শনিক, সংস্কারক বা চরিত্র-বিজ্ঞানীরা কল্পনাও করতে পারেনি।

১১৯. সূরা বনি ইসরাইল : ২৩-২৪

কুরআন পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহারের শুধু একটি রূপরেখা দিয়েই স্ফান্ত থাকেনি; বরং সন্তানদের মনে তাদের প্রতি দয়া ও ভালোবাসার উপস্থিতি কামনা করেছে। বলা হয়েছে, ‘তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ষিক্যে উপনীত হয়’, তখন তাদের তোমার যত্ন ও হিফাজতের চাদরে ঢুকিয়ে নাও। তাদের এমন কোনো কথা বলা যাবে না, যে কথায় তারা কষ্ট পাবে, বিব্রত হবে কিংবা মনে সংকীর্ণতাবোধ সৃষ্টি হবে। বলা হয়েছে, ‘তাদের “উহ” শব্দটিও বলো না এবং তাদের ধমক দিয়ো না।’ তাই তাদের সাথে কথা বলতে তোমাকে সময় নিয়ে চিন্তাভাবনা করে এমন ভাষায় কথা বলতে হবে, যা তাদের অন্তরকে আনন্দ দেবে এবং চক্ষু শীতল করবে। বলা হয়েছে, ‘আর তাদের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বলো।’ অতএব, তাদের সামনে তোমাকে এমনভাবে চলতে হবে, যেন তোমার মাঝে তাদের প্রতি সম্মান, ভালোবাসা, বিনয় ও নম্রতার ছাপ দেখা যায়। বলা হয়েছে, ‘আর তাদের জন্য সদয়ভাবে নম্রতার বাহু প্রসারিত করে দাও।’ এ ছাড়াও তাদের জন্য সর্বদা দুআ করতে হবে। কোনো দুআয় তাদের কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। এ ব্যাপারে বলা হয়েছে, ‘আর বলো, হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম করুন, যেমনিভাবে তারা আমাকে শৈশবকালে লালনপালন করেছেন।’

আলোকিত হৃদয়ের অধিকারী প্রকৃত মুসলমান যখন পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার-সম্পর্কিত আয়াতগুলো পড়ে, তখন তার মাঝে পিতা-মাতার প্রতি মর্যাদাবোধ ও তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করার ইচ্ছা ও প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এ সম্পর্কিত আরও কয়েকটি আয়াত এখানে উল্লেখ করা হলো :

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَاَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

‘আর আল্লাহর উপাসনা করো, তাঁর সাথে অপর কাউকে শরিক কোরো না। পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার করো।’^{১২০}

অন্যত্র তিনি বলেন :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا

১২০. সূরা আন-নিসা : ৩৬



‘আর আমি মানুষকে পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করার জোর নির্দেশ দিয়েছি।’^{১২১}

অন্য আয়াতে বলেন :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ

‘আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে।’^{১২২}

কুরআনের পর বিশাল হাদিসভাভারের দিকে নজর দিলেও এমন অসংখ্য হাদিস দেখা যায়, যেগুলোতে পবিত্র কুরআনের মতো পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করতে তাগিদ দেওয়া হয়েছে এবং যৌক্তিক কারণ পাওয়া গেলেও তাদের অবাধ্যতা ও তাদের সাথে মন্দ আচরণ করা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যেমন আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাঃ বলেন :

أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

‘(আমি রাসুলুল্লাহ সঃ-কে জিজ্ঞেস করলাম,) কোন আমল আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়? তিনি বললেন, যথাসময়ে নামাজ আদায় করা। আমি বললাম, তারপর কী? তিনি বললেন, পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করা। বললাম, তারপর কোনটি? বললেন, আল্লাহর পথে জিহাদ করা।’^{১২৩}

এখানে রাসুলুল্লাহ সঃ পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করাকে ইসলামের মহান দুটি আমল তথা যথাসময়ে নামাজ আদায় করা ও আল্লাহর পথে জিহাদ করার মাঝখানে রেখেছেন। নামাজ দ্বীনের ভিত্তি, আর জিহাদ হলো ইসলামের

১২১. সূরা আল-আনকাবুত : ৮

১২২. সূরা লুকমান : ১৪

১২৩. সহিহুল বুখারি : ৫২৭

সর্বোচ্চ শিখর। এবার আপনিই অনুধাবন করুন, রাসুলুল্লাহ ﷺ পিতা-মাতাকে কতটা মর্যাদা ও সম্মান দিয়েছেন।

হাদিসে এসেছে :

أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَبَايُكَ عَلَى
الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ، أَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ، قَالَ: «فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ
حَيٌّ؟» قَالَ: نَعَمْ، بَلْ كِلَاهُمَا، قَالَ: «فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنَ اللَّهِ؟» قَالَ: نَعَمْ،
قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا

‘এক ব্যক্তি নবিজি ﷺ-এর নিকট এসে বলল, আমি হিজরত ও জিহাদের ওপর বাইআত হতে এসেছি, আল্লাহর নিকট সাওয়াব ও প্রতিদানের আশায়। নবিজি ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পিতা-মাতার মধ্যে কেউ কি জীবিত আছেন? লোকটি বলল, হ্যাঁ, দুজনই আছেন। তখন নবিজি ﷺ বললেন, আচ্ছা, তুমি তো আল্লাহর নিকট সাওয়াব ও প্রতিদান পাওয়ার জন্যই এসেছ? লোকটি বলল, জি। তখন নবিজি ﷺ বললেন, তাহলে তুমি পিতা-মাতার নিকট ফিরে যাও এবং তাদের সাথে সদ্যবহার করো।’^{১২৪}

সহিহ বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনায় ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ، فَقَالَ:
أَحْيَى وَالِدَاكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ

‘এক ব্যক্তি নবিজি ﷺ-এর নিকট এসে জিহাদের অনুমতি চাইল। নবিজি ﷺ বললেন, তোমার কি পিতা-মাতা বেঁচে আছেন? লোকটি হ্যাঁ-বোধক উত্তর দিলেন। তখন তিনি বললেন, তাদের মাঝেই জিহাদ করো (অর্থাৎ এ মুহূর্তে তাদের সেবা করার মাঝেই তোমার জিহাদের সাওয়াব বিদ্যমান)।’^{১২৫}

১২৪. সহিহ মুসলিম : ২৫৪৯

১২৫. সহিহ বুখারি : ৩০০৪, সহিহ মুসলিম : ২৫৪৯

রাসুলুল্লাহ ﷺ তখন জিহাদের জন্য সৈন্য জোগাড় করছিলেন। এ মুহূর্তে তলোয়ার চালাতে সক্ষম যুবকদের তাঁর ভীষণ প্রয়োজন। এমন মুহূর্তেও তাঁর দয়ালু মন জিহাদ করতে আগ্রহী লোকটির পিতা-মাতার অসহায়ত্ব ও সন্তানের প্রতি তাদের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে, তাকে জিহাদ না করে পিতা-মাতার সেবা করতে পাঠিয়ে দিলেন। এর মাধ্যমে তিনি জানিয়ে দিলেন, মানুষের সফলতার জন্য প্রণীত ইসলামি জীবনবিধানে পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করা ও তাদের সেবা করার গুরুত্ব অপরিসীম।

সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ؓ ইসলাম গ্রহণ করায় তাঁর মাতা বেজায় অসন্তুষ্ট হলেন। তাঁকে বললেন, তুমি যদি ইসলাম থেকে ফিরে না আসো, তাহলে আমি না খেয়ে মরে যাব। তখন আরবের লোকেরা মায়ের হত্যাকারী বলে তোমাকে তিরস্কার ও ধিক্কারবাণে জর্জরিত করলে মজা বুঝতে পারবে। সাদ ؓ উত্তরে বললেন, আল্লাহর কসম! তুমিও জেনে রাখো, তোমার যদি একশটা প্রাণ থাকে, আর একটার পর একটা যেতে থাকে, তবুও আমি ইসলাম ত্যাগ করব না। এরপর তাঁর মাতা দুদিন না খেয়ে থাকলেন। তৃতীয় দিনে তিনি ক্ষুধার জ্বালা সহ্যে না পেয়ে খানা খেয়ে নিলেন। কিন্তু মাকে এমন কঠোর ভাষায় জবাব দেওয়াটা আল্লাহর পছন্দ হয়নি। তাই সাদ ؓ-কে ভৎসনা করে আল্লাহ এ আয়াত নাজিল করলেন :

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا
وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

‘পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরিক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহঅবস্থান করবে।’^{১২৬}

পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করা এবং দেরি না করে জলদিই তাদের আদেশ পূরণ করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তা প্রখ্যাত আবিদ জুরাইজ ؓ-এর কাহিনি থেকে আরও স্পষ্টরূপে বুঝে আসে। জুরাইজ ؓ নামাজ পড়ছিলেন। তখন

তার মা তাকে ডাকলেন। জুরাইজ ﷺ ভাবলেন, আমার মা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, নাকি নামাজ বেশি জরুরি? ভাবার পর নামাজে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন। এদিকে মা আবার ডাক দিলেন। আর তিনি মায়ের ডাকে সাড়া না দিয়ে নামাজ অব্যাহত রাখলেন। তৃতীয়বার মায়ের ডাক পড়ল। এবারেও কোনো সাড়া নেই। তখন মা বদদুআ করলেন, ‘বেশ্যাদের চেহারা না দেখিয়ে আল্লাহ তাকে মারবেন না।’ ওদিকে এক বেশ্যা এক রাখালের সাথে ব্যভিচার করে গর্ভবতী হয়ে পড়ল। যখন লোকলজ্জার ভয় তাকে ঘিরে ধরল, তখন রাখাল পরামর্শ দিল, তোমাকে বাচ্চাটির জন্মদাতার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে বলবে, জুরাইজ এই বাচ্চার জন্মদাতা। বেশ্যাটি লোকদের তাই বলে বেড়াল। ফলে জনগণ জুরাইজ ﷺ-এর উপাসনালয় ভেঙে চুরমার করে দিল এবং বাদশা তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে গেল। যখন তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন মায়ের বদদুআর কথা মনে পড়ল। এতে তার মুখে অনুশোচনার বিরস মুচকি হাসি ফুটে উঠল। এরপর শাস্তি কার্যকর করার আগমুহূর্তে অনুমতি নিয়ে দুই রাকআত নামাজ পড়লেন তিনি। নামাজের পর বাচ্চাটিকে তার কাছে আনতে বললেন। তারপর বাচ্চার কানে কানে বললেন, তোমার পিতা কে? তখন বাচ্চাটি উত্তর দিল, আমার পিতা অমুক রাখাল।^{১২৭} তখন লোকজন তাকবির ধ্বনি দিয়ে উঠল এবং বলল, আমরা সোনা-রুপা দিয়ে আপনার ইবাদতখানা পুনঃনির্মাণ করে দেবো। জুরাইজ ﷺ বললেন, সোনা-রুপা দিয়ে নয়; বরং আগের মতো মাটি দিয়ে নির্মাণ করে দাও।

এ ঘটনা সম্পর্কে সহিহ বুখারিতে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মন্তব্য বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, জুরাইজ যদি ফকিহ (দ্বীন সম্পর্কে অভিজ্ঞ) হতেন, তাহলে বুঝতে পারতেন, মায়ের ডাকে সাড়া দেওয়া নামাজ চালিয়ে যাওয়া অপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

উল্লিখিত ঘটনা ও হাদিস থেকে ফুকাহায়ে কিরাম মাসআলা বের করেছেন যে, নফল নামাজ আদায় করার সময় যদি পিতা-মাতার কেউ ডাক দেন, তখন নামাজ ভেঙে ডাকে সাড়া দেওয়া ওয়াজিব।

১২৭. এ বাচ্চাটি সেই তিন বাচ্চার একজন, যারা দোলনায় থাকতে কথা বলেছিল। বাকি দুজন হলো, ইসা ইবনে মারইয়াম ﷺ ও আসহাবে উখদুদের বাচ্চা, যে তার মাকে ইমানের ওপর অবিচল থাকার পরামর্শ দিয়েছিল। (অনুবাদক)



পিতা-মাতা অমুসলিম হলেও তাদের সাথে সদ্যবহার করে

ইসলামের মহান নবি তাঁর মহানুভবতা ও উদারতামূলক দিক-নির্দেশনার কারণে মানবিকতার শীর্ষ চূড়ায় আরোহণ করেছেন। তাঁর মহানুভবতার একটি প্রমাণ হলো, তিনি অমুসলিম পিতা-মাতার সাথেও সদ্যবহার করতে ও তাদের সেবা করতে আদেশ করেছেন। এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা আসমা বিনতে আবু বকর ؓ-এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন :

قَدِمْتُ عَلَى أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: نَعَمْ صِلِي أُمَّكَ

‘আমার কাছে আমার মা আসলেন। রাসুলুল্লাহ ؓ-এর জীবদ্দশায় তিনি মুশরিকা ছিলেন। তখন আমি রাসুলুল্লাহ ؓ-কে এ ব্যাপারে তাঁর নির্দেশনা জানার জন্য জিজ্ঞাসা করলাম যে, আমার মা আমার নিকট কিছু চাইছেন; আমি কি তার সাথে মাতৃত্বের সম্পর্ক রাখব?’ রাসুলুল্লাহ ؓ বললেন, হ্যাঁ, তার সাথে মাতৃত্বের সম্পর্ক বজায় রাখো।’^{১২৮}

কুরআন ও হাদিসের এমন উন্নত নির্দেশনা সম্পর্কে অবগত একজন প্রকৃত মুসলমান পিতা-মাতার সাথে সবচেয়ে বেশি সদাচারী ও অনুগ্রহশীল হয়ে থাকে। সর্বাবস্থায় এবং সব সময়। সাহাবায়ে কিরাম ও তাঁদের প্রকৃত অনুসারীগণ এমনই ছিলেন।

যেমন এক ব্যক্তি সাইদ বিন মুসাইয়িব ؓ-কে বললেন, আমি পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার-সম্পর্কিত আয়াতটির মর্ম পুরোটাই বুঝেছি, তবে তার একটি অংশ—وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (আর তাদের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বলো।) এর মর্ম আমি ঠিকভাবে বুঝতে পারিনি। এখানে ‘কাওলে কারিম’ বা শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বলতে কী বুঝানো হয়েছে আসলে? তখন সাইদ ؓ উত্তর দিলেন, এর অর্থ হলো, তাদের সাথে এমনভাবে কথা বলবে, যেভাবে একজন গোলাম তার মনিবের সাথে কথা বলে। আর ইবনে সিরিন ؓ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি

তার মায়ের সাথে অসুস্থ ব্যক্তির মতো খুব ক্ষীণ আওয়াজে কথা বলতেন। মাকে যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা দেওয়ার জন্যই তিনি এমনটি করতেন।

তাদের অবাধ্য হতে ভয় করে

এ অধ্যায়ে এতক্ষণ ধরে আমরা পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করে এসেছি। এখান থেকে পিতা-মাতার নাফরমানি ও অবাধ্যতা সম্পর্কে আলোচনা করব। আশা করি, এ আলোচনা পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তানের হৃদয়ের গভীরে নাড়া দেবে।

পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করার স্থান যেমন ঠিক ইমানের পরে, তেমনই পিতা-মাতার অবাধ্যতার স্থানও ঠিক শিরকের পরে। এখান থেকেই বুঝা যায়, পিতা-মাতার অবাধ্যতা কতখানি গুরুতর একটি অপরাধ। তা ছাড়া ইসলাম এটাকে সবচেয়ে বড় কবিরাত গুনাহসমূহের একটি বলে পরিচয় দিয়েছে। যেমন : আবু বাকরা নুফাই বিন হারিস রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সঃ ইরশাদ করেছেন :

أَلَا أُنبِّئُكُمْ بِأكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟ ثَلَاثًا، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ:
الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ...

‘আমি কি সবচেয়ে বড় কবিরাত গুনাহসমূহ সম্পর্কে তোমাদের বলব না? কথাটি তিনি তিনবার বললেন। আমরা বললাম, অবশ্যই বলবেন, হে আল্লাহর রাসুল। তিনি বললেন, তা হলো, আল্লাহর সাথে শিরক করা ও পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া।...’^{১২৯}

সদ্যবহারের ক্ষেত্রে মাতাকে পিতার ওপর প্রাধান্য দেয়

পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহারের সুষ্ঠু ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে যেন কোনোরূপ ভুল না হয়, এজন্য এ সম্পর্কিত ইসলামের নির্দেশনাগুলো তিনভাগে বর্ণিত হয়েছে। কিছু নির্দেশনা পিতা-মাতা উভয়কে শামিল করে, কিছু শুধু পিতার জন্য, আর কিছু শুধুই মায়ের জন্য।

১২৯. সহিহুল বুখারি : ২৬৫৪, সহিহ মুসলিম : ৮৭

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তিনি জানতে চাইলেন, পিতা-মাতা উভয়ের মধ্যে কেউ জীবিত আছে কি না। এ হাদিসের মাধ্যমে তিনি জানিয়ে দিলেন, পিতা-মাতা উভয়ের সাথে সদ্যবহার করা আবশ্যিক।

উপরোল্লিখিত আরেকটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ ﷺ আসমা ﷺ-কে তাঁর মুশরিকা মায়ের সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

আরেক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে :

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَبُوكَ»

‘এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করলেন, কে আমার উত্তম আচরণ পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার? উত্তরে তিনি বললেন, তোমার মা। আবার প্রশ্ন করলেন, তারপর কে? উত্তর দিলেন, তোমার মা। তৃতীয়বার প্রশ্ন করলেন, তারপর কে? উত্তর দিলেন, তোমার মা। চতুর্থবার প্রশ্ন করলেন, তারপর কে? এবারে উত্তরে দিলেন, তোমার পিতা।’^{১৩০}

এ হাদিসে রাসুলুল্লাহ ﷺ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, সদ্যবহারের ক্ষেত্রে মাকে পিতার ওপর অগ্রাধিকার দিতে হবে। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পর সাহাবায়ে কিরাম ﷺ এ বিষয়ের প্রতি মুসলমানদের তাগিদ দিতেন। এমনকি উম্মাহর অভিজ্ঞ আলিম ও ফকিহ সাহাবি ইবনে আব্বাস ﷺ মায়ের সাথে সদ্যবহার করাকে আল্লাহর সবচেয়ে নৈকট্যশীল আমল মনে করতেন।

এ সম্পর্কে হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে :

أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنِّي خَطَبْتُ امْرَأَةً، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَنِي، وَخَطَبْتُهَا غَيْرِي، فَأَحَبَّتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَعِزْتُ عَلَيْهَا فَقَتَلْتُهَا، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟

১৩০. সহিহুল বুখারি : ৫৯৭১, সহিহ মুসলিম : ২৫৪৮

قَالَ: أُمُّكَ حَيَّةٌ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: تُبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ مَا اسْتَطَعْتَ. فَذَهَبْتُ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: لِمَ سَأَلْتَهُ عَنْ حَيَاةِ أُمِّهِ؟ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَعْلَمُ عَمَلًا أَقْرَبَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ بِرِّ الْوَالِدَةِ

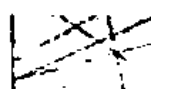
‘এক ব্যক্তি তাঁকে (ইবনে আব্বাস ؓ-কে) বললেন, একটি মেয়ের কাছে আমি বিয়ের প্রস্তাব পাঠালাম, কিন্তু সে আমার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিল। আরেক ব্যক্তি তাকে প্রস্তাব পাঠালে সে তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়ে গেল। এতে ঈর্ষাকাতর হয়ে আমি মেয়েটিকে হত্যা করে ফেললাম। এখন কি আমার তাওবার কোনো পথ খোলা আছে? তিনি বললেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন? লোকটি বললেন, না, নেই। তিনি বললেন, তাহলে আল্লাহর কাছে তাওবা করতে থাকো এবং তোমার সবটুকু চেষ্টা ব্যয় করে তাঁর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করতে থাকো।’

এ হাদিসের বর্ণনাকারী আতা বিন ইয়াসার ؓ বলেন, তখন আমি ইবনে আব্বাস ؓ-এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি তার মা জীবিত কি না জানতে চেয়েছেন কেন? তিনি বললেন, কারণ মায়ের সাথে সদ্যবহার করার চেয়ে আল্লাহর অধিক নৈকট্যশীল কোনো আমল আমার জানা নেই।”৩৩

এজন্যই ইমাম বুখারি ؓ তাঁর কিতাব ‘আল-আদাবুল মুফরাদ’-এর প্রথম অধ্যায় ‘পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার’-এ মায়ের সাথে সদ্যবহারের পরিচ্ছেদকে পিতার সাথে সদ্যবহারের পরিচ্ছেদের পূর্বে উল্লেখ করেছেন। পরিচ্ছেদের এমন বিন্যাসের মাধ্যমে তিনি সদ্যবহারের ক্ষেত্রে পিতার ওপর মায়ের অগ্রাধিকার বুঝাতে চেয়েছেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ
أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ



‘আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুবছরে। তাকে নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে।’^{১৩২}

কুরআনের বর্ণনার দিকে লক্ষ করুন, এখানে প্রথমে পিতা-মাতা উভয়ের সাথে সন্তানদের সদ্যবহারের জোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারপর মায়ের ফজিলতের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। গর্ভধারণ, দুধপান করানো ও এ দুই কাজ করতে গিয়ে কী নিদারুণ কষ্ট তাকে পোহাতে হয়েছে, তার প্রতি সন্তানদের অবহিত করা হয়েছে। বুঝাই যায়, কুরআনও মায়ের মর্যাদা ও তার প্রতি সদ্যবহার করাকে প্রাধান্য দিয়েছে।

আয়াতে আরেকটি বিষয় লক্ষ করুন, এখানে বলা হয়েছে, ‘নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।’ অর্থাৎ আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন করা যেমন জরুরি, তেমনই সন্তানদের জন্য পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় করাও বাঞ্ছনীয়। অথচ আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা সকল ফজিলত ও উত্তম আমলসমূহের মূল। সুবহানাল্লাহ! ইসলাম পিতা-মাতাকে কী উচ্চ মর্যাদাই না দিয়েছে!

কিন্তু বর্তমান সময়ের চিত্র হলো, সন্তান দুনিয়া নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। রিজিক অনুসন্ধানই তার একমাত্র কাজ। সম্পদের পাহাড় গড়েছে। সুন্দরী বউকে নিয়ে বড় মজায় আছে। কিন্তু পিতা-মাতার প্রতি তার চরম অবহেলা। তাদের একরকম ভুলেই গেছে। তাদের জন্য খরচ করতে তার হাত গুটিয়ে আসে। যাদের অবস্থা এমন, তারা আসলে বুঝতেই পারছে না যে, এ কারণে আল্লাহ তাদের ওপর কতখানি রেগে আছেন এবং যেকোনো সময় তাঁর ক্রোধ তাদের ওপর গজব হয়ে নেমে আসতে পারে!

কিন্তু প্রকৃত মুসলমান এমন নয়। সে সব সময় পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করে। তাদের সেবা করে, যত্ন নেয় এবং ভালোবাসে। যথাসাধ্য তাদের

ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে। আবার এটাকে তাদের প্রতি কোনো করুণা হিসাবে দেখে না; বরং এটাকে তার ওপর পিতা-মাতার হক ও অধিকার মনে করে। এর কারণ হলো, প্রকৃত মুসলমান পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার-সম্পর্কিত ইসলামি নির্দেশনাগুলো পুরোপুরিভাবে অনুসরণ করে চলে এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এ হাদিসটির ওপর পূর্ণরূপে আমল করে—‘তুমি এবং তোমার সম্পদ তোমার পিতার অধিকারে।’^{১৩৩}

পিতা-মাতার বন্ধুদের সাথে সদ্যবহার করে

ইসলাম শুধু পিতা-মাতার সাথেই সদ্যবহারের কথা বলে না; বরং তাদের বন্ধুবান্ধব ও প্রিয়জনদের সাথেও ভালো ব্যবহার করতে বলে।

এ সম্পর্কে ইবনে উমর ؓ থেকে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

أَبْرُ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ وَدَّ أَبِيهِ

‘সর্বোত্তম সদ্যবহার হলো, কোনো ব্যক্তি তার পিতার বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা।’^{১৩৪}

অন্য বর্ণনায় এভাবে বলা হয়েছে :

إِنَّ مِنْ أَبْرِ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وَدَّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ

‘নিশ্চয় সর্বোত্তম সদ্যবহার হলো, স্বীয় পিতার মৃত্যুর পর তার (পিতার) বন্ধুদের পরিবারের সাথে সুসম্পর্ক রাখবে।’^{১৩৫}

আব্দুল্লাহ বিন উমর ؓ-এর সাথে তাঁর পিতার এক বন্ধুর দেখা হলো। তিনি তার সাথে একটু বেশিই সদ্যবহার করলেন এবং তাকে খুব বেশি সম্মান দেখালেন। তা দেখে সাথে থাকা কয়েকজন লোক বলল, ওই ব্যক্তিকে দুই দিরহাম সদকা দিয়ে দিলেই সেটা তার জন্য যথেষ্ট হতো! (এত মর্যাদা

১৩৩. সুনানু আবি দাউদ : ৩৫৩০, সুনানু ইবনি মাজাহ : ২২৯২

১৩৪. সহিহ মুসলিম : ২৫৫২

১৩৫. সহিহ মুসলিম : ২৫৫২



দেওয়ার কী প্রয়োজন ছিল?) তখন ইবনে উমর   বললেন, রাসুলুল্লাহ   ইরশাদ করেছেন :

احْفَظْ وَدَّ أَبْيِكَ لَا تَقْطَعُهُ فَيُطْفِئَ اللَّهُ نُورَكَ

‘তোমার পিতার বন্ধুত্ব রক্ষা করবে, ছিন্ন করবে না; অন্যথায় আল্লাহ তাআলা তোমার নুর নিভিয়ে দেবেন।’^{১৩৬}

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ  -কে জিজ্ঞেস করলেন :

يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَيْ شَيْءٍ بَعْدَ مَوْتِهِمَا أَبْرُهُمَا؟ قَالَ:
نَعَمْ، خِصَالُ أَرْبَعٍ: الدُّعَاءُ لَهُمَا، وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا،
وَإِكْرَامُ صَدِيقَيْهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا رَحِمَ لَكَ إِلَّا مِنْ قَبْلِهِمَا

‘হে আল্লাহর রাসুল, পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদ্যবহার করার কোনো পন্থা কি আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, চারটি পন্থা রয়েছে। এক. তাদের জন্য দুআ ও ক্ষমাপ্রার্থনা করা, দুই. তাদের কৃত ওয়াদাসমূহ বাস্তবায়ন করা, তিন. তাদের বন্ধুবান্ধবদের সম্মান করা, চার. তাদের সূত্র ধরে যারা তোমার আত্মীয় হয়েছে, তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা।’^{১৩৭}

পিতা-মাতার প্রতি ভালোবাসা, সদ্যবহার ও সম্মান প্রদর্শনের সর্বোচ্চ স্তর হলো, সন্তান পিতা-মাতার বন্ধুদের সাথে তাদের জীবদ্দশায় এবং মরণের পর সুসম্পর্ক রাখবে। তাই প্রকৃত মুসলমান পিতা-মাতার বন্ধুবান্ধব ও তাদের প্রিয়জনদের সাথে বন্ধুত্ব ও সুসম্পর্ক রাখে। তাদের মৃত্যুর পরও সে বন্ধুত্ব ও সুসম্পর্ক রক্ষা করে চলে। তারা সম্পর্কের যে বন্ধন তৈরি করেছিলেন, তা ছিন্ন করে দেয় না। এ ধরনের উচ্চাঙ্গ মানবিক গুণাবলি ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসাই মানুষের জীবনে সুখ ও শান্তির স্নিগ্ধ বাতাস প্রবাহিত করে। এ গুণগুলো কেবল একজন প্রকৃত মুসলমানের মাঝেই পাওয়া যায়।

১৩৬. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৪০

১৩৭. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৩৫, সুনানু আবি দাউদ : ৫১৪২

পশ্চিমা সমাজে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর সন্তান পিতা-মাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তার সাথে সাথে পুত্রত্বের সম্পর্কও ছিন্ন হয়ে যায়। তাই পিতা-মাতার সাথে তার দেখাশোনা ও ভালোবাসা বিনিময় হয় না আর। সন্তান আপন পথে আপন গতিতে চলতে থাকে। যে বাবা-মা তাকে জন্ম দিয়েছেন, শৈশবের দুর্বলতার সময় তার শক্তি হয়ে পাশে ছিলেন, তার সুখের জন্য নিজেদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কুরবানি দিয়েছেন এবং সব হারিয়ে এখন বার্ধক্যতাড়িত হয়ে ধুঁকছেন, তাদের প্রতি পেছনে ফিরে তাকাবার সময় তার নেই। মা-বাবার মাথায় একটুখানি ভালোবাসার পরশ বুলিয়ে দেওয়ার ফুরসত তার হয়ে ওঠে না। এটাই পশ্চিমা সমাজে এবং পশ্চিমা-প্রভাবিত অনেক মুসলমান সমাজে পিতা-মাতার অবাধ্যতার চিত্র। পক্ষান্তরে প্রকৃত মুসলমান তার পিতা-মাতার সাথে তাদের জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর সদ্যবহার করে। নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও নির্ভেজাল আন্তরিকতা নিয়ে তাদের সেবা করে। তাদের বন্ধুবান্ধব ও প্রিয়জনদের সাথে সুসম্পর্ক রাখে। এখানেই অন্যান্য সমাজব্যবস্থা ও ইসলামের মাঝে আকাশ-পাতাল পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম বা জীবনব্যবস্থা মানবজাতির মাঝে পূর্ণাঙ্গ মানবিকতা তৈরি করতে পারেনি।

পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহারের পদ্ধতি

প্রকৃত মুসলমান পিতা-মাতার সাথে সদাচারী হয়। তাদের প্রতি মর্যাদা ও সম্মানের সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটায়। তারা যখন তার কাছে আসেন, তখন তাদের সম্মানার্থে সে দাঁড়িয়ে যায়। তাদের হাত আলতো করে ধরে তাতে চুম্বন করে। তাদের সামনে নিচু আওয়াজে কথা বলে। নম্রভাবে মাথা নত করে রাখে। কথা বলার সময় নম্র, ভদ্র ও শিষ্টাচারপূর্ণ বাক্য ব্যবহার করে। এমন কোনো শব্দ বা বাক্য মুখ দিয়ে বের করে না, যা তাদের কানে কটু শোনায় বা তাদের মনে আঘাত হানতে পারে। তাদের সাথে আচার-ব্যবহারের সময় এমন কোনো আচরণ তার থেকে প্রকাশ পায় না, যা তাদের প্রতি শিষ্টাচার ও সম্মান প্রদর্শনের পরিপন্থী। কেননা, সে সর্বাবস্থায় ও সকল পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলার এ নির্দেশনা অনুযায়ী নিজেকে পরিচালিত করে :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا - إِمَّا يَبُلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكَبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا

وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ
ارْحَمُهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

‘তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত কোরো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ষিক্যে উপনীত হয়, তবে তাদের “উহ” শব্দটিও বলো না এবং তাদের ধমক দিয়ো না এবং তাদের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বলো। আর তাদের জন্য সদয়ভাবে নম্রতার বাহু প্রসারিত করে দাও এবং বলো, হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম করুন, যেমনিভাবে তারা আমাকে শৈশবকালে লালনপালন করেছেন।’^{১৩৮}

পিতা-মাতা অনেক সময় সত্য পথ থেকে বিচ্যুত থাকেন। তখন মুসলমান সন্তানের কর্তব্য হলো, খুব বিচক্ষণতার সাথে তাদের প্রতি নম্র, ভদ্র, আন্তরিক, উদার ও একনিষ্ঠ কল্যাণকামী হয়ে তাদের সামনে নিজেকে উপস্থাপন করা এবং এভাবেই হকের পথে তাদের দাওয়াত দিতে থাকা। এ ক্ষেত্রে তাদের সামনে কঠোর হওয়া যাবে না, কোনো রকমের কটুবাক্য ও তিরস্কারমূলক কথা শোনানো যাবে না; বরং তাদের ভালোবাসা ও নম্রতার সহিত বুঝাতে হবে, যাতে তারা সে সত্যের দিকে ফিরে আসে, যার ওপর তাদের সন্তান বিশ্বাস স্থাপন করেছে। সারকথা হলো, পিতা-মাতাকে হকের পথে দাওয়াত দেওয়ার জন্য মুসলমান সন্তানকে হকের অকাট্য প্রমাণাদি, উত্তম কথা এবং ভদ্রজনোচিত আচরণ—এ বিষয়গুলো মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে হবে।

পিতা-মাতা মুশরিক হলেও ইসলাম তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দেয়; অথচ শিরক হলো সবচেয়ে বড় কবিরাত্তা গুনাহ!

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ
أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ - وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي

مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ
سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

‘আর আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মাতা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুবছরে। পাশাপাশি এ নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই নিকট ফিরে আসতে হবে। পিতা-মাতা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন বিষয়কে শরিক স্থির করতে পীড়াপীড়ি করে, যার জ্ঞান তোমার নেই, তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহঅবস্থান করবে। যে আমার অভিমুখী হয়, তার পথ অনুসরণ করবে। অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন আমারই দিকে এবং তোমরা যা করতে, আমি সে বিষয়ে তোমাদের জ্ঞাত করব।’^{১৩৯}

পিতা-মাতা সন্তানের সবচেয়ে কাছের আত্মীয় ও সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। তাদের মর্যাদা ও সম্মান অনেক ওপরে। কিন্তু একজন মুসলমানের জন্য সবার আগে তার আকিদা ও বিশ্বাস। তাই পিতা-মাতা যদি মুশরিক হন আর তারা সন্তানকে শরিক করার নির্দেশ দেন, তখন তাদের আনুগত্য করা যাবে না। কারণ, স্রষ্টার নাফরমানির ক্ষেত্রে সৃষ্টির আনুগত্য চলে না। তা ছাড়া আকিদার সম্পর্ক অন্য সকল সম্পর্কের উর্ধ্বে। তবে হ্যাঁ, এমন মুহূর্তেও পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করা ও তাদের সেবা করা সন্তানের কর্তব্য।

এজন্য প্রকৃত মুসলমান সর্বাবস্থায় পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করে। আল্লাহর আনুগত্যের পরিসীমায় থেকে যথাসাধ্য তাদের আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করে। তাদের সাথে সদ্যবহার করতে, তাদের সেবা করতে ও তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে কোনোরূপ সংকীর্ণতা দেখায় না। তাদের জন্য যথাসাধ্য উত্তম খাবার-দাবার, ভালো পোশাক-আশাক ও সুন্দর আবাসস্থলের ব্যবস্থা করে। মোটকথা, তারা যে সময়ে বাস করেন, সে সময়ের যথোপযুক্ত বৈধ

বিলাসিতা ও উন্নত জীবনযাপনের ব্যবস্থা করে। এ ছাড়াও তাদের সাথে উত্তম ও সুন্দর ভাষায় হাসিমুখে কথা বলে। তাদের প্রতি আন্তরিকতা ও ভালোবাসার সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটায়।

প্রকৃত মুসলমান পিতা-মাতার সাথে শুধু তাদের জীবদ্দশায় সদ্যবহার করে, তা নয়; বরং তাদের মৃত্যুর পরেও তাদের পক্ষ থেকে সদকা করে এবং তাদের জন্য অধিক হারে দুআ করে। মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদ্যবহার করার পদ্ধতি এটাই। পিতা-মাতার জন্য দুআর বাক্য স্বয়ং আল্লাহ-ই শিখিয়ে দিয়েছেন।

পবিত্র কুরআনে তিনি বলেন :

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَّانِي صَغِيرًا

‘আর তাদের জন্য সদয়ভাবে নম্রতার বাহু প্রসারিত করে দাও এবং বলো, হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম করুন, যেমনিভাবে তারা আমাকে শৈশবকালে লালনপালন করেছেন।’^{১৪০}

মাতা-পিতার সাথে সদ্যবহারের ক্ষেত্রে এটাই ইসলামের নির্দেশনা, যা এ অধ্যায়ের শুরু থেকে এতক্ষণ আলোচনা করা হলো। আর সে-ই প্রকৃত মুসলমান, যে এ নির্দেশনা পূর্ণরূপে অনুসরণ করে চলে। কিন্তু বড়ই আফসোসের বিষয় হলো, বর্তমান বস্তুবাদী-ভোগবাদী জীবনব্যবস্থা ও আধুনিক নগরায়ণ অধিকাংশ মুসলমানকে ইসলামের এ নির্দেশনা থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

বর্তমান সময়ে আমাদের নিকট প্রথমে গুরুত্ব পায় স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি। পিতা-মাতার অবস্থান এদের পরে। তা-ও খুব অল্পসংখ্যক পিতা-মাতা এ দ্বিতীয় স্তরের গুরুত্ব পেয়ে থাকেন। অবশ্য সন্তান যদি প্রকৃত মুসলমান হয়, নেককার ও দীনদার হয়, তখন পিতা-মাতা সন্তানের নিকট থেকে তাদের ন্যায্য অধিকার ও যথাযথ গুরুত্ব পেয়ে থাকেন।

১৪০. সূরা বনি ইসরাইল : ২৪

আসলে পাশ্চিমা আধুনিক সমাজব্যবস্থা অধিকাংশ মুসলমানের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে, যে সমাজব্যবস্থায় পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার ও মুরব্বিদের যত্ন নেওয়ার কোনোই বাধ্যবাধকতা নেই। তাই যে সকল মুসলমান এ সমাজব্যবস্থা দ্বারা প্রভাবিত, তাদের নিকট কেবল স্ত্রী-সন্তানই গুরুত্ব পায়। যে পিতা-মাতা সন্তানদের জন্য শত শত নির্ঘুম রজনী কাটিয়েছেন, নিজেদের সুখ বিসর্জন দিয়ে সন্তানদের সুখ কামনা করেছেন, সেই পিতা-মাতার প্রতি একটু ভালোবাসা দেখানোর সময় এসব আধুনিক চিন্তা-চেতনায় পালিত সন্তানদের হয়ে ওঠে না; বরং তাদের খুব ভারী বোঝা মনে হয়, যখন তারা বয়সের ভারে অচল হয়ে পড়েন। তাদের সকল চিন্তা-ভাবনা আবর্তিত হয় স্ত্রী-সন্তানদের ঘিরে। তাদের উন্নত খাবার-দাবার, উত্তম পোশাক-আশাকসহ বিলাসী জীবনের সকল উপকরণ প্রদান করে। মা-বাবার হাতে সুখী জীবনের এসব উপকরণ তুলে দেওয়ার কোনো ইচ্ছাই তাদের মনে জাগে না। অথচ এমন সময়ে প্রিয় সন্তানের হাত থেকে এসব উপকরণ পাওয়া তাদের বড্ড বেশি প্রয়োজন!

পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করা, ভালোবাসা ও আন্তরিকতা নিয়ে তাদের প্রতি মনোযোগী হওয়া, তাদের জন্য যথাসাধ্য ব্যয় করা, সুন্দর কথা ও ভালোবাসামাখা হাসি তাদের উপহার দেওয়া ইত্যাদি বিষয় মুসলমানদের মৌলিক গুণাবলি। জীবনের সুখ-দুঃখ, সচ্ছলতা-অসচ্ছলতা—সব সময় সকল পরিস্থিতিতে প্রত্যেক মুসলমানের মাঝে এসব গুণাবলি থাকা বাঞ্ছনীয়। তখন এসব গুণাবলি অন্তর কঠোর হয়ে যাওয়া থেকে তাদের রক্ষা করবে। তাদের ভেতর থেকে দাঙ্গিকতা ও আত্মসন্ত্রিস্তা দূর করে দেবে। তাদের পৌঁছে দেবে মানবিকতার শীর্ষচূড়ায়। সবশেষে নিয়ে যাবে চিরশান্তির জান্নাতে। পক্ষান্তরে যাদের মাঝে এসব গুণাবলি থাকবে না, তারা মানবিকতার নিকৃষ্টতম নিম্নস্তরে নিপতিত হবে, যেখান থেকে জাহান্নামের জ্বলন্ত গর্ত খুব বেশি দূরে নয়।

স্ত্রীর সাথে মুসলমানের সম্পর্ক

বিয়ে ও স্ত্রীর ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামে বিয়ে হলো হৃদয়ের প্রশান্তি ও আত্মিক স্থিরতার উপাদান। বিয়ে একজন পুরুষ ও একজন নারীর মাঝে ভালোবাসা, অনুগ্রহ ও পারস্পরিক সহমর্মিতার এক পবিত্র বন্ধন। বিয়ের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের নিকট পৃথিবীর পরিবেশটা অনেক সুখী ও আনন্দদায়ক হয়ে ওঠে। একে অপরের ভালোবাসার সাগরে অবগাহন করে তারা। গড়ে ওঠে একটি সুস্থ, সুখী ও সমৃদ্ধ মুসলিম পরিবার।

পবিত্র কুরআন নারী ও পুরুষের এ আদি ও সনাতন সম্পর্কের মনোমুগ্ধকর চিত্র এঁকেছে। সে চিত্রে ফুটে উঠেছে প্রশান্তি ও নিরাপত্তার সুন্দর অবয়ব। সুবাসিত হয়েছে পারস্পরিক ভালোবাসা, বুঝাপড়া ও অনুগ্রহের সুগন্ধি।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

‘আর তাঁর একটি নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাকো এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।’^{১৪১}

বিয়ে দুটি মনের মিলন। আল্লাহ তাআলা বিয়ের মাধ্যমে দুটি হৃদয়ের মাঝে বন্ধন সৃষ্টি করে দেন, যেন তারা একে অপরের মাঝে প্রশান্তি, স্থিরতা ও শান্তি খুঁজে পায়। এ বন্ধন নিষ্ঠাপূর্ণ মহব্বতের, অপার্থিব ভালোবাসার।

ইসলামে পুরুষের জন্য সবচেয়ে বড় নিয়ামত ও সম্পদ হলো নেককার স্ত্রী। তার মাঝে সে জীবনের সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে গিয়ে এক অপার্থিব প্রশান্তি অনুভব করে। তার মাঝে এমন সুখ ও স্বাদ অনুভব করে, যা জীবনের আর কোনো

কিছুতে নেই। রাসুলুল্লাহ ﷺ সত্যই বলেছেন :

الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

‘দুনিয়ার সবকিছুই উপভোগের উপকরণ। আর দুনিয়ার সর্বোত্তম উপভোগ্য উপকরণ হলো পুণ্যবতী স্ত্রী।’^{১৪২}

এতক্ষণ বিয়ের ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করা হলো। সামনের লাইনগুলোতে স্ত্রী সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রকৃত মুসলমান কোন প্রকারের মেয়েকে স্ত্রী হিসাবে চায়

প্রকৃত মুসলমান বর্তমান সময়ের আধুনিক যুবতিদের ফিগার ও পারফিউমের কড়া গন্ধে বিমোহিত হয় না; বরং সে দেখে একজন প্রকৃত ও পূর্ণাঙ্গ মুসলিম রমণীর স্বপ্ন। এজন্য এমন মেয়েকে সে জীবনসঙ্গিনী হিসাবে বেছে নেয়, যার মাঝে ইসলামের সৌন্দর্য ও উন্নত গুণাবলি আছে। শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্য, লাবণ্য ও কমণীয়তা দেখে সে কারও প্রতি আকৃষ্ট হয় না, যেমনটি বর্তমান সময়ে ইসলামি আদর্শ-বিবর্জিত যুবকরা হয়ে থাকে। বরং প্রকৃত মুসলিম মাত্রই দীনদারি, বুদ্ধিমত্তা ও উত্তম চরিত্রের অনুসন্ধান করে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ
بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ

‘মেয়েদের বিয়ে করার ব্যাপারে (সাধারণত) চারটি জিনিসের প্রতি লক্ষ রাখা হয়। তার অর্থ-সম্পদ, বংশমর্যাদা, রূপ-সৌন্দর্য ও দীনদারি। তুমি দীনদারি বিচার করে বিয়ে করবে; (অন্যথায়) ধুলোয় ধূসরিত হোক তোমার উভয় হাত।’^{১৪৩}

১৪২. সহিহ মুসলিম : ১৪৬৭

১৪৩. সহিহ মুসলিম : ১৪৬৬, সহিহুল বুখারি : ৫০৯০

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এ নির্দেশনা অনুযায়ী মুসলমান যুবককে জীবনসঙ্গিনী চয়নের ক্ষেত্রে দীনদারিকেই প্রথম গুরুত্ব দিতে হবে, তবে তার অর্থ এ নয় যে, চেহারার সৌন্দর্য ও লাভণ্যের দিকে কোনোরূপ ভ্রক্ষেপই করা যাবে না। কেননা, স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ﷺ-ই অন্য হাদিসে বিয়ের পূর্বে মেয়ের চেহারা দেখে নেওয়াকে উত্তম বলেছেন। এতে বিয়ের পর ‘মেয়েকে ভালো লাগছে না বা তাকে দেখে চক্ষু শীতল হচ্ছে না’ জাতীয় কোনো রকমের জটিলতা বা বিব্রত অবস্থায় পড়তে হবে না।

মুগিরা বিন শুবা রা. বলেন :

خَطَبْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْظَرْتُ إِلَيْهَا؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَانْظُرِي إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤَدَّمَ بَيْنَكُمَا

‘রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে আমি এক মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালাম। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, মেয়েকে দেখেছ? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, প্রথমে তাকে দেখে নাও। কেননা, তোমাদের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টিতে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।’^{১৪৪}

আরেক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে :

خَطَبَ رَجُلٌ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: لَا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا

‘এক ব্যক্তি এক আনসারি মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন, মেয়ে দেখেছ? তিনি বললেন, না। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে মেয়ে দেখে নেওয়ার পরামর্শ দিলেন।’^{১৪৫}

এভাবে একাধিক হাদিসে রাসুলুল্লাহ ﷺ স্পষ্টভাবে বলেছেন, অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য ও গুণাবলির পাশাপাশি বাহ্যিক সৌন্দর্যও একটি মৌলিক গুণ, যা

১৪৪. সুনানুন নাসায়ি : ৩২৩৫

১৪৫. সুনানুন নাসায়ি : ৩২৩৪

স্ত্রীর মাঝে সব পুরুষই কামনা করে। এ দুটির একটি আরেকটির ঘাটতি পূরণ করতে পারে না। এজন্য তিনি ইবনে আব্বাস ؓ-কে বলেন :

أَلَا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ مَا يَكْنِزُهُ الْمَرْءُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتُهُ،
وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ

‘আমি কি তোমাকে জানিয়ে দেবো না যে, মানুষের সবচেয়ে উত্তম সম্পদ কী? তা হচ্ছে পুণ্যবতী স্ত্রী, যার দিকে তাকালে মন জুড়িয়ে যায়, যাকে আদেশ করলে তা মেনে চলে এবং যার কাছ থেকে অনুপস্থিত থাকলে তার (সম্পদের) হিফাজত করে।’^{১৪৬}

আবু হুরাইরা ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ فَقَالَ: خَيْرُ النِّسَاءِ
مَنْ تَسَرَّ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا

‘নবিজি ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলো, সর্বোত্তম নারী কে? তিনি বললেন, যার দিকে তাকালে মন জুড়িয়ে যায়, যাকে আদেশ করলে তা মান্য করে এবং নিজের ব্যক্তিসত্তা ও সম্পদের বিষয়ে স্বামীর সাথে কোনোরূপ বিরোধিতায় লিপ্ত হয় না।’^{১৪৭}

এটাই স্ত্রী সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি। ইসলামের দৃষ্টিতে আদর্শ স্ত্রী হলো সে, যে তার স্বামীকে প্রশান্তি ও স্থিরতা দিতে পারে। দাম্পত্য জীবনে আনন্দ ও নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। একজন আদর্শ মা হয়ে উপহার দিতে পারে একটি সুস্থ ও সুষ্ঠু প্রজন্ম। জন্ম দিতে পারে ইসলামের জন্য আত্মদানকারী জানবাজ মুজাহিদদের। গর্ভে ধারণ করতে পারে যুগের শ্রেষ্ঠ আলিম ও বিদ্বান ব্যক্তিদের।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বৈবাহিক সম্পর্ককে শত্রু ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর প্রতি জোর ত্যাগ দিচ্ছেন। যেখানে শরীর, বিবেক, আত্মা ও মনের মাঝে সুষ্ঠু ভারসাম্য থাকবে। সাময়িক রাগ ও ভুল-বুঝাবুঝির কারণে সম্পর্ক নড়বড়ে

১৪৬. মুস্তাদরাকুল হাকিম : ৩২৮১, শুআবুল ইমান : ৩০৩৫

১৪৭. মুস্তাদরাকুল হাকিম : ২৬৮২, সুনানুন নাসায়ি : ৩২৩১

হয়ে যাবে না। দীর্ঘস্থায়ী মনোমালিন্য সৃষ্টি হবে না। এজন্য প্রকৃত মুসলমান বিয়ে করবে একজন আদর্শ মেয়েকে, যার মাঝে উপরোক্ত সকল গুণ বিদ্যমান থাকবে। আর ছলনাময়ী সুন্দরী মেয়েদের ফাঁদ থেকে অনেক দূরে থাকতে হবে। মুখে শ্লোগান তুলতে হবে, ‘ছলনাময়ী সুন্দরী নারীদের “না” বলুন।’

দাম্পত্য জীবনে ইসলামের নির্দেশনা মেনে চলে

প্রকৃত মুসলমান বিয়ের পর স্ত্রীর সাথে জীবনযাপন ও আচার-ব্যবহারে ইসলামের নির্দেশনা অনুসরণ করে। স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণ ও তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশনা ও উৎসাহ দেখলে রীতিমতো আশ্চর্য হতে হয়।

ইসলাম স্ত্রীর সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছে। ইসলাম স্ত্রীকে এমন মর্যাদার স্তরে উন্নীত করেছে, যা অন্য কোনো ধর্ম বা জীবনব্যবস্থার কাছ থেকে কল্পনাও করা যায় না। রাসুলুল্লাহ ﷺ সকল পুরুষকে উদ্দেশ্য করে বলেন :

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي
الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ ثَقِيمُهُ كَسَرَتْهُ، وَإِنْ تَرَكَتُهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ،
فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ

‘তোমরা স্ত্রীদের সাথে সৎ ও উত্তম আচরণ করো। কেননা, তাদেরকে পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাঁজরের ওপরের দিককার হাড় সবচেয়ে বেশি বাঁকা। যদি তুমি তা সোজা করতে চাও, তাহলে তা ভেঙে ফেলবে। আর যদি যেমন আছে তেমন রাখো, তাহলে তা বাঁকা হতে থাকবে। অতএব, তোমরা স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ করো।’^{১৪৮}

সহিহাইনের অপর এক বর্ণনায় এসেছে :

الْمَرْأَةُ كَالضِّلْعِ، إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرَتْهَا، وَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا
وَفِيهَا عَوَجٌ

১৪৮. সহিহুল বুখারি : ৩৩৩১, সহিহ মুসলিম : ১৪৬৮

‘স্ত্রীলোক পাঁজরের বাঁকা হাড়ের মতো। তুমি যদি তা সোজা করতে যাও, তাহলে ভেঙে ফেলবে। আর তুমি যদি তার বক্রতা মেনে নিয়ে তার নিকট থেকে ফায়দা পেতে চাও, তাহলে ফায়দা পাবে।’^{১৪৯}

সহিহ মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় এসেছে :

إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيمَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ، فَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَبِهَا عَوَجٌ، وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا، كَسَرْتَهَا وَكَسَرُهَا طَلَاُهَا

‘স্ত্রীলোককে পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে কখনো তোমার সাথে সহজ ব্যবহার করবে না বা সোজা হয়ে চলবে না। তুমি যদি তার বক্রতা মেনে নিয়ে তার নিকট থেকে ফায়দা পেতে চাও, তাহলে ফায়দা পাবে। আর যদি তার বক্রতা সোজা করতে যাও, তাহলে তা ভেঙে ফেলবে। আর ভেঙে ফেলার অর্থ হলো তালাক।’^{১৫০}

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এমন অলংকারসমৃদ্ধ উচ্চাঙ্গের উপমায় মহিলাদের সহজাত স্বভাব সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে। তা হলো, মেয়েরা এক অবস্থার ওপর স্থির থাকে না, যেমনটি স্বামীরা তাদের থেকে আশা করে। তাই একজন প্রকৃত মুসলমান স্বামীকে এ কথা জেনে নিতে হবে যে, এটাই স্ত্রীর সহজাত অভ্যাস, এ অভ্যাস ঠিক করতে গেলে হিতে বিপরীত হবে। স্ত্রীর মেয়েসুলভ মান-অভিমান ও মেয়েলি আচরণগুলো মেনে নিতে হবে। আল্লাহ তাআলা তার মাঝে যে বক্রতা রেখেছেন, সে বক্রতাসহ তাকে গ্রহণ করতে হবে। এ বক্রতা সোজা করতে গেলে ভেঙে যাবে, অর্থাৎ বিবাহবিচ্ছেদ ঘটবে।

যখন মুসলমান স্বামীর মনে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এ নির্দেশনা ভালোভাবে বদ্ধমূল হয়ে যাবে, ফলে স্ত্রীর ছোটখাটো ভুলগুলো ক্ষমা করে দেবে এবং তার মেয়েলি রাগ ও অভিমানে ধৈর্য ধরবে, তখন তাদের দাম্পত্য জীবন সুখী ও শান্তিময় হবে এবং তাদের মাঝে কথা কাটাকাটি, চিল্লাচিল্লি ও ঝগড়াঝাঁটি হবে না।

১৪৯. সহিহুল বুখারি : ৫১৮৪, সহিহ মুসলিম : ১৪৬৮

১৫০. সহিহ মুসলিম : ১৪৬৮

হাদিসটির ওপর একটু গবেষকের দৃষ্টি দিয়ে তাকান, এখানে রাসুলুল্লাহ ﷺ কথা শুরু করেছেন ‘স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ করো’ বলে। তারপর মেয়েদের সহজাত অভ্যাস সম্পর্কে ধারণা দিলেন। শেষে আবার বললেন, ‘স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ করো।’ এখান থেকেই বুঝা যায়, স্ত্রীদের প্রতি কী পরিমাণ গুরুত্ব দেওয়ার আদেশ করেছেন রাসুলুল্লাহ ﷺ! প্রকৃত মুসলমান যখন এ হাদিসটি জেনে নেয়, তখন এর ওপর আমল না করে কি আর পারে!?

স্ত্রীদের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ ﷺ এত বেশি গুরুত্ব দিতেন যে, তিনি বিদায় হজের ভাষণে তাদের ব্যাপারে (আলাদাভাবে) অসিয়ত করতে পর্যন্ত ভুলেননি। এটি সেই ভাষণ, যা সম্পর্কে তাঁর ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে, বড় জনসমাগমের সামনে এটাই তাঁর শেষ ভাষণ। আর তাই এ ভাষণে মুসলমানদের জন্য অধিক প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো তিনি এক এক করে তুলে ধরেছেন।

এ ভাষণে স্ত্রীদের সম্পর্কে তিনি বলেন :

أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِجٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُوطِئُنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ، أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ.

‘শোনো, আমি তোমাদের স্ত্রীদের সাথে ভালো ব্যবহারের উপদেশ দিচ্ছি। তারা তোমাদের নিকট বন্দীর মতো। তাদের ওপর তোমাদের কোনো কর্তৃত্ব নেই, যদি না তারা কোনো প্রকাশ্য অশ্লীলতায় জড়িয়ে পড়ে। যদি তারা তা-ই করে, তাহলে তোমরা তাদের বিছানা পৃথক করে দিয়ো এবং একান্ত প্রয়োজন হলে হালকাভাবে প্রহার করো। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তবে তাদের প্রতি বাড়াবাড়ির পথ অন্বেষণ করো না। জেনে রেখো, তোমাদের

যে রূপ অধিকার রয়েছে স্ত্রীদের ওপর, তোমাদের স্ত্রীদেরও তদ্রূপ অধিকার রয়েছে তোমাদের ওপর। তোমাদের স্ত্রীদের ওপর তোমাদের অধিকার এই যে, তারা তোমাদের অপছন্দনীয় লোককে তোমাদের বিছানা মাড়াতে (অর্থাৎ বসতে) দেবে না এবং তোমাদের অপছন্দনীয় লোককে তোমাদের ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেবে না। আর তোমাদের ওপর তাদের অধিকার এই যে, তোমরা যথাসম্ভব তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ ও খাবার-দাবারের উত্তম ব্যবস্থা করবে।”^{১৫১}

প্রকৃত মুসলমান রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এ অসিয়ত অবশ্যই গুনেছে। এখানে সে স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার কী এবং স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকার কী, তা জেনে নিয়েছে। জেনে নিয়েছে, স্ত্রীর প্রতি দয়া করা এবং তার সাথে ভালো ব্যবহার করা অত্যাবশ্যিক। তাই প্রকৃত মুসলিমের দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর ওপর জুলুমের ঘটনা বা স্ত্রীকে কষ্ট দেওয়ার ঘটনা সংঘটিত হয় না বললে মোটেই অতু্যক্তি হবে না।

স্ত্রীদের সাথে ভালো ব্যবহার করা সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আরও অনেক হাদিস রয়েছে। এক হাদিসে তিনি স্ত্রীর সাথে সদ্যবহারকারী স্বামীকে উম্মাহর শ্রেষ্ঠ মানুষ বলে অভিহিত করেছেন।

ইরশাদ করেছেন :

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ
‘সেই মুমিন ইমানের দিক দিয়ে সবার সেরা, যার চরিত্র সুন্দর। আর তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম মানুষ সে, যে তার স্ত্রীর কাছে সর্বোত্তম।’^{১৫২}

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীদের নিকট কতিপয় মহিলা তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আসলেন। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা করলেন :

لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أَوْلَئِكَ بِخِيَارِكُمْ

১৫১. সুনানুত তিরমিজি : ১১৬৩

১৫২. সুনানুত তিরমিজি : ১১৬২

‘মুহাম্মাদের স্ত্রীদের নিকট অনেক মেয়ে তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আসে। ওরা (অভিযোগকারিণীদের স্বামীরা) ভালো মানুষ নয়।’^{১৫৩}

স্ত্রীদের প্রতি ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও তাদের পছন্দ না হলেও তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করার আদেশ প্রদানে ইসলাম অন্যান্য দ্বীন ও জীবনব্যবস্থার চেয়ে অনেক অনেক এগিয়ে। মানব-ইতিহাসে অন্য কোনো ধর্ম বা জীবনব্যবস্থা নারীদের প্রতি এত গুরুত্ব দেয়নি।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

‘নারীদের সাথে সড়াবে জীবনযাপন করো। অতঃপর যদি তাদের অপছন্দ করো, তবে হয়তো তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।’^{১৫৪}

এ পবিত্র আয়াতের আহ্বান সত্যিকারের মুসলমানের হৃদয়ে গিয়ে পৌঁছে। ফলে সে তার হঠাৎ করে আসা রাগ দমন করে এবং স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা কমে যেতে দেখলে কার্যকর কোনো উপায় অবলম্বন করে পুনরায় ভালোবাসা নবায়ন করতে চেষ্টা করে। এভাবেই ইসলাম অনেক দাম্পত্য সম্পর্ক ভেঙে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। সাময়িক আবেগ ও খামখেয়ালিপনার আক্রমণ থেকে এ পবিত্র বন্ধনকে হিফাজত করে।

এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার ইচ্ছা করল। কারণ, তাকে আর ভালো লাগছিল না। তখন উমর রাঃ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি কথা বললেন, ‘আফসোস তোমার জন্য! ঘরসমূহের ভিত্তি কি শুধুই ভালোবাসার ওপর? (স্ত্রীর প্রতি) দায়িত্ববোধ ও (সামাজিক) লজ্জাবোধের কি এখানে কোনোই দখল নেই?’

১৫৩. সুনানু আবি দাউদ : ২১৪৬, সুনানুদ দারিমি : ২২৬৫

১৫৪. সূরা আন-নিসা : ১৯

ইসলামের দৃষ্টিতে দাম্পত্য সম্পর্ক মনের আবেগ ও খামখেয়ালিপনার উর্ধ্বে। আর প্রকৃত মুসলমানের মাঝে মনুষ্যত্ব, মহত্ত্ব, মনের সৌন্দর্য, সহনশীলতা, হৃদয়ের প্রশস্ততা ও উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকে, যা তাকে স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা না থাকলেও তার সাথে উত্তম আচরণ করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। তার মাঝে স্ত্রীকে ভালো না লাগলেই ছেড়ে দেওয়ার পাশবিক প্রবণতা ও প্রয়োজন ফুরালেই ছুড়ে ফেলার ব্যবসায়িক মানসিকতা থাকে না।

প্রকৃত মুসলমান অবশ্যই আল্লাহর আদেশ মেনে চলে। তাই স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা না থাকলেও তার সাথে উত্তমভাবে জীবনযাপন করে এবং তার সাথে সদ্যবহার করে। কারণ, সে সর্বজ্ঞ মহান আল্লাহর এ বাণী সম্পর্কে জানে যে, অনেক সময় মানুষ যাকে অপছন্দ করে এবং যার থেকে দূরে থাকে, তার মাঝেই নিহিত থাকে সমূহ কল্যাণ ও বরকত। তাই প্রকৃত বিচক্ষণ মুসলমান ভালোবাসতে হলে কীভাবে বাসতে হবে, অপছন্দ করতে হলে কীভাবে করতে হবে, তা ভালোভাবেই জানে। কাজেই কাউকে ভালোবাসলে অন্ধের মতো ভালোবাসে না; আর কাউকে অপছন্দ করলে তার প্রতি ঘৃণার প্রকাশ ঘটায় না। বরং দুইয়ের মাঝে সুষ্ঠু ভারসাম্য রক্ষা করে চলে।

তা ছাড়া রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুমিনা স্ত্রী তার স্বামীর যতই অপছন্দনীয় হোক, তার ভেতর এমন কিছু গুণ অবশ্যই থাকে, যা স্বামীকে সন্তুষ্ট করার জন্য যথেষ্ট। তাই অপছন্দ করার কারণগুলোর দিকে না তাকিয়ে এমন গুণগুলোর দিকে তাকানো উচিত, যা স্বামীকে সন্তুষ্ট করে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

لَا يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

‘কোনো মুমিনের জন্য তার মুমিন স্ত্রীকে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। কেননা, তার ভেতর অপছন্দ করার মতো বিষয় যেমন আছে, তেমনই পছন্দ করার মতো বিষয়ও আছে।’^{১৫৫}

প্রকৃত মুসলমান একজন আদর্শ স্বামী

প্রকৃত মুসলমান স্ত্রীর প্রতি ন্যায়বান ও সদাচারী হওয়ার নির্দেশ-সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত ও হাদিস সম্পর্কে অবগত থাকে। তাই এ সকল আয়াত ও হাদিস তাকে একজন আদর্শ স্বামীতে পরিণত করে। সে স্ত্রীর সাথে উত্তমভাবে জীবনযাপন করে, তার সাথে ভালো ও ভদ্রজনোচিত ব্যবহার করে। বিয়ের পর সময় যতই গড়িয়ে যাক, বয়স যতই বৃদ্ধি পেতে থাকুক, তার ভালোবাসা ও সদাচারে কোনোরূপ ঘাটতি আসে না।

যখন সে ঘরে প্রবেশ করে, তখন স্ত্রী ও সন্তানদের সাথে হাসিমুখে ও প্রশান্ত মনে সাক্ষাৎ করে। প্রথমে এসে সবাইকে সালাম করে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ

‘অতঃপর যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করবে, তখন তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে। এটা আল্লাহর কাছ থেকে কল্যাণময় ও পবিত্র দুআ।’^{১৫৬}

রাসুলুল্লাহ ﷺ-ও সালাম করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি আনাস র.কে বলেছেন :

يَا بُنَيَّ إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ يَكُونُ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ

‘প্রিয় বৎস, যখন তুমি তোমার পরিবারের নিকট যাবে, তখন সালাম করবে। এটা তোমার ও তোমার পরিবারের জন্য বরকত বয়ে আনবে।’^{১৫৭}

সালামের কারণে যে বরকত আসার কথা রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, বিভিন্নভাবে তার প্রকাশ ঘটবে। যেমন : স্বামী-স্ত্রীর মাঝে হৃদয়তা ও ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। তাদের মাঝে হাসি-আনন্দ থাকবে। স্ত্রীর কাজে স্বামী হাত লাগাবে। স্ত্রী

১৫৬. সূরা আন-নূর : ৬১

১৫৭. সুনানুত তিরমিজি : ২৬৯৮

অসুস্থ হয়ে পড়লে বা শরীর খারাপ লাগলে প্রেমভরা হাতে তার সেবা করবে। যথাসাধ্য স্ত্রীর যত্ন নেবে এবং তার বৈধ প্রয়োজনাঙ্গী পূর্ণ করে দেবে। শরিয়তের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী স্ত্রীর মেয়েলি মান-অভিমান ও আহ্লাদ মেনে নেবে। এভাবে স্ত্রীর মনে তার প্রতি ভালোবাসা ও নির্ভরতা সৃষ্টি করবে। এ ছাড়াও তাকে পর্যাপ্ত সময় দেবে। সময়ের সবটুকু অংশ অধ্যয়ন, কাজ, দায়িত্ব ও বন্ধুদের মাঝে কাটিয়ে না দিয়ে স্ত্রীর জন্যও যথেষ্ট সময় হাতে রাখবে। এটা পুরুষদের ওপর স্ত্রীদের ইসলামপ্রদত্ত অধিকার।

ইসলাম বলে, স্বামীর জন্য পুরো সময় ইবাদতে কাটিয়ে দেওয়া জায়িজ নেই; স্ত্রীকে দেওয়ার মতো কিছু সময় অবশ্যই হাতে রাখতে হবে। অন্যথায় দ্বীনের মাঝে ভারসাম্য থাকবে না; অথচ এ ভারসাম্যের ওপরই পুরো দ্বীনের ভিত্তি।

আব্দুল্লাহ বিন আমর ؓ-এর ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন জানতে পারলেন যে, তিনি ইবাদতে অতিরঞ্জন করছেন, তখন তাঁকে বললেন :

أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ؟ فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرِجْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَإِنَّ لِرِزْوَرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا...

‘শুনলাম, তুমি নাকি প্রতিদিন রোজা রাখো, আর প্রতিরাতে সারারাত ধরে নফল নামাজ পড়ো? তিনি বললেন, জি, হে আল্লাহর রাসুল। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, এমন কোরো না; বরং (মাঝেমধ্যে) রোজা রাখবে, আবার (মাঝেমধ্যে) রোজা রাখবে না। রাতের কিছু অংশ ঘুমাবে, কিছু অংশে ইবাদত করবে। কেননা, তোমার ওপর তোমার শরীরের অধিকার রয়েছে, চোখের অধিকার রয়েছে, স্ত্রীর অধিকার রয়েছে এবং মেহমানের অধিকার রয়েছে।’^{১৫৮}

উসমান বিন মাজউন ؓ-এর স্ত্রী খাওলা বিনতে হাকিম ؓ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীদের নিকট জীর্ণশীর্ণ কাপড় ও বিস্ত্রী বেশভূষা নিয়ে আসলেন। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন, আপনার অবস্থা এমন কেন? তিনি বললেন, আমার স্বামী সারারাত

১৫৮. সহিছুল বুখারি : ১৯৭৫, সহিছ মুসলিম : ১১৫৯

নামাজে দাঁড়িয়ে থাকে, সারাদিন রোজা রাখে। (তো সুন্দর পোশাক-আশাক পরে ও সাজসজ্জা করে কী লাভ!?)। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রীগণ তাঁকে এ কথা জানানো। তখন তিনি উসমান বিন মাজউন ﷺ-এর সাথে দেখা করে তাকে তিরস্কার করলেন। তাকে বললেন, আমাকে কি তুমি আদর্শ হিসাবে মানো না? তিনি বললেন, অবশ্যই মানি, আমার সত্তা আপনার ওপর কুরবান হোক! এর পরে খাওয়া আসলেন সুন্দর ও সুবাসমাখা বেশে। অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, উসমান, আমাদের জন্য বৈরাগ্য ফরজ করা হয়নি। আমাকে কি তুমি তোমার আদর্শ হিসাবে মানো না? নিঃসন্দেহে আমিই আল্লাহকেই সবচেয়ে বেশি ভয় করি, তাঁর বিধিবিধান আমিই সবার চেয়ে বেশি মেনে চলি।”^{১৫৯}

রাসুলুল্লাহ ﷺ এ নির্দেশনা তাঁর সকল সাহাবির মাঝে প্রচার করে দিয়েছিলেন। তাঁদেরকে ইবাদত-বন্দেগি ও স্ত্রীদের সাথে জীবনযাপনের মাঝে সুষ্ঠু ভারসাম্য রক্ষা করে চলার সবকিছু দিয়েছিলেন। তাই পরবর্তী সময়ে এ ভারসাম্যই তাঁদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। তাঁরা একে অপরকে এভাবে ভারসাম্যপূর্ণ জীবনযাপন করতে নসিহত করতেন। তাঁদের মধ্যে কেউ যদি দুনিয়াবিমুখতা অবলম্বন করতেন, স্ত্রীদের সংশ্রব থেকে দূরে থাকতেন এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে খুব বেশি বাড়াবাড়ি করতেন, তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে এ বিষয়ে অবহিত করে তার সংশোধনের চেষ্টা করতেন।

এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা ইমাম বুখারি ﷺ আবু জুহাইফা ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু জুহাইফা ﷺ বলেন :

أَخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَرَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَدِّلَةً، فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا، فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ؟ قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ، قَالَ: مَا أَنَا بِأَكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ، قَالَ: فَأَكَلَ، فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُومُ، قَالَ: نَمْ،

১৫৯. হিলইয়াতুল আওলিয়া : ১/১০৬, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৩/৩৯৪

فَتَنَامَ، ثُمَّ ذَهَبَ يَقُومُ فَقَالَ: نَمْ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ: سَلَمَانُ
 قُمْ الْآنَ، فَصَلِّ يَا فَقَالَ لَهُ سَلَمَانُ: إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ
 عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَأَتَى
 النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ سَلَمَانُ

‘নবিজি ﷺ সালমান ﷺ ও আবু দারদা ﷺ-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দেন। এরপর একদিন সালমান ﷺ আবু দারদা ﷺ-এর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। সেখানে উম্মে দারদা ﷺ-কে অতিসাধারণ পোশাকে দেখতে পেয়ে বললেন, আপনার এ অবস্থা কেন? তিনি বললেন, আপনার ভাই আবু দারদার তো দুনিয়ার কোনো কিছুই প্রয়োজন নেই! এরই মাঝে আবু দারদা ﷺ এলেন। তারপর সালমান ﷺ-এর জন্য খাবার প্রস্তুত করে তাকে বললেন, আপনি খেয়ে নিন, আমি রোজা রেখেছি। তখন সালমান ﷺ বললেন, আপনি যতক্ষণ না খাবেন, ততক্ষণ আমিও খাব না। তখন তিনিও তার সাথে খেলেন। অতঃপর যখন রাত হলো, তখন আবু দারদা ﷺ সালাতে দাঁড়ালেন। তখন সালমান ﷺ তাকে বললেন, আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন। তিনি শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর আবার দাঁড়ালে তিনি বললেন, আরেকটু ঘুমান। অবশেষে যখন রাতের শেষ প্রহর আসলো, তখন সালমান ﷺ বললেন, এখন উঠুন। তারপর তারা উভয়েই নামাজ পড়লেন। এরপর সালমান ﷺ বললেন, আপনার ওপর আপনার রবের যেমন হক আছে, তেমনই আপনার ওপর আপনার নিজের ও আপনার স্ত্রীরও হক আছে। সুতরাং আপনাকে প্রত্যেক হকদারের হক আদায় করতে হবে। তারপর তিনি নবিজি ﷺ-এর কাছে এসে এ ব্যাপারে জানালে তিনি বললেন, সালমান সত্যই বলেছে।’^{১৬০}

প্রকৃত মুসলমান বৈবাহিক জীবনকে খুব উপভোগ করে। স্ত্রীর সাথে হাসি-কৌতুক, রসিকতা ও সুস্থ বিনোদন করে জীবনটাকে অনেক উপভোগ্য করে

তোলে। কারণ, এটাও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ। রাসুলুল্লাহ ﷺ মুসলিম উম্মাহকে সুসংগঠিত করা, জিহাদের সৈন্যদল প্রস্তুত করাসহ অসংখ্য কাজের ব্যস্ততার ফাঁকে স্ত্রীদের সাথে আমোদ-প্রমোদ ও সুস্থ বিনোদন করতেন। ব্যস্ততা তাঁকে স্ত্রীদের সাথে উত্তম ব্যবহারে, চারিত্রিক উদারতায়, সহাস্যবদনে কথা বলায় ও সুস্থ বিনোদনে একজন আদর্শ স্বামী হতে বাধা দিতে পারেনি।

এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা আয়িশা রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন :

‘আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য “হারিরা” (আটার তৈরি এক ধরনের প্রোটিন জাতীয় খাবার) রান্না করে তাঁর কাছে নিয়ে গেলাম। তখন সাওদা রা. তাঁর নিকট ছিলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ ছিলেন তার ও আমার মাঝে। আমি সাওদা রা.-কে বললাম, আপনিও খান। তিনি খেতে অস্বীকৃতি জানালেন। আমি বললাম, না খেলে আপনার মুখে মেখে দেবো। তবুও তিনি খেলেন না। তাই আমি হারিরার ভেতর হাত ঢুকিয়ে তার মুখে মেখে দিলাম। তা দেখে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে ধরে হাসতে হাসতে বললেন, এবার তুমিও ওর মুখে মেখে দাও। আরেক বর্ণনায় আছে, তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাঁটু নিচু করে দিলেন যেন সাওদা রা. আমার থেকে তা নিতে পারেন। তারপর পাত্র থেকে তিনি কিছুটা খেয়ে হাতটা আমার মুখে মুছে দিলেন। এ কাণ্ড দেখে রাসুলুল্লাহ ﷺ অনেক হাসলেন।’^{১৬১}

এখানে দেখুন, রাসুলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীদের সাথে কত মজার রসিকতা করলেন! এটা নিঃসন্দেহে স্ত্রীদের প্রতি তাঁর উদারচিত্ততা, উত্তম ব্যবহার ও বড় মনের পরিচয় বহন করে।

আয়িশা রা. বর্ণনা করেন :

‘এক সফরে তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলেন। সে সফরে রাসুলুল্লাহ ﷺ তার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করে হেরে গেলেন। তখন তার শরীর হালকা-পাতলা ছিল। তিনি স্বাস্থ্যবান হওয়ার পর আরেক সফরে তাকে নিয়ে বের

১৬১. মাজমাউজ জাওয়ায়িদ: ৪/৩১৬; কানজুল উম্মাল : ৭/৩০২; হাইসামি রহ. বলেন, এটি আবু ইয়াল্লা রহ. বর্ণনা করেছেন। একমাত্র মুহাম্মদ বিন আমর বিন আলকামা ব্যতীত এ হাদিসের সকল রাবি সহিহ হাদিসের রাবি। আর এ হাদিসটি হাসান পর্যায়ের।

হলে আবার প্রতিযোগিতা করলেন। এবারে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে হারিয়ে দিয়ে বললেন, আগের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়ে নিলাম।^{১৬২}

প্রিয়তমা স্ত্রীর মনে আনন্দ দেওয়ার জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ এর চেয়েও বড় কাজ করেছেন। নিজেই তাকে আড়াল করে (পাপাচারমুক্ত) খেলা দেখিয়েছেন।

এ সম্পর্কে আয়িশা ﷺ বর্ণনা করেন :

‘একদিন রাসুলুল্লাহ ﷺ বসা ছিলেন। এমন সময় তিনি লোকজন ও শিশু-কিশোরদের হর্ষোল্লাস শুনতে পেলেন। দেখতে পেলেন, হাবশিরা নাচছে আর লোকজন তাদের চারপাশে দাঁড়িয়ে সে দৃশ্য উপভোগ করছে। তখন তিনি বললেন, আয়িশা, চলো খেলা দেখে আসি। তিনি বলেন, তখন আমি তাঁর কাঁধের ওপর আমার গাল রেখে দুই কাঁধের মাঝখান দিয়ে খেলা দেখতে থাকলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি বললেন, আয়িশা, মন ভরেছে? আমি বললাম, না। আমি আসলে তাঁর কাছে আমার গুরুত্ব কতটুকু তা দেখতে চাইছিলাম। দেখলাম, তিনি কিছুক্ষণ এক পায়ের ওপর, কিছুক্ষণ অপর পায়ের ওপর পালাক্রমে ভর দিয়ে আমার জন্য দাঁড়িয়ে থেকেছেন।’^{১৬৩}

অন্য বর্ণনায় আয়িশা ﷺ বলেন :

وَاللّٰهُ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْمُ عَلَى بَابِ حُجْرَتِيْ، وَالْحُبَشَةُ يَلْعَبُوْنَ بِحُرَابِهِمْ، فِيْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَسْتُرْنِيْ بِرِدَائِهِ، لِكَيْ أَنْظُرَ إِلَىٰ لَعِبِهِمْ، ثُمَّ يَقُوْمُ مِنْ أَجْلِيْ، حَتَّىٰ أَكُوْنَ أَنَا الَّتِي أَنْصَرِفُ، فَاقْدِرُوا قَدَرَ الْجَارِيَةِ الْحَدِيثَةِ السَّنِّ، حَرِيصَةً عَلَى اللّٰهُو

‘কসম খেয়ে বলছি, রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে আমার রুমের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম, যখন হাবশিরা মসজিদের মাঠে বল্লম

১৬২. সুনানু আবি দাউদ : ২৫৭৮, মুসনাদু আহমাদ : ২৬২৭৭

১৬৩. আস-সুনানুল কুবরা, নাসায়ি : ৮৯০৮

দিয়ে খেলছিল। তিনি তাঁর চাদর দিয়ে আমাকে আড়াল করছিলেন, যেন তাঁর কাঁধ ও কানের মাঝ দিয়ে আমি খেলা দেখতে পারি। আমার জন্য তিনি ততক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন, যতক্ষণ না আমি নিজেই সেখান থেকে সরে আসি। এখন তোমরা অনুমান করে দেখো যে, খেলাধুলায় আত্মহী অল্পবয়স্কা একজন বালিকার (খেলা দেখার) আত্মহের মাত্রা কতটুকু হতে পারে!'^{১৬৪}

প্রকৃত মুসলমান যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনীতে স্ত্রীদের সাথে তাঁর সহজ-সরল আচরণ ও রসিকতার ঘটনা দেখতে পায়, তখন সেও আপন স্ত্রীর সাথে উত্তম জীবনযাপনকারী ও নম্র-ভদ্র-সহজ-সরল আচরণকারী হয়ে ওঠে। আর বৈধতার গণ্ডির ভেতর থেকে তাকে রসিকতা ও আনন্দ-বিনোদন করার সুযোগ দেয়।

প্রকৃত মুসলমান মূর্খ স্বামীদের মতো বদমেজাজি নয়, যারা রান্না পছন্দ না হলে বা ঠিক সময় খাবার প্রস্তুত করতে না পারলে কিংবা এ ধরনের অন্য কোনো দোষ পেলে দুনিয়া ওলটপালট করে দেয়। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শে আদর্শবান প্রকৃত মুসলমান স্ত্রীর সাথে ভদ্র, ধৈর্যশীল ও উদারচিত্তে আচরণ করে। এ ধরনের কোনো ভুল হলে ক্ষমা করে দেয়। কেননা, রাসুলুল্লাহ ﷺ কখনো কোনো খাবারের দোষ ধরেননি। পছন্দ হলে খেতেন, আর পছন্দ না হলে রেখে দিতেন।^{১৬৫}

১৬৪. সহিহ মুসলিম : ৮৯২

হাদিসটির শেষোক্ত বাক্য দ্বারা আয়িশা ﷺ-এর উদ্দেশ্য, রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীর বৈধ আনন্দ-বিনোদনের ব্যাপারে কতটা গুরুত্ব দিতেন, তা বর্ণনা করা। তিনি অল্পবয়স্কা হওয়ায় স্বাভাবিকত খেলাধুলা ও বিনোদনের প্রতি বেশি আত্মহী ছিলেন। আর রাসুলুল্লাহ ﷺ একজন আদর্শ স্বামী হিসাবে তাঁর এ আত্মহ বা চাহিদার অবমূল্যায়ন করেননি। বৈধতার সীমার মধ্যে রেখে তাঁকে এ বিষয়ে সাহায্য করেছেন এবং এজন্য তাঁকে এতটা সময় দিয়েছেন যে, খেলাধুলার প্রতি প্রচণ্ড আত্মহী হওয়া সত্ত্বেও অনেক সময় ধরে দেখতে থাকায় তার বিরক্তি চলে এসেছে, কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ স্থির দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে সঙ্গ দিয়ে গেছেন, বিরক্তির কোনো চিহ্ন পর্যন্ত প্রকাশ করেননি। শেষ বাক্যে আয়িশা ﷺ সেটাই বলছিলেন যে, চিন্তা করে দেখো, খেলাধুলায় আমার এত আসক্তি থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় হয়ে যাওয়ায় আমি সেখান থেকে উঠে চলে এসেছি, কিন্তু আল্লাহর রাসুল ﷺ এ দীর্ঘ সময়ে কোনো বিরক্তিভাব দেখাননি। আসলে একজন প্রকৃত মুসলিম স্বামীর এমনই হওয়া উচিত। এমন স্বামীকেই বলে আদর্শ স্বামী, যার পূর্ণ প্রতিচ্ছবি ছিলেন রাসুলুল্লাহ ﷺ। (অনুবাদক)

১৬৫. সহিহল বুখারি : ৩৫৬৩, সহিহ মুসলিম : ২০৬৪

রাসুলুল্লাহ ﷺ একদিন তাঁর স্ত্রীদের কাছে তরকারি আছে কি না জানতে চাইলেন। তারা উত্তর দিলেন, ঝোল ছাড়া কিছুই নেই। তিনি সেটাই খেলেন। আর বললেন, نِعْمَ الْأُذْمُ الْحُلُّ، نِعْمَ الْأُذْمُ الْحُلُّ ‘ঝোল কত উত্তম তরকারি! ঝোল কত উত্তম তরকারি!’^{১৬৬}

যেসব স্বামী নামের জালিম পুরুষ পান থেকে চুন খসলেই স্ত্রীর ওপর তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে, খানা দিতে একটু দেরি হলে বা খানা তেমন সুস্বাদু না হলে স্ত্রীদের গালিগালাজ করে বা মারধর করে, অথচ এর পেছনে যৌক্তিক কোনো অজুহাতও থাকতে পারে, কিন্তু এসব অজুহাত জানার পূর্বেই রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে—এ সকল মূর্খ স্বামীদের রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এ হাদিসগুলো দেখে নেওয়া অতীব জরুরি। এ কথা তাদের বুঝে নেওয়া জরুরি যে, তারা যা করে তা পুরুষত্ব নয়; বরং স্ত্রীর প্রেম-ভালোবাসা অর্জন করতে পারাই আসল পুরুষত্বের নিদর্শন।

প্রকৃত মুসলমান তার স্ত্রীর সাথে যেমন উত্তম আচরণ ও ভালো ব্যবহার করে, তেমনই স্ত্রীর বান্ধবীদের সাথেও উত্তম আচরণ ও ভালো ব্যবহার করে। কারণ, রাসুলুল্লাহ ﷺ-ও এমনই করতেন।

এ ব্যাপারে আয়িশা রা. বর্ণনা করেন :

كَانَتْ عَجُوزٌ تَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبِشُّ بِهَا وَيُكْرِمُهَا، فَقُلْتُ: يَا أَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، إِنَّكَ لَتَصْنَعُ بِهِذِهِ الْعَجُوزِ شَيْئًا لَا تَصْنَعُهُ بِأَحَدٍ قَال: إِنَّهَا كَانَتْ تَأْتِينَا عِنْدَ خَدِيجَةَ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ كَرَمَ الْوَدِّ مِنَ الْإِيمَانِ

‘এক বৃদ্ধা মাঝেমধ্যে নবিজি ﷺ-এর নিকট আসতেন। তিনি আসলে নবিজি ﷺ খুশি হতেন এবং তাকে খুব সম্মান করতেন। আমি বললাম, আমার পিতা-মাতা আপনার ওপর কুরবান হোক! এ বুড়ির প্রতি আপনি এত আগ্রহী হন কেন? তার সাথে এমন ব্যবহার করেন কেন, যা অন্যদের সাথে করেন না? নবিজি ﷺ উত্তর দিলেন,

^{১৬৬}. সহিছ মুসলিম : ২০৫২

খাদিজা বেঁচে থাকতে এ মহিলা আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসতেন (অর্থাৎ তিনি খাদিজার বান্ধবী ছিলেন)। তুমি কি জানো না যে, বন্ধুত্বের মর্যাদা দেওয়া ইমানেরই অংশ? ১৬৭

স্ত্রীরও মাঝেমধ্যে রাগ আসে। যেকোনো কারণে হঠাৎ অভিমান করে গাল ফুলিয়ে বসে থাকে। আবার স্বামীর সামনে বিভিন্ন উপায়ে এ রাগের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। এমন অবস্থায় মুসলমান স্বামীকে স্ত্রীর সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। এটাকে স্ত্রীর সহজাত মেয়েলি স্বভাব মনে করে ধৈর্য ধরতে হবে। এভাবেই তার রাগ ও অভিমান ভাঙতে হবে। রাসুলুল্লাহ ﷺ-ও এমনটাই করতেন, যখন তাঁর স্ত্রীগণ তাঁর সাথে অভিমান করতেন বা কোনো স্ত্রী তাঁর সাথে (সাময়িক) কথা বলা বন্ধ করে দিতেন।

উমর বিন খাত্তাব রাঃ বলেন :

وَكَانَ مَنْزِلِي فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ بِالْعَوَالِي، فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِي، فَإِذَا هِيَ تُرَاجِعُنِي، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي، فَقَالَتْ: مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ، فَوَاللَّهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُرَاجِعْنَهُ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ، فَاِنْطَلَقْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: أَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: أَتَهْجُرُهُ إِحْدَاكُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قُلْتُ: قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُنَّ، وَخَسِرَ، أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا لِيَغْضَبَ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ، لَا تُرَاجِعِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا تَسْأَلِيهِ شَيْئًا، وَسَلِّينِي مَا بَدَا لَكَ

‘আমাদের কুরাইশ নারীরা ততটা স্বাধীনভাবাপন্ন ছিল না, যতটা ছিল আনসার নারীরা। যখন আমরা আনসার ভাইদের নিকট এলাম,

তখন আমাদের নারীরাও সে স্বাধীনচেতা মনোভাব দ্বারা প্রভাবিত হলো। মদিনার উপকণ্ঠে বনি উমাইয়া বিন জাইদের এলাকায় ছিল আমাদের বাড়ি। একবার আমি কোনো ব্যাপারে আমার স্ত্রীর ওপর রাগান্বিত হলে সেও আমার কথার প্রত্যুত্তর দিতে থাকল। এটা আমার কাছে অপছন্দনীয় ঠেকল। তখন সে বলল, আপনি আমার এ প্রত্যুত্তরে অবাক হচ্ছেন? আল্লাহর কসম! নবিজি ﷺ-এর স্ত্রীগণও (কখনোসখনো) তাঁর কথার প্রত্যুত্তর করেন। তাদের কেউ কেউ তো রাগ করে পুরো দিন নবিজি ﷺ-এর সাথে কথা বলেন না। এটা আমাকে আশ্চর্যান্বিত করল। তাই আমি (আমার মেয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী) হাফসা ﷺ-এর কাছে গেলাম। তাকে বললাম, তোমরা কি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রাগ করে তাঁর কথার প্রত্যুত্তর দিয়ে থাকো? সে বলল, হ্যাঁ। আমি বললাম, তোমাদের কেউ কি সকাল হতে রাত পর্যন্ত রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রাগ করে কথা বলা বন্ধ করে থাকো? সে বলল, হ্যাঁ। আমি বললাম, তোমাদের মধ্যে যে এরূপ আচরণ করেছে, সে তো ধ্বংস হয়ে যাবে! তোমরা কি মনে করো যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে রাগান্বিত করার মাধ্যমে আল্লাহর ক্রোধের মুখোমুখি হয়েও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে? তাই কখনো তুমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে রাগান্বিত হয়ে কথা বলবে না এবং তাঁর কাছ থেকে কোনো কিছু চাইবে না। কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে আমাকেই বলবে।^{১৬৮}

এরপর উমর ﷺ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে তার ও হাফসার কথোপকথনের ব্যাপারে জানালেন। উমর ﷺ-এর কথা শুনে রাসুলুল্লাহ ﷺ মুচকি হাসলেন।

প্রত্যেক মুসলমানকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এসব গুণ অবশ্যই অর্জন করতে হবে এবং সকল বিষয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলতে হবে। আর তখনই ‘ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা’ কথাটির স্বার্থকতা প্রমাণিত হবে। বর্তমান সময়ে অহরহ পারিবারিক কলহ-বিবাদ হচ্ছে, দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে, এসব মূলত রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দাম্পত্য জীবন-সম্পর্কিত আদর্শ

না জানার কারণে কিংবা জেনেও না মানার কারণে হচ্ছে। যদি দাম্পত্য জীবনে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর উল্লিখিত গুণাবলি ও আদর্শ মেনে চলা হয়, তাহলে পারিবারিক জীবনে শান্তি ও সুখের হাওয়া প্রবাহিত হবে। প্রত্যেক ঘর থেকে কলহ-বিবাদের কোলাহল বিদায় হয়ে প্রশান্তির শীতলতা নেমে আসবে।

সফল স্বামী

প্রকৃত মুসলমান দাম্পত্য জীবনে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ মেনে চলে। তাই সে সমাজে একজন সফল স্বামী হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়। নেককার, পূত-পবিত্র ও সতী-সাদ্বী স্ত্রীর হৃদয়ের মণিকোঠায় তার জন্য ভালোবাসার প্রাসাদ নির্মিত হয়। কারণ, সে স্ত্রীর ভালোবাসা আদায়ের জন্য নববি পদ্ধতি অনুসরণ করে। কথা বলার সময় তাকে মুচকি হাসি উপহার দেয়। তার মেয়েলি মান-অভিমান ও আহ্লাদগুলো মেনে নেয়। মিষ্টিকথার ফুলঝুরি দিয়ে তার অভিমান ভাঙায়। একটিবারের জন্যও সে ভুলে যায় না যে, তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করা হয়েছে পঁজরের বাঁকা হাড় থেকে, যার বক্রতা সোজা করার সাধ্য তার নেই।

স্ত্রীর সাথে জীবনযাপনে বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা অবলম্বন করে

প্রকৃত মুসলমান সব সময় বিচক্ষণতা, বুদ্ধিমত্তা ও চাতুর্যের সহিত স্ত্রীর সাথে জীবনযাপন করে। স্ত্রীর সামনে কোনো খারাপ কাজ বা খারাপ আচরণ করে না। তার সামনে এমন কোনো শব্দ বা বাক্য উচ্চারণ করে না, যা তার বা তার কোনো আত্মীয় ও প্রিয়জনের মনে কষ্ট দেয়। স্ত্রীর আবেগ-অনুভূতির মূল্য দেয়। মুসলমান স্ত্রীকেও স্বামীর আবেগ-অনুভূতির মূল্য দিতে হবে। স্বামীর সামনে এমন কোনো কথা বলা যাবে না, যা স্বামী বা স্বামীর কোনো আত্মীয়ের মনে কষ্ট দেবে।

স্ত্রীর কোনো গোপন বিষয় সে প্রকাশ করে না। এমন কোনো সংবাদ প্রচার করে না, যা স্ত্রী কেবল তাকেই বলেছে। কেননা, এতে কোনোরূপ অবহেলা বা শিথিলতা করলে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়। ভালোবাসার প্রদীপ নিভু নিভু হয়ে যায়। তবে প্রকৃত মুসলমান যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলামের আদর্শ অনুসরণ করে চলে এবং ইসলামি শিষ্টাচার মেনে চলে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে এ বিপদ থেকে বেঁচে থাকে।

স্ত্রীর ঋণটি সংশোধন করে দেয়

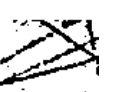
প্রকৃত মুসলমান তার স্ত্রীর ইলম ও চরিত্রের মাঝে কোনো ঋণটি দেখতে পেলে বিচক্ষণতার সহিত উত্তম উপায়ে তা সংশোধন করে দেয়। এ ক্ষেত্রে স্ত্রীর মাঝে সাধারণত অবাধ্যতা ও অমনোযোগিতার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। প্রকৃত মুসলমান ধৈর্য, নম্রতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে এর মোকাবেলা করে। মানুষের সামনে স্ত্রীকে তিরস্কার করে না, ধমক দেয় না। কারণ, মানুষের সামনে স্ত্রীকে তিরস্কার করলে তার অনুভূতিতে আঘাত আসে। এতে সে খুব অপমান বোধ করে। আর একজন প্রকৃত মুসলমানের জন্য মানুষের অনুভূতিতে আঘাত হানা মোটেই উচিত নয়।

মা ও স্ত্রীকে সম্ভ্রষ্ট রাখার মাঝে সুষ্ঠু ভারসাম্য বজায় রাখে

সত্যিকারের মুসলমান নিজের মা ও স্ত্রী উভয়কে সম্ভ্রষ্ট রাখার পদ্ধতি জানে। এ দুজনের সাথে আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে তার বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও ধৈর্যশক্তি ব্যবহার করে। একজনের প্রতি সুবিচার করতে গিয়ে আরেকজনের ওপর অন্যায় করে বসে না। একদিকে মায়ের অবাধ্য হয় না; অপরদিকে স্ত্রীর প্রতিও অবিচার করে না। বরং মায়ের হক মাকে আদায় করে দেয়, সুতরাং তার সাথে সদ্যবহার করে। একইভাবে স্ত্রীর হক স্ত্রীকে দিয়ে দেয়, সুতরাং মায়ের সাথে সদ্যবহার করতে গিয়ে ও তার যত্ন নিতে গিয়ে স্ত্রীকে তার হক ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করে না। দাম্পত্য জীবনে এ কাজটা মারাত্মক পর্যায়ের কঠিন। এ কাজ সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেওয়া রীতিমতো কঠিন এক যুদ্ধ। তবে এ যুদ্ধে যদি রসদ হিসাবে তাকওয়া ও ইসলামের আদর্শ থাকে, তখন বিজয়লাভ তেমন কঠিন হয় না। কেননা, ইসলাম মা ও স্ত্রী উভয়ের প্রতি ইনসাফ করেছে। প্রত্যেককে তার যথাযথ মর্যাদা দিয়েছে।

স্ত্রীর ওপর আল্লাহপ্রদত্ত কর্তৃত্বকে উত্তম পন্থায় ব্যবহার করে

মুসলমান স্বামী যখন তার স্ত্রীর সাথে ইসলামের উন্নত আদর্শ অনুযায়ী জীবনযাপন করে এবং তার সাথে উত্তম ব্যবহার করে, তখন সে স্ত্রীর হৃদয়-রাজ্যের রাজত্ব লাভ করে। তার সব কথা স্ত্রী মেনে চলে। এভাবেই একজন প্রকৃত মুসলমান নারীর ওপর পুরুষের আল্লাহপ্রদত্ত কর্তৃত্বের সার্থক বাস্তবায়ন ঘটায়।



আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

‘পুরুষেরা নারীদের ওপর কর্তৃত্বশীল এজন্য যে, আল্লাহ একের ওপর অন্যের বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং এজন্য যে, তারা তাদের অর্থ ব্যয় করে।’^{১৬৯}

এ কর্তৃত্বের কারণে পুরুষের কাঁধে অনেক জিন্মাদারি ও দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। তাই স্বামী তার স্ত্রীর পরিপূর্ণ জিন্মাদার ও দায়িত্বশীল।

যেমন রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

أَلَا كُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى
النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ،
وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا، وَوَلَدِهِ
وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ
عَنْهُ، أَلَا فَكُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

‘সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকই স্ব-স্ব অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। রাষ্ট্রপ্রধান দায়িত্বশীল এবং সে তার প্রজাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ তার পরিবারের লোকদের দায়িত্বশীল এবং তাদের ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর পরিবারের দায়িত্বশীল, এ ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে। সেবক তার মালিকের সম্পদের দায়িত্বশীল, এ ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে। সাবধান! মনে রেখো, তোমাদের প্রত্যেকই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকই তার অধীনস্থ লোকদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।’^{১৭০}

১৬৯. সূরা আন-নিসা : ৩৪

১৭০. সহিহুল বুখারি : ৭১৩৮, সহিহ মুসলিম : ১৮২৯

ইসলামি সমাজ তার প্রত্যেক সদস্যকে জিম্মাদারি দিয়ে রেখেছে। এমন কোনো সদস্য পাওয়া যাবে না, যার ওপর কোনো ধরনের জিম্মাদারি নেই। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে জীবন এক বাস্তবমুখী, গুরুত্বপূর্ণ ও জবাবদিহিমূলক বিষয়; হাসি-তামাশার কোনো বিষয় নয়।

ইসলাম যেভাবে নারীর সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিয়েছে এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে, তেমনিভাবে উত্তমভাবে জীবনযাপনের জন্য তার কী ভূমিকা রাখতে হবে, তা জেনে নিতে নির্দেশ দিয়েছে এবং শরিয়ত তার জন্য যে সীমারেখা টেনে দিয়েছে, তা অতিক্রম করতে নিষেধ করেছে। যেন সে তার বার্তা (একজন মুসলিম নারী হিসাবে বিশ্বের সকল নারীদের জন্য যে ইসলামের বার্তা সে বহন করছে) পৌঁছে দিতে পারে এবং উত্তমরূপে তার ভূমিকা পালন করতে পারে। যেন সে ভবিষ্যৎ-প্রজন্ম গড়তে এবং জীবনকে সার্থক, সুন্দর ও আলোকিত করতে পুরুষদের সাহায্যকারী হতে পারে।

ইসলাম যেখানে স্ত্রীদের সাথে উত্তমভাবে জীবনযাপন করতে এবং ভালো আচরণ করতে পুরুষদের নির্দেশ দিয়েছে, সেখানে নারীদেরও তাদের স্বামীদের বৈধ ও ন্যায়ভিত্তিক আদেশ-নিষেধ মেনে চলতে নির্দেশ দিয়েছে। ইসলাম খুব জোরালো কণ্ঠেই স্ত্রীদের এ নির্দেশ প্রদান করেছে।

যেমন রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

لَوْ كُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

‘আমি যদি কাউকে (আল্লাহ ব্যতীত অন্য) কারও প্রতি সিজদা করার অনুমতি দিতাম, তাহলে অবশ্যই স্ত্রীকে তার স্বামীর উদ্দেশে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম।’^{১৭১}

শুধু এতটুকুই নয়, রাসুলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সম্ভ্রষ্টিকে স্ত্রীর জান্নাতে যাওয়ার অবলম্বন বলে অভিহিত করেছেন।

১৭১. সুনানুত তিরমিজি : ১১৫৯

ইরশাদ করেছেন :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ، وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ، دَخَلَتْ الْجَنَّةَ

‘যে মহিলা স্বীয় স্বামীর সন্তুষ্টি নিয়ে মারা গেল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।’^{১৭২}

অপরদিকে, স্বামীর অবাধ্য স্ত্রীকে শুধরে না যাওয়া পর্যন্ত ফেরেশতাদের অভিসম্পাতে জর্জরিত হওয়ার ভ্রমকি দেওয়া হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ، هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

‘যে নারী স্বামীর বিছানা ত্যাগ করে রাতযাপন করবে, সকাল পর্যন্ত ফেরেশতারা তার ওপর অভিশাপ দিতে থাকে।’^{১৭৩}

এ ছাড়াও ইসলাম বিভিন্ন বিধানে নারীর ওপর পুরুষের কর্তৃত্ব জোরালোভাবে ঘোষণা করেছে এবং নারীর ওপর স্বামীর আনুগত্য করা ও তাকে সন্তুষ্ট করা বাধ্যতামূলক করেছে। যেমন : ইসলাম বলে, রমজানের রোজা ব্যতীত অন্য রোজা রাখতে হলে স্বামীর অনুমতি নিয়ে রাখতে হবে। তদ্রূপ স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে কোনো মেহমানের আপ্যায়ন করাও স্ত্রীর জন্য নিষিদ্ধ।

এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

‘স্বামী পাশে থাকাবস্থায় তার অনুমতি না নিয়ে (নফল) রোজা রাখা স্ত্রীর জন্য বৈধ নয়। আর স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রী কোনো মেহমানকে ঘরে আসার অনুমতি দিতে পারবে না।’^{১৭৪}

১৭২. সুনানু ইবনি মাজাহ : ১৮৫৪

১৭৩. সহিহ মুসলিম : ১৪৩৬

১৭৪. সহিহুল বুখারি : ৫১৯৫

ইসলাম স্বামীকে স্ত্রীর ওপর কর্তৃত্ব দিয়েছে, যেন সে এমন এক প্রকৃত পুরুষ হতে পারে, যে দাম্পত্য জীবন নামক জাহাজের কাণ্ডানি করে সেটাকে নিরাপত্তা ও হিদায়াতের তীরে ভিড়াতে পারে। এ কর্তৃত্ব আদায়ে সকল পুরুষকে স্ত্রীদের ফিতনা থেকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। কেননা, নারীর ফিতনায় আক্রান্ত হলে পুরুষের চোখে পর্দা পড়ে যায়, মনোবল দুর্বল হয়ে পড়ে এবং দীন হালকা হয়ে যায়। ফলে স্ত্রী যদি সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে এবং শরিয়তবিরোধী কোনো কাজে জড়িয়ে পড়ে, তখন স্ত্রীকে বাধা দেওয়ার মানসিক শক্তি স্বামীর থাকে না। তার হাত থেকে কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণের বাগডোর ফসকে বেরিয়ে যায়। তখন ঘরের সবকিছু উক্ত পথচ্যুত নারীর অধীনে পরিচালিত হয়। তার হুকুম অমান্য করা যায় না, কথার বিরোধিতা করা যায় না এবং সবকিছুতে তার ইচ্ছা ও আত্মহেরই প্রতিফলন ঘটে।

এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ ﷺ সত্যই বলেছেন :

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

‘আমি আমার পরে পুরুষদের জন্য নারীর ফিতনা থেকে শক্তিশালী কোনো ফিতনা রেখে যাইনি।’^{১৭৫}

প্রকৃত মুসলমান সত্যপথ থেকে বিচ্যুত স্ত্রীর ফিতনার সামনে দুর্বল হয় না; যতই শক্তিশালী হোক সে ফিতনা। তাকে সে খুব বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে এ কথা বুঝিয়ে দেয় যে, স্ত্রী তার কাছে যতই প্রিয় হোক, আল্লাহর সন্তুষ্টি তার নিকট আরও অধিক প্রিয় এবং স্ত্রীর প্রতি তার অন্তরে যতই ভালোবাসা থাকুক, তা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ-এর ভালোবাসার সামনে কিছুই নয়।

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ইরশাদ করেন :

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

‘বলো, তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা—যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় করো এবং তোমাদের বাসস্থান—যাকে তোমরা পছন্দ করো যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও তাঁর রাস্তায় জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। আর আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।’^{১৭৬}

এজন্য বর্তমান অনেক (নামধারী) মুসলমানের ঘরে স্ত্রীদের যেসব অবাধ্যতা ও বিরোধিতা দেখা যায়, প্রকৃত মুসলমানের ঘরে তা দেখা যায় না।

যে ব্যক্তি তার স্ত্রী, মেয়ে ও বোনদের মাথায় কাপড়বিহীন, বুক ও বাহু অনাবৃত অবস্থায় বেপর্দা হয়ে রাস্তায় ও বাজারে বের হতে দেখা সত্ত্বেও বাধা দেয় না এবং ইসলামবিরোধী চালচলন থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করে না, সে ব্যক্তি পুরুষত্বহীন ও ইসলামি আদর্শ থেকে বিচ্যুত। অচিরেই সে আল্লাহর ক্রোধাগ্নির গর্ভে পতিত হবে। এ গর্ভ থেকে বাঁচতে হলে তাকে এমন খাঁটি তাওবা করতে হবে, যা তার অন্তরাত্মা ও ঘুমন্ত পুরুষত্বকে জাগিয়ে দেবে এবং শক্ত মনোবল ও সিরাতে মুসতাকিমের দিকে পথনির্দেশ করবে। এ তাওবার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে স্ত্রী, মেয়ে ও বোনদের ভুল পথ থেকে দ্বীনের পথে নিয়ে আসার সাধ্যাতীত চেষ্টার মাধ্যমে।

ইসলাম নারীর জন্য আলাদা শিষ্টাচার ও বৈশিষ্ট্য প্রণয়ন করেছে। বাইরে বের হতে হলে বা গাইরে মাহরাম^{১৭৭} পুরুষের সামনে যেতে হলে কী পোশাক পরতে হবে, ইসলাম তা নির্ধারণ করে দিয়েছে। এ পোশাকের নাম শরয়ি হিজাব বা পর্দা। প্রকৃত মুসলিম নারী, যে ইসলামের সফেদ দুধ পান করেছে, ইসলামের স্নিগ্ধ ও স্বচ্ছ পানির নদীতে অবগাহন করেছে এবং ইসলামের সবুজ-শ্যামল-ছায়াময় পরিবেশে বেড়ে উঠেছে, সে সন্তুষ্টচিত্তে ও প্রশান্তমনে পূর্ণ আগ্রহের সহিত এ হিজাব গ্রহণ করে নেয়। সে বিশ্বাস করে, এটা তার

১৭৬. সূরা আত-তাওবা : ২৪

১৭৭. এখানে গাইরে মাহরাম বলতে উদ্দেশ্য ওই সব পুরুষ, শরিয়তের আলোকে যাদের সাথে বিবাহ বৈধ। (অনুবাদক)

জন্য আল্লাহর প্রবর্তিত বিধান, পুরুষদের পক্ষ থেকে কোনো জুলুম নয়। এটা আল্লাহর বিধান, নারীর ওপর পুরুষদের স্বেচ্ছাচারিতা ও একচেটিয়া শাসন প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যমূলক কোনো আইন নয়। এটা ইসলামের বিধান, উমাইয়া শাসনামালে ওয়ালিদের খিলাফতের সময় নির্ধারণকৃত কোনো ড্রেসকোড নয়, যেমনটি স্থূলবুদ্ধি ও মাথামোটা তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা কোনো জ্ঞান-দর্শন ও কুরআন-হাদিসের কোনো দলিল-প্রমাণ ছাড়া বলে থাকে। তাই প্রকৃত মুসলমান নারী এ বিধান কখনো লঙ্ঘন করে না।

আয়িশা রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأَوَّلِ، لَمَّا أُنْزِلَ اللَّهُ: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور: ٣١] شَقَّقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَأَخْتَمَرْنَ بِهَا

‘আল্লাহ তাআলা প্রাথমিক যুগের মুহাজিরা নারীদের ওপর রহম করুন, যখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত “তারা যেন তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ ওড়না দ্বারা আবৃত করে” [সূরা আন-নূর : ৩১] নাজিল করলেন, তখন তারা নিজেদের চাদর ছিঁড়ে ওড়না হিসাবে ব্যবহার করলেন।’^{১৭৮}

অপর এক বর্ণনায় সাফিয়া বিনতে শাইবা রাঃ বলেন :

‘একদিন আমরা আয়িশা রাঃ-এর নিকট বসে কুরাইশ মহিলাদের ফজিলত সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম, তখন আয়িশা রাঃ বললেন, কুরাইশ মহিলাদের ফজিলত আছে তা ঠিক, তবে শপথ করে বলছি, আমি আনসারি মহিলাদের চেয়ে ফজিলতপূর্ণ, পবিত্র কুরআনের সত্যায়নকারী ও অবতীর্ণ আয়াতের ওপর (দ্রুত) বিশ্বাস স্থাপনকারী কোনো মহিলা দেখিনি। যখন সূরা নূরের এ আয়াত “তারা যেন তাদের গ্রীবা ও বক্ষদেশ ওড়না দ্বারা আবৃত করে” অবতীর্ণ হলো আর তাদের পুরুষেরা তাদের নিকট এ আয়াত তিলাওয়াত করে শোনালেন, নিজেদের স্ত্রী, মেয়ে, বোন ও নিকটাত্মীয়াদের নিকট এ আয়াত পৌঁছালেন, তখন প্রত্যেক মহিলা আল্লাহর অবতীর্ণ আয়াতের প্রতি বিশ্বাস ও ইমানের

১৭৮. সহিহুল বুখারি : ৪৭৫৮

দাবি মেনে নিজেদের কালো রঙের চাদর দিয়ে মাথা ঢেকে ফেললেন। তারপর তারা ওড়নাবৃত্তা হয়েই (নামাজে) রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে দাঁড়ালেন। তখন মনে হচ্ছিল, তাদের মাথার ওপর যেন কাক বসে আছে।^{১৭৯}

আল্লাহ তাআলা আনসার মহিলাদের ওপর রহম করুন। কী মজবুত তাদের ইমান! কী সত্য ছিল তাদের ইসলাম! আল্লাহর বিধান নাজিল হওয়ার সাথে সাথে তা মেনে নেওয়ার কী আগ্রহ ছিল তাদের মনে! যে মুমিন নারী আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ইমান রাখার দাবি করে, তাকে অবশ্যই আনসার মহিলাদের অনুকরণ করতে হবে। ইসলাম তার জন্য যে বিশেষ পোশাক নির্ধারণ করেছে, তা অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নিতে হবে। বেপর্দা ও খোলামেলা চলার কোনো অবকাশ তার নেই। এখানে দামেশক বিশ্ববিদ্যালয়ের পর্দানশীন ছাত্রীদের কথা উল্লেখ না করলে তাদের প্রতি চরম অবিচার করা হবে। তাদের আল্লাহভীতি আনসার মহিলাগণের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। দামেশক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয় কাভার করতে একদল সাংবাদিক ক্যাম্পাসে আসলেন। তারা পর্দানশীন ছাত্রীদের প্রশ্ন করলেন, গ্রীষ্মের কঠিন গরমে পর্দার ভেতর আপনারা কী করে থাকেন? উত্তরে ছাত্রীরা কুরআনে এ আয়াতাতাংশটি বলল : قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ : 'বলে দাও, জাহান্নামের আগুন অনেক বেশি গরম।'^{১৮০}

এ ছাত্রীদের মতো পূত-পবিত্র ও গুণবতী মেয়েদের নিয়েই প্রকৃত ইসলামি পরিবার গড়ে ওঠে। তাদের থেকে বের হয় সোনালি প্রজন্ম। তাদের গর্ভে জন্ম নেয় স্বীনের মুজাহিদ ও বীর-সেনানীরা। আনন্দের বিষয় হলো, ফিতনার এ যুগেও এ ধরনের পর্দানশীন যুবতির সংখ্যা খুব একটা কম নয়, আল-হামদুলিল্লাহ।

প্রকৃত মুসলমান তার অধীনস্থ মেয়েদের শরয়ি পর্দা—যা মুসলিম মেয়েদের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য—মেনে চলতে এবং ঘরের বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে শরিয়তের নির্দেশনা মেনে চলতে বাধ্য করে। কারণ, এটা তার দায়িত্ব। পক্ষান্তরে যে পুরুষ এ দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ, এ ব্যাপারে তার কথার ওপর স্ত্রীর কথা প্রাধান্য পায়, ফলে স্ত্রী শরিয়তের সীমা পার হয়ে যায়; আর স্বামী অসহায়ের মতো

১৭৯. ফাতহুল বারি : ৮/৪৮৯

১৮০. সূরা আত-তাওবা : ৮১

দেখে যায়, কোনো প্রতিবাদ করতে পারে না—এমন পুরুষরা নপুংশক; তাদের দীন ও পুরুষত্ব একসাথে বিদায় নিয়েছে।

স্ত্রীর প্রতি পুরুষের দায়িত্ব শুধু বাহ্যিক বিষয়ে নয়; স্ত্রীর ইবাদত ও চালচলনেও স্বামীর দায়িত্ব রয়েছে। সুতরাং স্ত্রী যদি ইবাদতে শিথিলতা করে, আল্লাহর আদেশ পালনে অবহেলা করে কিংবা কোনো পাপকাজে জড়িয়ে পড়ে, তখন এ ব্যাপারে স্বামীকে আল্লাহর সামনে জবাবদিহি করতে হবে। তদ্রূপ স্ত্রীর চরিত্র গঠন, চরিত্রের দৃঢ়তা, চারিত্রিক আবশ্যকীয় বিষয়াদি পালন ইত্যাদির ক্ষেত্রেও স্বামীর দায়িত্ব আছে। এসব বিষয়ে স্ত্রীর পক্ষ থেকে কোনো শিথিলতা ও অবহেলা পাওয়া গেলে স্বামী জিজ্ঞাসিত হবে। তাই প্রত্যেক স্বামীর জন্য এ দায়িত্বসমূহ যথাযথ পালন করা বাঞ্ছনীয়। এতে ব্যর্থ হলে নারীর ওপর পুরুষের যে কর্তৃত্ব আল্লাহ দান করেছেন, তার বেলায় সেটা প্রযোজ্য হবে না।

স্ত্রী তার স্বামীর হাতে আমানতস্বরূপ। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামীর দীনকেই স্ত্রী নিজের দীন হিসাবে বেছে নেয়। জান্নাতে গেলে তারা দুজন একসাথে যায়; আবার জাহান্নামে গেলেও দুজনে একসাথেই যায়। এজন্য আল্লাহ তাআলা মুমিনগণকে তাদের নিজেদের এবং পরিবারের লোকদের একসাথে আগুন থেকে বাঁচাতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

‘হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর, যাতে নিয়োজিত আছে পাষণহৃদয় ও কঠোরস্বভাবের ফেরেশতাগণ। আল্লাহ তাআলা তাদের যা করতে আদেশ করেন, তারা তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তারা তা-ই পালন করে।’^{১৮১}

ইসলামের দৃষ্টিতে স্ত্রীর ওপর স্বামীর কর্তৃত্ব তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন স্বামী পরিবারের নেতৃত্ব দেওয়ায় সফল হবে। মুসলমান স্বামীর পুরুষত্ব রাগ, কঠোরতা, শক্ত ভাষা ব্যবহার ইত্যাদির মাঝে নয়। এসব বিষয়কে মূর্খতার যুগে পুরুষত্ব মনে করা হতো। ইসলামি যুগে এগুলোকে পুরুষত্ব বলা হয় না; বরং ইসলামের দৃষ্টিতে পুরুষত্ব হলো, শক্তিশালী ব্যক্তিসত্তা, আকর্ষণশক্তি, উন্নত চারিত্রিক মাধুর্য, ছোটখাটো ভুল ক্ষমা করার উদার মানসিকতা, আল্লাহর বিধিবিধান লঙ্ঘন না করার ব্যাপারে কঠোর হওয়া, পরিবারের সদস্যদের ওপর আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা, সত্যের দিকে আহ্বান করার দৃঢ় মনোবল, অপব্যয় ও অপচয়হীন বদান্যতা, দুনিয়া ও আখিরাতের বিভিন্ন দায়িত্বের প্রতি আন্তরিকতা, ইসলামি আদর্শ পরিবার গঠনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান ইত্যাদি। এসব গুণ যার মাঝে আছে, ইসলামের দৃষ্টিতে সেই প্রকৃত পুরুষ। (বাস্তবিক দৃষ্টিকোণ থেকে) নারীর ওপর পুরুষের কর্তৃত্ব কেবল তার বেলায়ই প্রযোজ্য।



সন্তান-সন্ততির সাথে মুসলমানের সম্পর্ক

ভূমিকা

মানুষের জীবনে সন্তান হলো চোখের শীতলতা ও হৃদয়ের প্রশান্তি। একজন মানুষের জন্য নিজের সন্তানই তার সবচেয়ে আপন ও ঘনিষ্ঠজন। আল্লাহর পরেই মানুষের সকল আশা-আশাজ্ঞার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে সন্তান। সন্তানের বরকতে রিজিকে প্রবৃদ্ধি ঘটে, আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয় এবং সাওয়াব কয়েকগুণে বৃদ্ধি পায়।

তবে এ সবকিছু নির্ভর করে সন্তানের সুষ্ঠু তারবিয়াত ও শিক্ষা-দীক্ষার ওপর এবং এমন পরিবেশে তার বেড়ে ওঠার ওপর, যে পরিবেশ তার মাঝে কল্যাণের উপাদান জোগায়, সফলতার রাজপথ দেখিয়ে দেয়। কোনো মানুষ যদি তার সন্তানের জন্য সুষ্ঠু তারবিয়াত ও উত্তম পরিবেশে বেড়ে ওঠার ব্যবস্থা করতে পারে, তখনই তার সন্তান প্রকৃত অর্থে জীবনের সৌন্দর্য হবে, যেমনটি পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

‘ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি হলো পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য।’^{১৮২}

এজন্যই রাসুলুল্লাহ ﷺ কাউকে ভালোবাসলে তার জন্য সম্পদ ও সন্তানের প্রবৃদ্ধির দুআ করতেন।

আনাস র. বর্ণনা করেন :

دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَمَا هُوَ إِلَّا أَنَا، وَأُمِّي، وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتِي، فَقَالَ: قُومُوا فَلَأُصَلِّيَ بِكُمْ فِي غَيْرِ وَقْتِ صَلَاةٍ، فَصَلَّى بِنَا... ثُمَّ دَعَا لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ بِكُلِّ خَيْرٍ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَقَالَتْ

১৮২. সূরা আল-কাহফ : ৪৬

أُمِّي: يَا رَسُولَ اللَّهِ خُودِيكَ اذْغُ اللَّهُ لَهُ، قَالَ: فَدَعَا لِي بِكُلِّ خَيْرٍ،
وَكَانَ فِي آخِرِ مَا دَعَا لِي بِهِ، أَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَبَارِكْ لَهُ فِيهِ

‘নবিজি ﷺ আমাদের কাছে আসলেন। আমরা বলতে আমি, আমার মা ও খালা উম্মে হারাম। তখন নবিজি ﷺ বললেন, সবাই দাঁড়াও, তোমাদের নিয়ে (ফরজ নামাজের) ওয়াক্ত আসা ছাড়াই (নফল) নামাজ পড়ব। অতঃপর আমাদের নিয়ে তিনি নামাজ আদায় করলেন। ...তারপর আমাদের জন্য দুনিয়া-আখিরাতের সার্বিক কল্যাণের দুআ করলেন। তখন আমার মা বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, এ আপনার ছোট্ট খাদিম; তার জন্য দুআ করুন। তখন তিনি আমার জন্য সার্বিক কল্যাণের দুআ করলেন। দুআর শেষাংশে বললেন, হে আল্লাহ, তাকে অধিক সম্পদ ও সন্তান দান করুন এবং তাতে বরকত দান করুন।’^{১৮৩}

পক্ষান্তরে যদি সন্তানের সুষ্ঠু তারবিয়াতে গাফিলতি করা হয় এবং তাকে সঠিক শিক্ষা-দীক্ষা ও দিক-নির্দেশনা দেওয়া না হয়, তখন পিতা-মাতার জন্য সে মুসিবত হয়ে দাঁড়ায় এবং তাদের দিনের সুখ ও রাতের ঘুম কেড়ে নেয়।

হৃদয়ে লালন করে পিতৃত্বের দায়িত্ববোধ

প্রকৃত মুসলমান সন্তানের প্রতি খুবই দায়িত্বশীল হয়। সন্তানকে সুষ্ঠুভাবে লালনপালন করা ও আদর্শ জীবনের অধিকারী হিসাবে গড়ে তোলাকে নিজের অন্যতম বড় দায়িত্ব মনে করে।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

‘হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই অগ্নি থেকে রক্ষা করো, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও প্রস্তর। যাতে নিয়োজিত আছে পাষণহৃদয় ও কঠোরস্বভাবের ফেরেশতাগণ। আল্লাহ তাআলা তাদের যা করতে আদেশ করেন, তারা তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয়, তারা তা-ই পালন করে।’^{১৮৪}

এ মহান দায়িত্ব সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

أَلَا كُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا، وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

‘সাবধান! তোমাদের প্রত্যেকই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকই স্ব-স্ব অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। রাষ্ট্রপ্রধান দায়িত্বশীল এবং সে তার প্রজাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে। পুরুষ তার পরিবারের লোকদের দায়িত্বশীল এবং তাদের ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর পরিবারের দায়িত্বশীল, এ ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে। সেবক তার মালিকের সম্পদের দায়িত্বশীল, এ ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে। সাবধান! মনে রেখো, তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকই তার অধীনস্থ লোকদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।’^{১৮৫}

এ এক ব্যাপক দায়িত্ব, যা সকল মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। কেউ এ দায়িত্ব থেকে মুক্ত নয়। এ দায়িত্বের দাবি অনুযায়ী পিতা-মাতা সন্তানের সুষ্ঠু লালনপালন ও তাকে ইসলামি আদর্শে আদর্শবান করার জিম্মাদার।

১৮৪. সূরা আত-তাহরীম : ৬

১৮৫. সহিহুল বুখারি : ৭১৩৮, সহিহ মুসলিম : ১৮২৯

তাই রাসুলুল্লাহ ﷺ যে উত্তম চরিত্র উম্মাহর মাঝে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রেরিত হয়েছেন, তা সন্তানের মাঝে প্রতিষ্ঠা করা পিতা-মাতার একান্ত কর্তব্য।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ

‘আমি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতাদানের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছি।’^{১৮৬}

সন্তানকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ-এর আনুগত্যশীল হিসাবে গড়ে তোলা পিতা-মাতার অনেক বড় দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনে যারা অবহেলা করবে, তারা মুফরিত বা দ্বীনের ব্যাপারে অবহেলাকারী বলে সাব্যস্ত হবে। এ সম্পর্কে উলামায়ে কিরাম বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাদিসটি : **مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ** (তোমাদের সন্তানরা যখন সাত বছর বয়সে উপনীত হবে, তখন তাদের নামাজ পড়তে বলবে। আর যখন দশ বছরে উপনীত হবে, তখন নামাজ না পড়লে তাদের প্রহার করবে।)^{১৮৭} শোনার পর কোনো ঘরে যদি সন্তানদের সাত বছরে উপনীত হওয়ার পর নামাজের আদেশ দেওয়া না হয় এবং দশ বছরে উপনীত হওয়ার পর নামাজ ছেড়ে দিলে শাস্তি দেওয়া না হয়, সে ঘর দ্বীনের ব্যাপারে অবহেলাকারী হিসাবে বিবেচিত হবে এবং পিতা-মাতা এ অবহেলার ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে।

কেননা, ঘর হলো সন্তানের প্রথম নীড়, যেখানে তার কোমল পালক গজায়; প্রথম পরিবেশ, যেখানে সে বেড়ে ওঠে; প্রথম কেন্দ্র, যেখানে তার আবেগ, অনুভূতি ও ব্যক্তিত্বের ভিত তৈরি হয়। তাই ঘরের পরিবেশে সন্তানের সুষ্ঠুভাবে গড়ে ওঠার জন্য পিতা-মাতাকে বড় ভূমিকা রাখতে হয়। একদিকে সুস্বাদু খাবারের ব্যবস্থা করে তার স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে হয়, অপরদিকে ইসলামি শিষ্টাচার ও আদর্শ শিক্ষা দিয়ে তার বিবেক ও আত্মা পরিপূর্ণ করতে হয়।

১৮৬. আল-আদাবুল মুফরাদ : ২৭৩

১৮৭. সুনানু আবি দাউদ : ৪৯৫

সন্তানের লালনপালনে শ্রেষ্ঠতম ও কৌশলগত পন্থা অবলম্বন করে

বিচক্ষণ মুসলিম পিতা-মাতা সন্তানের মানসিকতা ও মনের কথা বুঝতে পারে। ফলে সে অনুযায়ী সন্তানের সামনে তারা নিজেদের উপস্থাপন করে। তাদের চরিত্রগঠন ও দিক-নির্দেশনা দেওয়ার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতম ও কৌশলগত উপায় অবলম্বন করে।

মুসলমান পিতা-মাতা বিভিন্ন উপায়ে সন্তানদের হৃদয়ে স্থান করে নেয় এবং তাদের নিকটতম বন্ধু হয়ে যায়। তাদের পছন্দ-অপছন্দের মূল্যায়ন করে। তাদের সাথে খেলাধুলা করে, হাসি-কৌতুক করে। স্নেহ ও মমতামধুর ভাষায় কথা বলে। ফলে সন্তানরাও মা-বাবাকে ভালোবাসতে শুরু করে। তাদের আদেশ-নিষেধ ও দিক-নির্দেশনা পূর্ণরূপে মেনে চলে। এ আনুগত্য কোনো ভয়ের কারণে নয়; বরং পিতা-মাতার প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসার কারণে। পক্ষান্তরে যে বাবা-মা সন্তানদের সাথে কঠোর আচরণ করে, কথায় কথায় তাদের শাসায়, তিরস্কার করে—এদের সন্তানরাও তাদের আনুগত্য করে, তবে এ আনুগত্য ভয়ের কারণে, ভালোবাসা বা ভক্তির কারণে নয়। এ দুই আনুগত্যের মাঝে বড় ব্যবধান রয়েছে। যে আনুগত্য ভক্তি ও ভালোবাসার কারণে হয়, তা আজীবন টিকে থাকে। আর যে আনুগত্য ভয়ের কারণে হয়, তা একসময় বিলুপ্ত হয়ে যায়।

অনেক মানুষ মনে করে, সন্তানদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করলে তারা মাথায় উঠে নাচবে, পিতা-মাতার সম্মান করবে না। কিন্তু এ ধারণা ভুল। কেননা, সন্তানদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণের মাধ্যমে তাদের লালনপালন করা নববি পদ্ধতি। পনেরো শত বছর পূর্বে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে উম্মাহকে এ পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়েছেন।

এ সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হলো :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُفُّ عَبْدَ اللَّهِ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ،
وَكَثِيرًا بَنِي الْعَبَّاسِ، ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ سَبَقَ إِلَيَّ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا قَالَ:
فَيَسْتَبِقُونَ إِلَيْهِ فَيَقْعُونَ عَلَى ظَهْرِهِ وَصَدْرِهِ، فَيَقْبَلُهُمْ وَيَلْتَزِمُهُمْ

‘রাসুলুল্লাহ ﷺ আব্বাস ﷺ-এর ছেলে আব্দুল্লাহ, উবাইদুল্লাহ ও কুসাইয়্যারকে একসারিতে দাঁড় করিয়ে বলতেন, আমার নিকট যে আগে পৌছতে পারবে, তাকে এমন এমন পুরস্কার দেওয়া হবে। তখন তারা দৌড়ে এসে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পিঠ ও বুকের ওপর উঠে যেতেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ আদর করে তাদের চুমু খেতেন।’^{১৮৮}

ইমাম বুখারি ﷺ ও তাবারানি ﷺ আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন :

أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِ الْحَسَنِ أَوْ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ وَضَعَ قَدَمَيْهِ عَلَى قَدَمَيْهِ ثُمَّ قَالَ: تَرَقَّى

‘রাসুলুল্লাহ ﷺ হাসান অথবা হুসাইন ﷺ-এর হাত ধরলেন এবং তার পা নিজের পায়ের ওপর রেখে বললেন, আরোহণ করো।’^{১৮৯}

নবিজি ﷺ হাসান ﷺ ও হুসাইন ﷺ-কে কাঁধের ওপর উঠিয়ে এবং তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুসুলভ আচরণ করার মাধ্যমে উম্মাহর সর্বযুগের সকল দেশের পিতা ও দাদা-নানাদের শিখিয়ে দিয়েছেন, কীভাবে সন্তানদের লালনপালন করতে হবে। বুঝিয়ে দিয়েছেন, মানুষ যত সম্মানিত ও মর্যাদাবানই হোক না কেন, সন্তানদের এভাবেই লালনপালন করতে হবে। এ সম্পর্কিত ঘটনাটি শাদাদ ﷺ-এর সূত্রে ইমাম আহমাদ ও নাসায়ি ﷺ বর্ণনা করেছেন।

শাদাদ ﷺ বলেন :

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِحْدَى صَلَاتِي الْعِشَاءِ وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ فَصَلَّى فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانِي صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا، قَالَ أَبِي: فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ

১৮৮. মুসনাদু আহমাদ : ১৮৩৬

১৮৯. আল-আদাবুল মুফরাদ : ২৭০

سَجَدَتْ بَيْنَ ظَهْرَانِي صَلَاتِكَ سَجْدَةً أَطْلَتْهَا حَتَّى ظَنَنْتَا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ
أَمْرٌ أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ، قَالَ: «كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي
فَكَرِهْتُ أَنْ أَعْجَلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ»

‘রাসুলুল্লাহ ﷺ হাসান ﷺ অথবা হুসাইন ﷺ-কে কোলে নিয়ে বের হলেন। তাকে পাশে রেখে তিনি নামাজে দাঁড়ালেন। তারপর যথারীতি তাকবির বলে নামাজ শুরু করলেন। সিজদায় যাওয়ার পর দীর্ঘ সময় ধরে উঠছেন না দেখে আমি মাথা তুলে তাকালাম। দেখলাম, বাচ্চাটা তাঁর পিঠের ওপর বসে আছে। আমি পুনরায় সিজদায় ফিরে গেলাম। নামাজ শেষ হওয়ার পর সাহাবিগণ বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ, এত দীর্ঘক্ষণ সিজদা করলেন যে! তিনি বললেন, বাচ্চাটা আমার ওপর সওয়ার হয়েছিল, আর আমি তার প্রয়োজন পূরণ করার পূর্বে তাড়াহুড়া করাটা ভালো মনে করিনি।’^{১৯০}

সন্তানদের সাথে মুসলমান পিতা-মাতার আচরণ এমনই হওয়া উচিত। যথাসম্ভব তাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করা, বন্ধুসুলভ আচরণ করা, হাসি-কৌতুক করা, তাদের পর্যাপ্ত সময় দেওয়া একজন সফল বাবা-মা হওয়ার জন্য অপরিহার্য। বিশেষ করে মুসলমান পিতা-মাতার মাঝে এ গুণগুলো অবশ্যই থাকা চাই।

সন্তানদের প্রতি ভালোবাসা ও মমতা অনুভব করে

একজন আদর্শ পিতা হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম জরুরি হলো, সন্তানদের প্রতি দয়া, স্নেহ, মমতা ও ভালোবাসা থাকা। তখনই সন্তানরা সুষ্ঠুভাবে বেড়ে উঠতে পারবে এবং তাদের অন্তরে সাহস ও মনোবল সৃষ্টি হবে। তাদের অন্তর পরিচ্ছন্ন হবে এবং বুদ্ধি-বিবেক স্বচ্ছ ও তীক্ষ্ণ হবে।

আদর-স্নেহ ইসলামের একটি মৌলিক চরিত্র। এটি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণও বটে।

১৯০. সুনানুন নাসায়ি : ১১৪১

আনাস ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

«مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَرْحَمَ بِالْعِيَالِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، قَالَ: «كَانَ إِبْرَاهِيمُ مُسْتَرْضِعًا لَهُ فِي عَوَالِي الْمَدِينَةِ، فَكَانَ يَنْطَلِقُ وَنَحْنُ مَعَهُ فَيَدْخُلُ الْبَيْتَ وَإِنَّهُ لَيُدْخِنُ، وَكَانَ ظَنُّهُ قَيْنًا، فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبِّلُهُ، ثُمَّ يَرْجِعُ»

‘আমি রাসুলুল্লাহ ؐ-এর মতো পরিবার-পরিজনের প্রতি অধিক আদর-স্নেহ করতে আর কাউকে দেখিনি। মদিনার উপকণ্ঠে একটি বাড়িতে ইবরাহিম ؑ দুধ পান করতেন। রাসুলুল্লাহ ؐ হেঁটে হেঁটে সেখানে যেতেন। আমরাও তাঁর সাথে থাকতাম। বাড়িতে প্রবেশ করে তিনি তাকে কোলে নিয়ে চুমু খেতেন, এরপর ফিরে আসতেন।’^{১৯১}

কচি কচি প্রস্ফুটমান মুসলমান শিশুদের প্রতি রাসুলুল্লাহ ؐ-এর দয়া ও মমতা অনেক বিস্তৃত ছিল, আদর-স্নেহের ছায়াময় পরিধি অনেক প্রশস্ত ছিল। খেলাধুলায় ব্যস্ত শিশুদের সাথে মিশে যেতেন তিনি। তাদের ঢেকে নিতেন স্নেহ-ভালোবাসার উষ্ণ চাদরে।

এ সম্পর্কে আনাস ؓ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ؐ যখন শিশুদের পাশ দিয়ে যেতেন, তখন হর্ষোৎফুল্ল হয়ে তাদের সাথে মিশতেন এবং তাদের সালাম দিতেন।

তারবিয়াত সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ ؐ-এর অমর এক বাণী হলো :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرِنَا

‘সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ছোটদের স্নেহ করে না এবং বড়দের মান-ইজ্জত বুঝে না।’^{১৯২}

১৯১. সহিহ মুসলিম : ২৩১৬

১৯২. মুসনাদু আহমাদ : ৬৭৩৩, মুসতাদরাবুল হাকিম : ২০৯

আবু হুরাইরা رضي الله عنه বর্ণনা করেন :

قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ
بُنُ حَابِسِ التَّمِيمِيِّ جَالِسًا، فَقَالَ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشْرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا
قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ
قَالَ: «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ»

‘রাসুলুল্লাহ ﷺ হাসান رضي الله عنه-কে চুমু খেলেন। তখন তাঁর নিকট আকরা
বিন হাবিস তামিমি رضي الله عنه ছিলেন। তিনি বললেন, আমার দশটি
বাচ্চা আছে, আমি তাদের কখনো চুমু খাইনি। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ
বললেন, যে দয়া (আদর-স্নেহ) করে না, তাকে দয়া করা হবে না।’^{১৯৩}

রাসুলুল্লাহ ﷺ ছিলেন উম্মাহর মহান অভিভাবক ও লালনপালনকারী। তিনি
মানুষের চরিত্র গঠন করতেন। তাদের অন্তরে দয়া-মায়া ও আদর-স্নেহের
শ্রোতধারা জারি করার চেষ্টা করতেন। তাদের অন্তরসমূহ আদর-ভালোবাসা
ও মায়া-মমতায় ভরে দিতে চাইতেন, যা মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে :

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَتُقَبِّلُونَ
صِبْيَانَكُمْ؟ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْ أَمْلِكُ
لَكَ أَنْ نَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ؟

‘জনৈক বেদুইন নবিজি ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, আপনারা দেখি
বাচ্চাদের চুমু খান! আমরা তো আমাদের বাচ্চাদের চুমু খাই না।
তখন নবিজি ﷺ বললেন, তোমাদের অন্তর থেকে আল্লাহ দয়া-মায়া
তুলে নিয়েছেন বলে কি আমাদের অন্তর থেকেও তুলে নেবেন?’^{১৯৪}

উম্মুল মুমিনিন আয়িশা رضي الله عنها বর্ণনা করেন :

১৯৩. সহিহুল বুখারি : ৫৯৯৭, সহিহ মুসলিম : ২৩১৮

১৯৪. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৯০, সহিহ মুসলিম : ২৩১৭



وَكَاثَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا، فَرَحَّبَ بِهَا وَقَبَّلَهَا، وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ، وَكَانَ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ، فَرَحَّبَتْ بِهِ وَقَبَّلَتْهُ، وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا، فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ، فَرَحَّبَ بِهَا وَقَبَّلَهَا

‘ফাতিমা ؓ যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসতেন, তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ দাঁড়িয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানাতেন। তাকে চুম্বন করে পাশে বসাতেন। একইভাবে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিকট গেলে তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন। তাঁর হাত ধরে তাঁকে বরণ করতেন। তারপর চুম্বন করে পাশে বসাতেন। মৃত্যুপূর্ববর্তী অসুস্থতার সময়েও যখন ফাতিমা ؓ আসলেন, তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁকে অভিবাদন জানালেন এবং চুম্বন করলেন।’^{১৯৫}

প্রকৃত মুসলমান রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশনা অনুসরণ করে চলে, তাই সে সন্তানদের প্রতি কখনো নির্দয় হয় না। আচার-আচরণে নীরস ও শুষ্ক হয় না। কথাবার্তায় কঠোর ও রুক্ষ হয় না। এমনকি তার চরিত্রে সহজাত রুক্ষতা ও শুষ্কতা থাকলেও দ্বীনের নির্দেশনা জানার পর তদস্থলে নম্রতা, আদর-স্নেহ, মায়া-মমতা ও ভালোবাসা স্থাপন করে নেয়। এক কথায় বললে, প্রকৃত মুসলমানের নিকট সন্তানরা হলো তার কলিজার টুকরো, যা শরীর থেকে আলাদা হয়ে পৃথিবীতে বিচরণ করছে এই যা!

কবি খুব সুন্দর বলেছেন :

وإنما لأولادنا بيننا * أكبادنا تمشي على الأرض

إن هبت الريح على بعضهم * تمتنع العين من الغمض

‘আমাদের ছেলেমেয়ে আমাদের কলিজার টুকরা, যা পৃথিবীর বুকে বিচরণ করে।

১৯৫. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৯৭১

বাতাস যদি তাদের শরীরে হালকাও আঘাত করে, উধাও হয়ে যায় আমাদের নিদ্রা।’

সারকথা হলো, পিতা-মাতা মানে মায়া-মমতার মূর্তপ্রতীক, উপচে পড়া স্নেহ-ভালোবাসার আধার এবং ত্যাগ-বিসর্জনের উর্মিমাল।

সন্তানদের জন্য উদারচিত্তে ব্যয় করে

ইসলাম সন্তানদের জন্য পিতা-মাতার সহজাত স্নেহ-ভালোবাসা ও মায়া-মমতাকে যথেষ্ট মনে করেনি। কেননা, অনেক সময় মানুষের জীবন এমন কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় যে, তখন সন্তানের প্রতি মনোযোগ দেওয়াও হয়ে ওঠে না; তাদের জন্য জীবনের সেরা মুহূর্তগুলো উৎসর্গ করা তো অনেক দূরের কথা। অথবা অনেক সময় মানুষ জীবন নিয়ে এমন বিতৃষ্ণ হয়ে পড়ে যে, সন্তান লালনপালনের দায়িত্বভার বহন করা কিংবা তাদের পেছনে ব্যয় করার কোনো ইচ্ছাই আর তাদের মনে থাকে না। এজন্য ইসলাম পিতা-মাতার সহজাত আদর-ভালোবাসা ও স্নেহ-মমতার জন্যও অনেক বড় সাওয়াব নির্ধারণ করে রেখেছে, যেন পরিস্থিতির কারণে সহজাত স্নেহ-ভালোবাসা না থাকলেও সাওয়াবের আশায় সন্তানদের লালনপালন ও তাদের জন্য ব্যয় করতে পিতা-মাতা আগ্রহী হন। এ সম্পর্কিত দু-একটি হাদিস নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

উম্মে সালামা রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لِي مِنْ أَجْرِ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ،
وَلَسْتُ بِتَارِكِيهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، إِنَّمَا هُمْ بَنِي؟ قَالَ: نَعَمْ، لَكَ أَجْرُ مَا
أَنْفَقْتَ عَلَيْهِمْ

‘আমি রাসুলুল্লাহ সঃ-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আবু সালামার সন্তানদের জন্য আমি যা খরচ করি, তার বিনিময়ে আমি কি সাওয়াব পাব? আমি চাই না যে, তারা আমার হাতছাড়া হয়ে আশ্রয়হীন হয়ে পড়ুক। কেননা, তারা তো আমারই সন্তান। তখন রাসুলুল্লাহ সঃ উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, তাদের জন্য তুমি যা খরচ করবে, তার সাওয়াব পাবে।’^{১৯৬}

১৯৬. সহিহুল বুখারি : ৫৩৬৯

আবু মাসউদ বদরি ۞ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ۞ ইরশাদ করেছেন :

إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ

‘কোনো ব্যক্তি সাওয়াবের আশা নিয়ে তার পরিবার-পরিজনের (ভরণপোষণের) জন্য যা খরচ করে, তা সদকা হিসাবে পরিগণিত হবে।’^{১৯৭}

শুধু তাই নয়; বরং পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করাকে ইসলাম সবচেয়ে ফজিলতপূর্ণ ও অধিক সাওয়াবপূর্ণ খরচ বলে অভিহিত করেছে।

এ সম্পর্কে সহিহ মুসলিমে আবু হুরাইরা ۞ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ ۞ ইরশাদ করেছেন :

دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

‘একটি দিনার তুমি আল্লাহর পথে ব্যয় করেছ, একটি দিনার দিয়ে দাস মুক্ত করেছ, একটি দিনার নিঃস্বদের দান করেছ এবং একটি দিনার তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করেছ। এর মধ্যে (সাওয়াবের দিক থেকে) সেই দিনারটিই উত্তম, যা তুমি পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করেছ।’^{১৯৮}

সহিহ মুসলিমের আরেক বর্ণনায় এসেছে :

أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ، دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى ذَاتَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

‘কোনো ব্যক্তি যেসব দিনার ব্যয় করে থাকে, তন্মধ্যে ওই দিনারটি সবচেয়ে উত্তম, যা সে নিজের পরিবার-পরিজনের (ভরণপোষণের)

১৯৭. সহিহুল বুখারি : ৫৫

১৯৮. সহিহ মুসলিম : ৯৯৫

জন্য ব্যয় করে, অথবা আল্লাহর পথে (অর্থাৎ জিহাদের উদ্দেশ্যে)
তার বাহনের জন্য ব্যয় করে, অথবা আল্লাহর পথে (জিহাদের
ময়দানে) তার সঙ্গী-সাথীদের জন্য ব্যয় করে।^{১৯৯}

প্রকৃত মুসলমান পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করতে খুব স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।
কারণ, সে বিশ্বাস করে, মুসলমান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজের পরিবার-
পরিজন ও অন্যদের জন্য যা-ই ব্যয় করে, তার বিনিময়ে তাকে অনেক বড়
সাওয়াব ও প্রতিদান দেওয়া হবে। এমনকি প্রিয়তমা স্ত্রীর মুখে ভালোবেসে
খাবারের একটি গ্রাস তুলে দিলেও তার জন্য সাওয়াব দেওয়া হবে! এ কথার
কথা নয়, স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ﷺ এমনটাই বলেছেন।

সাদ বিন আবু ওয়াক্কাস ؓ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে বলেছেন :

وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلَ
فِي فِي امْرَأَتِكَ

‘তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যা-ই ব্যয় করবে, তার সাওয়াব
দেওয়া হবে। এমনকি খাবারের যে লুকমা তুমি স্ত্রীর মুখে তুলে
দাও, তারও সাওয়াব দান করা হবে।^{২০০}

প্রকৃত মুসলমান পরিবারের লোকদের অনাহারে অর্ধাহারে রেখে তাদের থেকে
বিচ্ছিন্ন ও দায়িত্বমুক্ত থাকতে পারে না। কেননা, রাসুলুল্লাহ ﷺ পারিবারিক
দায়িত্ব আদায় না করে বসে থাকা লোকদের ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি বাক্য
উচ্চারণ করেছেন এবং বড় গুনাহ ও কঠিন শাস্তির হুমকি দিয়েছেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ

‘কোনো ব্যক্তি পাপী হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে
(ভরণপোষণের ক্ষেত্রে) তার ওপর নির্ভরশীলদের রিজিক (দায়িত্ব

১৯৯. সহিহ মুসলিম : ৯৯৪

২০০. সহিহুল বুখারি : ১২৯৫, সুনানু আবু দাউদ : ২৮৬৪

পালন না করে বা তাতে অবহেলা করে) নষ্ট করে।’^{২০১}

মায়া-মমতা ও খরচের ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়েদের মাঝে পার্থক্য করে না

অনেক মানুষ মেয়েসন্তান হলে চরম নাখোশ হয়। তারা আশা করে, আল্লাহ যদি তাদের শুধু পুত্রসন্তানই দান করতেন! এর কারণ হলো, তারা জানে না যে, যাকে আল্লাহ কন্যাসন্তান দান করেছেন, আর সে তার ব্যাপারে ধৈর্য ধরেছে, তাদের ভালোভাবে প্রতিপালন করেছে, মেয়ে বলে তাদের প্রতি মায়া-মমতা ও ভালোবাসায় কোনোরূপ ঘাটতি রাখেনি, সেই পিতার জন্য আল্লাহ কত বড় পুরস্কার তৈরি করে রেখেছেন! কী মহান সৌভাগ্য কন্যাসন্তানের স্নেহশীল পিতার জন্য অপেক্ষা করছে, তা যদি এরা জানত, তাহলে মেয়েসন্তানের পিতার প্রতি রীতিমতো ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠত এবং তারাও কন্যাসন্তান পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করত।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، فَصَبَّرَ عَلَيْهِنَّ، فَأُطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ
مِنْ جَدَّتِهِ، كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ

‘যার তিনটি মেয়েসন্তান আছে এবং সে তাদের ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করেছে (অর্থাৎ তাদের নিয়ে বিরক্ত হয়নি এবং ধৈর্য সহকারে তাদের লালনপালন করেছে), সাধ্য অনুযায়ী তাদের পানাহারের ব্যবস্থা করেছে, তাদের লেবাস-পোশাকের ব্যবস্থা করেছে, কিয়ামতের দিন এ মেয়েরা তার ও জাহান্নামের মাঝে অন্তরায় হবে।’^{২০২}

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، يُؤْوِيَهُنَّ، وَيَكْفِيَهُنَّ، وَيَرْحُمُهُنَّ، فَقَدْ وَجَبَتْ
لَهُ الْجَنَّةُ الْبَتَّةَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَعْضِ الْقَوْمِ: وَثْنَتَيْنِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ؟
قَالَ: وَثْنَتَيْنِ

২০১. সুনানু আবি দাউদ : ১৬৯২

২০২. মুসনাদু আহমাদ : ১৭৪০৩, আল-আদাবুল মুফরাদ : ৭৬



‘যার তিনটি কন্যাসন্তান আছে এবং সে তাদের আশ্রয় দিয়ে তাদের ব্যয়ভার বহন করে, তাদের আদর-স্নেহ করে, তার জন্য বেহেশত অবধারিত হয়ে যায়। এক ব্যক্তি বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, কারও যদি দুটি কন্যাসন্তান থাকে? তিনি বললেন, দুটি থাকলেও।’^{২০৩}

এ হাদিসগুলো শোনার পর, এমন সাওয়াব ও প্রতিদানের ব্যাপারে জানার পর, কোনো পিতা কি কন্যাসন্তানের লালনপালন ও তাদের ব্যয়ভার বহন করতে অবহেলা করতে পারে?

ইসলাম এমন এক জীবনব্যস্থা, যা সর্বযুগের সকল জায়গার মানুষদের ঘটনাপ্রবাহের ওপর দৃষ্টি রাখে এবং তাদের সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান দেয়। তাই ইসলাম এ ব্যাপারেও লক্ষ রেখেছে যে, কন্যাসন্তান কখনো তালাকপ্রাপ্ত হয়ে পিতার ঘরে ফিরে আসবে, তখন পিতার আর্থিক অবস্থা ও আয় কম হওয়ার কারণে বা অধিক সন্তানের কারণে খুব একটা সচ্ছল না হতে পারে। ইসলাম বলে, এমন মুহূর্তে যদি কোনো পিতা স্বামীর ঘর থেকে বিতাড়িত মেয়েসন্তানের ব্যয়ভার বহন করে এবং তার দুঃখ-দুর্দশা লাঘব করার চেষ্টা করে, এটা তার জন্য সবচেয়ে বড় সদকা এবং আল্লাহর অধিক নৈকট্যশীল ইবাদত হবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ সুরাকা বিন জুশুম -কে বললেন :

أَلَا أَدُلُّكَ عَلَىٰ أَكْثَرِ الصَّدَقَةِ، أَوْ مِنْ أَكْثَرِ الصَّدَقَةِ؟ قَالَ: بَلَىٰ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: ابْنُكَ مَرْدُودَةٌ إِلَيْكَ، لَيْسَ لَهَا كَاسِبٌ غَيْرُكَ

‘আমি কি তোমাকে সবচেয়ে বড় সদকার খাত কী, তা জানিয়ে দেবো না? অথবা বললেন, আমি কি তোমাকে সবচেয়ে বড় সদকার অন্যতম খাতের ব্যাপারে অবহিত করব না? তিনি বললেন, অবশ্যই বলুন, হে আল্লাহর রাসুল। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, তা হচ্ছে তোমার মেয়ে, যে স্বামীর ঘর থেকে (তালাকপ্রাপ্ত হয়ে) তোমার নিকট ফিরে এসেছে এবং তার জন্য তুমি ছাড়া অন্য কোনো উপার্জনকারী নেই।’^{২০৪}

২০৩. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৭৮

২০৪. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৮০, মুসনাদু আহমাদ : ১৭৫৮৬

ইসলামি সমাজব্যবস্থায় সন্তানরা যেরূপ আদর-ভালোবাসা ও স্নেহ-মমতা পেয়ে থাকে, পশ্চিমা বস্তুবাদী সমাজব্যবস্থায় তারা তা থেকে বঞ্চিত। কেননা, পশ্চিমা সমাজে সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে, আঠারো বছরে উপনীত হলেই তাকে নিজ দায়িত্বের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। তারুণ্যের কোমলতা চলে যাওয়ার পূর্বেই তাকে পেশ করা হয় কঠিন বস্তুবাদী জীবনের সামনে। এতে তার যতই কষ্ট হোক না কেন, বাবা-মার ভালোবাসার উষ্ণ পরশ আর সে পায় না। বস্তুত, এমনই আকাশ-পাতাল পার্থক্য থাকে মানবরচিত ভুলে ভরা সমাজব্যবস্থা আর আল্লাহর প্রবর্তিত নিখুঁত ও নির্ভেজাল শরিয়ার মাঝে। একটি ব্যবস্থা (শরিয়াব্যবস্থা) মানুষের জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে, আরেকটি মানুষের জীবনকে ভোগবাদ ও বস্তুবাদের আঘাতে দুর্বিষহ করে তোলে।

ফলে দেখা যায়, বস্তুবাদী পৃথিবীর প্রতি চরম বিতৃষ্ণ হয়ে অনেক যুবক আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। এ ছাড়াও এ বস্তুবাদী সমাজ পৃথিবীকে একদল অবিবাহিত মা উপহার দেয়। কী অশ্লীল আর নোংরা এ উপহার! সময়ের চাকা যত গড়াচ্ছে, এ ধরনের আত্মহত্যাকারী ও অবিবাহিত মায়ের সংখ্যা দিনদিন তত বেড়েই চলছে।

সন্তানদের ওপর কড়া নজর রাখে

প্রকৃত মুসলমান সন্তানদের ওপর দুচোখ খোলা রেখে কড়া নজর রাখে। তারা কী পড়ছে বা কী লিখছে, তার ওপর নজর রাখে। তাদের প্রিয় অভ্যাস বা প্রিয় বস্তু কী, কিংবা তাদের অজান্তেই কোনো অভ্যাস বা বস্তু তাদের প্রিয় হয়ে যাচ্ছে কি না, তা পর্যবেক্ষণ করে। কাদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করছে, কাদের সাথে দিনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করছে, তার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে। ছুটির দিনে বা অবসর সময়ে কোন জায়গায় তারা বেড়াতে যায়, কী করে সময় অতিবাহিত করে, তা খোলা চোখে নিরীক্ষণ করে। এ সবকিছু তারা সন্তানদের অজান্তেই করে। জীবনের সকল গলিতে তারবিয়াতের প্রকাশ্য সি সি ক্যামেরা বসিয়ে তাদের পথচলার সাবলীলতাকে বিনষ্ট করে না। তবে যখন তাদের পড়াশোনায় বা প্রিয় প্রসঙ্গ নির্বাচনে বিচ্যুতি দেখা যায়, সাথে সাথেই তাদের সতর্ক করে দেয়। খারাপ ছেলেদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখলে বা আপত্তিকর

স্থানে যেতে দেখলে তা থেকে বারণ করে। ধূমপান ইত্যাদি কোনো খারাপ স্বভাব তার মাঝে দেখতে পেলে কিংবা সময় ও শক্তি বিনষ্টকারী মাকরুহ ও হারাম খেলাধুলার প্রতি আসক্ত হতে দেখলে কোনোরূপ বিলম্ব না করে উত্তম পদ্ধতিতে তাদের নিষেধ করে এবং সত্য ও সুন্দরের পথ দেখিয়ে দেয়।

এর কারণ হলো, প্রত্যেক সন্তান স্বভাবধর্ম ইসলাম নিয়ে জন্মলাভ করে। পরবর্তী সময়ে তার পিতা-মাতাই তাকে ইহুদি, খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজক বানিয়ে দেয়। সহিহ বুখারিতে বর্ণিত একটি হাদিসে এমনটাই বলা হয়েছে।

নিম্নে পিতা-মাতার জন্য সন্তান লালনপালন এবং তাদের সুস্থ বিবেক ও ব্যক্তিত্ব গঠনের কিছু কার্যকর টিপস দেওয়া হলো :

- সন্তানদের হাতে অধ্যয়নের জন্য এমন বই তুলে দেবেন, যা তাদের বুদ্ধির পরিধি প্রশস্ত করবে, তাদের মাঝে উত্তম চরিত্র স্থাপন করবে এবং তাদের ভালো ও আদর্শ মানুষ হওয়ার পাথেয় জোগাবে। এমন বই থেকে সন্তানদের দূরে রাখবেন, যা তাদের বিবেক-বুদ্ধি বিনষ্ট করবে, স্বভাব-চরিত্র ধ্বংস করবে এবং মনের ভেতর থেকে ভালো ও কল্যাণমূলক কাজের প্রবণতা দূর করে দেবে।
- এমন স্বভাবসমূহকে তাদের নিকট প্রিয় করে তুলতে হবে, যেগুলো তাদের অন্তরে ভালো ও কল্যাণমূলক কাজের প্রবণতা বৃদ্ধি করবে এবং হক ও সত্যের প্রতি আগ্রহবোধ ও জজবা বাড়িয়ে দেবে। তাদের মাঝে উত্তম রুচিবোধ সৃষ্টি করবে। এমন কোনো অভ্যাস বা স্বভাব তাদের প্রিয় হতে দেবেন না, যা তাদের মাঝে খারাপ ও মন্দ কাজের প্রেরণা জোগাবে, ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হতে প্রলুব্ধ করবে এবং তাদের অন্তরে কুরুচিপূর্ণ ভাবনা সৃষ্টি করবে।
- সন্তানরা যেন এমন ছেলেদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে, যারা তাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে, জাহান্নামে নয়। হক ও সত্যের পথে পরিচালিত করবে, বাতিল ও ভ্রান্তির পথে নয়। হিদায়াত, সফলতা, উন্নতি ও পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারের দিকে পথনির্দেশ করবে, গোমরাহি, ব্যর্থতা, অধঃপতন ও পিতা-মাতার অবাধ্যতার প্রতি নয়। প্রবাদ আছে, ‘সঙ্গদোষে স্বভাব

নষ্ট।' পিতা-মাতার অবহেলার সুযোগ নিয়ে, খারাপ লোকের সাথে বন্ধুত্ব করার কারণে কত মানুষ যে পাপের পথে পা বাড়িয়েছে, কত মানুষ ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিপতিত হয়েছে, তার নজির মানব-ইতিহাসে খুব একটা কম নয়।

দার্শনিক কবি আদি বিন জাইদ আল-ইবাদি সত্যই বলেছেন :

إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم * ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه * فكل قرين بالمقارن يقتدي

‘কোনো জাতির মাঝে থাকতে হলে তুমি তাদের ভালো মানুষদের সংশ্রবে থাকবে, বাজে লোকদের নয়; অন্যথায় তুমিও তাদের মতো নষ্ট হয়ে যাবে।

কারও ব্যাপারে জানতে হলে ব্যক্তিকে নয়; বরং আগে যাচাই করে দেখো, তার বন্ধুবান্ধব কেমন। কারণ, বন্ধু (সাধারণত) তার বন্ধুকেই অনুসরণ করে।’

এভাবে প্রকৃত মুসলমান পিতাকে সন্তানদের লালনপালনের ক্ষেত্রে তাদের বইপুস্তক, ম্যাগাজিন, বন্ধু, প্রিয় প্রসঙ্গসমূহ, স্কুল-মাদরাসা, শিক্ষক-শিক্ষিকা, সহপাঠী, প্রচারমাধ্যম ইত্যাদি বিষয়—যেগুলো সাধারণত সন্তানদের ব্যক্তিত্ব, আমল, আখলাক, মানসিকতা, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাধারা ও আকিদায় প্রভাব ফেলে থাকে—সেসবের ওপর সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কেননা, এসব বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি না রাখলে সন্তানদের আমলি তারবিয়াত ব্যাহত হবে এবং তাদের ভেতর বিভিন্ন চারিত্রিক ব্যাধি বাসা বেঁধে ফেলবে।

আমরা দেখি, অনেক পরিবার সন্তানদের সুষ্ঠু লালনপালন ও তাদের নেক সন্তান হিসাবে গড়ে তুলতে শতভাগ সফল, আবার অনেক পরিবার এ ক্ষেত্রে চরমভাবে ব্যর্থ। এর পেছনের রহস্য হলো, যেসব পরিবার সন্তানদের লালনপালনের দায়িত্ব সুচারুরূপে আনজাম দিয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা অনুসরণ করেছে, সেসব পরিবারের সন্তানেরা পরিবার, সমাজ ও জাতির জন্য কল্যাণের কারণ হয়েছে। পক্ষান্তরে যেসব পরিবার সন্তান লালনপালনের দায়িত্ব

ভালোভাবে আঞ্জাম দেয়নি এবং এ সম্পর্কিত ইসলামের আদেশ-নিষেধ মেনে চলেনি, সেসব পরিবারের সন্তানেরা পরিবার, সমাজ ও জাতির জন্য আপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তারা জীবিত থাকতেও সবার জন্য আপদ হয়ে থাকে। মৃত্যুর পরেও এদের অনিষ্ট থেকে মানুষ রেহাই পায় না।

এ ধরনের সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ
فَاخْذَرُوهُمْ

‘হে মুমিনগণ, তোমাদের কোনো কোনো স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি তোমাদের দুশমন। অতএব, তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকো।’^{২০৫}

আজ যদি এসব সন্তানের পিতা-মাতা ও অভিভাবক তাদের লালনপালনের ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা অনুসরণ করত, তাহলে এরা পিতা-মাতা ও অভিভাবকদের শত্রু হতো না।

সন্তানদের মাঝে সমতা বিধান করে

সন্তান লালনপালনে ইসলামের আরেকটি নীতি হলো, সকল সন্তানের মাঝে সমতা প্রতিষ্ঠা করা। কোনো বিষয়ে একজনকে আরেকজনের ওপর প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার না দেওয়া। কেননা, সন্তান যখন বুঝতে পারে, বাবা-মার কাছে সে ও তার অন্যান্য ভাইবোন একই সমান, তখন সুস্থ মানসিকতা নিয়ে সে বড় হয়। কোনো ধরনের হীনম্মন্যতাবোধ তার মাঝে থাকে না। ভাইবোনদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ, ঘৃণা ও প্রতিযোগিতার মনোভাব থাকে না; বরং সবার মাঝে সবার জন্য ভালোবাসা ও উদারতা থাকে। একে অপরকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মানসিকতা তৈরি হয়। এজন্য ইসলাম এ বিষয়টির প্রতি খুব গুরুত্ব দিয়েছে।

ইমাম বুখারি ও মুসলিম ۞ নুমান বিন বাশির ۞ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন :

২০৫. সূরা আত-তাগাবুন : ১৪

আমার পিতা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে বললেন, আমার এ ছেলেকে আমার একটি গোলাম উপহার দিয়েছি। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার অন্য সন্তানদেরও কি এর মতো উপহার দিয়েছ? তিনি বললেন, না। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে তা ফিরিয়ে নাও।’

অপর রিওয়াযাতে এসেছে :

‘তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার সকল সন্তানের জন্যই কি এমন করেছ? তিনি বললেন, না। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, আল্লাহকে ভয় করো এবং তোমার সন্তানদের মাঝে ন্যায়বিচার করো। তখন আমার পিতা এসে উপহারটি ফিরিয়ে নিলেন।’

অপর এক বর্ণনায় এসেছে :

‘রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে বাশির, এ ব্যতীত তোমার আর কোনো সন্তান আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে। তিনি বললেন, এর মতো কি সবাইকে দান করেছ? তিনি বললেন, না। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে আমাকে (তোমার এ কাজের) সাক্ষী বানায়ো না। কেননা, আমি জুলুমের সাক্ষী হই না। তারপর বললেন, তুমি কি এটা পছন্দ করো যে, তোমার প্রত্যেক সন্তান তোমার সাথে সমানভাবে সদ্যবহার করবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে উপহার দেওয়ার ক্ষেত্রেও তাদের মাঝে সমতা বিধান করো।’^{২০৬}

প্রকৃত মুসলমান তার সন্তানদের মাঝে ন্যায়বিচার ও সমতা প্রতিষ্ঠা করে। উপহার, ভরণপোষণ ও আচরণের ক্ষেত্রে একজনকে আরেকজনের ওপর প্রাধান্য দেয় না। ফলে তাদের প্রত্যেকেই তার জন্য দুআ করে, প্রত্যেকের অন্তরে তার জন্য মহব্বত থাকে, প্রত্যেক সন্তান তাকে সম্মান করে এবং তার সাথে সদ্যবহার করে।

সন্তানদের উন্নত আখলাক-চরিত্র শিক্ষা দেয়

সন্তানদের আদর্শ সন্তান হিসাবে গড়ে তুলতে হলে তাদের অন্তরে উত্তম আখলাক-চরিত্রের বীজ বপন করতে হয়। এজন্য প্রকৃত মুসলমান তার

সন্তানদের উন্নত ও উত্তম আখলাক-চরিত্র শিক্ষাদান করে। মানুষকে ভালোবাসা, দুর্বলদের সহায় হওয়া, আত্মীয়তার সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা, বড়দের সম্মান করা, ছোটদের স্নেহ করা, ভালো কাজ করার উৎসাহ বোধ করা, মানুষের মাঝে ন্যায় প্রতিষ্ঠার আশ্রয় করা ইত্যাদি যত উন্নত ও উত্তম গুণাবলি রয়েছে—সব তাদের শেখায়। কেননা, যেসব হৃদয় এ গুণাবলি দ্বারা সিক্ত নয়, সেসব হৃদয় থেকে কল্যাণের আশা করা যায় না। কারণ, যার ভেতর যা আছে, তা-ই তো বের হবে! তাই পিতা-মাতা যদি সন্তানদের থেকে কল্যাণের প্রত্যাশা রাখেন, তাহলে তাদের ভেতর উত্তম গুণাবলি ও আখলাক-চরিত্রের চারা রোপণ করতে হবে। এজন্যই বলি, যারা নিম্নোল্লিখিত কথাটি বলেছেন, তারা সত্যিই বলেছেন—

الصَّلَاحُ مِنَ اللَّهِ، وَالْأَدَبُ مِنَ الْآبَاءِ

‘সৎপথে চলার প্রবণতা আল্লাহর দান, আর আদব-শিষ্টাচার পিতাদের দান।’^{২০৭}

প্রকৃত মুসলমান ইসলামের তারবিয়াত-পদ্ধতি অনুসরণ করে সন্তানদের সুষ্ঠুভাবে লালনপালন করে। এর জন্য প্রথমে সে নিজের ঘরকে সন্তানদের বেড়ে ওঠার সুষ্ঠু পরিবেশ হিসাবে গড়ে তোলে। সে পরিবেশে সন্তানদের জন্য থাকে উত্তম ব্যবহার, স্নেহ-ভালোবাসা, মায়া-মমতা, সকল সন্তানের মাঝে সমতা, যত্নের উষ্ণ পরশ, দুর্বলতামুক্ত নম্রতা ও কঠোরতামুক্ত শাসন। যখন সন্তানেরা এমন পরিবেশে বেড়ে ওঠে, তখন তারা ছোট থাকতেই ইসলামের উত্তম আখলাক ও গুণগুলো অর্জন করে নেয়। তারা হয়ে ওঠে নেককার, পিতা-মাতার অনুগত ও প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী। ভবিষ্যতের যেকোনো কঠিন দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা তাদের মাঝে এসে যায়। এভাবে প্রত্যেক এমন পরিবার, যা ইসলামের নির্দেশনা ও কুরআনি শিষ্টাচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত, সে পরিবারের সন্তানেরা শুরু থেকেই উত্তম আখলাক-চরিত্র নিয়ে বড় হয়।

পবিত্র কুরআনে যথার্থই বলা হয়েছে :

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً

‘আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করেছি। আল্লাহর রঙের চেয়ে উত্তম রং আর কার হতে পারে?’^{২০৮}



২০৮. সূরা আল-বাকারাহ : ১৩৮

আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মুসলমানের সম্পর্ক

আত্মীয়তা-সম্পর্ক কী?

প্রকৃত মুসলমানের সদ্যবহার শুধু পিতা-মাতা ও স্ত্রী-সন্তানদের সাথেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং অন্য সব আত্মীয়-স্বজনের সাথেও সে সদ্যবহার করে। তাদের সাথে ভদ্রজনোচিত আচরণ করে এবং সুসম্পর্ক রাখে। বংশগত দিক থেকে সম্পর্কিত লোকদের আত্মীয়-স্বজন বলে; চাই তাদের সাথে উত্তরাধিকারের সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক।

ইসলামে আত্মীয়তা-সম্পর্কের গুরুত্ব

আত্মীয়তা-সম্পর্কের প্রতি যতটুকু গুরুত্ব ইসলামে দেওয়া হয়েছে, অন্য কোনো ধর্ম বা জীবনব্যবস্থায় ততটুকু দেওয়া হয়নি। ইসলাম এ সম্পর্ক রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছে এবং সম্পর্কচ্ছেদ করার ব্যাপারে শাস্তির হুমকি দিয়েছে। এ সম্পর্কের প্রতি ইসলাম কতটা গুরুত্ব দিয়েছে, তা সৃষ্টির সূচনাকালের একটি ঘটনা থেকে বুঝা যায়। আল্লাহ তাআলা যখন তাঁর সৃষ্টিকর্ম শেষ করলেন, তখন আত্মীয়তা-সম্পর্ক সেখানে দাঁড়িয়ে তাকে ছিন্ন করার ব্যাপারে অভিযোগ করল। তখন আল্লাহ তাআলা এ বলে আশ্বস্ত করলেন যে, তাকে যে রক্ষা করবে, তার সাথে আল্লাহর সুসম্পর্ক থাকবে এবং তাকে যে ছিন্ন করবে, আল্লাহ তাআলা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। ঘটনাটি আবু হুরাইরা রা থেকে বর্ণিত একটি সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ স ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخُلُقَ حَتَّى إِذَا فَرَّغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ، فَقَالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ مِنَ الْقَطِيعَةِ، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكَ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكَ؟ قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: فَذَاكَ لَكَ «ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَءُوا إِن شِئْتُمْ: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطَعُوا أَرْحَامَكُمْ، أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ، أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا}

‘আল্লাহ তাআলা যখন তাঁর সৃষ্টিকর্ম সমাপ্ত করলেন, তখন আত্মীয়তা-সম্পর্ক দাঁড়িয়ে বলল, আমাকে ছিন্ন করার ব্যাপারে আমার অভিযোগ আছে। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, হ্যাঁ, অভিযোগ ঠিক আছে। তবে তুমি কি এতে সম্মুখ নও যে, তোমাকে যারা রক্ষা করবে, তাদের সাথে আমার সুসম্পর্ক থাকবে; আর তোমাকে যারা ছিন্ন করবে, তাদের সাথে আমি সম্পর্ক ছিন্ন করব? সে বলল, অবশ্যই (তাতে আমি সম্মুখ)। আল্লাহ তাআলা বললেন, তাহলে এটাই তোমার জন্য থাকল। এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা চাইলে এ আয়াতটি পড়তে পারো, “ক্ষমতা লাভ করলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। এদের প্রতিই আল্লাহ অভিসম্পাত করেন, অতঃপর তাদের বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন। তারা কি কুরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না, না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?”^{২০৯}

পবিত্র কুরআনের আরও অনেক আয়াতে আত্মীয়তা-সম্পর্কের গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সম্পর্কের এ বন্ধনকে রক্ষা করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ

‘আর আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচনা করে থাকো এবং আত্মীয় জ্ঞাতীদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো।’^{২১০}

এ আয়াতে তাকওয়া অবলম্বনের পরপরই আত্মীয়তা-সম্পর্ক বিষয়ে সতর্ক থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহর পক্ষ থেকে আত্মীয়তা-সম্পর্কের প্রতি এটা বিশাল গুরুত্বপ্রদান।

২০৯. সহিহ মুসলিম : ২৫৫৪

২১০. সূরা আন-নিসা : ১

প্রকৃত মুসলমানের অন্তরে আত্মীয়তা-সম্পর্কের গুরুত্বের অনুভব সৃষ্টি হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, অনেক আয়াতে ইমান ও পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহারের পর আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করার ব্যাপারে নির্দেশ এসেছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

‘তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত কোরো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার করো।’^{২১১}

তারপর কিছুদূর গিয়েই তিনি বললেন :

وَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

‘আত্মীয়-স্বজনকে তার হক দান করো এবং অভাবগ্রস্ত ও মুসাফিরকেও। আর কিছুতেই অপব্যয় কোরো না।’^{২১২}

অন্য আয়াতে তিনি বলেন :

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنُبِ وَابْنَ السَّبِيلِ...

‘আর উপাসনা করো আল্লাহর, শরিক কোরো না তাঁর সাথে অপর কাউকে। পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার করো এবং নিকটাত্মীয়, এতিম-মিসকিন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফিরের প্রতিও।’^{২১৩}

আয়াতসমূহ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সদ্যবহার করার ক্ষেত্রে পিতা-মাতার পরেই আত্মীয়-স্বজনদের অবস্থান। তারপর অন্যান্য মানবিক সম্পর্কগুলো

২১১. সূরা বনি ইসরাইল : ২৩

২১২. সূরা বনি ইসরাইল : ২৬

২১৩. সূরা আন-নিসা : ৩৬

আসে। ইসলামের এ বিধান মানুষের স্বভাবের অনুকূলে। কেননা, মানুষ প্রথমে পরিবারের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়, তারপর আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি, তারপর অন্যান্য মানুষের প্রতি।

আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করা ইসলামের একদম প্রাথমিক সময়ের অন্যতম মূলনীতি। রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন থেকেই ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু করেছেন, তখন থেকেই এ বিষয়ের প্রতি লোকদের দাওয়াত দিয়েছেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় আবু সুফইয়ান ؓ-এর কথা থেকে, যা তিনি হিরাক্লিয়াসকে বলেছিলেন। যখন হিরাক্লিয়াস তাকে প্রশ্ন করেছিল, আপনাদের নবি আপনাদের কীসের নির্দেশ দেন? তিনি উত্তরে বলেছিলেন, তিনি নির্দেশ দেন, একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করো; তাঁর সাথে শিরক করো না; পূর্বপুরুষদের (ভ্রাত্ত) কথা পরিত্যাগ করো—এসব কথা বলেন। আর আমাদের নামাজের নির্দেশ দেন এবং সত্যবাদিতা, নিষ্কলুষতা ও আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করার নির্দেশ দেন।^{২১৪}

এখান থেকে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করা ইসলামের প্রাথমিক মূলনীতিসমূহ, যেমন : আল্লাহর একত্ববাদ, নামাজ কায়েম করা, সত্যবাদিতা ও নিষ্কলুষতা অবলম্বন ইত্যাদির অন্যতম। এজন্য এ কথা বলাই যায়, ইসলামধর্মে আত্মীয়তা-সম্পর্কের আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

ইসলামের প্রাথমিক মূলনীতিগুলো কী ছিল, এ প্রসঙ্গে আমরা বিন আমবাসা ؓ-এর একটি দীর্ঘ হাদিস রয়েছে। সেখানে তিনি বলেন :

دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا نَبِيٌّ، فَقُلْتُ: وَمَا نَبِيٌّ؟ قَالَ: أُرْسَلَنِي اللَّهُ، فَقُلْتُ: وَبِأَيِّ شَيْءٍ أُرْسَلَكَ، قَالَ: أُرْسَلَنِي بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ، وَكُسْرِ الْأَوْثَانِ، وَأَنْ يُوحَّدَ اللَّهُ لَا يُشْرَكَ بِهِ شَيْءٌ...

‘আমি (নবুয়তের প্রথম যুগে) মক্কায় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলাম। তাঁকে বললাম, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি নবি, আমাকে আল্লাহ তাআলা প্রেরণ করেছেন। আমি বললাম, কী কী

বিষয় দিয়ে আপনাকে প্রেরণ করা হয়েছে? তিনি বললেন, আমাকে আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করা, মূর্তি ভেঙে ফেলা, আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা ও শিরক বিলুপ্ত করা—এসব বিষয় নিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।^{২১৫}

এখানে রাসুলুল্লাহ ﷺ সংক্ষেপে দ্বীনের মূলনীতির বিবরণ দেওয়ার সময় আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করাকে প্রথমে উল্লেখ করেছেন। এখান থেকেও বুঝা যায়, আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করা ইসলাম ধর্মে কী পরিমাণ গুরুত্ব রাখে!

এজন্য একাধিক হাদিসে রাসুলুল্লাহ ﷺ আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং তা ছিন্ন করার ব্যাপারে শাস্তির হুমকি দিয়েছেন। এ সম্পর্কিত কয়েকটি হাদিস এখানে উল্লেখ করা হলো :

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ، ... فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ
الرَّحِمَ...

‘আবু আইয়ুব আনসারি থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসুল ﷺ, আমাকে এমন একটি আমল বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি বললেন, আল্লাহর ইবাদত করবে, তার সাথে কাউকে শরিক করবে না, নামাজ কায়েম করবে, জাকাত আদায় করবে এবং আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করবে।^{২১৬}

এ হাদিসে আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করাকে আল্লাহর ইবাদত, তাওহিদ, নামাজ ও জাকাতের মতো ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধানের সাথে মেলানো হয়েছে। প্রমাণ হলো যে, এটা এমন একটি নেক আমল, যা ব্যক্তির জান্নাতলাভের অসিলা ও জাহান্নাম থেকে মুক্তির কারণ হতে পারে।

২১৫. সহিহ মুসলিম : ৮৩২

২১৬. সহিহল বুখারি : ১৩৯৬, ৫৯৮৩; সহিহ মুসলিম : ১৩

আনাস ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، فَلْيَصِلْ رَحْمَةً

‘যে ব্যক্তি রিজিকের প্রশস্ততা ও আয়ু বৃদ্ধি হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে, সে যেন আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করে।’^{২১৭}

এ হাদিস থেকে বুঝা গেল, আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করলে রিজিক ও বয়সে বরকত হয়।

ইবনে উমর ؓ বলতেন :

مَنْ اتَّقَى رَبَّهُ، وَوَصَلَ رَحْمَةً، نُسِيَ فِي أَجَلِهِ، وَثَرَى مَالُهُ، وَأَحَبَّهُ أَهْلُهُ

‘যে ব্যক্তি তার রবকে ভয় করে এবং আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করে, তার মৃত্যু বিলম্ব করা হয় (তার বয়স বৃদ্ধি পায়); তার ধন-সম্পদ বেড়ে যায় এবং তার পরিবার-পরিজন তাকে খুব ভালোবাসে।’^{২১৮}

যেভাবে আমরা দেখতে পেলাম, আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করার ফলে মানুষের রিজিক ও বয়সে বরকত হয় এবং সর্বোপরি দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ তাআলার রহমত অর্জিত হয়। একইভাবে ইসলামের অসংখ্য নুসুসে (আয়াত ও হাদিসে) আত্মীয়তা-সম্পর্ক ছিন্ন করার শাস্তিও আমরা দেখতে পাই যে, এর কারণে আল্লাহ তাআলা ক্রোধান্বিত হন এবং লোকজনও ক্রোধান্বিত হয় এবং আখিরাতে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

আত্মীয়তা-সম্পর্ক ছিন্নকারীর বিপদ, বঞ্চনা ও দুর্ভাগ্যের জন্য নিম্নোল্লিখিত একটি হাদিসই যথেষ্ট, যেখানে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ

‘আত্মীয়তা-সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।’^{২১৯}

২১৭. সহিহুল বুখারি : ২০৬৭, ৫৯৮৫; সহিহ মুসলিম : ২৫৫৭

২১৮. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৫৮

২১৯. সহিহুল বুখারি : ৫৯৮৪, সহিহ মুসলিম : ২৫৫৬

এ ছাড়াও অপর এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, এমন জাতির ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হয় না, যাদের মাঝে আত্মীয়তা-সম্পর্ক ছিন্নকারী লোক থাকে। হাদিসটি ইমাম বাইহাকি ৷ তার শুআবুল ইমান গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।

হাদিসটির ভাষ্য নিম্নরূপ :

لَا تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعٌ رَحِيمٍ

‘আল্লাহর রহমত এমন সম্প্রদায়ের ওপর বর্ষিত হয় না, যাদের মাঝে আত্মীয়তা-সম্পর্ক ছিন্নকারী থাকে।’^{২২০}

এজন্যই আবু হুরাইরা ৷ আত্মীয়তা-সম্পর্ক ছিন্নকারী কোনো ব্যক্তি আছে, এমন কোনো মজলিসে দুআ করতে চাইতেন না। কারণ, এমন মজলিসের ওপর আল্লাহর রহমত নাজিল হয় না বিধায় এখানে দুআ করাটাই বৃথা। একবার জুমার রাতে একটি মজলিসে তিনি বললেন :

أُحْرِجْ عَلَى كُلِّ قَاطِعٍ رَحِيمٌ لِمَا قَامَ مِنْ عِنْدِنَا، فَلَمْ يَقُمْ أَحَدٌ حَتَّى قَالَ ثَلَاثًا، فَأَتَى فَتَى عَمَّةٍ لَهُ قَدْ صَرَمَهَا مِنْذُ سَنَتَيْنِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ لَهُ: يَا ابْنَ أَخِي، مَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا، قَالَتْ: ارْجِعْ إِلَيْهِ فَسَلْهُ: لِمَ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ تُعْرَضُ عَلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَشِيَّةَ كُلِّ خَمِيسٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَلَا يَقْبَلُ عَمَلٌ قَاطِعٌ رَحِيمٍ»

‘আত্মীয়তা-সম্পর্ক ছিন্নকারীকে আমি ভালোবাসি না। এমন কেউ থাকলে সে যেন এখান থেকে চলে যায়। কেউ মজলিস থেকে উঠল না। তিনি কথাটি আরও দুবার বললেন। তারপর এক যুবক তার ফুফুর কাছে গেল, যার সাথে তার দুবছরের বেশি সময় ধরে সম্পর্ক ছিন্ন ছিল। ফুফু জিজ্ঞেস করলেন, ভাতিজা, এতদিন পর হঠাৎ কী মনে করে? যুবক বলল, আমি আবু হুরাইরা ৷-কে এরূপ বলতে শুনলাম। ফুফু বললেন, তাঁর নিকট আবার যাও, গিয়ে জিজ্ঞেস

করো, কেন তিনি এমন কথা বললেন? এ প্রশ্নের উত্তরে আবু হুরাইরা  বললেন, আমি নবিজি -কে বলতে শুনেছি, আদম-সন্তানের আমলসমূহ আল্লাহর সমীপে প্রতি বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে পেশ করা হয়, তখন আত্মীয়তা-সম্পর্ক ছিন্নকারী কোনো ব্যক্তির আমল কবুল করা হয় না।’^{২২১}

এ হাদিসগুলো প্রকৃত মুসলমানের হৃদয়কে শক্তভাবে নাড়া দেয়। তাই সে যখন দেখতে পায়, আত্মীয়তা-সম্পর্ক ছিন্ন করার ফলে বান্দা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়, তার দুআ কবুল হয় না এবং আমল বিনষ্ট হয়ে যায়, তখন আত্মীয়তা-সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা সে ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারে না। কারণ, এর চেয়ে বড় বিপদ আর কী হতে পারে যে, বান্দা দুআ করে, কিন্তু তার দুআ কবুল হয় না; আমল করে, কিন্তু আমলনামায় তা লেখা হয় না; আল্লাহর রহমতের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু রহমত তার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে থাকে!

আত্মীয়তা-সম্পর্ক ছিন্ন করা এমন এক গুনাহ, যা প্রকৃত মুসলমান থেকে কখনো সংঘটিত হতে পারে না। কারণ, এ গুনাহর কারণে আল্লাহর শাস্তি খুব দ্রুতই এসে পড়ে। অনেক সময় আখিরাতের পূর্বেই দুনিয়াতে এ গুনাহের শাস্তি ভোগ করতে হয়।

এ সম্পর্কে হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে :

مَا مِنْ ذَنْبٍ أُخْرِى أَنْ يُعَجَّلَ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، مِنْ قَطِيعَةِ الرَّجْمِ وَالْبَغْيِ

‘আত্মীয়তা-সম্পর্ক ছিন্ন করা ও (ইসলামি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে) বিদ্রোহের মতো দুনিয়াতেই তড়িৎ শাস্তির উপযুক্ত আর কোনো গুনাহ নেই। পরকালে তার জন্য যে শাস্তি জমা করে রাখা হয়েছে, তা তো আছেই।’^{২২২}

২২১. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৬১

২২২. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৬৭, শুআবুল ইমান : ৭৫৮৮

এ হাদিসে আত্মীয়তা-সম্পর্ক ছিন্ন করাকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, রাষ্ট্রদ্রোহিতার মতো আত্মীয়তা-সম্পর্ক ছিন্ন করাও এক প্রকার জুলুম। আসলেই তো জুলুম! ভালোবাসার বন্ধন ভেঙে ফেলা ও হৃদয়তার প্রবহমান নদী শুকিয়ে ফেলা জুলুম নয় তো কী।

আত্মীয়তা-সম্পর্ক ছিন্ন করা যে একটা জুলুম, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কথা থেকে সেটা প্রমাণিত হয়।

তিনি বলেন :

إِنَّ الرَّحِمَ شُجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، تَقُولُ: يَا رَبِّ، إِنِّي ظَلِمْتُ، يَا رَبِّ، إِنِّي قُطِعْتُ، يَا رَبِّ، إِنِّي إِنِّي، يَا رَبِّ، يَا رَبِّ. فَيُجِيبُهَا: أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكَ، وَأَصِلَ مَنْ وَصَلَكَ؟

‘আত্মীয়তা-সম্পর্কের সাথে করুণাময়ের বিশেষ একটা সম্পর্ক আছে। সে যখন বলল, হে আমার রব, আমার প্রতি জুলুম করা হয়েছে। হে আমার রব, আমাকে ছিন্ন করা হয়েছে। হে আমার রব, আমাকে, হে আমার রব, আমাকে... তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও, যে তোমাকে ছিন্ন করবে, আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব; আর যে তোমাকে রক্ষা করবে, আমি তার সাথে সুসম্পর্ক রাখব?’^{২২৩}

আল্লাহ তাআলা আত্মীয়তা-সম্পর্ককে আরও একটি উপায়ে সম্মানিত করেছেন। তা হলো, তিনি তার নাম রেখেছেন নিজের নামের মূলধাতু থেকে। অর্থাৎ আরবি ভাষায় আত্মীয়তা-সম্পর্কের প্রতিশব্দ হলো, الرَّحِمُ। আর আল্লাহ তাআলার বিশেষ একটি নাম হলো, الرَّحْمَنُ (পরম করুণাময়)।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন :

أَنَا الرَّحْمَنُ، وَأَنَا خَلَقْتُ الرَّحِمَ، وَاشْتَقَّقْتُ لَهَا مِنْ اسْمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَّيْتُ

‘আমি রহমান (পরম করুণাময়)। আর আমি ‘রাহিম’ বা আত্মীয়তা-সম্পর্ক সৃষ্টি করেছি এবং তার নাম রেখেছি নিজের নামের মূলধাতু থেকে। সুতরাং যে তাকে রক্ষা করবে, আমি তার সাথে সুসম্পর্ক রাখব; আর যে তাকে ছিন্ন করবে, আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করব।’^{২২৪}

এ হাদিসে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত পাওয়া গেল যে, মুসলমান যতক্ষণ আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করে চলবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রহম বা করুণার ছায়া তার মাথার ওপর থাকবে। কিন্তু যখনই তা ছিন্ন করবে, তখনই আল্লাহর রহমত ও করুণা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।

মুসলমান ইসলামের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করে

প্রকৃত মুসলমান আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করে চলে। দুনিয়ার ব্যস্ততা, ধন-সম্পদ ও স্ত্রী-সন্তান আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করা থেকে তাকে বিরত রাখে না। প্রত্যেক আত্মীয়ের সাথে গুরুত্ব ও নৈকট্য বিবেচনায় যথাযথভাবে সুসম্পর্ক রাখে এবং সদ্যবহার করে। এ ক্ষেত্রে প্রথম মায়ের সাথে, তারপর পিতার সাথে, তারপর এদের পরে সবচেয়ে নিকটাত্মীয়ের সাথে, তারপর এর পরের নিকটাত্মীয়ের সাথে... এভাবে সবার সাথে সুসম্পর্ক রাখে।

এ সম্পর্কে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে :

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ قَالَ: أُمُّكَ،
ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أُمُّكَ، ثُمَّ أَبُوكَ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ

‘এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমার সদাচারের বেশি হকদার কে? উত্তরে তিনি বললেন, তোমার মা, তোমার মা, তোমার মা, তারপর তোমার পিতা, তাদের পরে ক্রমপর্যায়ে তোমার নিকটাত্মীয়রা।’^{২২৫}

২২৪. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৫৩

২২৫. সহিহ মুসলিম : ২৫৪৮

আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি অনুগ্রহ করলে দ্বিগুণ সাওয়াব হয়। একটি আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করার সাওয়াব, আরেকটি সদকার সাওয়াব। তাই আত্মীয়-স্বজন যদি গরিব হয়, তাহলে দান-সদকার ক্ষেত্রে তাদের প্রাধান্য দেওয়া উত্তম। কারণ এতে দ্বিগুণ সাওয়াব হওয়ার পাশাপাশি আত্মীয়-স্বজনদের ভালোবাসাও অর্জিত হয়। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ؓ-এর স্ত্রী জাইনাব সাকাফিয়া ؓ থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এ বিষয়টির প্রতি উৎসাহিত করেছেন।

হাদিসটি নিম্নরূপ :

عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَصَدَّقْنَ، يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ» قَالَتْ: فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ: إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ، فَأَتَيْهِ فَاسْأَلْهُ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَجْزِي عَنِّي وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ، قَالَتْ: فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ: بَلِ اثْنِيهِ أَنْتِ، قَالَتْ: فَانْطَلَقْتُ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِيَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتِي حَاجَتُهَا، قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُلْقِيَ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ، قَالَتْ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهُ: ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبِرْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلَانِكَ: أَتُجْزَى الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا، عَلَى أَزْوَاجِهِمَا، وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا؟ وَلَا تُخْبِرُهُ مَنْ نَحْنُ، قَالَتْ: فَدَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ هُمَا؟» فَقَالَ: امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّ الزَّيَانِبِ؟» قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَهُمَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ

‘রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে মহিলা সম্প্রদায়, তোমরা সদকা করো, যদিও তা তোমাদের গয়না-অলংকার থেকে হোক। জাইনাব ﷺ বলেন, তখন আমি আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ-এর নিকট গিয়ে বললাম, আপনি তো দরিদ্র লোক, এদিকে রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের সদকা করার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর কাছে গিয়ে জেনে আসুন, আপনাকে সদকা করলে তা আদায় হবে কি না? না হলে অন্য কাউকে দিতে হবে আরকি! আব্দুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি গেলেই বরং ভালো হবে। তখন আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলাম। সেখানে এক আনসারি মহিলাকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। আমাদের উভয়ের প্রয়োজন ছিল অভিন্ন। এদিকে আমাদের মনে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ভয় কাজ করছিল বিধায় সরাসরি তাঁর নিকট যেতে পারছিলাম না। তখনই বিলাল ﷺ আমাদের দিকে বেরিয়ে এলেন। আমরা তাকে বললাম, ভাই, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গিয়ে একটু বলুন, দুজন মহিলা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে এবং তারা জানতে চায়, যদি তাদের স্বামী ও তাদের তত্ত্বাবধানে থাকা এতিম শিশুদের সদকা করে, তাহলে আদায় হবে কি না? বিলাল ﷺ রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে তা বললেন। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, ওরা কারা? বিলাল ﷺ বললেন, জনৈক আনসারি মহিলা আর জাইনাব। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, জাইনাব তো অনেক আছে, তুমি কোন জাইনাবের কথা বলছ? তিনি বললেন, আব্দুল্লাহ ﷺ-এর স্ত্রী। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, (স্বামী ও নিজেদের তত্ত্বাবধানে থাকা এতিম শিশুদের সদকা করলে) তারা দ্বিগুণ সাওয়াব পাবে। একে তো আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করার সাওয়াব, দ্বিতীয়ত সদকার সাওয়াব।’^{২২৬}

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ

‘মিসকিনকে সদকা করলে এক সদকার সাওয়াব। আর আত্মীয়কে দান করলে দুই সদকার সাওয়াব। প্রথমত, সদকার সাওয়াব; দ্বিতীয়ত, আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করার সাওয়াব।’^{২২৭}

রাসুলুল্লাহ ﷺ সময় ও সুযোগ পেলেই সাহাবিগণকে আত্মীয়দের প্রতি অনুগ্রহ করার তাগিদ দিতেন।

নিম্নোল্লিখিত হাদিস থেকে সেটার প্রমাণ পাওয়া যায় :

فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: ৯২] قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: ৯২] وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءٌ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، أَرْجُو بَرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَيْحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ» فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ

‘যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হলো, “কস্মিনকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে ব্যয় না করো। [সূরা আলি ইমরান : ৯২] তখন আবু তালহা ﷺ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহ বলছেন, “কস্মিনকালেও কল্যাণ লাভ করতে পারবে না, যদি তোমরা তোমাদের প্রিয় বস্তু থেকে ব্যয় না করো।” আর বাইরুহা বাগানটি আমার সবচেয়ে প্রিয়। এটি আমি আল্লাহর নামে সদকা করে দিলাম। আমি এর কল্যাণ কামনা করি এবং তা আল্লাহর নিকট আমার জন্য সঞ্চয়স্বরূপ থাকবে। কাজেই আপনি যাকে দান করা

ভালো মনে করেন, তাকে দান করুন। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, বাহ! এ সম্পদ অনেক লাভজনক, এ সম্পদ অনেক লাভজনক! তুমি যা বলেছ, তা আমি গুনলাম। আমার মতে এ বাগান তোমার আত্মীয়-স্বজনদের দিয়ে দেওয়া সবচেয়ে উত্তম হবে। তখন আবু তালহা ﷺ বললেন, তাই করব হে আল্লাহর রাসুল! অতঃপর আবু তালহা ﷺ বাগানটি তাঁর নিকটাত্মীয় ও চাচার বংশধরদের মাঝে বণ্টন করে দিলেন।^{২২৮}

রাসুলুল্লাহ ﷺ অনেক দূরসম্পর্কের আত্মীয়দের সাথেও সুসম্পর্ক রাখার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। এ সম্পর্কিত একটি হাদিস সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ وَهِيَ أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا الْقَيْرَاطُ، فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا أَوْ قَالَ ذِمَّةً وَصِهْرًا

‘অচিরেই তোমরা মিশর বিজয় করবে। সেখানে কিরাতের প্রচলন রয়েছে। তোমরা যখন সে দেশ জয় করবে, তখন তার অধিবাসীদের সাথে সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার করবে। কেননা, তারা একদিকে তোমাদের করায়ত্তে চলে আসবে, অপরদিকে তাদের সাথে তোমাদের আত্মীয়তার সম্পর্কও আছে। অথবা বলেছেন, তারা একদিকে তোমাদের করায়ত্তে চলে আসবে, অপরদিকে তাদের সাথে বৈবাহিক সূত্রে তোমাদের আত্মীয়তা আছে।’^{২২৯}

এ হাদিসের ব্যাখ্যায় উলামায়ে কিরাম বলেন, মিশরীয়দের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক হলো, হাজিরা ﷺ ও ইসমাইল ﷺ তাদের জাতি থেকে ছিলেন। আর বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তা হলো, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ছেলে ইবরাহিম ﷺ-এর মাতা মারিয়া ﷺ ছিলেন তাদেরই বংশের মেয়ে।

আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করার প্রতি ইসলামে কী পরিমাণ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে দেখুন। কত বছর, কত যুগ আগের আত্মীয়দের সাথেও সুসম্পর্ক

২২৮. সহিহ মুসলিম : ১৪৬১

২২৯. সহিহ মুসলিম : ২৫৪৩

রাখতে আদেশ করা হয়েছে! এজন্যই প্রকৃত মুসলমান তার কাছের ও দূরের সকল আত্মীয়ের সাথে সুসম্পর্ক রাখে এবং ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী তাদের হক ও অধিকার যথাযথভাবে আদায় করে দেয়।

অমুসলিম আত্মীয়দের সাথেও সুসম্পর্ক রাখে

ইসলাম উদারতা ও মানবতার ধর্ম। তাই ইসলাম মুসলিম আত্মীয়দের মতো অমুসলিম আত্মীয়দের সাথেও সুসম্পর্ক রক্ষা করার কথা বলে। যেমন : আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস ؓ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে উচ্চ আওয়াজে বলতে শুনেছি :

إِنَّ آلَ أَبِي فُلَانٍ لَّيْسُوا بِأَوْلِيَاءِي، إِنَّمَا وَلِيِّيَ اللَّهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ،
وَلَكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ سَأَبُلُّهَا بِبِلَاهَا

‘অমুক গোত্রের লোকেরা আমার বন্ধু নয়। আমার বন্ধু হলো আল্লাহ ও সৎকর্মশীল মুসলমানগণ। তবে তাদের সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। সুসম্পর্কের বারিধারা দিয়ে সেটাকে আমি জিইয়ে রাখি (অর্থাৎ তাদের সাথে আত্মীয়তা-সম্পর্ক যথাযথভাবে রক্ষা করে চলি)।’^{২৩০}

আবু হুরাইরা ؓ থেকে আরেকটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন :

لَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: ২১৬]،
دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا، فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ،
فَقَالَ: يَا بَنِي كَعْبٍ بَنِ لُؤَيٍّ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي مُرَّةَ
بَنِ كَعْبٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، أَنْقِذُوا
أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ،
يَا بَنِي هَاشِمٍ، أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ،

أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ، يَا فَاطِمَةُ، أَنْقِذِي نَفْسَكَ مِنَ النَّارِ، فَإِنِّي
لَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأُبَلِّغُهَا بِبِلَالِهَا

‘যখন এ আয়াত নাজিল হলো, “আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন।” (সূরা আশ-শুআরা : ২১৪) তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ কুরাইশের বিশেষ ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ লোক সবাইকে ডেকে একত্র করলেন। অতঃপর বললেন, হে আবদে শামসের বংশধর, হে কাব বিন লুয়াইর সন্তানেরা, জাহান্নাম থেকে নিজেদের বাঁচাও। হে মুররা বিন কাবের বংশধর, হে আবদে মানাফের উত্তরসূরিরা, জাহান্নাম থেকে নিজেদের রক্ষা করো। হে বনি হাশেম, জাহান্নাম থেকে বাঁচো। হে আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান-সন্ততিরা, জাহান্নাম থেকে নিজেদের রক্ষা করো। হে ফাতিমা, নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। কেননা, আল্লাহর দরবারে তোমাদের কোনো জিম্মাদারি নেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। অবশ্য তোমাদের সাথে যে আত্মীয়তা-সম্পর্ক রয়েছে, তা আমি সুসম্পর্কের প্রবাহ দ্বারা সিক্ত রাখব (অর্থাৎ তা আমি অবশ্যই অটুট রাখব)।’^{২৩১}

প্রকৃত মুসলমানের হৃদয় থেকে অনুগ্রহ ও করুণার স্রোতধারা কখনো বন্ধ হয় না; বরং এ স্রোতধারা অমুসলিম আত্মীয়-স্বজনকেও সিদ্ধিত করে। এজন্যই রাসুলুল্লাহ ﷺ উচ্চাঙ্গ ও আলংকারিক ভাষায় আত্মীয়তা-সম্পর্কের উদাহরণ দিয়েছেন। বলেছেন, ‘তবে তোমাদের সাথে আমার যে আত্মীয়তা-সম্পর্ক রয়েছে, সেটা সুসম্পর্কের স্রোতধারা দিয়ে সিক্ত রাখব।’ এখানে আত্মীয়তা-সম্পর্ককে তিনি একটি জমিনের সাথে তুলনা করেছেন, যেটাকে তিনি সুসম্পর্কের স্রোতধারা দিয়ে সিক্ত করবেন। ফলে বিচ্ছিন্নতা, শত্রুতা ও রক্ষতার আবর্জনা বিদূরিত হয়ে নির্মল ও পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠবে এ জমিন। এজন্যই সাহাবায়ে কিরাম ﷺ তাদের অমুসলিম আত্মীয়-স্বজনদের সাথে উত্তম আচরণ করতেন এবং তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতেন। যেমন উমর ﷺ-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ

থেকে হাদিয়া পাওয়া একসেট পোশাক তার এক মুশরিক বৈপিদ্রেয় ভাইকে দিয়ে দিয়েছিলেন।

ইতিপূর্বে আমরা অমুসলিম পিতা-মাতার প্রতি সদ্যবহার করতে ইসলামের নির্দেশ পড়ে এসেছি। এখানে অমুসলিম আত্মীয়দের সাথে সদ্যবহারের নির্দেশ দেখতে পেলাম। এটাই ইসলামের উদারতা, মানবিকতা ও উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বাস্তব প্রমাণ। এজন্যই তো রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বিশ্বজগতের জন্য রহমত নামে অভিহিত করা হয়েছে।

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

‘আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি।’^{২৩২}

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ

‘আমি সুন্দর চরিত্রাবলির পূর্ণতাদানের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছি।’^{২৩৩}

আত্মীয়তা-সম্পর্কের ব্যাপক অর্থ অনুধাবন করে

প্রকৃত মুসলমানের নিকট আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করা মানে কেবল তাদের কিছু টাকা-পয়সা দান করা নয়; বরং তার কাছে এ সম্পর্কের অর্থ আরও ব্যাপক। যেমন : তাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা, তাদের কল্যাণ কামনা করা, সাহায্য-সহযোগিতা করা, অগ্রাধিকার দেওয়া, ইনসাফ করা ও টাকা-পয়সার অভাব থাকলে দান করা। এ সবকিছুই আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করার অর্থের অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়াও রয়েছে, তাদের সাথে উত্তম ও সুন্দর ভাষায় কথা বলা, হাসিমুখে ও প্রশান্ত হৃদয়ে সাক্ষাৎ করা, ভুবনভোলানো মুচকি হাসি উপহার দেওয়া। এগুলো ছাড়াও আরও যেসব বিষয় পারম্পরিক ভালোবাসা, হৃদয়তা ও সৌহাদ্য-সম্প্রীতি সৃষ্টি করে, সেগুলোও আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা

২৩২. সূরা আল-আম্বিয়া : ১০৭

২৩৩. মুয়াত্তা মালিক : ৬৮৬/৩৩৫৭

করার ব্যাপকতার অন্তর্ভুক্ত। এজন্যই রাসুলুল্লাহ ﷺ খুব ব্যাপক বাক্য উচ্চারণ করে আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ইরশাদ করেছেন :

بُلُّوا أَرْحَامَكُمْ وَلَوْ بِالسَّلَامِ

‘আত্মীয়তা-সম্পর্ক সিক্ত রাখো; যদিও তা সালাম করার মাধ্যমে হোক।’^{২৩৪}

আত্মীয়-স্বজনরা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখে

প্রকৃত মুসলমান আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক রাখে। তারা তার সাথে সুসম্পর্ক না রাখলেও সে তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখে। কেননা, আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষা করা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম কার্যকর উপায় এবং ইসলামের অন্যতম মৌলিক গুণ। এ ছাড়াও হাদিস শরিফের ভাষ্য অনুযায়ী সে ব্যক্তিই প্রকৃত আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষাকারী, যে আত্মীয়দের পক্ষ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা সত্ত্বেও তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখে।

হাদিসটি নিম্নরূপ :

لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي، وَلَكِنَّ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحْمَةُ
وَصَلَّهَا

‘যে ব্যক্তি আত্মীয়দের পক্ষ থেকে সুসম্পর্ক রাখার বিনিময়ে তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখে, সে প্রকৃত আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষাকারী নয়; বরং সে ব্যক্তিই প্রকৃত আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষাকারী, যে আত্মীয়দের পক্ষ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা হলেও তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখে।’^{২৩৫}

রাসুলুল্লাহ ﷺ হাদিসে আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষাকারীর মাঝে ধৈর্য, সহনশীলতা, ক্ষমা ও উদারতা—এসব গুণের প্রশংসা করেছেন। আর এ গুণগুলো তার

২৩৪. শুআবুল ইমান : ৭৬০২

২৩৫. সহিহুল বুখারি : ৫৯৯১

মাঝে তখনই প্রতিফলিত হবে, যখন আত্মীয়-স্বজন তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে। তা ছাড়া আল্লাহ তাআলা ঘোষণা দিয়েছেন, তিনি আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষাকারীর সাথে সুসম্পর্ক রাখবেন। এ ঘোষণা সুসম্পর্কের বিনিময়ে সুসম্পর্ক রক্ষাকারীর বেলায় যতটুকু প্রযোজ্য, তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি প্রযোজ্য সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যে আত্মীয়-স্বজনের পক্ষ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করা সত্ত্বেও তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখে। এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ ﷺ আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষাকারীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পাপ ও আত্মীয়তা-সম্পর্ক ছিন্নকারীর সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারীর পুণ্যের বিবরণ দিয়েছেন।

হাদিসটি হলো :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصْلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، فَقَالَ: «لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ»

‘এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমার কিছু আত্মীয়-স্বজন আছে, তাদের সাথে আমি সুসম্পর্ক রাখি, কিন্তু তারা আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে। আমি তাদের সাথে ভালো আচরণ করি, বিনিময়ে তারা আমার সাথে খারাপ আচরণ করে। আমি তাদের প্রতি সহনশীল থাকি, কিন্তু তারা আমার সাথে মূর্থতাসুলভ আচরণ করে। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি যা বলেছ তা যদি সত্য হয়, তাহলে তুমি যেন তাদের মুখে গরম ছাই নিক্ষেপ করেছ। আর যতদিন তুমি এ অবস্থানে অটল থাকবে, ততদিন তাদের বিপক্ষে আল্লাহ তোমাকে সাহায্য করবেন।’^{২৩৬}

এ হাদিসে লক্ষ্য করুন, এখানে আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষাকারীর ধৈর্য ও সহনশীলতার পুরস্কারস্বরূপ আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার কথা বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা আত্মীয়তা-সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের বলা হয়েছে গরম ছাই

ভক্ষণকারী। আসলে অপকারের বিনিময়ে উপকারের পুরস্কার এবং উপকারের বিনিময়ে অপকারের শাস্তি এমনই হয়ে থাকে। আপনি কোনটা বেছে নেবেন?

উল্লিখিত আয়াত ও হাদিসের মর্ম অনুধাবন করে প্রকৃত মুসলমান সব সময় আত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলে। তাদের পক্ষ থেকে যতই সম্পর্কহীনতা, খারাপ ও মূর্খতাসুলভ আচরণ আসুক, সবগুলোর ওপর ধৈর্য ও সহনশীল থাকে। এসবের মোকাবেলায় ধৈর্য হারিয়ে সে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায় না।

হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে :

الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَنِي
قَطَعَهُ اللَّهُ

‘আত্মীয়তা-সম্পর্ক আরশের সাথে সংযুক্ত। সে বলে, আমাকে যে রক্ষা করবে, আল্লাহ তার সাথে সুসম্পর্ক রাখবেন; আর আমাকে যে ছিন্ন করবে, আল্লাহ তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন।’^{২৩৭}



প্রতিবেশীদের সাথে মুসলমানের সম্পর্ক

প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার-সম্পর্কিত ইসলামি নির্দেশনা অনুসরণ করে

প্রকৃত মুসলমান প্রতিবেশীদের সাথে উত্তম লেনদেন ও ভালো ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্য সবার চেয়ে এগিয়ে। কেননা, সে প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করার ব্যাপারে ইসলামে যে নির্দেশনা এসেছে, সেগুলো অনুসরণ করে। আসলে ইসলাম ধর্মে প্রতিবেশীকে যেভাবে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়েছে, তা অন্য কোনো ধর্ম বা জীবনব্যবস্থায় দেখা হয়নি। প্রতিবেশীর সাথে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ আল্লাহ তাআলা সরাসরি পবিত্র কুরআনে দিয়েছেন।

তিনি বলেন :

وَاَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ
بِالْجُنُبِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

‘আর ইবাদত করো আল্লাহর এবং তাঁর সাথে অপর কাউকে শরিক কোরো না। পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার করো এবং নিকটাত্মীয়, এতিম-মিসকিন, আত্মীয় প্রতিবেশী, অনাত্মীয় প্রতিবেশী, পার্শ্বব্যক্তি, অসহায় মুসাফির ও নিজের দাস-দাসীর প্রতিও।’^{২৩৮}

‘আত্মীয় প্রতিবেশী’ বলা হয় ওই প্রতিবেশীকে, যার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্কও রয়েছে। ‘অনাত্মীয় প্রতিবেশী’ বলা হয় ওই প্রতিবেশীকে, যার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই। আর ‘পার্শ্বব্যক্তি’ বলা হয় উত্তম কাজের সহকর্মীকে।

প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর তার প্রতিবেশীর অধিকার রয়েছে। তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকুক বা না থাকুক। এমনকি ধর্মীয়ভাবে সম্পর্ক না থাকলেও! এখান থেকেই বুঝা যায়, উদারতা ও মানবতার ধর্ম ইসলাম প্রতিবেশীকে কতটা সম্মান দিয়েছে!

এজন্যই যত হাদিসে রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রতিবেশীর ব্যাপারে নসিহত করেছেন, প্রত্যেকবারেই ব্যাপক শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেন তিনি বুঝাতে চেয়েছেন, প্রতিবেশীর অধিকারের ক্ষেত্রে আত্মীয়তা ও ধর্মীয় সম্পর্কের দিকে দ্রষ্টব্য করা হবে না।

যেমন এক হাদিসে তিনি ইরশাদ করেছেন :

مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورُّهُ

‘জিবরাইল ﷺ সর্বদা আমাকে প্রতিবেশীর হক সম্পর্কে এত বেশি উপদেশ দিচ্ছিলেন যে, একসময় আমার ধারণা হতে লাগল যে, অচিরেই বুঝি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করা হবে।’^{২৩৯}

প্রতিবেশীর প্রতি ইসলামের গুরুত্ব দেখুন, ফেরেশতাকুলের সর্দার জিবরাইল ﷺ রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অনবরত উপদেশ ও তাগাদা দিয়ে গেছেন। এমনকি একসময় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মনে ধারণা এসে গিয়েছিল যে, ভবিষ্যতে প্রতিবেশীকে আত্মীয়ের মর্যাদা দান করে দিয়ে উত্তরাধিকারী হওয়ার ঘোষণা আসতে পারে!

প্রতিবেশীর অধিকার বিষয়ে জিবরাইল ﷺ-এর অতিরিক্ত উদ্বুদ্ধকরণের ফলে রাসুলুল্লাহ ﷺ বিষয়টির প্রতি খুব আগ্রহী হয়ে পড়েছিলেন। এজন্যই মুসলমানদের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোর ওপর দেওয়া ঐতিহাসিক বিদায় হজের ভাষণের বড় এক অংশ প্রতিবেশীর ব্যাপারে ছিল। তা দেখে আবু উমামা ﷺ-এর মনে হয়েছিল, অচিরেই রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রতিবেশীদের মাঝে উত্তরাধিকারের বিধান প্রবর্তন করতে যাচ্ছেন!

আবু উমামা ﷺ বলেন :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْجَذْعَاءِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، يَقُولُ: «أَوْصِيكُمْ بِالْجَارِ» حَتَّى أَكْثَرَ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ لَيُورُّهُ

২৩৯. সহিহুল বুখারি : ৬০১৫, সহিহ মুসলিম : ২৬২৫

আমি শুনেছি, রাসুলুল্লাহ ﷺ বিদায় হজের দিন তাঁর উটের ওপর সওয়ার হয়ে বলেছেন, ‘আমি প্রতিবেশীর ব্যাপারে তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি।’ কথাটি তিনি এত অধিকবার বললেন যে, আমি মনে মনে বললাম, রাসুলুল্লাহ ﷺ বুঝি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করতে যাচ্ছেন! ২৪০

এ ছাড়াও আরও অনেক হাদিসে রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে উম্মাহকে উপদেশ দিয়েছেন। প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার করা ও তাকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকাকে ইমানের অন্যতম আলামত বলেছেন।

যেমন এক হাদিসে তিনি বলেন :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لَيْسَ كُتْ

‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের ওপর ইমান রাখে, সে যেন প্রতিবেশীর সাথে সদ্যবহার করে; যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের ওপর ইমান রাখে, সে যেন অতিথিকে সম্মান করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের ওপর ইমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা (ভালো কথা বলতে না পারলে অন্তত) চুপ থাকে।’ ২৪১

সহিহ বুখারির বর্ণনায় এসেছে :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ

‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের ওপর ইমান রাখে, সে যেন প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।’ ২৪২

২৪০. আল-মুজামুল কবির, তাবারানি : ৭৫২৩

২৪১. সহিহ মুসলিম : ৪৮

২৪২. সহিহ বুখারি : ৬০১৮

প্রকৃত মুসলমান প্রতিবেশীর প্রতি উদার হয়

প্রকৃত মুসলমান—যার অন্তর ও বিবেক ইসলামের হিদায়াতের আলোয় আলোকিত—প্রতিবেশীর প্রতি উদার ও ভদ্রজনোচিত আচরণ করে। প্রয়োজনবশত তার বাড়ির কোনো বস্তু দ্বারা প্রতিবেশী উপকৃত হতে চাইলে বাধা দেয় না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

لَا يَمْنَعُ جَارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشْبَهُ فِي جِدَارِهِ

‘এক প্রতিবেশী অপর প্রতিবেশীকে তার দেয়ালে খুঁটি গাড়া থেকে বাধা দেওয়া উচিত নয়।’^{২৪৩}

নিজের জন্য যা পছন্দ করে, প্রতিবেশীর জন্যও তাই পছন্দ করে

প্রকৃত মুসলমান উদারমনস্ক ও বন্ধুভাবাপন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়। প্রতিবেশীর আবেগ-অনুভূতিকে সমীহ করে সে। তার সুখে সুখী হয় এবং তার ব্যথায় ব্যথিত হয়। নিজের জন্য যা পছন্দ করে, প্রতিবেশীর জন্যও তাই পছন্দ করে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

‘তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে, অপর মুমিন ভাইয়ের জন্যও তা-ই পছন্দ করবে।’^{২৪৪}

সহিহ মুসলিমের এক বর্ণনায় আনাস র. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

২৪৩. সহিহুল বুখারি : ২৪৬৩

২৪৪. সহিহুল বুখারি : ১৩

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ - أَوْ قَالَ: لِأَخِيهِ
- مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

‘সে সত্তার শপথ করে বলছি যার হাতে আমার প্রাণ, বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত ইমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার প্রতিবেশীর জন্য অথবা (বলেছেন,) তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করবে, যা নিজের জন্য পছন্দ করে।’^{২৪৫}

প্রকৃত মুসলমান গরিব প্রতিবেশীদের খুব দেখাশোনা করে। বিশেষ করে যখন তার ঘরে এমন কোনো ব্যঞ্জন রান্না করা হয়, যার সুগন্ধি আশপাশের ঘরগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। কারণ, সে সুগন্ধি পেয়ে গরিব প্রতিবেশীর জিহ্বায় পানি চলে আসবে, কিন্তু সামর্থ্য না থাকায় বেচারী শুধু মুখের লালাই চেটে চেটে খাবে। আবার তাদের মধ্যে অনেক অবুঝ শিশু, অসহায় এতিম, নিঃস্ব বিধবা বা অকেজো বৃদ্ধও থাকতে পারে। এমন অবস্থায় প্রকৃত মুসলমান গরিব প্রতিবেশীদের খোঁজখবর নেয়। সেই সুগন্ধিযুক্ত খাবারের কিছু অংশ তাদের কাছেও পাঠিয়ে দেয়। কেননা, রাসুলুল্লাহ ﷺ মুমিনদের অন্তরে সামাজিক সহানুভূতির যে চারা রোপণ করে গিয়েছেন, তা সজীব ও জীবন্ত থাকে প্রকৃত মুসলমানের হৃদয়ে।

এ সম্পর্কে হাদিসে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ আবু জার -কে বললেন :

يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ

‘হে আবু জার, কোনো তরকারি রান্না করলে সেখানে ঝোল একটু বেশি দিয়ো এবং প্রতিবেশীদের খবর নিয়ো।’^{২৪৬}

অপর এক বর্ণনায় এসেছে :

إِذَا طَبَخْتَ مَرَقًا فَأَكْثِرْ مَاءَهُ، ثُمَّ انْظُرْ أَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ،
فَأَصِْبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوفٍ

২৪৫. সহিছ মুসলিম : ৪৫

২৪৬. সহিছ মুসলিম : ২৬২৫

‘যদি কোনো তরকারি রান্না করো, তখন সেখানে পানি বেশি দিয়ে,
তারপর প্রতিবেশীদের খোঁজখবর নিয়ে তাদের জন্যও কিছু পাঠিয়ে
দিয়ে।’^{২৪৭}

প্রকৃত মুসলমানের মন কখনো এ বিষয়ে সায় দেয় না যে, তার প্রতিবেশী
ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের কারণে কষ্ট পাবে, অথচ সে আরাম-আয়েশ ও বিলাসী
জীপনযাপন করবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَا آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبَعَانًا وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِهِ

‘সে ব্যক্তি আমার প্রতি (প্রকৃত) বিশ্বাস স্থাপন করেনি, যে পরিতৃপ্ত
হয়ে রাত্রিযাপন করে; অথচ সে জানে যে, তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত।’^{২৪৮}

আরেক হাদিসে তিনি বলেন :

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ

‘সে ব্যক্তি মুমিন নয়, যে তৃপ্তিভরে খানা খায়; অথচ তার প্রতিবেশী
ক্ষুধার্ত থাকে।’^{২৪৯}

**বর্তমান মানবতার করুণ পরিণতির কারণ ইসলামি আখলাকের
অনুপস্থিতি**

বর্তমান সময়ে বিশ্বের প্রতিটি জায়গায় মানবতার প্রতি যে দুর্ভোগ নেমে
এসেছে, তার একমাত্র কারণ হলো, ইসলাম ও প্রকৃত মুসলমানের
অনুপস্থিতি। ইসলামের ইনসাফপূর্ণ মানবিক মূলনীতিগুলো যখন মানবরচিত
ভোগবাদী রীতিনীতির আড়ালে হারিয়ে যায়, তখন এমন দুর্ভোগ অস্বাভাবিক
কিছু নয়। মানবরচিত ভোগবাদী জীবনব্যবস্থা মানবের চন্দ্রাভিযানের যুগে
মানবতাকে উপহার দিয়েছে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের অসহ্য ব্যথা। জাতিসংঘের

২৪৭. সহিহ মুসলিম : ২৬২৫

২৪৮. আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি : ৭৫১

২৪৯. আল-আদাবুল মুফরাদ : ১১২, আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি : ১২৭৪১

খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) ১৯৭৫ সালে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এশিয়া ও আফ্রিকায় বিগত কয়েক বছর ধরে ২০ থেকে ১০০ মিলিয়ন মানুষ ক্ষুধা ও অনাহারের কারণে মৃত্যুবৃত্তিতে আছে। এভাবে চলতে থাকলে প্রতি সপ্তাহে প্রায় ৩ মিলিয়ন মানুষ মারা যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ ছাড়াও সেখানে প্রায় ১,৪৬০ মিলিয়ন মানুষ খাদ্যসংকটে ভুগছে।

চলতি বছরে বিশ্ব প্রচারমাধ্যম একটি ঘটনা খুব ফলাও করে প্রচার করেছে। ঘটনাটির সারসংক্ষেপ হলো, এক ইউরোপীয় তরুণী চরম খাদ্যসংকটে ভোগা আফ্রিকার একটি অঞ্চলে স্বেচ্ছাসেবী নার্স হিসাবে গমন করেন। সেখানে যাওয়ার পর মানসিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পাগলের মতো হয়ে যান তিনি। তার এমনভাবে বিধ্বস্ত হওয়ার কারণ হলো, একদিন তিনি দেখলেন, কিছু আফ্রিকান শিশু—যাদের সবচেয়ে বড়জনের বয়স আটের বেশি নয়—ক্ষুধার তাড়নায় আমার একটা অংশের জন্য নিজেদের মাঝে বুনো লড়াই লড়ছে। একজনের চক্ষু ফুঁড়ে দেওয়া পর্যন্ত তাদের এ লড়াই অব্যাহত থাকল!

এমন ক্ষুধার কারণে সেখানকার লোকদের শরীর প্রয়োজনীয় ভিটামিন থেকে বঞ্চিত থাকে এবং শিশুদের জন্য শরীর গঠনকারী খাদ্য তারা পায় না। ফলে তারা একেকজন জীবন্ত কঙ্কাল হয়ে দুনিয়াতে বিচরণ করে। তাদের শরীরে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা থাকে না বিধায় নানাবিধ রোগে তারা আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এভাবে ধুকতে ধুকতে একসময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

যে সময় এশিয়া ও আফ্রিকায় মানুষ ক্ষুধায় জর্জরিত, সে সময় পশ্চিমা ধনাট্য বিশ্বে—যে বিশ্বে পৃথিবীর জনসংখ্যার মাত্র ২০% মানুষ বাস করে, কিন্তু বৈশ্বিক প্রাচুর্যের ৮০% তারা নিজেদের হাতে ধরে রেখেছে—তাদের ধনাঢ্যতা ও প্রাচুর্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য পাগলের মতো অসংখ্য কাণ্ড ঘটিয়ে চলছে। যেমন : বিশ্ববাজারে কফির দাম চড়া রাখার জন্য ১৯৭৫ সালে ব্রাজিল হাজার হাজার কফি গাছ পুড়িয়ে ফেলে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশসমূহ প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য ও কৃষি উৎপাদনব্য ধ্বংস করার জন্য প্রতিবছর পঞ্চাশ মিলিয়ন ডলার খরচ করে, যেন বিশ্ববাজারে সেগুলোর দাম চড়া থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিবছর তিন লক্ষ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে খাদ্যশস্য উৎপাদন রোধ করার জন্য, যেন বিশ্ববাজারে সেগুলোর দাম বেশি

হয়। মার্কিন মাংস ব্যবসায়ীরা লাখ লাখ গরুর বাছুর মেরে মাটিতে পুঁতে ফেলে, যেন বিশ্ববাজারে মাংসের দাম উর্ধ্বমুখী থাকে; অথচ তখন এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় লক্ষ লক্ষ মানুষ খাদ্যাভাবে মারা যায়। যদি দাম বাড়ানোর উদ্দেশ্যে এসব খাদ্যদ্রব্য ধ্বংস না করা হতো, তাহলে পৃথিবীর বুকে কোনো মানুষ খাদ্যসংকটে ভুগত না।

ইসলামি মানবিক সভ্যতা ও পাশ্চাত্য ভোগবাদী সভ্যতার মাঝে কী বিরাট পার্থক্য! ইসলাম তরকারির সুঘ্রাণের মাধ্যমে গরিব প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়ার মতো সামান্য অমানবিক কাজের সাথেও আপস করেনি। কিন্তু পাশ্চাত্য ভোগবাদী সভ্যতা ধনাঢ্য লোকদের ধনাঢ্যতা আরও বৃদ্ধি করার জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন প্রাণকে না খাইয়ে মেরে ফেলতেও কুণ্ঠাবোধ করে না!

পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের ভোগবাদী জীবন ও অর্থব্যবস্থা এভাবে মানবতাকে বিপন্ন করে চলেছে যুগ যুগ ধরে। এহেন দুর্ভোগ থেকে মানবতাকে মুক্ত করতে হলে ফিরে আসতে হবে ইসলামের পথে। ভোগবাদের বিষাক্ত গ্যাসে দমবন্ধ হয়ে মরা থেকে মানবতাকে মুক্ত করতে হলে তাকে ছেড়ে দিতে হবে ইসলামের মুক্ত বাতাসে।

সাধ্যানুযায়ী প্রতিবেশীর উপকার করে

প্রকৃত মুসলমান তার সাধ্যানুযায়ী প্রতিবেশীর উপকার করে। উপকারের পরিমাণ কম হলে তা করতে লজ্জাবোধ করে না, যেমনটা মূর্খরা করে থাকে। মূর্খরা (অনেক সময়) উপকারকে ছোট মনে করে প্রতিবেশীর জন্য তা করা থেকে বিরত থাকে। ফলে নিজেও সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হয়, প্রতিবেশীকেও উপকার থেকে বঞ্চিত রাখে।

প্রতিবেশীকে ছোট উপকার করতে সাধারণত মেয়েরাই বেশি লজ্জা পায়। এজন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ মেয়েদের উদ্দেশ্য করে বলেন :

يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِّجَارَتِهَا، وَلَوْ فَرْسِنَ شَاةٌ

‘হে মুসলিম নারীরা, তোমাদের কোনো প্রতিবেশী যদি ছাগলের খুরও উপহার দেয়, তবুও তা তুচ্ছজ্ঞান করবে না (অর্থাৎ দাতা যেন

লজ্জার বশীভূত হয়ে দান থেকে বিরত না থাকে এবং গ্রহীতাও যেন
অল্প বলে অবজ্ঞা না করে)।^{২৫০}

হাদিসে ছাগলের খুর বলে কম বা নিম্নমানের উপহার বুঝানো হয়েছে।
হাদিসের ব্যাখ্যা হলো, এক প্রতিবেশী আরেক প্রতিবেশীর কোনো ছোট
উপকার করতে লজ্জাবোধ করবে না এবং একইভাবে যার উপকার করা
হয়েছে, সে যেন ছোট বলে তাকে অবজ্ঞা না করে। কারণ, প্রবাদ আছে ‘নাই
মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।’

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

‘অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে।’^{২৫১}

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

‘খেজুরের সামান্য একটা অংশের (সদকা করার) মাধ্যমেও হলে
তোমরা জাহান্নাম থেকে বাঁচো।’^{২৫২}

উল্লিখিত হাদিস থেকে বুঝা গেল, প্রথমত, কোনো প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীকে
ছোট উপহার দিতে লজ্জা করবে না। তার পাশাপাশি হাদিস থেকে এটাও
বুঝা গেল যে, উপহারগ্রহীতা প্রতিবেশীর ছোট উপহারকে অবজ্ঞা করবে
না; বরং তার শুকরিয়া আদায় করবে। এর মাধ্যমে উভয় প্রতিবেশীর মাঝে
ভালোবাসা ও হৃদয়তার সম্পর্ক কায়েম হবে। তাদের মাঝে পরস্পরের প্রতি
সহানুভূতি ও সহমর্মিতা জাগবে। তা ছাড়া উপকারকারীর শুকরিয়া আদায়
করা মুসলমানদের অন্যতম উত্তম চরিত্রও বটে।

২৫০. সহিহুল বুখারি : ২৫৬৬, সহিহ মুসলিম : ১০৩০

২৫১. সূরা আজ-জিলজাল : ৭

২৫২. সহিহুল বুখারি : ১৪১৭, সহিহ মুসলিম : ১০১৬

এজন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ তার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে বলেন :

لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ

‘যে ব্যক্তি মানুষের শুকরিয়া আদায় করে না, সে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করতে পারে না।’^{২৫৩}

মুসলিম ও অমুসলিম উভয় প্রকার প্রতিবেশীর সাথে সে সদ্যবহার করে প্রকৃত মুসলমান শুধু আত্মীয় প্রতিবেশী ও মুসলমান প্রতিবেশীর সাথেই ভালো ব্যবহার করে, তা নয়; বরং অমুসলিম প্রতিবেশীর সাথেও উত্তম ব্যবহার করে এবং তার উপকার করে। কেননা, ইসলামের উদারনীতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য।

প্রখ্যাত সাহাবি আব্দুল্লাহ বিন উমর ؓ-এর আমল দেখুন। তাঁর ব্যাপারে বর্ণিত আছে :

أَنَّهُ ذُبِحَتْ لَهُ شَاةٌ، فَجَعَلَ يَقُولُ لِغُلَامِهِ: أَهْدَيْتَ لِحَارِنَا الْيَهُودِيَّ؟
أَهْدَيْتَ لِحَارِنَا الْيَهُودِيَّ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ: مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَّثُهُ

‘তার ঘরে একটি ছাগল জবাই করা হলো। তখন তিনি ভৃত্যকে ডেকে বললেন, আমাদের প্রতিবেশী ওই ইহুদি লোকটার ঘরে কি হাদিয়া পাঠানো হয়েছে (দুবার বললেন)? কেননা, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, জিবরাইল ؑ আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে এত বেশি উপদেশ দিয়েছেন যে, একসময় আমি ধারণা করতে শুরু করেছিলাম, অচিরেই বুঝি প্রতিবেশীকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করা হবে।’^{২৫৪}

এজন্যই যুগ যুগ ধরে ইহুদি ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায় মুসলমানদের পাশে নিরাপত্তা ও স্বস্তির সাথে বসবাস করে আসছে। তাদের জান-মাল, ইজ্জত-আবরু ও ধর্মপালনের ওপর মুসলমানদের পক্ষ থেকে কোনো ধরনের অনিষ্টের আশঙ্কা

২৫৩. সুনানু আবি দাউদ : ৪৮১১

২৫৪. আল-আদাবুল মুফরাদ : ১০৫

তারা করে না। মুসলমানদের এলাকায় পাহাড়ের ওপর তাদের বড় বড় গির্জাগুলো তার জীবন্ত সাক্ষী। গির্জার আশপাশে হাজার হাজার মুসলমান বসবাস করে, কিন্তু তারা তাদের সাথে উত্তম আচরণ করে, প্রতিবেশীর হক যথাযথ আদায় করে এবং অন্যায়ভাবে তাদের ওপর আক্রমণ করে না।

কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

‘ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদের দেশ থেকে বহিস্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন।’^{২৫৫}

সদ্যবহার ও উপকারের ক্ষেত্রে নিকটতম প্রতিবেশীকে এগিয়ে রাখে

প্রকৃত মুসলমান প্রতিবেশীর সাথে সদ্যবহার করার ক্ষেত্রে নিকটতম প্রতিবেশীকে অন্যদের ওপর প্রাধান্য দেয়। কেননা, এটাই ইসলামের নির্দেশ। দুই নিকটতম প্রতিবেশীর মাঝে সম্পর্ক শক্তিশালী হওয়ার কারণে ও তাদের মাঝে সাধারণত খুব স্পর্শকাতর কিছু বিষয় জড়িয়ে থাকার কারণে ইসলাম সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশীকে অগ্রাধিকার দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। যাতে তাদের মাঝে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সখ্যতা দৃঢ় হয়।

এ সম্পর্কে আয়িশা রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন :

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابًا

‘আমি রাসুলুল্লাহ স-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমার প্রতিবেশী তো দুজন আছে। তাহলে কার কাছে হাদিয়া পাঠাব? তিনি

২৫৫. সূরা আল-মুমতাহিনা : ৮

বললেন, দুজনের মধ্যে যার দরজা তোমার অধিকতর নিকটবর্তী,
তার নিকট? ২৫৬

সাহাবায়ে কিরাম ৷ প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইসলামের এ নির্দেশনা অনুসরণ করতেন। এজন্য সদ্যবহার ও উপকার করার ক্ষেত্রে তাঁরা নিকটতম প্রতিবেশীকে দূরতম প্রতিবেশীর ওপর প্রাধান্য দিতেন।

এ সম্পর্কে আবু হুরাইরা ৷ বলেন :

وَلَا يَبْدَأُ بِجَارِهِ الْأَقْصَى قَبْلَ الْأَذْنَى، وَلَكِنْ يَبْدَأُ بِالْأَذْنَى قَبْلَ الْأَقْصَى

‘নিকটবর্তী প্রতিবেশীকে বাদ দিয়ে দূরবর্তী প্রতিবেশী থেকে (হাদিয়া-তোফহা প্রেরণ) শুরু করবে না; বরং দূরবর্তী প্রতিবেশীর পূর্বে নিকটবর্তী প্রতিবেশী থেকে শুরু করবে।’ ২৫৭

ইসলাম নিকটবর্তী প্রতিবেশীকে অন্যান্য প্রতিবেশীর ওপর প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলে। এর অর্থ কোনোভাবেই এটা নয় যে, ইসলাম দূরবর্তী প্রতিবেশীদের থেকে একদম মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে; বরং নিকটবর্তী বা দূরবর্তী প্রত্যেক প্রতিবেশীর হক ও অধিকার যথাযথভাবে আদায় করার প্রতি ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে। তবে নিকটবর্তী প্রতিবেশীর সাথে একটু বেশি দেখা-সাক্ষাৎ হওয়ার কারণে এবং তার সাথে স্বাভাবিকভাবেই কিছু স্পর্শকাতর বিষয় জড়িয়ে থাকার কারণে তাকে অন্যান্য প্রতিবেশীর ওপর প্রাধান্য দিতে বলা হয়েছে।

প্রকৃত মুসলমান একজন উত্তম প্রতিবেশী হয়ে থাকে

প্রকৃত মুসলমান তার প্রতিবেশীদের জন্য একজন আদর্শ ও উত্তম প্রতিবেশী হয়। প্রতিবেশীদের সাথে উত্তম আচরণ করা ও তাদের প্রতি উপকার করাকে অন্তর থেকে নিজের গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব মনে করে সে। এটাকে আল্লাহ ও মানুষের নিকট আলাদা মর্যাদা পাওয়ার অন্যতম উপায় মনে করে।

২৫৬. সহিহুল বুখারি : ২২৫৯

২৫৭. আল-আদাবুল মুফরাদ : ১১০

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ
خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ

‘আল্লাহর নিকট সে সঙ্গীই উত্তম, যে তার সঙ্গীদের নিকট উত্তম
এবং আল্লাহর নিকট সে প্রতিবেশীই উত্তম, যে তার প্রতিবেশীদের
নিকট উত্তম।’^{২৫৮}

এজন্যই ইসলাম উত্তম প্রতিবেশী থাকাকে মুসলমানদের অন্যতম সৌভাগ্য
বলে অভিহিত করেছে। কেননা, প্রতিবেশী উত্তম হলে মানুষ সব সময় স্বস্তি
ও নিরাপত্তা বোধ করে।

এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَالْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرْكَبُ الْهَنِيءُ

‘একজন মুসলমানের জন্য প্রশস্ত বাসভবন, উত্তম প্রতিবেশী ও
রুচিসম্মত বাহন সৌভাগ্যস্বরূপ।’^{২৫৯}

সালাফে সালিহিন উত্তম প্রতিবেশীকে মূল্যবান নিয়ামত ও গনিমত মনে
করতেন। তার মোকাবেলায় ধন-সম্পদ ও সকল পার্থিব স্বার্থকে তুচ্ছ মনে
করতেন।

এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা হলো, সাইদ বিন আস ﷺ-এর প্রতিবেশী তার বাড়ি
বিক্রি করার জন্য দাম ঠিক করলেন এক লক্ষ দিরহাম। তারপর ক্রেতাকে
বললেন, এ হলো শুধু বাড়ির দাম। সাইদ ﷺ-এর প্রতিবেশিত্ব কত দামে
কিনতে পারবে? এ ব্যাপারে সাইদ ﷺ যখন জানতে পারলেন, তখন তার
নিকট বাড়ির দাম পাঠিয়ে দিয়ে তাকে তার বাড়িতেই থাকতে বললেন।

এতক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা করে আসছি উত্তম প্রতিবেশী সম্পর্কে। এখন খারাপ
প্রতিবেশীর ব্যাপারে আলোচনা করা হবে।

২৫৮. সুনানুত তিরমিজি : ১৯৪৪

২৫৯. আল-আদাবুল মুফরাদ : ১১৬

খারাপ প্রতিবেশী ইমানের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত

খারাপ প্রতিবেশী এমন এক ব্যক্তি, যে ইমানের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত; যা স্রষ্টার পক্ষ থেকে সৃষ্টির জন্য সবচেয়ে বড় নিয়ামত এবং দুনিয়াবি জীবনের সকল শ্রেষ্ঠত্বের কেন্দ্রবিন্দু। রাসুলুল্লাহ ﷺ খুব কঠিন ভাষায় এ ঘোষণা দিয়েছেন।

তিনি ইরশাদ করেছেন :

وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ، وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ، وَاللّٰهُ لَا يُؤْمِنُ قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ؟ قَالَ:
الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

‘আল্লাহর শপথ, সে ব্যক্তি মুমিন নয় (তিনবার বললেন)! জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল, কার ব্যাপারে বলছেন? তিনি বললেন, সেই ব্যক্তির ব্যাপারে বলছি, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।’^{২৬০}

সহিহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

‘সেই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অনিষ্ট থেকে প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।’^{২৬১}

প্রতিবেশীর সাথে খারাপ আচরণ করা কত বড় অপরাধ, তা শাস্তি দেখেই অনুমান করুন! কত বড় সে অপরাধ, যা ব্যক্তিকে ইমানের নিয়ামত থেকে বের করে দেয় এবং জান্নাতে প্রবেশ করা থেকে বাধা দেয়!

২৬০. সহিহুল বুখারি : ৬০১৬

উল্লেখ্য যে, কুফর বা শিরকের সাথে জড়িত না হয়ে শুধু গুনাহের কারণে কারও ইমান বিনষ্ট হয় না; গুনাহ যত বড়ই হোক না কেন! এটাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহ’র আকিদা। অতএব, যেসব হাদিসে বিভিন্ন গুনাহ বা জুসুমের কারণে ইমান না থাকার কথা বলা হয়েছে, বিজ্ঞ মুহাদ্দিস ও ফকিহগণ তথ্য পূর্ণাঙ্গ ইমান না থাকার কথা বলেছেন। অর্থাৎ এখানে অর্থ হবে, সে পূর্ণ ইমানদার হতে পারবে না। নচেৎ এসব হাদিস থেকে শুধু গুনাহের ভিত্তিতে কাউকে বে-ইমান বলা বা কাফির বলা সঠিক নয়, যেমনটি কোনো জাহিরি মাজহাবের লোক করে থাকে। তাই এসব বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। (অনুবাদক)

২৬১. সহিহ মুসলিম : ৪৬

প্রকৃত মুসলমান খারাপ প্রতিবেশী হওয়ার এসব শাস্তির কথা জানে। তাই সে প্রতিবেশীর সাথে খারাপ ব্যবহার করা, ঝগড়া করা কিংবা তাকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকে। কারণ, সে জানে, এ বিষয়গুলো তার ইমান ধ্বংস করে দেবে এবং আখিরাত বরবাদ করে দেবে। আর একজন মানুষের জন্য সবচেয়ে দুর্ভাগ্য ও ক্ষতি হলো, ইমান ও আখিরাতের ক্ষতি। প্রকৃত মুসলমান তাই এমন কোনো কাজ করে না, যা তার ইমান ও আখিরাতের ক্ষতি করে।

খারাপ প্রতিবেশীর আমল বিনষ্ট হয়ে যায়

প্রতিবেশীর সাথে খারাপ আচরণ করলে আমল বিনষ্ট হয়ে যায়। যতই নেক আমল করুক, তা আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয় না। কারণ, সকল নেক আমল নির্ভর করে ইমানের ওপর। আর উপরোল্লিখিত হাদিসের স্পষ্ট ভাষ্য অনুযায়ী খারাপ প্রতিবেশীর ইমান নেই।^{২৬২} সুতরাং বুঝা গেল, খারাপ প্রতিবেশীর কোনো আমল আল্লাহ কবুল করেন না। আমল করতে করতে রাতদিন কাটিয়ে দিলেও তার কোনো সাওয়াব আমলনামায় লেখা হয় না।

এ সম্পর্কে হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে :

قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانَةً تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ، وَتَفْعَلُ، وَتَصَّدَّقُ، وَتُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا خَيْرَ فِيهَا، هِيَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ» قَالُوا: وَفُلَانَةٌ تُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ، وَتَصَّدَّقُ بِأَثْوَارٍ، وَلَا تُؤْذِي أَحَدًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هِيَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ»

‘নবিজি ﷺ-কে প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল, অমুক মহিলা রাতে নামাজ পড়ে, দিনে রোজা রাখে, ভালো কাজ করে এবং দান-সদকা করে, কিন্তু কথার মাধ্যমে প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয়। (তার সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কী?) রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, তার মাঝে কোনো কল্যাণ নেই, সে জাহান্নামি। তারা বললেন, আরেকজন

২৬২. এখানে ইমান না থাকা অর্থ ইমান পরিপূর্ণ নয়। একটু আগে এ সংক্রান্ত বিশদ ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছি। (অনুবাদক)

মহিলা ফরজ নামাজসমূহ আদায় করে এবং আবশ্যকীয় সদকাগুলো আদায় করে, কিন্তু কাউকে কষ্ট দেয় না। (তার ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী?) রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, সে জান্নাতি।^{২৬৩}

রাসুলুল্লাহ ﷺ কয়েক শ্রেণির লোককে বক্ষ্যা বলেছেন, খারাপ প্রতিবেশী তাদের অন্যতম। তিনি ইরশাদ করেছেন :

ثَلَاثٌ هُنَّ الْعَوَاقِرُ: إِمَامٌ إِنْ أَحْسَنْتَ لَمْ يَشْكُرْ وَإِنْ أَسَأْتَ لَمْ يَغْفِرْ،
وَجَارٌ إِنْ رَأَى خَيْرًا دَفَنَهُ وَإِنْ رَأَى شَرًّا أَشَاعَهُ، وَامْرَأَةٌ إِنْ حَضَرَكَ
أَذْنُكَ وَإِنْ غَبَتْ عَنْهَا خَانَتْكَ

‘তিন শ্রেণির মানুষ বক্ষ্যা। এক. এমন শাসক, যার সাথে ভালো ব্যবহার করলে শুকরিয়া আদায় করে না এবং খারাপ ব্যবহার করলে ক্ষমা করে না। দুই. খারাপ প্রতিবেশী, যে (প্রতিবেশীদের) ভালো কিছু দেখলে তা গোপন রাখে, কিন্তু খারাপ কিছু দেখলে তা প্রচার করে দেয়। তিন. ওই স্ত্রী, যার পাশে থাকলে তোমাকে কষ্ট দেয়, আর দূরে থাকলে বিশ্বাসঘাতকতা করে।’^{২৬৪}

হাদিস শরিফে খারাপ প্রতিবেশীর যে কুৎসিত চিত্র আঁকা হয়েছে, তা প্রকৃত মুসলমানের অন্তরে গেঁথে আছে। ফলে প্রতিবেশীদের সাথে খারাপ আচরণ করা বা তাদের কষ্ট দেওয়ার কথা সে ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারে না।

প্রতিবেশীর সাথে পাপকর্মে লিপ্ত হয় না

প্রকৃত মুসলমান বিশেষভাবে প্রতিবেশীর সাথে পাপকর্মে লিপ্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাকে। কেননা, প্রতিবেশীর সাথে পাপকর্ম করা সাধারণত সহজ হয়ে থাকে বিধায় তা তুলনামূলক বেশি সংঘটিত হয়। এজন্য অপরাধ হিসাবেও তা বেশি গুরুতর।

২৬৩. আল-আদাবুল মুফরাদ : ১১৯

২৬৪. আল-মুজামুল কবির, তাবারানি : ৮২৪

এ সম্পর্কে হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে :

سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ عَنِ الزِّنَا؟ قَالُوا: حَرَامٌ،
حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ: «لِأَن يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ
مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِأَمْرَأَةٍ جَارِهِ»، وَسَأَلَهُمْ عَنِ السَّرِقَةِ؟ قَالُوا: حَرَامٌ، حَرَّمَهَا
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ: «لِأَن يَسْرِقَ مِنْ عَشْرَةِ أَهْلِ أُبْيَاتٍ، أَيْسَرُ
عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ بَيْتِ جَارِهِ»

‘রাসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবিগণকে ব্যভিচারের বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরা বললেন, হারাম। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ এটাকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, কোনো ব্যক্তি দশজন মেয়ের সাথে ব্যভিচার করার চেয়ে মারাত্মক গুনাহ হলো প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা। অতঃপর তাদের থেকে চুরির ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলো। তাঁরা উত্তরে বললেন, তা হারাম। আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ তা হারাম করেছেন। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, প্রতিবেশীর বাড়িতে চুরি করা দশ বাড়িতে চুরি করার চেয়েও মারাত্মক অপরাধ।’^{২৬৫}

ইসলামে প্রতিবেশীর মর্যাদা সুরক্ষিত। মানবরচিত কোনো সমাজব্যবস্থা প্রতিবেশীকে এমন মর্যাদা দিতে পারেনি। বরং এসব সমাজব্যবস্থা প্রতিবেশীর ইজ্জত-সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে শেখায়। কারণ, প্রতিবেশীর মান-ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা অন্যদের তুলনায় সহজ। এর জন্য প্রচুর সময়ও পাওয়া যায়। তবে অতি দুঃখজনক বাস্তবতা হলো, বর্তমান সময়ে অনেক মুসলমানকে দেখা যায়, তারা জানালার পাশের ঘরের তরুণীকে উদ্দেশ্য করে অশ্লীল গান গায়, অশালীন অঙ্গভঙ্গি করে। এ ধরনের অমুসলমানসুলভ কাজকর্ম মুসলমানদের থেকে প্রকৃত মুসলমানিত্ব ও ইমানি আখলাক চলে যাওয়ার কারণে এবং মুসলমানরা বিভিন্ন মানবরচিত অসভ্য চিন্তাধারা লালন করার দরুন সংঘটিত হচ্ছে। নচেৎ ইসলামপূর্ব জাহিলি যুগেও এ ধরনের

খারাপ কাজের নজির পাওয়া যায় না, ইসলামি যুগে তো থাকার প্রশ্নই ওঠে না। ইসলামি যুগে প্রতিবেশী নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নজির দেখুন একজন মুসলিম কবির কবিতায় :

وأغض طرفي ما بدت لي جارتني * حتى يوارى جارتني مأواها

‘যখন আমার প্রতিবেশিনী হঠাৎ আমার সামনে পড়ে যায়, আমার দৃষ্টি তখন অবনমিত হয়ে পড়ে। ততক্ষণ দৃষ্টি উত্তোলন করি না, যতক্ষণ না প্রতিবেশিনী তার ঘরে ঢুকে যায়।’

কবি আরমাবি বলেন :

ناري ونار الجار واحدة * وإليه قبلي تنزل القدر
ما ضر جارا لي أجاوره * ألا يكون لبابه ستر
أعمى إذا ما جارتني برزت * حتى تغيب جارتني الخدر

‘আমি ও আমার প্রতিবেশী এক আগুন দিয়ে উনুন জ্বালাই। আমার পূর্বেই তার ঘরে পৌঁছে যায় রান্নার হাঁড়ি। তবে আমার প্রতিবেশী আমাকে নিয়ে কোনো আশঙ্কা করে না, যখন তার ঘরের দরজায় কোনো পর্দা থাকে না। কারণ, প্রতিবেশিনী যখন বের হয়, তখন আমি অন্ধ হয়ে যাই, যতক্ষণ না সে তার অন্তরমহলে প্রবেশ করে।’

মোটকথা, ইসলাম বিভিন্ন আয়াত ও হাদিসে প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছে। তার ইজ্জত-আবরূর হিফাজত করতে এবং যথাসাধ্য তার প্রয়োজন পূরণ করে দিতে আদেশ করেছে। তার ঘরের মেয়ে ও অন্যান্য নিষিদ্ধ বিষয়ের ওপর নজর দেওয়া ও তাকে কোনো ধরনের কষ্ট দেওয়া থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। এজন্য প্রকৃত মুসলমান সর্বযুগে, সব সময়, সকল সমাজে উত্তম ও আদর্শ প্রতিবেশী হিসাবে খ্যাতিলাভ করে।

প্রকৃত সচেতন মুসলমান—যে প্রতিবেশীর ব্যাপারে ইসলামের সকল নির্দেশনা মেনে চলে—প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া করার আগে হাজারবার চিন্তা করে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

أَوَّلُ خُصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ

‘কিয়ামতের দিন যে দুজন ঝগড়াকারীর বিচার আগে হবে, তারা পরস্পর প্রতিবেশী।’^{২৬৬}

প্রতিবেশীর উপকার করতে অবহেলা করে না

প্রকৃত মুসলমান প্রতিবেশীদের জন্য তার উপকার ও অনুগ্রহের দরজা সব সময় উন্মুক্ত রাখে, যেন তাদের হক আদায়ে কোনো ধরনের অবহেলা ও শিথিলতা না হয় এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিম্নোক্ত হাদিসটি তার ওপর প্রযোজ্য হয়ে না যায়, যে হাদিসে তিনি ইরশাদ করেছেন :

كَمْ مِنْ جَارٍ مُتَعَلِّقٌ بِجَارِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ: يَا رَبِّ، هَذَا أَغْلَقَ بَابَهُ
دُونِي، فَمَنْعَ مَعْرُوفَهُ

‘অনেক প্রতিবেশী কিয়ামতের দিন তার প্রতিবেশীকে অভিযুক্ত করবে এবং বলবে, হে আমার প্রভু, এ ব্যক্তি আমার জন্য তার দরজা বন্ধ করে রেখেছিল এবং আমাকে তার প্রতিবেশীসুলভ সদ্যবহার থেকে বঞ্চিত করেছিল।’^{২৬৭}

কিয়ামতের দিন বিশাল জনসমুদ্রের সম্মুখে যখন এ অভিযোগ করা হবে, তখন কী পরিমাণ লজ্জা লাগবে, একটু ভাবুন তো!

ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মুসলমান একটি শক্ত ও উঁচু ভবনের মতো। এ উম্মাহর প্রতিজন সন্তান এ ভবনের একেকটি ইট। কোনো ভবন তখনই টিকে থাকে, যখন তার এক ইটের সাথে আরেক ইটের মিলবন্ধন শক্ত হয় এবং একটির সাথে আরেকটির সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়। অন্যথায় তা নিমিষেই ধসে পড়বে। তাই ইসলাম তার অনুসারীদের মাঝে আত্মিক মিলবন্ধন ও ভ্রাতৃত্ববন্ধন সৃষ্টি করেছে, যেন মুসলমানদের ভবন মজবুত হয় এবং দুনিয়ার কোনো শক্তি তাকে ধসিয়ে দিতে না পারে।

২৬৬. মুসনাদু আহমাদ : ১৭৩৭২

২৬৭. আল-আদাবুল মুফরাদ : ১১১



এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

‘মুমিন মুমিনের জন্য ভবনের কাঠামোস্বরূপ, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে।’^{২৬৮}

অপর এক হাদিসে তিনি ইরশাদ করেছেন :

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى

‘পারস্পরিক সৌহার্দ্য, দয়া প্রদর্শন ও সহানুভূতিশীল হওয়ার ক্ষেত্রে সকল মুমিন এক দেহের ন্যায়, যার একটি অঙ্গ অসুস্থ হলে পুরো শরীর অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।’^{২৬৯}

যে দ্বীন সকল মুসলমানের মাঝে এমন গভীর সম্পর্ক রাখার কথা বলে, সে দ্বীন প্রতিবেশীর সাথে গভীর সম্পর্ক রাখার ব্যাপারে কতটা গুরুত্ব দেবে, তা তো সহজেই অনুমেয়। এজন্য প্রকৃত মুসলমান প্রতিবেশীর সাথে গভীর বন্ধুত্ব রাখে, তার প্রয়োজনে পাশে থাকে এবং তার সাথে উত্তম আচরণ করে।

প্রতিবেশীর পক্ষ থেকে পাওয়া কষ্টের ওপর ধৈর্যধারণ করে

প্রকৃত মুসলমান প্রতিবেশীর অনিষ্ট ও তার পক্ষ থেকে আসা কষ্টের ওপর ধৈর্যধারণ করে। প্রতিবেশী থেকে কোনো দোষ সংঘটিত হলে রেগে যায় না; বরং তাকে ক্ষমা করে দেয়। কারণ, সে বিশ্বাস করে, এ ধৈর্য ও ক্ষমা আল্লাহর কাছে বৃথা যাবে না; বরং বিনিময়ে আল্লাহর ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি অর্জিত হবে।

এ প্রসঙ্গে আবু জার ﷺ থেকে একটি হাদিস বর্ণিত আছে :

‘মুতাররিফ বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি আবু জার ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বললাম, হে আবু জার, আপনার পক্ষ থেকে আমার কাছে একটি

২৬৮. সহিহুল বুখারি : ২৪৪৬, সহিহ মুসলিম : ২৫৮৫

২৬৯. সহিহ মুসলিম : ২৫৮৬

হাদিস পৌছেছে, তাই আপনার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য খুব আগ্রহী ছিলাম। আবু জার   বললেন, তোমার পিতা আল্লাহর জন্য উৎসর্গিত হোক! এখন তো আমার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে (এখন বলো, যা বলার)। আমি বললাম, যে হাদিসটি আমার নিকট পৌছেছে তা হলো, রাসুলুল্লাহ   আপনাকে বলেছেন, আল্লাহ তাআলা তিন শ্রেণির লোকদের ভালোবাসেন এবং তিন শ্রেণির লোকদের অপছন্দ করেন। আবু জার   বললেন, হ্যাঁ, সত্যিই তো বলেছেন, আমি খামোখা রাসুলুল্লাহ  -এর ওপর মিথ্যাচার করতে যাব কেন? আমি বললাম, তা বলছি না, আমি শুধু জানতে চাইছি, সে তিন শ্রেণির লোক কারা, যাদের আল্লাহ ভালোবাসেন? তিনি বললেন, সে ব্যক্তি, যে আল্লাহর রাস্তায় ধৈর্য সহকারে ও সাওয়াবের প্রত্যাশায় জিহাদ করেছে, অতঃপর শহিদ হয়েছে। কুরআনের আয়াতেই তার প্রমাণ আছে। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ (আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন, যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে লড়াই করে, যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর।) ২৭০ আমি বললাম, তারপর কে?’ তিনি বললেন, সে ব্যক্তি, যার খারাপ প্রতিবেশী তাকে প্রতিনিয়ত কষ্ট দেয়, কিন্তু সে তার ওপর ধৈর্যধারণ করে, যতক্ষণ না আল্লাহ তার জন্য জীবন বা মৃত্যু দানের মাধ্যমে যথেষ্ট হয়ে যান।...’ ২৭১

প্রতিবেশীর মন্দ আচরণের মোকাবেলায় মন্দ আচরণ করে না

রাসুলুল্লাহ   সাহাবায়ে কিরাম  -কে ইসলামের যে উন্নত আখলাক শিক্ষা দিয়েছেন, তার অন্যতম হলো, প্রতিবেশীর মন্দ আচরণের মোকাবেলায় মন্দ আচরণ করবে না; বরং যথাসাধ্য তার ওপর ধৈর্যধারণ করবে। হতে পারে, এর কারণে তার মন গলে যাবে এবং কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকবে। কেননা, সে যখন দেখতে পাবে, প্রতিবেশীর সাথে এত খারাপ ব্যবহার করা ও এত কষ্ট দেওয়া সত্ত্বেও সে তার প্রতি খারাপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করে ধৈর্য ধরে যাচ্ছে, তখন তার মনে লজ্জার অনুভূতি সৃষ্টি হওয়া অমূলক নয়।

২৭০. সূরা আস-সাফ : ৪

২৭১. মুসনাদু আহমাদ : ২১৫৩০

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন সাল্লাম ﷺ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, আমার প্রতিবেশী আমাকে কষ্ট দিয়েছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, ধৈর্য ধরো। তারপর দ্বিতীয়বার এসে একই কথা বললেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ-ও একই উত্তর দিলেন। তৃতীয়বারে এসে যখন বললেন, আমার প্রতিবেশী আমাকে কষ্ট দিয়েছে, তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, তোমার আসবাবপত্র নিয়ে রাস্তায় নিক্ষেপ করো। তারপর যে-ই তোমার কাছে আসবে, তাকেই বলো যে, আমার প্রতিবেশী আমাকে কষ্ট দিয়েছে। তার প্রতি অভিসম্পাত করার জন্য এটাই যথেষ্ট। (অর্থাৎ প্রতিবেশীর দেওয়া কষ্টের ওপর ধৈর্য না ধরে এভাবে অভিযোগ করাকে রাসুলুল্লাহ ﷺ অপছন্দ করেছেন, তাই তাকে এভাবে উত্তর দিয়েছেন।) আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের ওপর যে ইমান রাখে, তার উচিত প্রতিবেশীর সম্মান করা।^{২৭২}

প্রতিবেশীর অধিকার আদায়ে সচেষ্টি

প্রকৃত মুসলমান সব সময় প্রতিবেশীর হক ও অধিকার যথাযথভাবে আদায় করে দেয়। সুতরাং কষ্টের মুহূর্তে তার সহযোগী হয়, খুশির সময় তার প্রফুল্লতায় শরিক হয়, অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যায়, মৃত্যুবরণ করলে মৃত্যুপরবর্তী কার্যক্রমে উপস্থিত হয় এবং স্বজনদের সান্ত্বনা দেয়। প্রকৃত মুসলমান প্রতিবেশীর আবেগ-অনুভূতির মূল্যায়ন করে এবং এমন কোনো কাজ করে না, যা তার অনুভূতিতে আঘাত লাগে বা তাকে কোনো ধরনের কষ্ট দেয়।

এটাই প্রতিবেশীর অধিকার সম্পর্কে ইসলামের বিধান ও শিক্ষা। প্রকৃত মুসলমান এ বিধান যথাযথ বাস্তবায়ন করে বিধায় তাকে সমাজ একজন আদর্শ ও উত্তম প্রতিবেশী হিসাবে চেনে। ভেবে দেখুন, আপনার ভেতর কি এসব গুণ আছে?

ভাই-বন্ধুদের সাথে মুসলমানের সম্পর্ক

আল্লাহর জন্য তাদের ভালোবাসে

প্রকৃত মুসলমানের অন্যতম মহান গুণ হলো, ভাই-বন্ধুদের প্রতি আন্তরিক, নির্ভেজাল ও নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। এ ভালোবাসাকেই সত্যিকারের ভ্রাতৃত্ব বলা হয়, যার বর্ণনা কুরআন ও হাদিসে এসেছে। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ইতিহাসে এ সম্পর্কের প্রভাব অনন্য। এ সম্পর্ক জাতি-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে এক মুসলমানের সাথে অপর মুসলমানের সম্পর্ক। এ সম্পর্কের ভিত্তি ইমান বিল্লাহ বা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

‘মুমিনরা পরস্পর ভাই-ভাই।’ ২৭৩

আর ইমানি ভ্রাতৃত্ব রক্ত ও মনের সকল সম্পর্কের চেয়ে দৃঢ় ও শক্তিশালী।

তাই এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, এ অনন্য ভ্রাতৃত্ব মুসলমানদের মনে এমন এক ভালোবাসা সৃষ্টি করে, যার উচ্চতা, স্বচ্ছতা, গভীরতা ও স্থায়িত্ব রীতিমতো বিস্ময়কর। ইসলাম এ ভালোবাসার নাম দিয়েছে ‘আল্লাহর জন্য ভালোবাসা’। প্রকৃত মুসলমান এ ভালোবাসার মাঝে ইমানের স্বাদ আশ্বাদন করে।

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে :

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ
أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهُ
أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ

‘তিনটি বিষয় যে ব্যক্তির মাঝে থাকবে, সে ইমানের স্বাদ পাবে।
এক. আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ তার নিকট অন্য সবার চেয়ে অধিক

প্রিয়তর হওয়া। দুই. কোনো ব্যক্তিকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা। তিন. কুফর থেকে মুক্তি পাওয়ার পর পুনরায় তাতে ফিরে যাওয়াকে এমনভাবে অপছন্দ করা, যেমন আগুনে নিষ্কিণ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে।^{২৭৪}

আল্লাহর জন্য পরস্পর মহব্বতকারীদের মর্যাদা

যারা আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালোবাসে, তাদের উচ্চ মর্যাদার ব্যাপারে অনেক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এসব হাদিসে তাদের উচ্চ মর্যাদার চিত্র আঁকা হয়েছে, যা আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য জান্নাতে তৈরি করে রেখেছেন এবং এমন মহান নিয়ামতের কথা উল্লেখ হয়েছে, যা কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাদের দান করবেন।

তন্মধ্যে একটি হাদিস হলো ‘সাত ব্যক্তির হাদিস’, যে হাদিসে এমন সাত শ্রেণির লোকের কথা বর্ণিত হয়েছে, যাদের কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাঁর আরশের ছায়াতলে স্থান দেবেন।

সে সাত শ্রেণির লোক হলো :

إِمَامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ،
وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ
ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ
فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا،
فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ

এক. ন্যায়পরায়ণ বাদশা; দুই. সে যুবক, যে আল্লাহর ইবাদত করে তার যৌবন অতিবাহিত করে; তিন. সে ব্যক্তি, যার কলব মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত থাকে; চার. এমন দুই ব্যক্তি, যারা পরস্পরকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে; পাঁচ. সে ব্যক্তি, যাকে কোনো সুন্দরী রমণী খারাপ কাজের প্রতি আহ্বান করেছে, আর সে ‘আমি আল্লাহকে ভয় করি’

বলে তার ডাকে সাড়া দেয়নি; ছয়. সে ব্যক্তি, যে গোপনে সদকা করে, এমনকি তার ডান হাত যা দান করে, সে সম্পর্কে তার বাম হাতেরও ধারণা থাকে না; সাত. এমন ব্যক্তি, যে একাকিত্বের মুহূর্তে আল্লাহর জিকির করে চোখের অশ্রু ঝরায়।^{২৭৫}

এ হাদিসে আল্লাহর জন্য পরস্পর মহব্বতকারীদের সেই বাছাই করা সাত শ্রেণির লোকের দলভুক্ত করা হয়েছে, যাদের আল্লাহ তাআলা তাঁর আরশের ছায়াতলে স্থান দেবেন এবং দয়া ও করুণার চাদরে জড়িয়ে নেবেন। একজন মানুষের জন্য এর চেয়ে বড় মর্যাদা ও সম্মান আর কী হতে পারে?

শুধু তাই নয়, কিয়ামতের দিন হাশরের ময়দানে আল্লাহ তাআলা তাঁর জন্য মহব্বতকারীদের প্রতি আলাদা মনোযোগ দেবেন। সেদিন তিনি বলবেন, **أَيُّنَ الْمُتَحَابُّونَ بِيَلَالِي، الْيَوْمَ أَظْلَهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي** ‘আমার বড়ত্ব ও মহত্ত্বের জন্য পরস্পর মহব্বতকারীরা কোথায়? আজকের এ দিনে—যেদিন আমার (আরশের) ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া নেই—আমি আমার (আরশের) ছায়াতলে তাদের স্থান দেবো।’^{২৭৬}

কিয়ামতের কঠিনতম ভয়াবহ দিনে এর চেয়ে উত্তম পুরস্কার ও উচ্চ মর্যাদা আর কী হতে পারে, যা আল্লাহর জন্য একে অপরকে মহব্বতকারীরা পাবে!?

এর কারণ হলো, একমাত্র আল্লাহর জন্য ভালোবাসা—যে ভালোবাসায় পার্থিব কোনো স্বার্থ থাকে না—অনেক কঠিন এক বিষয়। এটা শুধু তাদের পক্ষেই সম্ভব, যাদের অন্তর স্বচ্ছ ও পরিশুদ্ধ, যাদের নিকট আল্লাহর সন্তুষ্টির তুলনায় দুনিয়া অতি তুচ্ছ। কাজেই এমন লোকদের জন্য ঈর্ষনীয় মর্যাদা ও পুরস্কার থাকতেই পারে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

মুআজ রাঃ বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সঃ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

الْمُتَحَابُّونَ فِي جَلَالِي لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يَغِيظُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ

২৭৫. সহিহুল বুখারি : ১৪২৩

২৭৬. সহিহ মুসলিম : ২৫৬৬

‘আমার জন্য যারা পরস্পরকে ভালোবাসে, তাদের জন্য নুরের মিস্বর থাকবে, যা দেখে নবিগণ ও শহিদগণ পর্যন্ত ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়বেন।’^{২৭৭}

শুধু এতটুকুই নয়; বরং আল্লাহ তাআলা এর চেয়েও অনেক বড় নিয়ামত তাদের দান করবেন। তা হচ্ছে, স্বয়ং তিনিই তাদের ভালোবাসবেন! আবু হুরাইরা রা-এর হাদিসে এ মহান পুরস্কারের কথা বর্ণিত হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ সা বলেন :

أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ، عَلَى مَذْرَجَتِهِ، مَلَكًا فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ، قَالَ: أَتَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَخًا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لَا، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، قَالَ: فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ، بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحَبَّتُهُ فِيهِ

‘এক ব্যক্তি তার এক ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের জন্য অপর এক গ্রামে গেলেন। তার যাত্রাপথে আল্লাহ তাআলা একজন ফেরেশতাকে দাঁড় করে দিলেন। যখন ওই ব্যক্তি সেই ফেরেশতার কাছে পৌঁছলেন, তখন তিনি বললেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ? লোকটি উত্তর দিলেন, এ গ্রামে আমার এক ভাই আছে, তার সাথে দেখা করতে যাচ্ছি। ফেরেশতা বললেন, তোমার ওপর কি তার কোনো অবদান রয়েছে, যার কারণে তুমি তার নিকট যাচ্ছ? লোকটি উত্তর দিলেন, আমি তাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি, এ ছাড়া অন্য কোনো কারণ নেই। তখন ফেরেশতা বললেন, আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এ মর্মে তোমাকে অবহিত করার জন্য দূত হয়ে এসেছি যে, তুমি যে রূপ ওই লোকটিকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসো, আল্লাহও অনুরূপ তোমাকে ভালোবাসেন।’^{২৭৮}

২৭৭. সুনানুত তিরমিজি : ২৩৯০

২৭৮. সহিছ মুসলিম : ২৫৬৭

কত মহান সে ভালোবাসা, যে ভালোবাসার পুরস্কারস্বরূপ আল্লাহর ভালোবাসা অর্জিত হয়! এ ভালোবাসা যার যত গভীর, সে তত উত্তম। হাদিস শরিফে এমনটাই এসেছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

مَا تَحَابَّ الرَّجُلَانِ إِلَّا كَانَ أَفْضَلُهُمَا أَشَدَّهُمَا حُبًّا لِصَاحِبِهِ

‘যে দুই ব্যক্তি একে অপরকে ভালোবাসে, তাদের মধ্যে সে-ই উত্তম, যার ভালোবাসা বেশি গভীর।’^{২৭৯}

কাউকে ভালোবাসলে সেটা তাকে জানিয়ে দেওয়া উচিত। এর মাধ্যমে মুসলমানদের মাঝে ভালোবাসার প্রসার ঘটবে, যা ইসলামি সমাজের জন্য খুবই ইতিবাচক।

এজন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ

‘কোনো ব্যক্তি যদি কাউকে ভালোবাসে, সে যেন তাকে ভালোবাসার কথা বলে দেয়।’^{২৮০}

রাসুলুল্লাহ ﷺ অনুধাবন করেছিলেন, সুষ্ঠু সমাজ ও উম্মাহ গঠনে স্বার্থহীন এ ভালোবাসা খুব ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। তাই তিনি সুযোগ পেলেই পরস্পর ভালোবাসার প্রতি মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করতেন এবং ভালোবাসার ঘোষণা দেওয়ার নির্দেশ দিতেন। যেন হৃদয়সমূহের বন্ধ দুয়ার খুলে যায় এবং পরস্পরের মাঝে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বন্ধন সৃষ্টি হয়।

এ সম্পর্কে আনাস রাদি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন :

أَنَّ رَجُلًا كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لِأُحِبُّ هَذَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

২৭৯. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৫৪৪

২৮০. সুনানু আবি দাউদ : ৫১২৪

«أَعْلَمْتُهُ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «أَعْلِمْنِي» قَالَ: فَلَحِقَهُ، فَقَالَ: إِنِّي أَحِبُّكَ فِي
اللَّهِ، فَقَالَ: أَحَبُّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ

‘এক ব্যক্তি নবিজি ﷺ-এর নিকট ছিলেন। তার পাশ দিয়ে আরেকজন ব্যক্তি চলে গেলেন। তখন তিনি (পাশে থাকা ব্যক্তি) নবিজি ﷺ-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, ওই ব্যক্তিকে (পাশ দিয়ে যিনি চলে গেলেন) আমি ভীষণ ভালোবাসি। নবিজি ﷺ বললেন, ভালোবাসার কথা তাকে বলেছ? তিনি বললেন, না। তখন নবিজি ﷺ বললেন, তাকে জানিয়ে দাও যে, তুমি তাকে ভালোবাসো। তখন তিনি তার কাছে গিয়ে বললেন, আমি আল্লাহর জন্য আপনাকে ভীষণ ভালোবাসি। তিনি উত্তর দিলেন, দুআ করি, যে আল্লাহর জন্য তুমি আমাকে ভালোবাসো, সে আল্লাহও যেন তোমাকে ভালোবাসেন।’^{২৮১}

ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির সমাজ বিনির্মাণের জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজেও সাহাবিদের প্রতি তাঁর ভালোবাসার কথা প্রকাশ করতেন। সে ধারাবাহিকতায় একদিন তিনি মুআজ ﷺ-এর হাত ধরে বললেন :

يَا مُعَاذُ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ، فَقَالَ: أَوْصِيكَ يَا مُعَاذُ
لَا تَدْعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ،
وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

‘হে মুআজ, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি তোমাকে ভালোবাসি, আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি তোমাকে ভালোবাসি। আর তোমাকে নসিহত করছি, তুমি প্রতি (ফরজ) নামাজের পর অবশ্যই বলবে, হে আল্লাহ, আমাকে আপনার জিকির, শোকর ও উত্তম ইবাদত করতে সহযোগিতা করুন।’^{২৮২}

মুআজ ﷺ এ পবিত্র ভালোবাসার সৌরভ সকল দেশের মুসলমানদের মাঝে ছড়িয়ে দিলেন। সবাইকে জানিয়ে দিলেন যে, একে অপরকে আল্লাহর জন্য

২৮১. সুনানু আবি দাউদ : ৫১২৫

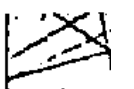
২৮২. সুনানু আবি দাউদ : ১৫২২

ভালোবাসে এমন মুসলমানদের জন্য আল্লাহ তাআলা অনেক বড় সাওয়াব ও পুরস্কার রেখেছেন, যার মধ্যে সবচেয়ে বড় পুরস্কার হলো, আল্লাহর ভালোবাসা অর্জন করা।

এ সম্পর্কে ইমাম মালিক رحمہ اللہ তার মুয়াত্তা গ্রন্থে সহিহ সনদে আবু ইদরিস খাওলানি رحمہ اللہ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন :

دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَإِذَا فَتًى شَابٌّ بَرَّاقُ الثَّنَائِيَا، وَإِذَا النَّاسُ مَعَهُ إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَسْنَدُوا إِلَيْهِ، وَصَدَرُوا عَنْ قَوْلِهِ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ، فَقِيلَ هَذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ هَجَرْتُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِالتَّهْجِيرِ، وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، قَالَ: فَأَنْتَظَرْتُهُ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ، ثُمَّ جِئْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قُلْتُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّكَ لِلَّهِ، فَقَالَ: أَللَّهُ؟ فَقُلْتُ: أَللَّهُ، فَقَالَ: أَللَّهُ؟ فَقُلْتُ: أَللَّهُ، فَقَالَ: أَللَّهُ؟ فَقُلْتُ: أَللَّهُ. قَالَ: فَأَخَذَ بِحُبُورَةٍ رِدَائِي فَجَبَذَنِي إِلَيْهِ، وَقَالَ: أَبْشِرْ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ، وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ

‘আমি দামেশকের মসজিদে প্রবেশ করলাম। সেখানে এক যুবককে দেখলাম, তার দাঁতগুলো অতিউজ্জ্বল সাদা (মুক্তার মতো)। তার সঙ্গে অনেক মানুষ আছে। যখনই কোনো ব্যাপারে মতবিরোধ হচ্ছে, সে যুবকের কথাকেই নির্ভরযোগ্য বলে গণ্য করা হচ্ছে এবং তার কথাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বিবেচিত হচ্ছে। আমি লোকদের কাছে জানতে চাইলাম যুবকটি কে? তারা বলল, তিনি মুআজ বিন জাবাল رحمہ اللہ। পরদিন ভোরে আমি মসজিদে গিয়ে দেখলাম, তিনি আমার পূর্বেই সেখানে গিয়ে নামাজ পড়ছেন। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। নামাজ শেষ হলে আমি তার সামনে গেলাম। তারপর তাকে সালাম করে বললাম, আল্লাহর কসম, আমি আপনাকে



আল্লাহর জন্য ভালোবাসি। তিনি বললেন, আল্লাহরই জন্য? আমি বললাম, জি, আল্লাহরই জন্য। তিনি আবার বললেন, আল্লাহরই জন্য? আমি বললাম, জি, আল্লাহরই জন্য। অতঃপর তিনি আমার চাদরের এক কোনা ধরে নিজের দিকে টেনে নিলেন এবং বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ করো! আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার ভালোবাসা সেই সকল লোকের জন্য ওয়াজিব, যারা আমার জন্য একে অপরকে ভালোবাসে, আমারই জন্য একে অপরের সাথে বসে, আমারই জন্য পরস্পর সাক্ষাৎ করে এবং আমারই জন্য একজন অন্যজনের জন্য খরচ করে।^{২৮৩}

মুসলমানদের জীবনে আল্লাহর জন্য ভালোবাসার প্রভাব

এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুমিনদের মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসা ইমানের অন্যতম শর্ত। এ ভালোবাসা তাদের জান্নাতের পথ ধরিয়ে দেয়।

হাদিসটি আবু হুরাইরা র. থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ

‘সেই সত্তার শপথ করে বলছি, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের মাঝে ইমান থাকবে। আর তোমাদের মাঝে ততক্ষণ পর্যন্ত (পরিপূর্ণ) ইমান আসবে না, যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদের এমন আমল বলে দেবো না, যা করলে তোমাদের পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে? (সে বিষয়টা হলো,) তোমরা নিজেদের মাঝে সালামের ব্যাপক প্রসার করো।’^{২৮৪}

২৮৩. মুয়াত্তা মালিক : ১৬

২৮৪. সহিহ মুসলিম : ৫৪, সুনানু আবু দাউদ : ৫১৯৩

রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর আল্লাহপ্রদত্ত অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, মুসলমানদের অন্তরসমূহ থেকে হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণার কদর্য বের করতে হলে তাদের মাঝে সত্যিকার ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করতে হবে। এ ভ্রাতৃত্ব একদিকে তাদের মনে ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য, পারস্পরিক কল্যাণকামিতা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করবে; অপরদিকে মন থেকে হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা ও শত্রুতা দূর করে দেবে। এজন্য তিনি তাদের মাঝে সালামের ব্যাপক প্রসার ঘটানোর নির্দেশ দেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ অনেকবার, অসংখ্যবার এ বিষয়টির প্রতি সাহাবিদের উৎসাহ দিয়েছেন, যেন তাদের অন্তরে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা বদ্ধমূল হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে এ ভালোবাসার ওপর ভিত্তি করেই রাসুলুল্লাহ ﷺ একটি সোনালি প্রজন্ম তৈরি করে যান, যারা আসমানের বার্তা জমিনের আনাচে-কানাচে যথাযথভাবে পৌঁছে দেন।

যদি তাদের অন্তরে এ পবিত্র ভালোবাসা না থাকত, তাহলে জিহাদের ময়দানে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য এমন দৃষ্টান্তহীন রক্ত ঝরানো ও প্রাণ উৎসর্গ করা তাদের পক্ষে কস্মিনকালেও সম্ভব হতো না। তাদের মাঝে এমন বিস্ময়কর সত্য ভালোবাসা ছিল বলেই রাসুলুল্লাহ ﷺ মানব-ইতিহাসের পাতায় এমন একদল মানুষের অধ্যায় রচনা করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যারা ছিলেন একটি প্রাসাদের ন্যায়, একটি দেহের মতো। স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে :

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

‘মুমিন মুমিনের জন্য ভবনের কাঠামোস্বরূপ, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে।’^{২৮৫}

অপর এক হাদিসে তিনি বলেন :

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادُّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

২৮৫. সহিহুল বুখারি : ২৪৪৬, সহিহ মুসলিম : ২৫৮৫

‘পারস্পরিক সৌহার্দ্য, দয়া প্রদর্শন ও সহানুভূতিশীল হওয়ার ক্ষেত্রে সকল মুমিন এক দেহের ন্যায়, যার একটি অঙ্গ অসুস্থ হলে পুরো শরীর অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।’^{২৮৬}

অন্য হাদিসে বলেন :

الْمُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ، إِنْ اشْتَكَى عَيْنُهُ، اشْتَكَى كُلُّهُ، وَإِنْ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ

‘সকল মুসলমান একজন ব্যক্তির মতো, যার চোখ বা মাথায় ব্যথা আসলে পুরো শরীর সে ব্যথা অনুভব করে।’^{২৮৭}

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এ সকল হাদিস ও নির্দেশনা জানার পর প্রকৃত মুসলমানের অন্তর মুসলমানদের প্রতি ভালোবাসা ও সৌহার্দ্যে ভরপুর হয়ে যায়। ফলে সে পৃথিবীতে কল্যাণ ও মঙ্গলের গুরুত্বপূর্ণ একটি উপাদান হয়ে ওঠে। আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাকে ভালোবাসেন।

ভাই-বন্ধুদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ এবং তাদের সাথে কথা বলা বন্ধ করে না

প্রকৃত মুসলমান জানে, ইসলাম যেভাবে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা, সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা ও সহানুভূতি প্রদর্শনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে; সেভাবে শত্রুতা, সম্পর্ক ছিন্ন করা ও একে অপরকে পরিত্যাগ করা হারাম করেছে। ইসলাম এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, যে দুব্যক্তি পরস্পরকে সত্যিকারার্থে ভালোবাসে, ছোটোখাটো ভুলত্রুটি তাদের ভালোবাসায় চিড় ধরাতে পারে না। কেননা, আল্লাহর জন্য ভালোবাসার বন্ধন কোনো একজনের গুনাহের কারণে ছিন্ন হয়ে যাওয়ার মতো নড়বড়ে নয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَا تَوَادَّ اثْنَانِ فِي اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ أَوْ فِي الْإِسْلَامِ فَيُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا أَوَّلَ ذَنْبٍ يَحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا

২৮৬. সহিহ মুসলিম : ২৫৮৬

২৮৭. সহিহ মুসলিম : ৬৭

‘যে দুজনের পারস্পরিক ভালোবাসা তাদের কোনো একজন থেকে সংঘটিত প্রথম গুনাহের কারণে ছিন্ন হয়ে যায়, তাদের ভালোবাসা আল্লাহ বা ইসলামের জন্য ছিল না।’^{২৮৮}

ইসলাম মানুষের মানবিক স্বভাব সম্পর্কে খুব ভালোভাবে অবগত। ইসলাম জানে, মানুষের মনে রাগ ও মান-অভিমান আসাটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তাই অভিমান ও রাগের আগুন নিভিয়ে ফেলার একটা সময়সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। এ সময়সীমার ভেতর ঝগড়াকারীদের কোনো একজন বা উভয়জন অগ্রসর হয়ে বিবাদ মিটিয়ে ফেলতে হবে। নির্ধারিত সময়সীমা পার হওয়ার পর রাগ করে থাকা হারাম।

এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ: فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ

‘কোনো মুসলমান ব্যক্তির জন্য অপর মুসলমান ভাইয়ের সাথে তিন দিনের অধিক রাগ করে কথা না বলে থাকা এবং সাক্ষাৎ হলে একজন এদিকে অপরজন ওদিকে তাকিয়ে থাকা বৈধ নয়। আর তাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি উত্তম, যে প্রথমে সালাম দেয়।’^{২৮৯}

প্রকৃত মুসলমান অপর মুসলমান ভাইয়ের সাথে রাগ করে কথা না বলে থাকতে পারে না। পরিস্থিতি যত প্রতিকূলেই থাকুক, সে তাকে সালাম দিয়ে বিবাদ মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করে। কেননা, দুই বিবাদকারীর মধ্যে সেই উত্তম, যে প্রথমে সালাম দিয়ে বিবাদের মীমাংসা করে ফেলে। এবার অপর ভাই যদি সালামের উত্তর দেয়, তাহলে মীমাংসা করার সাওয়াবে উভয়জন শরিক হবে। আর যদি সালামের উত্তর না দেয়, তাহলে প্রথমজন সম্পর্ক ছিন্ন করা ও রাগ করে কথা না বলে থাকার পাপ থেকে মুক্তি পাবে। কিন্তু যে সালামের উত্তর দেয়নি, সে একাই গুনাহগার থাকবে।

২৮৮. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৪০১

২৮৯. সহিহুল বুখারি : ৬০৭৭, সহিহ মুসলিম : ২৫৬০

আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে এ সম্পর্কে স্পষ্ট বিবরণ এসেছে। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সঃ-কে বলতে শুনেছি :

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَإِذَا مَرَّتْ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَلْيَلْقَهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ فَقَدْ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ، وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَرِيَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْهَجْرَةِ

‘কোনো ব্যক্তির জন্য কোনো মুমিনের সাথে তিন দিনের অধিক সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকা বৈধ নয়। তিনদিন অতিবাহিত হয়ে গেলে তার সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে সালাম করবে। যদি সালামের উত্তর দেয়, তাহলে উভয়জন সাওয়াবের মধ্যে শরিক হবে। আর যদি সালামের উত্তর না দেয়, তবে প্রথমজন সম্পর্ক ছিন্ন করার পাপ থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে।’^{২৯০}

মোটকথা, তিন দিনের অধিক কোনো মুসলমানের সাথে রাগ করে কথা বন্ধ করে থাকা বৈধ নয়। তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর যত দ্রুত সম্ভব মীমাংসা করে নিতে হবে। অন্যথায় সময় যত বৃদ্ধি পাবে, পাপের বোঝাও তত ভারী হতে থাকবে।

রাসুলুল্লাহ সঃ ইরশাদ করেছেন :

مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفِكَ دَمِهِ

‘যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে এক বছর সম্পর্কচ্ছেদ করে থাকল, সে যেন তাকে হত্যা করল।’^{২৯১}

ইসলাম ধর্মে মুসলমানদের তারবিয়াতের ভিত্তি পারস্পরিক ভালোবাসা, নৈকট্য ও হৃদয়তার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই প্রকৃত মুসলমানের অন্তরে মুসলমানদের প্রতি কোনোরূপ শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণাবোধ থাকে না। তার ভেতর এসব খারাপ গুণাবলি থাকবেই বা কীভাবে, যখন রাসুলুল্লাহ সঃ-এর নিম্নোক্ত বাণীগুলো তার কানে বাজতে থাকে!

২৯০. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৪১৪

২৯১. সুনানু আবি দাউদ : ৪৯১৫, আল-আদাবুল মুফরাদ : ৪০৪

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

لَا تَقَاطَعُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَكُونُوا إِخْوَانًا
كَمَا أَمَرَكُمُ اللَّهُ

‘তোমরা একে অপরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন কোরো না, শত্রুতা কোরো না, বিদ্বেষভাব পোষণ কোরো না এবং পরস্পরে হিংসা কোরো না; বরং আল্লাহ তাআলার নির্দেশমাফিক পরস্পর ভাই-ভাই হয়ে যাও।’^{২৯২}

অন্য হাদিসে তিনি ইরশাদ করেছেন :

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا،
وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

‘তোমরা অবশ্যই কুধারণা ও অনুমাননির্ভর কথা বলা থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা, কুধারণা ও অনুমাননির্ভর কথা সবচেয়ে বড় মিথ্যা। তোমরা অন্যের দোষ খুঁজে বেড়াবে না, গোয়েন্দাগিরিতে লিপ্ত হবে না, কান কথা বলবে না, পরস্পরে হিংসা করবে না, একে অপরের প্রতি বিদ্বেষভাব রাখবে না এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না; বরং আল্লাহর বান্দা হয়ে সবাই ভাই-ভাই হয়ে থাকবে।’^{২৯৩}

আরেক হাদিসে তিনি বলেন :

لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِيعُ
بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا الْمُسْلِمُ أَخُو
الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ الثَّقَوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى
صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «يَحْسِبُ امْرِيٍّ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ،
كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعَرَضُهُ

২৯২. সহিহ মুসলিম : ৩০

২৯৩. সহিহুল বুখারি : ৬০৬৪, সহিহ মুসলিম : ২৫৬৩

‘তোমরা একে অপরের প্রতি হিংসা করবে না, ধোঁকা দেবে না, বিদ্বেষ পোষণ করবে না, শত্রুতা করবে না এবং একজনের বেচা-কেনার প্রস্তাবের ওপর আরেকজন প্রস্তাব করবে না; বরং সকলে আল্লাহর বান্দা ও ভাই-ভাই হয়ে থাকবে। এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার ওপর জুলুম করে না, (বিপদে) একা ফেলে যায় না এবং তাকে অবজ্ঞা করে না। এ ছাড়া তিনবার বুকের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, তাকওয়া এখানে (অর্থাৎ এ সবকিছু সুষ্ঠুভাবে করার জন্য অন্তরে তাকওয়া থাকতে হবে)। কোনো ব্যক্তি খারাপ হওয়ার জন্য তার কোনো মুসলমান ভাইকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছজ্ঞান করাই যথেষ্ট। এক মুসলমানের ওপর অপর মুসলমানের জানমাল ও মান-সম্মান (বিনষ্ট করা) হারাম।’^{২৯৪}

যে মুসলমান রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এ হাদিসগুলো নিয়ে চিন্তা করে, যা সকল উত্তম চরিত্র ও উন্নত গুণকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে, তার মাঝে কখনো মুসলমানদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ থাকতে পারে না। তবে হ্যাঁ, কারও অন্তরে যদি রোগ থাকে, স্বভাবে যদি রুঢ়তা থাকে, মেজাজে যদি বক্রতা থাকে, তবে তার কথা ভিন্ন।

এজন্যই রাসুলুল্লাহ ﷺ ইসলামি চরিত্র ও উদারতা-বিবর্জিত এসব রুক্ষ ও কঠোর স্বভাবের লোকদের আখিরাতে তাদের কঠোর অবস্থার কথা জানিয়ে দিয়ে সতর্ক করেছেন। জানিয়ে দিয়েছেন, যদি তারা নিজেদের স্বভাব অনুযায়ী কোনো মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতার ওপর অটল থাকে, তাহলে আখিরাতে তারা আল্লাহর রহমত ও ক্ষমা থেকে বঞ্চিত থাকবে, জান্নাতের দরজাসমূহ তাদের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে।

এ সম্পর্কে হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে :

تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءٌ، فَيَقَالُ:

أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَضْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَضْطَلِحَا، أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَضْطَلِحَا

‘সোমবার ও বৃহস্পতিবারে জান্নাতের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। অতঃপর শিরক করে না এমন সকল বান্দাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। কিন্তু যে ব্যক্তির অন্তরে তার ভাইয়ের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ আছে, তাকে ক্ষমা করা হয় না। তখন এ কথা বলা হয় যে, এ দুজনের ক্ষমাকে মূলতবি রাখো, যতক্ষণ না তারা মীমাংসা করে ফেলে। এ দুজনের ক্ষমাকে মূলতবি রাখো, যতক্ষণ না তারা মীমাংসা করে ফেলে। এ দুজনের ক্ষমাকে মূলতবি রাখো, যতক্ষণ না তারা মীমাংসা করে ফেলে।’^{২৯৫}

আবু দারদা ؓ বলেন :

أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِمَا هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصِّيَامِ؟ صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، أَلَا وَإِنَّ الْبُغْضَةَ هِيَ الْحَالِقَةُ

‘আমি কি তোমাদের এমন বিষয় সম্পর্কে বলব না, যা সদকা দেওয়া ও রোজা রাখার চেয়েও উত্তম? তা হলো, পারস্পরিক বিদ্বেষভাব ও শত্রুতা মিটমাট করে ফেলা। জেনে রেখো, (মুসলমানের প্রতি) শত্রুতা ও বিদ্বেষ দ্বীনকে মুণ্ডন করে দেয়।’^{২৯৬}

আবু দারদা ؓ তাঁর দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা ও চিন্তার প্রখরতার কারণে রাসুলুল্লাহ ؐ-এর ভরসার পাত্র ছিলেন। তিনি ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার ওপর প্রতিষ্ঠিত দ্বীন ইসলামের গভীরে দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পেরেছেন, কোনো মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করলে তাদের আমল ধ্বংস হয়ে যায়, প্রতিদান বিনষ্ট হয়ে যায় এবং আমলনামা থেকে সাওয়াব মুছে যায়। এজন্যই তিনি বলেছেন, মন থেকে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা মিটিয়ে ফেলা সদকা করা ও রোজা রাখার চেয়েও উত্তম। কেননা, সে যদি সম্পর্কহীনতা, রাগ, হিংসা ও

২৯৫. সহিহ মুসলিম : ২৫৬৫

২৯৬. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৪১২

শত্রুতার ওপর অটল থাকে, তাহলে শুধু সদকা আর রোজা কেন, কোনো আমলের সাওয়াবই তো তার আমলনামায় স্থায়ী হতে পারবে না।

তবে আবু দারদা ؓ কথাটি নিছক নিজের গবেষণা থেকে বলেননি; বরং রাসুলুল্লাহ ؐ-এর হাদিস থেকেই বলেছেন। হাদিসটি সুনানে তিরমিজিতে তাঁরই সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। রাসুলুল্লাহ ؐ ইরশাদ করেছেন :

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ، قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «صَلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» وَيُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «هِيَ الْحَالِقَةُ لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ، وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ»

‘আমি কি এমন এক আমলের ব্যাপারে তোমাদের বলব, যা রোজা, নামাজ ও সদকার চেয়ে উত্তম? সাহাবায়ে কিরাম বললেন, অবশ্যই বলুন। তিনি বললেন, হিংসা-বিদ্বেষ মিটিয়ে ফেলা। কেননা, হিংসা-বিদ্বেষ হলো মুণ্ডনকারী (ধ্বংসকারী)। ইমাম তিরমিজি ؓ হাদিসটিকে হাসান সহিহ বলেছেন। নবিজি ؐ থেকে আরও বর্ণিত আছে, তিনি বললেন, এটা (অর্থাৎ হিংসা-বিদ্বেষ) মুণ্ডনকারী। তবে আমি মাথা মুণ্ডানোর কথা বলছি না; বরং দীন মুণ্ডিয়ে ফেলার কথা বলছি।’^{২৯৭}

তাদের প্রতি উদার এবং দোষত্রুটি ক্ষমা করে দেয়

প্রকৃত মুসলমানের মনে কোনো মুসলমান ভাইয়ের প্রতি যদি রাগ আসে, তখন রাগ সংবরণ করে ফেলে এবং তাকে দ্রুত ক্ষমা করে দেয়। এতে সে কোনোরূপ অসম্মান ও লজ্জা অনুভব করে না; বরং এটাকে ইহসান বা বিশেষ সৎকর্ম মনে করে, যা বান্দাকে আল্লাহর নৈকট্যশীল করে এবং তাঁর বিশেষ ভালোবাসার যোগ্য করে তোলে। আর এটা একমাত্র তিনি ইহসানকারীদের বা বিশেষ সৎকর্মশীলদেরই দান করে থাকেন।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

‘যারা নিজেদের রাগ সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে, (তারা সৎকর্মশীল)। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।’^{২৯৮}

অনেক সময় মানুষ রাগকে তো সংবরণ করে ফেলে, কিন্তু হিংসা-বিদ্বেষের কড়াই তার বক্ষে টগবগ করে ফুটতে থাকে। অতঃপর তা পরিণত হয় চরম শত্রুতায়। প্রকাশ্য রাগ পরিণত হয় গোপন বিদ্বেষে। অথচ শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষের চেয়ে রাগ অনেক ভালো ও পবিত্র। তবে প্রকৃত মুসলমান রাগ সংবরণ করার সাথে সাথে তাকে ক্ষমাও করে দেয়। ফলে তার ভেতর হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা বাসা বাঁধতে পারে না। এভাবে সে ইহসানকারীদের দলভুক্ত হয়ে যায়।

রাগ যখন সংবরণ করা হয়, তখন মনের ওপর সেটাকে ভারী বোঝা মনে হয় এবং রাগের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মনের ভেতরটাকে পুড়িয়ে ফেলতে থাকে। কিন্তু রাগ সংবরণ করার সাথে সাথে মন থেকে ক্ষমা করে দেওয়া হলে সে বোঝা হালকা হয়ে আসে এবং অন্তর ঠান্ডা ও প্রশান্ত হয়ে যায়। এটাই ইহসান বা বিশেষ সৎকর্ম, যা মুসলমান তার ভাইকে ক্ষমা করে দেওয়ার মাধ্যমে করে থাকে।

প্রকৃত মুসলমান অপর মুসলমান ভাইকে ক্ষমা করে দেয়। কেননা, এটা প্রকৃত অর্থে তার প্রতি বিনয় প্রদর্শন, যার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা সম্মান ও মর্যাদা দান করেন।

এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

‘কেউ কাউকে ক্ষমা করে দিলে তার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তার সম্মান বাড়িয়ে দেন এবং কেউ কারও প্রতি আল্লাহর জন্য বিনয় প্রদর্শন করলে আল্লাহ তাআলা তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন।’^{২৯৯}

২৯৮. সূরা আলি ইমরান : ১৩৪

২৯৯. সহিহ মুসলিম : ২৫৮৮

ক্ষমা করা ও বিনয় প্রদর্শন করা আল্লাহর পক্ষ থেকে সম্মান ও মর্যাদা লাভের উপায়। এ দুই বিষয়ও সে ইহসানের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ তাআলা উদার ও ক্ষমাশীল মুসলমানদের গুণ হিসাবে অভিহিত করেছেন। এখান থেকে প্রতীয়মান হয়, কেউ রাগ সংবরণ করার পর ক্ষমা করে দিলে সে ইহসানকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, যাদের আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন এবং এমন সম্মানিত লোকদের দলভুক্ত হয়ে যায়, যাদের লোকজন ভালোবাসে।

প্রকৃত মুসলমানের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষের কোনো স্থান নেই। কারণ, আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার জন্য অন্যকে ক্ষমা করা ও হিংসা-বিদ্বেষ থেকে অন্তর পরিচ্ছন্ন থাকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা সে জানে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

ثَلَاثٌ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ، غُفِرَ لَهُ مَا سِوَاهُ لِمَنْ شَاءَ، مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ
بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَمْ يَكُنْ سَاحِرًا يَتَّبِعُ السَّحْرَةَ، وَلَمْ يَحْقِدْ عَلَى أَخِيهِ

‘তিনটা গুনাহ যার মধ্যে না থাকবে, তার অন্যান্য গুনাহ আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিতে পারেন। এক. যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেল যে, সে আল্লাহর সাথে শিরক করত না। দুই. যে ব্যক্তি জাদুকর ছিল না এবং জাদুর অনুসরণ করত না। তিন. যে ব্যক্তি কোনো মুসলমান ভাইয়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত না।’^{৩০০}

দেখা-সাক্ষাৎ করার সময় হাস্যমুখ থাকে

উল্লিখিত বিষয়গুলোর পাশাপাশি মুসলমানকে সাদা মনের মানুষ হতে হয়, যে খোলামনে ও হাসিমুখে ভাই-বন্ধুদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ এটার প্রতি উৎসাহিত করে বলেন :

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلِقٍ

‘কোনো উত্তম আমলকে তুচ্ছ মনে কোরো না; যদিও তা তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করার মতো (ছোট আমল) হোক।’^{৩০১}

সদা হাস্যমুখ থাকা এমন একটি গুণ, যার প্রতি ইসলাম উৎসাহিত করেছে এবং সেটাকে অন্যতম নেক আমল বলা হয়েছে; যার জন্য সাওয়াব ও প্রতিদান দেওয়া হবে। এর কারণ হলো, মুখের হাসি অন্তরের পরিচ্ছন্নতার বার্তা দেয়। আর অন্তর পরিচ্ছন্ন থাকা কত বড় গুণ, তা তো একটু আগেই আমরা আলোচনা করে আসলাম। এজন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ মুখে হাসি রাখার প্রতি লোকদের খুব উৎসাহিত করতেন।

তিনি ইরশাদ করেছেন :

تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ

‘তোমার ভাইয়ের সামনে মুচকি হাসা তোমার জন্য একটি সদকা।’^{৩০২}

রাসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের সামনে সব সময় হাসিমুখে থাকতেন। কারও দিকে তাকালে তাকে একটি মুচকি হাসি উপহার দিতেন। এ সম্পর্কে সহিহাইনে জারির বিন আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি বলেন :

مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلَا رَأَيْتُ إِلَّا تَبَسَّمَ

‘আমি যখনই রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম দিয়েছি, কোনোবারেই তিনি আমাকে জবাব না দিয়ে থাকেননি। আর আমাকে দেখে সর্বদাই তিনি মুচকি হাসি উপহার দিতেন।’^{৩০৩}

আলি রضى الله عنه বলেন, ‘যখন দুজন মুসলমান একত্র হয়ে আলাপ-আলোচনা করে, তখন উভয়ের মধ্যে যে হাসিমুখে কথা বলে, তাকে আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেন।’

৩০১. সহিহ মুসলিম : ২৬২৬

৩০২. সুনানুত তিরমিজি : ১৯৫৬

৩০৩. সহিহুল বুখারি : ৩০৩৫, সহিহ মুসলিম : ২৪৭৫

এজন্যই সাহাবায়ে কিরাম ﷺ—যাদের অন্তরে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশনা জীবন্ত ছিল—একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করলে মুসাফাহা করতেন এবং কোনো সফর থেকে ফিরলে আলিঙ্গন করতেন। কেননা, এতে পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা ও হৃদয়তা সৃষ্টি হয়।

ইবনে সাদ ﷺ তার তাবাকাত গ্রন্থে ইমাম শাবি ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন খাইবার থেকে ফিরে আসলেন, তখন জাফর বিন আবি তালিব ﷺ তাঁর সাথে দেখা করলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং দুচোখের মাঝখানে চুম্বন করলেন। অতঃপর বললেন, আমি বুঝতে পারছি না, কী কারণে আমি এত আনন্দিত? জাফর ফিরে আসার কারণে, নাকি খাইবার বিজয়ের কারণে? আরেক রিওয়াযাতে এসেছে, তিনি তাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং আলিঙ্গন করলেন।

মুসলমানদের পারস্পরিক সাক্ষাতের সময় সালাম দেওয়া, মুসাফাহা করা ও আলিঙ্গন করা ইসলামে পছন্দনীয়। কেননা, এর মাধ্যমে পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য অক্ষুণ্ণ থাকে এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় ও মজবুত হয়। ফলে সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা এবং মুসলমানদের মাঝে ইসলামের সকল বিধান বাস্তবায়ন করা সহজ হয়ে যায়।

তাদের কল্যাণ কামনা করে

প্রকৃত মুসলমান আল্লাহ, কুরআন, রাসুল, মুসলমানদের নেতাগণ ও সকল মুসলমানের কল্যাণ কামনা করে।

সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

«الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيِّمَّةِ
الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»

‘দ্বীন হলো কল্যাণকামিতা। আমরা (উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম) বললাম, কার জন্য? তিনি বললেন, আল্লাহ, তাঁর কিতাব, রাসুল, নেতৃস্থানীয় মুসলমান এবং সকল সাধারণ মুসলমানের জন্য।’^{৩০৪}

প্রকৃত মুসলমান ভাই-বন্ধুদের কল্যাণকামী হয়। তাদের সাথে ধোঁকাবাজি করে না এবং প্রতারণা করে না। কারণ, সে জানে, কল্যাণকামিতা ইসলামের অন্যতম মূলনীতি, যার ব্যাপারে প্রাথমিক যুগের মুসলমানরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অঙ্গীকার করেছিলেন।

এ সম্পর্কে জারির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন :

بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

‘আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নামাজ কায়েম করা, জাকাত আদায় করা ও প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কল্যাণ কামনা করার ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছি।’^{৩০৫}

পূর্বের হাদিসে আমরা দেখেছি, রাসুলুল্লাহ ﷺ দ্বীনের পরিচয় দিয়েছেন মাত্র একটি শব্দ ‘নাসিহা’ বা কল্যাণকামিতার মাধ্যমে। এখান থেকেই বুঝা যায়, কল্যাণকামিতা হলো দ্বীনের মূলভিত্তি। কেননা, কল্যাণকামিতা ছাড়া মানুষের ইমান যথার্থ হয় না এবং ইসলাম সুন্দর হয় না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

‘তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে, অপর মুমিন ভাইয়ের জন্যও তাই পছন্দ করবে।’^{৩০৬}

এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, নিজের জন্য যা পছন্দ করে, অপরের জন্যও তাই পছন্দ করা সহজ বিষয় নয়। তবে কোনো মানুষের মনে যখন এ কথা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, নিজের জন্য যা পছন্দ করে অপরের জন্যও তা পছন্দ করা ইমানের অন্যতম শর্ত এবং কল্যাণকামিতাই হলো দ্বীন, তখন তার

৩০৫. সহিহুল বুখারি : ৫৭, ৫২৪; সহিহ মুসলিম : ৫৬

৩০৬. সহিহুল বুখারি : ১৩

জন্য এটা মোটেই কঠিন কিছু থাকে না; বরং সেটা প্রকৃত মুসলমানের স্বভাবে পরিণত হয়ে যায়। বিগত সময় ও বর্তমান সময়ের প্রকৃত মুসলমানদের মাঝে এর নজির ভুরিভুরি আছে।

এ জায়গায় এসে একটি কাহিনি মনে পড়ে গেল, যা বুড়োবুড়িরা বলে থাকেন। এ কাহিনি শামের কিছু ব্যবসায়ীদের। তখনকার সময়ের প্রত্যেক জিনিসের জন্য আলাদা আলাদা বাজার বসত। যেমন সকল আতরের দোকান এক বাজারে, সকল রঙের দোকান এক বাজারে, সকল দর্জির দোকান এক বাজারে। এভাবে অন্যান্য বস্তুরও আলাদা আলাদা বাজার বসত। তখন তাদের একজনের নিকট প্রথম ক্রেতা যে আসত, তাকে স্বাভাবিকভাবে জিনিস বিক্রি করত। এরপর তার দোকানে দ্বিতীয় ক্রেতা আসলে সে প্রথমে দেখে নিত, পাশের দোকানদার এতক্ষণ ধরে কাউকে কিছু বিক্রি করতে পেরেছে কি না। যদি দেখত, না, এখনো সে কিছু বিক্রি করতে পারেনি, তখন ক্রেতাকে ভদ্রভাবে বলত, আপনি পাশের দোকান থেকে ক্রয় করুন। কারণ, আমি একটু আগে বিক্রি করেছি, আর সে এতক্ষণ পর্যন্ত কিছুই বিক্রি করতে পারেনি।

সুবহানাল্লাহ! ভ্রাতৃত্ব ও সহমর্মিতার কেমন প্রকৃষ্ট উদাহরণ! আসলে যাদের অন্তরে এ কথা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে, কল্যাণকামিতা দ্বীনের মূলভিত্তি; আর প্রকৃত মুমিন হতে হলে অপর ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করতে হবে, যা নিজের জন্য পছন্দ করে, তাদের মাঝে এমন ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার বন্ধন মোটেই আশ্চর্যের কিছু নয়।

মুসলমানদের পারস্পরিক ভালোবাসা ও কল্যাণকামিতার আরেকটি দাবি হলো, কারও মাঝে দোষ দেখতে পেলে তা চুপিসারে তাকে জানিয়ে দেওয়া।

এ ব্যাপারে আবু হুরাইরা রাঃ বলেন :

الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ أَخِيهِ، إِذَا رَأَى فِيهَا عَيْبًا أَصْلَحَهُ

‘মুমিন তার (অপর মুমিন) ভাইয়ের জন্য আয়নারূপ। যখন তার মাঝে কোনো দোষ দেখতে পায়, তখন তা সংশোধন করে দেয়।’^{৩০৭}

আবু হুরাইরা ؓ তার কথাটি রাসুলুল্লাহ ؐ-এর নিম্নের হাদিস থেকে বলেছেন, যেখানে তিনি ইরশাদ করেছেন :

الْمُؤْمِنُ مِرْآةُ أَخِيهِ، وَالْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، يَكْفُ عَلَيْهِ ضِيَعَتُهُ،
وَيَحُوطُهُ مِنْ وَرَائِهِ

‘মুমিন তার (মুমিন) ভাইয়ের আয়নাস্বরূপ। আর মুমিন তো মুমিনের ভাই, যে তার অনুপস্থিতিতে তার সম্পদের হিফাজত করে এবং তার অবর্তমানেও তার প্রতি সমর্থন জানায়।’^{৩০৮}

আগেও উল্লেখ করেছি, অধিকাংশ মানুষের জন্য অপরের কল্যাণ কামনা করা এবং নিজের জন্য যা পছন্দ করে, সবার জন্যও তা পছন্দ করা অনেক কঠিন। কিন্তু এ বিষয়টি প্রকৃত মুসলমানের স্বভাবে পরিণত হয়ে গেছে। তাই চাইলেও সে এর বিপরীত করতে পারে না। কেননা, প্রকৃত মুসলমানের মাঝে ইসলামের আখলাক-চরিত্র ও উত্তম গুণাবলি প্রতিষ্ঠিত থাকে। সেজন্য তার থেকে সব সময় ইসলামের সৌন্দর্যই প্রকাশ পায়। কারণ, যে পাত্রে যা আছে, তাই তো সেখান থেকে ঝরবে! ফুল থেকে তো শুধু সুরভিই ছড়ায়! ভালো জমি থেকে সর্বদা ভালো ফসলই উৎপাদিত হয়!

কবি খুব সুন্দর বলেছেন :

وهل ينبت الخطي إلا وشيجه ** وتغرس إلا في منابتها النخل

‘উত্তম বল্লম উৎপাদিত করতে হলে তার আসল শেকড় লাগে। তেমনই খেজুর বৃক্ষ উৎপাদন করতে হলে তার উৎপাদনস্থলেই রোপণ করতে হয়।’

তাদের সাথে সদ্যবহার করে এবং কৃত অঙ্গীকার পালন করে

ইসলাম তার সকল অনুসারীকে স্বীয় বন্ধুদের সাথে সদাচারী ও বিশ্বস্ত হতে বলে। এমনকি পিতা-মাতার বন্ধুদের সাথেও সদ্যবহার করতে উৎসাহিত করে, যার বিস্তারিত বিবরণ ‘পিতা-মাতার সাথে মুসলমানের সম্পর্ক’ অধ্যায়ে

৩০৮. আল-আদাবুল মুফরাদ : ২৩৯

গত হয়েছে। কেননা, তা নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের আলামত। সালাফে সালিহিন তাদের জীবনে এ গুণ পুরোপুরিভাবে অবলম্বন করেছিলেন।

আব্দুল্লাহ বিন দিনার ؓ ইবনে উমর ؓ থেকে বর্ণনা করেন :

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ لَقِيَهُ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ، وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ. وَأَعْطَاهُ عِمَامَةً، كَانَتْ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ ابْنُ دِينَارٍ: فَقُلْنَا لَهُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّهُمْ الْأَعْرَابُ وَإِنَّهُمْ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيرِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ أَبَا هَذَا كَانَ وَدًّا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ أَبْرَّ الْبِرِّ صَلََةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وَدِّ أَبِيهِ»

‘একদিন মক্কার পথে চলার সময় এক বেদুইনের সাথে ইবনে উমর ؓ-এর দেখা হলে তিনি তাকে সালাম দিলেন, এরপর যে গাধার ওপর তিনি উপবিষ্ট ছিলেন তাতে তাকে তুলে নিলেন এবং তার মাথায় যে পাগড়িটি পরা ছিল তা তাকে প্রদান করলেন। ইবনে দিনার ؓ বলেন, তখন আমরা তাকে বললাম, আব্দুল্লাহ আপনার কল্যাণ করুন! এরা গ্রাম্য মানুষ, সামান্য কিছু পেলেই এরা সন্তুষ্ট হয়ে যায়! (তাই এতসব করার কী প্রয়োজন ছিল?) উত্তরে ইবনে উমর ؓ বললেন, এ লোকটির পিতা উমর বিন খাত্তাব ؓ-এর বন্ধু ছিলেন। আর আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, পুত্রের জন্য পিতার বন্ধু-বান্ধবের সাথে সুসম্পর্ক রাখা অনেক বড় সাওয়াবের কাজ।’৩০৯

রাসুলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদের অন্তরসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও যত্ন খুব ভালোভাবেই করেছিলেন; বিধায় তাদের অন্তরসমূহে বিশ্বস্ত বন্ধুত্বের বীজ বপন করা তাঁর জন্য সহজ হয়ে গিয়েছিল। তাই যখনই সুযোগ পেতেন, তাদের এ ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন।

হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে :

جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ بَقِيَ مِنْ بَرِّ أَبَوَيْ شَيْءٍ أَبْرَهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ قَالَ: «نَعَمْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا، وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا، وَإِنْفَادُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا»

‘বনু সালাম গোত্রের এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদ্যবহার করার কি কোনো পন্থা আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আছে। আর তা হলো, তাদের জন্য দুআ করা, তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করা, তাদের কৃত ওয়াদাসমূহ বাস্তবায়ন করা, তাদের বন্ধু-বান্ধবের সম্মান করা এবং তাদের সূত্র ধরে যারা তোমার আত্মীয় হয়েছে, তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা।’^{৩১০}

রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজেও বন্ধুত্বের সম্পর্ক ও বিশ্বস্ততা টিকিয়ে রাখার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করতেন। এমনকি খাদিজা ؓ-এর বান্ধবীদের সাথে তিনি এত বেশি সদ্যবহার করতেন যে, আয়িশা ؓ-এর মনে খাদিজা ؓ-এর প্রতি নারীসুলভ ঈর্ষা জেগে উঠত।

আয়িশা ؓ নিজেই তার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি বলেন :

مَا غَرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا غَرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، وَمَا رَأَيْتُهَا، وَلَكِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْرِزُ ذِكْرَهَا، وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يَقَطُّعُهَا أَغْضَاءً، ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيجَةَ، فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ: كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةً إِلَّا خَدِيجَةُ، فَيَقُولُ «إِنَّهَا كَانَتْ، وَكَانَتْ، وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ»

৩১০. সুনানু আবি দাউদ : ৫১৪২, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৬৬৪

‘নবিজি ﷺ-এর সহধর্মিনীদের মধ্যে খাদিজা ﷺ-এর প্রতি আমার যে পরিমাণ ঈর্ষা ছিল, অন্য কারও প্রতি সে পরিমাণ ছিল না; অথচ তাকে আমি কোনোদিন দেখিইনি! তবুও তার প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়ার কারণ হলো, নবিজি ﷺ তাকে একটু বেশিই স্মরণ করতেন। যখনই কোনো ছাগল জবাই করতেন, তা থেকে কিছু গোশত খাদিজার বান্ধবীদের নিকট অবশ্যই পাঠিয়ে দিতেন। অনেক সময় আমি বলেই বসতাম, দুনিয়াতে বুঝি খাদিজা ছাড়া আর কোনো স্ত্রী-ই নেই! তখন তিনি ﷺ বলতেন, হ্যাঁ, তার মতো স্ত্রী একজনই ছিল। তা ছাড়া সে আমার সন্তানের জন্ম দিয়েছে।’^{৩১১}

অপর এক বর্ণনায় আছে :

وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيُهِدِي فِي خَلَائِلِهَا مِنْهَا مَا يَسْعُهُنَّ

‘আর কোনো ছাগল জবাই করলে তা থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ অংশ তার (খাদিজার) বান্ধবীদের কাছে হাদিয়া পাঠাতেন।’^{৩১২}

এটাই ইসলাম ধর্মে বন্ধুত্বের স্বরূপ, যেখানে দূরের বন্ধু অর্থাৎ মৃত পিতা-মাতা ও স্ত্রীদের বান্ধবীদের সাথেও সদ্যবহার করা হয়। তাহলে আমাদের নিকটতম বন্ধুদের সাথে কেমন উত্তম ব্যবহার ও সদাচরণ করতে হবে, তা কি আর বলার অপেক্ষা রাখে?

ভাই-বন্ধুদের প্রতি ভালোবাসা, সদ্যবহার ও কল্যাণকামিতার অন্যতম দাবি ও বহিঃপ্রকাশ হলো, সর্বাবস্থায় তাদের সহযোগিতা করা। সুতরাং তাদের কেউ যদি হকের ওপর থাকে, তাহলে তার পক্ষে দাঁড়িয়ে তার সমর্থন করতে হবে এবং তার বিপদ প্রতিহত করার চেষ্টা করতে হবে। পক্ষান্তরে তাদের কেউ যদি হকের বিপক্ষে থাকে, তখনও তাকে সহযোগিতা করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সহযোগিতা করার পন্থা হলো, তাকে হকের বিরুদ্ধাচরণ করতে নিষেধ করা এবং ভালোভাবে বুঝিয়ে অন্যায় ও জুলুমের পথ থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা।

৩১১. সহিহুল বুখারি : ৩৮৩৮

৩১২. সহিহুল বুখারি : ৩৮১৬

এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

وَلْيَنْصُرِ الرَّجُلُ أَخَاهُ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، إِنْ كَانَ ظَالِمًا فَلْيَنْتَهِهِ، فَإِنَّهُ لَهُ
نَصْرٌ وَإِنْ كَانَ مَظْلُومًا فَلْيَنْصُرْهُ

‘প্রত্যেক লোকের উচিত তার ভাইয়ের সাহায্য করা, চাই সে জালিম (অত্যাচারী) হোক বা মাজলুম (অত্যাচারিত)। যদি সে জালিম হয়, তাহলে জুলুম থেকে বিরত রাখাই হলো তাকে সাহায্য করা। আর যদি মাজলুম হয়, তাহলে (জুলুম থেকে রক্ষা করে) তাকে সাহায্য করবে।’^{৩১৩}

প্রকৃত মুসলমান তার ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে না, সে জালিম হোক বা মাজলুম হোক। কেননা, ইসলাম তাকে শিক্ষা দিয়েছে, নিজের জন্য সে যা পছন্দ করে, তার ভাইয়ের জন্যও তা-ই পছন্দ করতে হবে। যেহেতু সে নিজের ব্যাপারে জালিম হওয়া বা মাজলুম হওয়া কোনোটাই পছন্দ করে না, তাই তার ভাইয়ের ব্যাপারেও তা পছন্দ করবে না। ফলে তার মুসলিম কোনো ভাই যদি মাজলুম হয়, তখন জুলুম থেকে বাঁচিয়ে তাকে সাহায্য করে। আর যদি সে জালিম হয়, তখন জুলুম থেকে বারণ করে তাকে সাহায্য করে। আমি শপথ করে বলতে পারব, এটাই নিঃস্বার্থ নাসিহা বা কল্যাণকামিতা এবং এটাই প্রকৃত সদ্যবহার, যে দুই গুণকে ইসলাম প্রকৃত মুসলমানের গুণ হিসাবে অভিহিত করেছে।

ভাই-বন্ধুদের সাথে বিন্দ্র আচরণ করে

প্রকৃত মুসলমান তার ভাই-বন্ধুদের সাথে ভদ্র ও বিন্দ্র আচরণ করে। সে তাদের প্রতি আন্তরিক ও ঘনিষ্ঠ হয়, তারাও তার প্রতি আন্তরিক ও ঘনিষ্ঠ হয়। কেননা, ইসলাম মুসলমানদের এমনই হতে বলে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ

‘তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফিরদের প্রতি হবে কঠোর।’^{৩১৪}

আয়াতে মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হওয়ার অর্থের ব্যাপকতায় বিনয়, নম্রতা, ভদ্রতা ও উত্তম লেনদেন সব অন্তর্ভুক্ত।

হাদিস শরিফেও রাসুলুল্লাহ ﷺ বিনয়-নম্রতাকে জীবনের সৌন্দর্য আখ্যা দিয়ে তার প্রতি মুসলমানদের উৎসাহিত করেছেন।

ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ الرَّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانُهُ

‘কোনো বিষয়ে বিনয়-নম্রতা থাকলে, তা সে বিষয়কে সুন্দর করে তোলে; আর কোনো বিষয় থেকে বিনয়-নম্রতা উঠিয়ে নেওয়া হলে তা ক্রটিযুক্ত হয়ে পড়ে।’^{৩১৫}

এ বিষয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সিরাত মুসলমানদের সামনে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল। তিনি ছিলেন বিনয়, নম্রতা, ভদ্রতা ও উদারতার মূর্তপ্রতীক। তাঁর মুখ থেকে কখনো অশ্লীল ও কঠোর শব্দ বের হয়নি। কখনো কোনো মুসলমানকে গালি দেননি।

এ প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর খাদিম আনাস রাদি আল্লাহু আনহু বলেন :

لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا، وَلَا لَعَّانًا، وَلَا سَبَّابًا،
كَأَن يَقُولُ عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ: «مَا لَهُ تَرَبَّ جَبِينُهُ»

‘রাসুলুল্লাহ ﷺ অশ্লীলভাষী ছিলেন না, অধিক অভিসম্পাতকারী ছিলেন না এবং গালিগালাজ করতেন না। কাউকে শাসন করার প্রয়োজন হলে বলতেন, কী হলো তার? ধুলায় মিশ্রিত হোক^{৩১৬} তার কপাল!’^{৩১৭}

৩১৪. সূরা আল-মায়িদা : ৫৪

৩১৫. সহিছ মুসলিম : ২৫৯৪

৩১৬. এ অংশের ব্যাখ্যায় মুহাদিসগণ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ এ শব্দের মাধ্যমে ওই ব্যক্তির জন্য দুআ করতেন, যেন সে বেশি করে সিজদা করার মাধ্যমে তার কপাল ধুলামিশ্রিত করতে পারে, যেখানে তার পরিশুদ্ধি ও হিদায়াত নিহিত আছে। (অনুবাদক)

৩১৭. সহিছল বুখারি : ৬০৪৬

তাদের গিবত করে না

প্রকৃত মুসলমান তার ভাই-বন্ধুদের গিবত করে না। কেননা, কুরআন গিবত করাকে স্পষ্টরূপে হারাম ঘোষণা করেছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

‘তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুত, তোমরা তো একে ঘৃণাই করো। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।’^{৩১৮}

প্রকৃত মুসলমান যখন আয়াতটি পড়ে, তখন গিবত বা পরনিন্দার প্রতি তার অন্তরে প্রচুর ঘৃণা জন্মায়। পরনিন্দাকারীকে আল্লাহ মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণকারীর সাথে তুলনা করেছেন, এ বিষয়টা তার ভেতর চরম ভীতির সঞ্চার করে। তাই সে কখনো কারও গিবত করে ফেললে সাথে সাথে তাকওয়ার দিকে অগ্রসর হয় এবং তাওবা করে ফেলে। আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তাআলা তাকওয়া ও তাওবার কথা এজন্যই বলেছেন, যেন কেউ গিবত করে ফেললে দ্রুতই তাকওয়া অবলম্বন করে এবং তাওবা করে।

প্রকৃত মুসলমান গিবত থেকে বাঁচার জন্য ভাই-বন্ধুদের ব্যাপারে উত্তম কথা ব্যতীত আর কোনো কথাই বলে না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

«أَتَذَرُونَ مَا الْغَيْبَةُ؟» قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ» قِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدْ اغْتَبَتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَهُ»

‘তোমরা কি জানো, গিবত কাকে বলে? তারা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ ভালো জানেন। তিনি বললেন, (গিবত হলো) তোমার ভাইয়ের ব্যাপারে এমন কথা বলা, যা সে অপছন্দ করে। জনৈক প্রশ্নকারী বললেন, আমি যা বলি, তা যদি তার মধ্যে থাকে, তখন? তিনি বললেন, তুমি যা বলো, তা যদি তার মধ্যে থাকে, তাহলে তুমি তার গিবত করেছ। আর যদি তার ভেতর তা না থাকে, তাহলে তুমি তার কুৎসা রটিয়েছ।’^{৩১৯}

প্রকৃত মুত্তাকি মুসলমান প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য গিবত থেকে বেঁচে থাকে। যেন মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করার মতো কঠিন গুনাহর কাজ তার থেকে প্রকাশ না পায় এবং উপুড় হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে না হয়।

হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ মুআজ ؓ-এর জিহ্বা ধরে তাকে সতর্ক করে বললেন :

كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَإِنَّا لَمُؤَاخِذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ؟ فَقَالَ: تَكَلَّمَ أُمَّكَ يَا مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُفُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ السِّنَتِهِمْ

‘এটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখো। মুআজ ؓ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, কথার কারণেও কি আমাদের পাকড়াও করা হবে? তিনি বললেন, তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক! জিহ্বার গুনাহর কারণেই তো লোকদের জাহান্নামে উপুড় করে নিক্ষেপ করা হবে।’^{৩২০}

গিবত চরম পর্যায়ে নিন্দনীয় এক কুঅভ্যাস। যাদের ভেতর পুরুষত্ব বলতে কিছু আছে, তাদের মাঝে এ অভ্যাস কক্ষনো থাকতে পারে না। এ নিন্দনীয় অভ্যাসটি শুধু তাদের মাঝেই থাকতে পারে, যারা আসলে পুরুষ নামের কলঙ্ক। এ ধরনের লোকদের দুইটা মুখ থাকে। এক মুখ দিয়ে লোকদের নিকট ভাই-বন্ধুদের গিবত করে বেড়ায়, আরেক মুখ দিয়ে তাদের প্রতি প্রফুল্লতা ও

৩১৯. সহিহ মুসলিম : ২৫৮৯

৩২০. সুনানুত তিরমিজি : ২৬১৬, সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩৯৭৩

বন্ধুত্ব প্রকাশ করে। এজন্য প্রকৃত মুসলমান গিবত ও দুই রঙে কলুষিত হওয়া থেকে যোজন যোজন দূরে থাকে। কেননা, ইসলাম তাকে পুরুষত্ব শিক্ষা দিয়েছে, চারিত্রিক দৃঢ়তা তার জীবনের অন্যতম সেরা অবলম্বন। তার কথা ও কাজে তাকওয়া ও আল্লাহভীতি পূর্ণরূপে বিদ্যমান থাকে। শঠতা, দ্বিমুখিতা, অষ্টোপাসের মতো রং বদলানো—এসব নিন্দনীয় অভ্যাস তার মাঝে বিলকূল নেই। চরম ঘৃণা করে সে এসব খারাপ অভ্যাসকে। কেননা, কিয়ামতের দিন এসব লোকই আল্লাহর নিকট সর্বনিকৃষ্ট মানব সাব্যস্ত হবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي
هَؤُلَاءِ بِوَجْهِهِ، وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهِهِ

‘তুমি কিয়ামতের দিন দ্বিমুখী লোকদের আল্লাহর নিকট সর্বনিকৃষ্ট লোক হিসাবে দেখতে পাবে, যারা একদলের কাছে এক মুখ নিয়ে যায়, আরেকদলের কাছে যায় ভিন্ন মুখ নিয়ে।’^{৩২১}

প্রকৃত মুসলমানের মুখ একটাই হয়। সবার সাথে এক মুখ দিয়েই কথা বলে। সবার সাথে হাসিমুখে কথা বলে। কিছু লোকের সাথে হাসিমুখে আর কিছু লোকের সাথে কুঞ্চিত মুখে কথা বলে না। কেননা, সে বিশ্বাস করে, দ্বিমুখিতা স্পষ্ট নিফাক ও শঠতা। আর ইসলাম ও নিফাক কখনো একত্র হতে পারে না। তাই যেসব লোকের মাঝে দ্বিমুখিতা আছে, তারা নিঃসন্দেহে মুনাফিকদের দলভুক্ত। জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরই তাদের শেষ ঠিকানা।

তাদের সাথে অহেতুক বিতর্ক ও মশকরা করে না এবং ওয়াদা ভঙ্গ করে না। প্রকৃত মুসলমানের উত্তম চরিত্রাবলির মধ্যে আরেকটি হলো, সে ভাই-বন্ধুদের সাথে অহেতুক ঝগড়া-বিবাদ ও বিতর্ক করে না। তাদের সাথে এমন হাসি-ঠাট্টা ও কৌতুক করে না, যা তাদের কষ্ট দেয় এবং তাদের সাথে কোনো ওয়াদা করার পর তা ভঙ্গ করে না।

৩২১. সহিহুল বুখারি : ৬০৫৮

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

لَا تُمَارِ أَخَاكَ، وَلَا تُمَارِحُهُ، وَلَا تَعِدُّهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفُهُ

‘তোমার ভাইয়ের সাথে অহেতুক বিতর্ক করবে না; তার সাথে (অতিরিক্ত) হাসি-ঠাট্টা ও মশকরা করবে না এবং তার সাথে কোনো ওয়াদা করার পর তা ভঙ্গ করবে না।’^{৩২২}

এর কারণ হলো, ঝগড়া-বিবাদ ও বিতর্ক কখনো ভালো কিছু বয়ে আনে না। বেশি ঠাট্টা-মশকারি করলে অনেক সময় তা সম্পর্ক ভাঙনের কারণ হয় কিংবা পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসা কমে যায়। আর ওয়াদা ভঙ্গ করলে মানুষের মন খারাপ হয়ে যায় এবং ভালোবাসা চলে যায়। এজন্য প্রকৃত মুসলমান এসব বিষয়ের ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকে।

নিজের ওপর ভাইদের অগ্রাধিকার দেয়

প্রকৃত মুসলমান উদার ও প্রশস্ত মনের অধিকারী। ভাই-বন্ধুদের জন্য তার সাহায্যের হাত সব সময় খোলা রাখে। কারণ, এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না যে, প্রকৃত মুসলমানের ভাই-বন্ধুরা মুক্তাকি মুমিনই হয়ে থাকে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

لَا تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ

‘কেবল মুমিনকেই বন্ধু বানাবে। আর মুক্তাকি ব্যক্তিই যেন তোমার খাবার খায়।’^{৩২৩}

এজন্য প্রকৃত মুসলমান তার উদারতা ও বদান্যতার গুণকে খুবই চাতুর্য ও বুদ্ধিমত্তার সাথে ব্যবহার করে। সুতরাং তার উদার মন সবার জন্য উন্মুক্ত রাখে না; বরং বেছে বেছে মুক্তাকি মুমিন ভাইদের প্রতি সে উদারতা প্রকাশ করে। মানবিকতার দোহাই দিয়ে দুঃখবতী গাভীর মতো তার উদারতার উলান নিকৃষ্ট নাস্তিক ও কাফিরদের জন্যও বাধাহীনভাবে ঝুলিয়ে রাখে না। কেননা, এতে তাদের অনিষ্টে আক্রান্ত হওয়ার যথেষ্ট ভয় আছে। তা ছাড়া দুষ্ট প্রকৃতির

৩২২. সুনানুত তিরমিজি : ১৯৯৫

৩২৩. সুনানু আবু দাউদ : ৪৮৩২, সুনানুত তিরমিজি : ২৩৯৫

অবিশ্বাসীদের থেকে এ আশাও করা যায় না যে, তারা দীনদার মুসলমানদের সরলতা ও উদারতা দেখে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাবে। তদুপরি, এসব দুষ্ট কাফিররা দীনদার মুসলমানদের এ ধরনের সরলতাকে দুর্বলতা ও বোকামি ভেবে মনে মনে হাসে। তাই তাদের এত সম্মান করে দাওয়াত খাওয়ানোর কোনোই প্রয়োজন নেই। অবশ্য কাফিরদের মধ্যে স্বভাবজাত কিছু ভালো মানুষও থাকে। দাওয়াতের উদ্দেশ্যে তাদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করতে কোনো সমস্যা নেই; বরং এর প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

প্রকৃত মুসলমান উদার হওয়ার পাশাপাশি বিচক্ষণ ও সতর্কও হয়। তার উদারতা ভিন্ন পাত্রে ব্যয়িত হয় না। এটাই ইসলামের অন্যতম মৌলিক চরিত্র। এ চরিত্র যার মাঝে থাকে, সে মানুষের ভালোবাসা ও নৈকট্য লাভ করে। সাহাবিদের মাঝে এ গুণ পুরোপুরিভাবে বিদ্যমান ছিল। এর প্রমাণ পাওয়া যায় আলি রা-এর একটি কথা থেকে।

আলি রা বলেন :

لَا أَنْ أَجْمَعَ نَفَرًا مِنْ إِخْوَانِي عَلَى صَاعٍ أَوْ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، أَحَبُّ إِلَيَّ
مِنْ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى سُوقِكُمْ فَأُعْتِقَ رَقَبَةً

‘আমার (মুসলমান) ভাইদের দাওয়াত করে এক সা’ বা দুই সা’ খাবার খাওয়ানো আমার কাছে বাজারে গিয়ে কোনো গোলাম আজাদ করে দেওয়া অপেক্ষা প্রিয়তর।’^{৩২৪}

এর কারণ হলো, এ ধরনের ভালোবাসাপূর্ণ খাবারের দাওয়াত মুসলমানদের মনে হৃদয়তা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করে। মানুষের প্রতি মানুষের মনে সৌহার্দ্য ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে, যা বর্তমান বস্তুবাদী সমাজব্যবস্থায় অনুপস্থিত। কারণ, এ সমাজব্যবস্থায় শুধু ব্যক্তি স্বার্থের দিকে লক্ষ করা হয়। তবে মানুষ স্বভাবগতভাবে ভালোবাসার কাঙাল। তাই বস্তুবাদী সমাজব্যবস্থাতেও ভালোবাসা ও হৃদয়তার অনুপস্থিতি তাদের খুব পীড়া দেয়। সত্যিকারের বন্ধু ও বন্ধুত্ব না থাকায় তারা খুব কষ্ট অনুভব করে। তাই বন্ধু ও

৩২৪. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৫৬৬

বন্ধুত্বের শূন্যতাপূরণে তারা কুকুর লালনপালন ও তাদের গুরুত্ব সহকারে যত্ন নেওয়ার প্রতি মনোযোগী হয়। কুকুরদের মাঝেই তারা হারানো ভালোবাসা ও হৃদয়তাকে খুঁজে বেড়ায়।

সম্প্রতি ফ্রান্স থেকে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে দেখা যায়, ফ্রান্সে কুকুরের সংখ্যা সাত মিলিয়ন, যা সে দেশের জনসংখ্যার ৫২ শতাংশের সমান! এসব কুকুর তাদের মালিকদের সাথে নিকটাত্মীয়দের মতো বসবাস করে। আর প্যারিসের হোটেলগুলোতে কুকুর আর কুকুরের মালিক একসাথে একপাত্রে খাওয়াকে মোটেই আশ্চর্যের বিষয় মনে করা হয় না!

এ সম্পর্কে প্যারিসের প্রাণী অধিকার-বিষয়ক একটি সংস্থার একজন দায়িত্বশীলকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ফরাসিরা কুকুরদের সাথে এত ঘনিষ্ঠ আচরণ করে কেন? উত্তরে তিনি বললেন, মানুষ স্বভাবগতভাবেই ভালোবাসতে চায়, ভালোবাসা পেতে চায়। কিন্তু এরা মানুষের মাঝে এমন কাউকে পায় না, যার সাথে ভালোবাসা বিনিময় করা যায়। তাই তারা বাধ্য হয়ে কুকুরের মাঝে ভালোবাসা খুঁজে বেড়ায়।^{৩২৫}

পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের বস্তুবাদী লোকেরা তাদের সমাজে কোনো নিঃস্বার্থ মানুষ-বন্ধু পায় না, যার সাথে ভালোবাসা বিনিময় করা যায়। তাই তারা জীব-জন্তুদের মাঝে ভালোবাসা, বিশ্বস্ততা ও হৃদয়তা খুঁজে বেড়ায়, যা তাদের চারপাশের লোকদের চেয়ে জন্তু-জানোয়ারের মাঝে ঢের বেশি আছে। ইসলামের আলো ও ইমানের নিয়ামত থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণেই তাদের মনুষ্যত্বের এমন অধঃপতন হয়েছে। মানুষ হয়েও তারা আজ জন্তু-জানোয়ারের নিকট ভালোবাসার ভিখারি!

আরবের কিছু মুসলিম ও অমুসলিম কবি-সাহিত্যিক যখন পশ্চিমা দেশে পাড়ি জমান, তখন সর্বপ্রথম তাদের নজর পড়ে পশ্চিমা লোকদের আবেগ-অনুভূতির অধঃপতনের দিকে। তারা দেখতে পেলেন, পশ্চিমা বস্তুবাদী সভ্যতা মানুষের

৩২৫. উসতাজ ওয়াহিদুদ্দিন খানের কলাম থেকে, যা 'সর্বযুগে ও সকল জায়গায় ইসলামি অনুশাসনের বাস্তবায়ন ওয়াজিব' শিরোনামে কুয়েতের 'আল-মুজতামা' ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে। ২৪ জিলকদ ১৩৯৬ হিজরি/১৬ নভেম্বর ১৯৮৬ ইংরেজি, ম্যাগাজিন সংখ্যা : ৩২৫।

কাছ থেকে মানবিকতা ও মনুষ্যত্ব কেড়ে নিয়েছে। ফলে দেখতে শুনতে মানুষ মনে হলেও আসলে তারা একেকটা রোবট! জীবন বলতে তারা বুঝে কেবল হাড়ভাঙা খাটুনি আর পয়সা কামাইয়ের পাশবিক প্রতিযোগিতা! কোনো বন্ধুর জন্য তাদের অন্তর প্রফুল্ল হয় না; বন্ধুকে ভুবনভোলানো মুচকি হাসি উপহার দিতে জানে না তারা! আবেগ-অনুভূতি কেমন যেন ভোঁতা হয়ে গেছে তাদের! কিন্তু পশ্চিমা দেশে পাড়ি জমানো আরব কবি-সাহিত্যিকরা বেড়ে উঠেছেন ইসলামি দেশে। উদারতা ও আন্তরিকতার মুক্ত বাতাসে শ্বাস নিয়ে তারা বড় হয়েছেন। মানুষ মানুষকে ভালোবাসবে—এ শিক্ষা সমাজ থেকেই পেয়েছেন তারা। এজন্য পশ্চিমা দেশে গিয়ে তাদের কেমন যেন বেখাপ্পা লাগতে শুরু করল। তাই কবিতা ও লেখনীর মাধ্যমে ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব, ও পারস্পরিক সম্পর্কের দিকে পশ্চিমাদের দাওয়াত দিতে শুরু করলেন তারা। সেখান থেকে একটি কবিতা এখানে উল্লেখ করা হলো। এখানে কবি এমন এক পশ্চিমা ব্যক্তিকে দাওয়াত দিচ্ছেন, যার অন্তরে বস্তুবাদের কদর্য জমেছে, সভ্যতার আলো যার চোখ ধাঁধিয়ে রেখেছে এবং যন্ত্রের বিকট আওয়াজে যার কান বধির হয়ে গেছে।

কবি বলেন :

يا بن ودي، يا صاحبي يا رفيقي * ليس حيي تطفلا أو ثقاله

فأجبنى ((بيا أخي)) يا صديقي * وأعد، إنها ألد مقالة

وإذا شئت أن تسير وحيدا * وإذا ما اعترتك مني ملالة

فامض، لكنما ستسمع صوتي صارخا * (يا أخي) يؤدي الرسالة

وسياتيك أين كنت صدى حي * فتدري جماله وجلاله

‘প্রিয়তম বন্ধু, সঙ্গী আমার! (আমি তোমাকে সত্যিই ভালোবাসি।)

আমার ভালোবাসা ছেলেমি নয়, নয় কোনো ভণিতা।

একটিবার আমাকে “ভাই” বলে ডাকো প্রিয়তম! আবারও ডাকো,

আবারও; তুমি অবাক হবে, কী স্বাদ রয়েছে ছোট্ট এ শব্দে!



(পার্থিব জীবনের এ দীর্ঘ পথে) তুমি যদি একাকী পথ চলতে চাও,
আর আমাকে (সঙ্গী হিসাবে) তোমার ভীষণ বিরক্ত লাগে।

তবে একাকীই চলো; কিন্তু (চলার পথে) তুমি শুনতে পাবে আমার
“ভাই, ভাই” ডাকের চিৎকার, যা পৌঁছে দেয় ভালোবাসার পয়গাম।

যত দূরেই যাও, আমার ভালোবাসার প্রতিধ্বনি পৌঁছবে তোমার
কাছে। সেদিন তুমি ভালোবাসার সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব বুঝতে পারবে।’

ইউসুফ আসআদ গানিমের কাছে বস্তুবাদী জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠল।
ভোগবাদের ভারে নুয়ে পড়া ও বস্তুবাদের সহিংস শুকনো ঢেউয়ে ডুবিয়ে
যাওয়া এ জীবন তার কাছে কেমন যেন বিষিয়ে উঠল। কারণ, এ জীবনে যে
আন্তরিকতা, ভ্রাতৃত্ব ও সহানুভূতি বলতে কিছুই নেই! তাই আরবের ইসলামি
ভূমিতে পুনরায় ফিরে যাওয়ার আকুতি ঝরে পড়ল তার কলম থেকে। যে
ভূমি নবুওয়াতের অবতরণস্থল, আধ্যাত্মিকতার উৎসমূল, ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব
ও স্বচ্ছতার দেশ। জাঁকজমক ও কোলাহলমুখর শহর ত্যাগ করে আরবের
তাঁবুতে থাকার আশ্রয় প্রকাশ করেন তিনি।

তিনি বলেন, যদি আমার পুরো জীবন বাষ্প হয়ে ক্ষণিকের জন্যও আরবের
কোনো ভূমিতে উড়ে বেড়াত, আমি সে জীবনের জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া
আদায় করতাম। কারণ, এ জীবন ক্ষণিকের হলেও তা অতিবাহিত হতো
এমন এক দুনিয়ায়, যার অধিবাসীদের অন্তরে রয়েছেন আল্লাহ! পশ্চিমা বিশ্বে
বস্তুবাদের কষাঘাতে আমি জর্জরিত। এখানের জীবন ভীষণ বিরক্তিকর হয়ে
উঠেছে আমার কাছে। আমার যান্ত্রিক বাহন গাড়ি ও উড়োজাহাজ তোমরা
নিয়ে নাও। আমি আগের সেই ধীরস্থির উট ও উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলা ঘোড়ার
পিঠে সওয়ার হতে চাই। আমার পশ্চিমা দুনিয়া নিয়ে নাও। মাটি, সাগর,
আকাশ সব নিয়ে নাও। বিনিময়ে আমাকে একটি আরবের তাঁবু দাও, যা
আমি কখনো স্থাপন করব লেবাননের কোনো পাহাড়ি টিলার ওপর, কখনো
স্থাপন করব প্যাপিরাসের উপত্যকায়, কখনো কলকল রবে বয়ে চলা ছোট
কোনো আরব্য নদীর তীরে, কখনো ওমানের সবুজ-শ্যামল বাগানে, কখনো
স্থাপন করব সৌদি আরবের বিস্তৃত মরুপ্রান্তরে, কখনো ইয়ামানের কোনো
অনাবিষ্কৃত অঞ্চলে, কখনো পিরামিডের পাদদেশে, আবার কখনো স্থাপন

করব লিবিয়ার কোনো মরুদ্যানে। আমাকে একটি আরবি তাঁবু দাও, যার বিনিময়ে গোটা পৃথিবী দিয়ে দেবো; তবুও আমি লাভবান হব...।

বিদেশে বসবাসকারী আরবের সাহিত্যিকদের লেখনীতে এ ধরনের আরও অনেক কবিতা ও প্রবন্ধ রয়েছে। প্রতিটি লেখনীতে আবেগ-অনুভূতির প্রতি আরব শরণার্থীদের তৃষ্ণা চিত্রিত হয়েছে, যা তারা বস্তুবাদী পশ্চিমা বিশ্বে গিয়ে হারিয়ে ফেলেছে। প্রতিটি লেখায় উঠে এসেছে মধ্যপ্রাচ্যের প্রতি তাদের প্রবল আত্মহের কথা, যেখানে ইসলাম সবার মাঝে ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব, সহানুভূতি ও পারস্পরিক দায়িত্ববোধ ছড়িয়ে রেখেছে।

মুসলমান ভাইদের খানার দাওয়াত দেওয়া ইসলামে পছন্দনীয় এবং দাওয়াতে যথাসম্ভব উদার হওয়া মুসতাহাব। কারণ, এর মাধ্যমে মুসলমানদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও মজবুত ও শক্তিশালী হয়। ফলে প্রকৃত মুসলমানরা এটাকে নিজেদের অন্যতম মৌলিক চরিত্র হিসাবে বেছে নিয়েছে। একইভাবে মুসলমান ভাইয়ের দাওয়াত কবুল করা ইসলামে ওয়াজিব। অবহেলা করার কোনো সুযোগ নেই। এজন্য সাহাবায়ে কিরাম রাঃ একদিকে মুসলমান ভাইদের দাওয়াত দিতেন, অপরদিকে কেউ দাওয়াত দিলে তা অবশ্যই কবুল করতেন। দাওয়াত কবুল করাকে তারা নিজেদের ওপর আবশ্যিক ও দাওয়াতকারীর অধিকার মনে করতেন। দাওয়াতে সাড়া না দেওয়াকে গুনাহ মনে করতেন। এর প্রমাণ আল-আদাবুল মুফরাদের একটি হাদিসে আছে। হাদিসটি ইমাম বুখারি রাঃ জিয়াদ বিন আনউম আফরিকি রাঃ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

তিনি (জিয়াদ বিন আনউম রাঃ) বলেন :

أَنَّهُمْ كَانُوا غُرَاةً فِي الْبَحْرِ زَمَنَ مُعَاوِيَةَ، فَانْضَمَّ مَرْكَبُنَا إِلَى مَرْكَبِ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، فَلَمَّا حَضَرَ غَدَاؤُنَا أُرْسِلَنَا إِلَيْهِ، فَأَتَانَا فَقَالَ: دَعَوْتُمُونِي وَأَنَا صَائِمٌ، فَلَمْ يَكُنْ لِي بُدٌّ مِنْ أَنْ أُجِيبَكُمْ، لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ سِتَّ خِصَالٍ وَاجِبَةٍ، إِنْ تَرَكَ مِنْهَا شَيْئًا فَقَدْ تَرَكَ حَقًّا وَاجِبًا لِأَخِيهِ



عَلَيْهِ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُسَمِّيهِ إِذَا عَطَسَ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرَضَ، وَيَحْضُرُهُ إِذَا مَاتَ، وَيَنْصَحُهُ إِذَا اسْتَنْصَحَهُ

‘মুআবিয়া ؓ-এর শাসনামলে আমরা সমুদ্রপথে একটি যুদ্ধাভিযানে যাচ্ছিলাম। তখন একসময় আমাদের নৌকা আবু আইয়ুব আনসারি ؓ-এর নৌকার পাশাপাশি চলতে লাগল। এ অবস্থায় যখন আমাদের দুপুরের খাবার খাওয়ার সময় আসলো, আমরা তাঁর জন্যও কিছু খাবার পাঠালাম। তখন তিনি আমাদের নিকট এসে বললেন, তোমরা আমাকে এমন অবস্থায় দাওয়াত করেছ যখন আমি রোজাদার। তবে তোমাদের দাওয়াত কবুল না করার কোনো উপায়ও নেই আমার কাছে। কেননা, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক মুসলমানের ওপর অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্য ছয়টি অধিকার রয়েছে। কেউ যদি সেখান থেকে কোনো একটি ত্যাগ করে, সে তার ভাইয়ের ওয়াজিব অধিকার ত্যাগকারী বলে সাব্যস্ত হবে। (সে ছয়টি বিষয় হলো,) যদি তার সাথে তোমার দেখা হয়, তখন তাকে সালাম করবে; যদি সে তোমাকে দাওয়াত দেয়, তা কবুল করবে; যদি সে হাঁচি দেওয়ার পর আল-হামদুলিল্লাহ বলে, তুমি তার জবাব দেবে (ইয়ারহামুকাল্লাহ বলবে); সে অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাবে; যদি সে মারা যায়, তখন তার নিকট (অর্থাৎ তার গোসল, কাফন-দাফন, জানাজা ইত্যাদিতে) উপস্থিত হবে; আর যদি তোমাকে উপদেশ দেয়, তাহলে উপদেশ গ্রহণ করবে।’^{৩২৬}

সাহাবায়ে কিরাম ؓ কোনো ওজর ব্যতীত মুসলমানের দাওয়াত কবুল না করাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ-এর অবাধ্যতা মনে করতেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا،
وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ

‘নিকৃষ্ট খানা হলো ওই ওলিমার খানা, যেখানে এমন লোকদের দাওয়াত দেওয়া হয় না, যারা ওলিমায় শরিক হবে এবং এমন লোকদের দাওয়াত করা হয়, যারা দাওয়াত কবুল করে না। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত কবুল করে না, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ-এর অবাধ্যতা করে।’^{৩২৭}

ইমানি ভ্রাতৃত্ব কোনো স্লোগান নয়, যা মুখে তুললেই দায়িত্ব খতম হয়ে যায়; কোনো গর্বের বিষয় নয়, যা শুধু ঘোষণা করাই কাম্য; বরং এটা এমন এক পবিত্র সম্পর্ক, যার জন্য অবশ্যপালনীয় বিষয় ও কিছু হক রয়েছে। এ বিষয়গুলো কেবল সে ব্যক্তিই পালন করতে পারে, যার অন্তরে আল্লাহর প্রতি যথাযথ ইমান আছে এবং যে ইসলামকে পূর্ণরূপে অনুসরণ করে চলে। এমন ইমান ও ইসলামের ছাপ আমরা আনসারি সাহাবিদের কর্মে দেখতে পাই, যারা মুহাজিরদের প্রতি অনন্য ভালোবাসা প্রদর্শন ও তাদের অগ্রাধিকার দেওয়ার অভূতপূর্ব নজির স্থাপন করেছিলেন। মুহাজিরগণ যখন নিজেদের দ্বীন বাঁচাতে সর্বস্ব ত্যাগ করে মদিনায় চলে আসলেন, তখন আনসার সাহাবিরা প্রয়োজনীয় সবকিছু তাদের সামনে পেশ করে দিলেন। এমনকি তাদের একজন তার মুহাজির ভাইকে বললেন, এগুলো আমার সম্পদ; এখান থেকে অর্ধেক তুমি নিয়ে নাও। আর এ দুজন আমার বিবি, কোনটি তোমার পছন্দ হয় দেখো। যাকে পছন্দ হবে, তার নাম আমাকে বলবে; তাহলে আমি তাকে তালাক দিয়ে দেবো, যেন ইদ্দত শেষ হওয়ার পর তুমি তাকে বিয়ে করতে পারো। মুহাজির ভাইটিও এ সহানুভূতির উত্তর খুব সুন্দরভাবেই দিলেন। তিনি বললেন, তোমার ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনে আল্লাহ বরকত দান করুন। আমার এসবের প্রয়োজন নেই। তুমি শুধু আমাকে বাজারটা দেখিয়ে দাও, আমি সেখানে ব্যবসা করব।

আরেকজন আনসার সাহাবির মেহমানদারির নমুনা দেখুন। এক মুহাজির ভাই তার কাছে এমন অবস্থায় মেহমান হলেন, যখন তার ঘরে বাচ্চাদের খানা ব্যতীত কিছুই ছিল না। তখন তিনি তার ও পরিবারের ওপর মুহাজির ভাইকে প্রাধান্য দিলেন। স্ত্রীকে বললেন, বাচ্চাদের ঘুম পাড়িয়ে দাও। তারপর বাতি

নিভিয়ে দিয়ে যা আছে তা মেহমানের সামনে উপস্থিত করো। আমরাও তার পাশে বসে থাকব, যেন তিনি মনে করেন, আমরাও তার সাথে খাচ্ছি। তবে আমরা খাব না। এভাবে তারা দস্তরখানের পাশে বসলেন, তবে খানা খেলেন শুধু মেহমান। তারা স্বামী-স্ত্রী না খেয়ে রাত অহিবাহিত করলেন। এরপর সকালে আনসারি সাহাবিটি যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট গেলেন, তখন তিনি বললেন, গতরাতের মেহমানের জন্য যা করেছ, তাতে আল্লাহ তোমাদের ওপর খুবই সন্তুষ্ট হয়েছেন।

আনসার কর্তৃক মুহাজিরদের প্রাধান্য দেওয়ার আরেকটি নজির হলো :

قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْسِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا
التَّخِيلِ، قَالَ: «لَا» فَقَالُوا: تَكْفُونَا الْمُوْنَةَ، وَتَشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ،
قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

‘আনসার সাহাবিগণ নবিজি ﷺ-কে বললেন, আমাদের খেজুর বাগান আমাদের ও আমাদের (মুহাজির) ভাইদের মাঝে বন্টন করে দিন। নবিজি ﷺ বললেন, না, তা হয় না। তখন তারা বললেন, তাহলে তারা বাগানের উৎপাদনকাজে আমাদের সহযোগিতা করবেন, তারপর ফল ভাগ করার সময় আমাদের সাথে তাদের জন্যও ভাগ থাকবে। তখন আনসার ও মুহাজির সবাই বললেন, আমরা গুনলাম এবং মেনে নিলাম।’^{৩২৮}

মুহাজিরগণও আনসার সাহাবিদের মহানুভবতার কথা স্বীকার করেছেন। তারা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন :

مَا رَأَيْنَا مِثْلَ قَوْمٍ قَدِمْنَا عَلَيْهِمْ أَحْسَنَ بَذْلًا مِنْ كَثِيرٍ وَلَا أَحْسَنَ
مُوَاسَاةً فِي قَلِيلٍ، كَفَوْنَا الْمُوْنَةَ، وَأَشْرَكُونَا فِي الْمَهْنَةِ، قَدْ خِفْنَا أَنْ
يَذْهَبُوا بِالْأَجْرِ كُلِّهِ، فَقَالَ: «لَا، مَا أَتْنَيْتُمْ عَلَيْهِمْ وَدَعَوْتُمْ اللَّهَ لَهُمْ»

‘আমরা আনসারদের মতো অন্য কোনো গোত্র দেখিনি, যারা সম্পদ কম হলে মৌখিক সহানুভূতি জানায় এবং সম্পদ পর্যাপ্ত থাকলে খরচ করে। আমাদের জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, তারা আমাদের (বাগান করার) রসদপাতি জোগাড় করে দেবেন (তারপর আমরা বাগান করব) এবং উৎপাদিত ফল-ফলাদিতে আমাদের অংশীদার করবেন। কারণ, আমরা ভয় পাচ্ছি যে, সব সাওয়াব এরাই অর্জন করে নেবেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, না, এমন হবে কেন? তোমরা যে তাদের প্রশংসা করেছ এবং তাদের জন্য দুআ করেছ, এর বিনিময়ে তোমরাও সাওয়াবের অংশ পাবে।’^{৩২৯}

আনসার সাহাবিদের ফজিলতের জন্য এটাই যথেষ্ট যে, তাদের উত্তম আমলের স্বীকারোক্তি দিয়ে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে আয়াত নাজিল করেছেন। যতদিন কুরআনের তিলাওয়াত হবে, ততদিন তাদের মহত্ত্ব ও মহানুভবতার কথা মানুষের মাঝে চর্চা হতে থাকবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

‘যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদিনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালোবাসে, মুহাজিরদের যা দেওয়া হয়েছে, তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষাপোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদের অগ্রাধিকার দান করে। আর যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।’^{৩৩০}

রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন মুহাজির ও আনসার সাহাবিদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপন করে দিলেন, তখন আনসার সাহাবিগণ এ ইমানি ভ্রাতৃত্বের দাবি আদায়ের

৩২৯. আল-আদাব, ইবনু আবি শাইবা : ২৩২

৩৩০. সূরা আল-হাশর : ৯

জন্য যা যা করা উচিত, সবই করেছেন। তারা মুহাজির ভাইদের জন্য তা-ই পছন্দ করেছেন, যা নিজেদের জন্য পছন্দ করেছেন। পার্থিব কোনো বিষয় থেকে তাদের বঞ্চিত রাখেননি। সম্ভ্রষ্টচিত্তে সেখান থেকে মুহাজির ভাইদের অংশ দিয়ে দিয়েছেন। এমনকি হিজরতের পর প্রথমদিকে আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকলেও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের কারণে আনসার সাহাবিগণ থেকে মুহাজিরগণ উত্তরাধিকার পাওয়ার বিধান ছিল।

সহিহ বুখারিতে ইবনে আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন :

كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَمَّا قَدِمُوا الْمَدِينَةَ، يَرِثُ الْمُهَاجِرُ الْأَنْصَارِيَّ دُونَ
ذَوِي رَحِمِهِ، لِلْأُخُوَّةِ الَّتِي آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا
نَزَلَتْ: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيًّا} [النساء: ৩৩] نَسَخَتْ... إِلَّا النَّصْرَ،
وَالرَّفَاذَةَ، وَالنَّصِيحَةَ، وَقَدْ ذَهَبَ الْمِيرَاثُ، وَيُوصِي لَهُ.

‘মুহাজিররা যখন মদিনায় আসলেন, তখন মুহাজির ব্যক্তি আনসারি ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার রক্তের সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও নবিজি সঃ-এর বেঁধে দেওয়া ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের কারণে উত্তরাধিকার পেতেন। পরে যখন وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيًّا (আর আমি প্রত্যেকটির জন্যই উত্তরাধিকারী করেছি। [সূরা আন-নিসা : ৩৩]) এ আয়াত নাজিল হলো, তখন মুহাজির ও আনসারের মাঝে মিরাসের বিধান রহিত হয়ে গেল। ...কিন্তু সাহায্য-সহযোগিতা, সহমর্মিতা, কল্যাণকামিতা বহাল থেকে যায়। মিরাসের বিধান রহিত হয়ে গেলেও তাদের জন্য অসিয়ত করা যাবে।’^{৩৩১}

তাদের অগোচরে তাদের জন্য দুআ করে

প্রকৃত মুসলমান নিজের জন্য যা পছন্দ করে, তার ভাইয়ের জন্যও তাই পছন্দ করে। কাজেই তার অগোচরে তার জন্য দুআ করে। এ দুআ তার বন্ধুত্বের আন্তরিকতা ও নিষ্কলুষতার পরিচয় বহন করে এবং অন্তরে ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ আরও মজবুত করে। তা ছাড়া কারও অজান্তে

৩৩১. সহিহল বুখারি : ২২৯২

তার জন্য দুআ করলে তা দ্রুত কবুল হয়। কারণ এ দুআয় নিষ্ঠা, সততা, নিষ্কলুষতা বেশি থাকে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ أَسْرَعَ الدُّعَاءِ إِجَابَةٌ، دَعْوَةُ غَائِبٍ لِغَائِبٍ

‘অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য অপর অনুপস্থিত ব্যক্তির দুআ সর্বাধিক কবুলযোগ্য।’^{৩৩২}

এজন্যই উমর ﷺ যখন উমরা করতে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন, তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ অনুমতি দেওয়ার পর তার কাছে নিজের জন্য দুআ চাইলেন।

এ ব্যাপারে উমর ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন :

اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُمْرَةِ، فَأَذِنَ لِي، وَقَالَ: «لَا تَنْسَنَا يَا أَخِي مِنْ دُعَائِكَ»، فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا الدُّنْيَا

‘আমি নবিজি ﷺ-এর কাছে উমরা করার অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দিলেন এবং বললেন, হে আমার ভাই, তোমার দুআয় আমাকে ভুলে যেয়ো না। তাঁর এ কথাটি আমার কাছে এতই দামি যে, এর পরিবর্তে যদি পুরো দুনিয়াটাই আমাকে দেওয়া হতো, তবুও আমি খুশি হতাম না।’^{৩৩৩}

এ বিষয়টি (কারও অজান্তে তার জন্য দুআ করলে তা দ্রুত কবুল হওয়া) সাহাবায়ে কিরাম ﷺ-এর অন্তরে খুব ভালোভাবে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। তাই দুআ কবুল হওয়ার বিশেষ মুহূর্তগুলোতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তারা একে অপরের নিকট দুআর দরখাস্ত করতেন। এ সম্পর্কে ইমাম বুখারি ﷺ আল-আদাবুল মুফরাদে সাফওয়ান বিন আব্দুল্লাহ বিন সাফওয়ান ﷺ—যার স্ত্রী ছিলেন দারদা বিনতে আবু দারদা ﷺ—থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন :

৩৩২. সুনানু আবি দাউদ : ১৩৩৫

৩৩৩. সুনানু আবি দাউদ : ১৪৯৮



قَدِمْتُ عَلَيْهِمُ الشَّامَ، فَوَجَدْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ فِي الْبَيْتِ، وَلَمْ أَجِدْ أَبَا الدَّرْدَاءِ، قَالَتْ: أَتُرِيدُ الْحَجَّ الْعَامَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَادْعُ اللَّهَ لَنَا بِخَيْرٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ دَعْوَةَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مُسْتَجَابَةٌ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ، كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ قَالَ: آمِينَ، وَلَكَ بِمِثْلِ، قَالَ: فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فِي السُّوقِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، يَأْتُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

‘একবার আমি শামদেশে আমার স্বশুরবাড়িতে গেলাম। সেখানে গিয়ে দারদা ﷺ-এর মাকে ঘরে পেলাম। দারদা ﷺ-এর পিতা (আবু দারদা ﷺ) তখন ঘরে ছিলেন না। তিনি বললেন, তুমি কি এ বছর হজ করার ইচ্ছা করেছ? আমি বললাম, জি হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, আমাদের সার্বিক কল্যাণের জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করো। কেননা, নবিজি ﷺ প্রায়ই বলতেন, অনুপস্থিত কোনো ভাইয়ের জন্য মুসলমানের দুআ আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে থাকে। তার মাথার ওপর একজন ফেরেশতা নিযুক্ত থাকেন। যখনই সে তার কোনো ভাইয়ের জন্য কল্যাণের দুআ করে, তখন উক্ত ফেরেশতা বলেন, আমিন এবং তোমার জন্যও অনুরূপ কল্যাণ হোক। সাফওয়ান ﷺ বলেন, অতঃপর বাজারে গিয়ে আবু দারদা ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনিও নবিজি ﷺ-এর সূত্রে অভিন্ন কথাই বললেন।’^{৩৩৪}

রাসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবিদের অন্তর থেকে অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নতার শেকড় উপড়ে ফেলে তদস্থলে একতার বীজ রোপণ করেছিলেন। যখনই সুযোগ পেতেন, একতা ও ভ্রাতৃত্বের অনুভব তাদের অন্তরসমূহে জাগিয়ে দিতেন। যেন জামাআতের মাঝে থেকেও কোনো মুসলমান নিজেকে একা না ভাবে, যে একাকিত্ববোধ মানুষের হৃদয়কে পাষণ করে দেয় এবং মনকে বিষণ্ণ করে তোলে।

সাহাবিদের মাঝে একতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করার প্রতি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আন্তরিক প্রচেষ্টার একটি উদাহরণ দেখুন :

৩৩৪. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৬২৫

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِمُحَمَّدٍ وَخَدَنَّا،
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَقَدْ حَاجَبَتْهَا عَنْ نَاسٍ كَثِيرٍ»

‘একবার জনৈক ব্যক্তি দুআ করার সময় বললেন, হে আল্লাহ, শুধু আমাকে ও মুহাম্মাদ ﷺ-কে ক্ষমা করে দাও। তখন নবিজি ﷺ বললেন, তুমি তো অনেক মানুষকে দুআ থেকে বঞ্চিত করে দিলে!’^{৩৩৫}

এ কথার মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ ﷺ লোকটাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, অন্যান্য মুসলমানের জন্য দুআ না করে শুধু নিজের জন্য দুআ করা, নিজের সাথে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে শরিক করলেও এটা ইসলামের শিষ্টাচার নয়। ইসলাম চায়, মুমিন নিজের জন্য যা পছন্দ করে, অপরজনের জন্যও তাই পছন্দ করুক।

সারকথা হলো, প্রকৃত মুসলমান সেই ব্যক্তি, যে তার ভাই ও বন্ধুদের ভালোবাসে, তাদের সাথে নিঃস্বার্থ সম্পর্ক রাখে, তাদের কল্যাণকামী হয়, তাদের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি উভয় অবস্থায় তাদের ইজ্জত-আবরু ও ধন-সম্পদের হিফাজত করে, নিজের ওপর তাদের অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য দেয়, তাদের কোনো ভুল হয়ে গেলে ক্ষমা করে দেয়—সর্বোপরি তাদের সাথে উত্তমরূপে জীবনযাপন করে। এ ছাড়াও ভাই-বন্ধুদের প্রতি সে উদার হয়, কৃপণতা করে না; সত্যবাদী হয়, মিথ্যা বলে না; অঙ্গীকার পালনকারী হয়, বিশ্বাসঘাতকতা করে না; একমুখী থাকে; ক্ষণে ক্ষণে রং বদলায় না। তাদের সাথে সাক্ষাৎ হলে প্রশান্তমনে ও হাসিমুখে কথা বলে। কথা বা কাজের মাধ্যমে কাউকে কষ্ট দেয় না। এ সবই একজন প্রকৃত মুসলমানের গুণাবলি। এগুলো যার ভেতর আছে, সেই ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃত মুসলমান।

সমাজের সাথে মুসলমানের সম্পর্ক

ভূমিকা

দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণকারী প্রকৃত মুসলমান আগাগোড়া একজন সামাজিক ব্যক্তি। কেননা, মানুষ সামাজিক জীব। তদুপরি প্রকৃত মুসলমান দ্বীনের বার্তাবাহক। তাই তাকে মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকতে হয় এবং তাদের সাথে লেনদেন করতে হয়।

প্রকৃত মুসলমান সামাজিক জীবনে উন্নত চরিত্রের অধিকারী হয়, যা তার দ্বীন তাকে শিখিয়েছে এবং সামাজিক জীবনে তা বাস্তবায়ন করার প্রতি উৎসাহিত করেছে।

পবিত্র কুরআন ও হাদিস সামাজিক জীবনের যে উন্নত রূপরেখা দিয়েছে, তা পূর্বের কোনো শরিয়ত বা হাল আমলের কোনো সমাজবিজ্ঞানী দিতে পারেনি। শুধু তাই নয়; বরং সামাজিক জীবনের উন্নত চরিত্রকে ইসলাম দ্বীন হিসাবে অভিহিত করেছে, যা অবলম্বন করলে সাওয়াব দেওয়া হয় আর ছেড়ে দিলে গুনাহ হয়। এসব কারণেই প্রকৃত মুসলমান একজন আদর্শ সামাজিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়।

উন্নত সমাজব্যবস্থা এবং আদর্শ সামাজিক ব্যক্তির গুণাবলি সম্পর্কে ইসলামের নুসুস (কুরআনের আয়াত ও হাদিস) অধ্যয়ন করতে গেলে রীতিমতো আশ্চর্যান্বিত হতে হয়। সামাজিক জীবনের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি বিষয় নিয়েও ইসলাম আলোচনা করেছে। এজন্যই সত্যিকার ইসলামের শিক্ষা যে ধারণ করে, সে একজন আদর্শ সামাজিক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়।

যে মৌলিক বিষয়ের ওপর মুসলমানের আদর্শ সমাজজীবন প্রতিষ্ঠিত, তা হচ্ছে সমাজজীবনে এবং মানুষের সাথে লেনদেনের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করা। এটাই আদর্শ সামাজিক মুসলমানের গুণাবলির কেন্দ্রবিন্দু। এ অধ্যায়ে আমরা প্রকৃত মুসলমানের সামাজিক চরিত্র ও গুণাবলি উল্লেখ করার প্রয়াস পাব।

সত্যবাদী

আদর্শ সামাজিক মুসলমান সবার সাথে সদা সত্য কথা বলে। কারণ, ইসলাম বলে, সত্য হচ্ছে সকল উন্নত চারিত্রিক গুণাবলির মূল। সত্য মানুষকে পুণ্যের দিকে নিয়ে নিয়ে যায়, যা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করায়। আর মিথ্যা পাপাচারে নিমজ্জিত করে, যেখান থেকে সে সোজা জাহান্নামের গভীরে তলিয়ে যায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِّيقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَّابًا

‘সত্য পুণ্যের পথ প্রদর্শন করে এবং পুণ্য জান্নাতের পথ দেখায়। কোনো ব্যক্তি সত্য বলতে থাকে; এমনকি তার নাম আল্লাহর কাছে সত্যবাদী হিসাবে লেখা হয়। আর মিথ্যা পাপাচারের পথ প্রদর্শন করে এবং পাপাচার দোজখের পথ দেখায়। কোনো ব্যক্তি মিথ্যা বলতে থাকে; একপর্যায়ে আল্লাহর কাছে তার নাম মিথ্যুক হিসাবে লেখা হয়।’^{৩৩৬}

প্রকৃত মুসলমান সত্যবাদী হয়ে থাকে। তার কথা ও কাজ থেকে সত্য প্রকাশ পায়। কারণ, আল্লাহর কাছে সত্যবাদীদের তালিকায় নাম থাকা মানুষের জন্য অনেক মর্যাদার বিষয়।

প্রতারক নয়

সত্যবাদী মুসলমান—যার নাম আল্লাহর দরবারে সত্যবাদী হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে—কখনো ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা করে না। কারণ, সত্য ও সত্যবাদিতার দাবি হলো, পরোপকার ও ওয়াদা রক্ষা করা। প্রতারণা, খিয়ানত ও ধোঁকাবাজি সত্যবাদিতার পরিপন্থী।

প্রকৃত সত্যবাদী মুসলমান কখনো ধোঁকাবাজি ও প্রতারক হতে পারে না। কারণ, সে জানে, প্রতারণা মানুষকে ইসলামের পরিচয় থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

৩৩৬. সহিহুল বুখারি : ৬০৯৪, সহিহ মুসলিম : ২৬০৭

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

‘যে আমাদের দিকে অস্ত্র তাক করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।
আর যে আমাদের সাথে প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।’^{৩৩৭}

অপর হাদিসে এসেছে :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ
فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ
الطَّعَامِ؟» قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ
الطَّعَامِ كَي يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي»

‘রাসুলুল্লাহ ﷺ খাদদ্রব্যের একটি স্তুপের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়
তাতে হাত ঢুকিয়ে দিলে তার আঙুল ভিজে গেল। তখন তিনি
বললেন, হে খাদ্যওয়ালা, এটা কী? খাদ্যওয়ালা উত্তর দিলেন,
হে আল্লাহর রাসুল, বৃষ্টির পানি পড়েছে। তিনি বললেন, তাহলে
যেগুলো ভিজে গেছে, সেগুলো ওপরে তুলে দিচ্ছ না কেন, যাতে
মানুষ দেখতে পারে? (মনে রেখো,) যে ধোঁকাবাজি করে, সে আমার
(আদর্শ উম্মতের) অন্তর্ভুক্ত নয়।’^{৩৩৮}

প্রকৃত মুসলমানদের সমাজ পারস্পরিক ভালোবাসা ও পরোপকারিতায় ভরপুর
থাকে। তার প্রত্যেক সদস্য সত্যবাদিতা ও ওয়াদা রক্ষা করার গুণে গুণান্বিত
হয়। এ সমাজে গাদ্দার, ধোঁকাবাজ ও মিথ্যাবাদীদের কোনো স্থান থাকে না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ধোঁকাবাজি, প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকার কঠোর সমালোচনা
করেছেন। ধোঁকাবাজদের দুনিয়াতে মুসলমানদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন ঘোষণা
করেই ক্ষান্ত হননি তিনি; বরং পরকালে তাদের পরিণতি কী হবে তা-ও
স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, প্রত্যেক ধোঁকাবাজকে কিয়ামতের দিন একত্র

৩৩৭. সহিহ মুসলিম : ১০১

৩৩৮. সহিহ মুসলিম : ১০২

করা হবে। ধোঁকাবাজির পতাকাতলে তাদের সমবেত করে সবার সামনে ধোঁকাবাজ হিসাবে তাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে।

এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

لِكُلِّ غَادِرٍ لِّوَاءٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ

‘কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ধোঁকাবাজের জন্য পতাকা উত্তোলিত হবে। আর বলা হবে, এটা অমুকের ধোঁকাবাজির প্রতীক।’^{৩৩৯}

তখন ধোঁকাবাজ ও বিশ্বাসঘাতকদের লজ্জা পাওয়া ও আফসোস করা ছাড়া কিছুই থাকবে না। তাদের লজ্জা ও আফসোস তখন আরও বৃদ্ধি পাবে, যখন স্বয়ং আল্লাহকেই তাদের প্রতিপক্ষ হিসাবে দেখতে পাবে।

হাদিসে কুদসিতে ইরশাদ হয়েছে, আল্লাহ তাআলা বলেন :

ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

‘কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির সরাসরি প্রতিপক্ষ হব। এক. যে আমার নামে প্রতিজ্ঞা করল, তারপর তা ভঙ্গ করল। দুই. যে স্বাধীন মানুষ বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করল। তিন. যে শ্রমিক নিয়োগ করে তার কাজ পুরোপুরি আদায় করে নিল, কিন্তু তার পারিশ্রমিক দিল না।’^{৩৪০}

প্রকৃত মুসলমান ধোঁকা, প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকা, মিথ্যা—এসব খারাপ অভ্যাস থেকে নিজেকে দূরে রাখে; এসবে যতই উপকার ও লাভ থাকুক না কেন। কেননা, ইসলাম এগুলোকে মুনাফিকের গুণাবলি বলে অভিহিত করেছে।

৩৩৯. সহিহ মুসলিম : ১৭৩৬

৩৪০. সহিহুল বুখারি : ২২২৭

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

أَرْبَعُ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَتْ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْهُمْ
كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدْعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ
غَدَرَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

‘চারটি দোষ যার মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে, সে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে এ দোষগুলোর একটি বিদ্যমান রয়েছে তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে নিফাকের একটি স্বভাব থাকে। এক. যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে। দুই. সে সন্ধিচুক্তি করলে তার বিপরীত করে। তিন. সে ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে। চার. সে ঝগড়া করলে অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করে।’^{৩৪১}

মুনাফিকদের পরিণাম সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন :

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

‘নিঃসন্দেহে মুনাফিকরা থাকবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। আর তুমি কখনো তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী পাবে না।’^{৩৪২}

হিংসুক নয়

যেসব খারাপ অভ্যাস থেকে দ্বীনদার মুসলমানদের বেঁচে থাকা জরুরি, তার একটি হচ্ছে হাসাদ বা হিংসা। রাসুলুল্লাহ ﷺ এ অভ্যাস থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

তিনি ইরশাদ করেছেন :

لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبٍ عَبْدٌ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ

‘কোনো বান্দার অন্তরে ইমান ও হিংসা একত্র হয় না।’^{৩৪৩}

৩৪১. সহিহুল বুখারি : ৩১৭৮, সহিহ মুসলিম : ৫৮

৩৪২. সূরা আন-নিসা : ১৪৫

৩৪৩. সুনানুন নাসায়ি : ৩১০৯

দামরা বিন সালাবা   থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ   ইরশাদ করেছেন :

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَتَحَاسَدُوا

'মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত পরস্পর হিংসা করে না, ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণের মধ্যে থাকে।' ৩৪৪

প্রকৃত মুসলমান নিজেকে প্রতারণা ও হিংসা থেকে, বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্বেষ থেকে বিরত রাখে। এসব খারাপ অভ্যাস থেকে যে বিরত থাকে, সে অধিক নফল ইবাদতকারী না হলেও জান্নাতে যাবে।

এ সম্পর্কে ইমাম আহমাদ   ও ইমাম নাসায়ি   আনাস বিন মালিক   থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন :

كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَطْلُعُ عَلَيْكُمُ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، تَنْطِفُ لِحْيَتُهُ مِنْ وُضُوئِهِ، قَدْ تَعَلَّقَ نَعْلَيْهِ فِي يَدِهِ الشَّمَالِ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَ ذَلِكَ، فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مِثْلَ الْمَرَّةِ الْأُولَى. فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَ مَقَالَتِهِ أَيْضًا، فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى مِثْلِ حَالِهِ الْأُولَى، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبِعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ: إِنِّي لَأَحِيثُ أَبِي فَأَقْسَمْتُ أَنْ لَا أَدْخُلَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُؤْوِيَنِي إِلَيْكَ حَتَّى تَمْضِيَ فَعَلْتُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ أَنَسُ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَاتَ مَعَهُ تِلْكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثَ، فَلَمْ يَرَهُ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا تَعَارَّ وَتَقَلَّبَ عَلَى فِرَاشِهِ ذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَبَّرَ، حَتَّى يَقُومَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: غَيْرَ أَنِّي لَمْ أَسْمَعُهُ يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا، فَلَمَّا مَضَتْ

الثَّلَاثَ لَيْالٍ وَكَذْتُ أَنْ أَحْقِرَ عَمَلَهُ، قُلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ
 بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي غَضَبٌ وَلَا هَجْرٌ ثُمَّ، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَكَ ثَلَاثَ مِرَارٍ: يَطْلُعُ عَلَيْكُمْ الْآنَ رَجُلٌ مِنْ
 أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَطَلَعْتَ أَنْتَ الثَّلَاثَ مِرَارٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ آوِيَ إِلَيْكَ لِأَنْظُرَ
 مَا عَمَلُكَ، فَأَقْتَدَيْتُ بِهِ، فَلَمْ أَرَكَ تَعْمَلُ كَثِيرَ عَمَلٍ، فَمَا الَّذِي بَلَغَ بِكَ
 مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ.
 قَالَ: فَلَمَّا وَلَّيْتُ دَعَانِي، فَقَالَ: مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ، غَيْرَ أَنِّي لَا أَجِدُ فِي
 نَفْسِي لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غِشًّا، وَلَا أَحْسُدُ أَحَدًا عَلَى خَيْرٍ أَعْطَاهُ
 اللَّهُ إِيَّاهُ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ هَذِهِ الَّتِي بَلَغْتَ بِكَ، وَهِيَ الَّتِي لَا تُطِيقُ

‘আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পাশে উপবিষ্ট ছিলাম। এমতাবস্থায় তিনি বললেন, এখন তোমাদের মাঝে একজন জান্নাতি ব্যক্তির আগমন ঘটবে। তখন একজন আনসারি সাহাবি আসলেন, যার দাড়ি থেকে অজুর পানি ঝরছিল এবং তিনি বাম হাতে পায়ের জুতো বহন করছিলেন। পরের দিনও নবিজি ﷺ একই কথা বললেন। এইদিনে সে একই ব্যক্তি প্রথমদিনের মতো করে আসলেন। তৃতীয় দিনেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো। নবিজি ﷺ যখন মজলিস থেকে উঠলেন, তখন আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস ﷺ লোকটির পিছু নিলেন। তার কাছে গিয়ে বললেন, আমি পিতার সাথে ঝগড়া করেছি এবং কসম করেছি যে, তিন দিন তার কাছে যাব না। আপনি কি এ সময় শেষ হওয়া পর্যন্ত আমাকে আপনার কাছে থাকতে দেবেন? লোকটি বললেন, হ্যাঁ, অবশ্যই। আনাস ﷺ বলেন, তার কাছে তিন রাত থাকার পর আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, আমি তাকে রাতে নফল নামাজ পড়তে দেখিনি। তবে যখন ঘুম ভেঙে যেত এবং পাশ পরিবর্তন করতেন, তখন আল্লাহর জিকির করতেন এবং তাকরির বলতেন। এরপর ফজরের নামাজের জন্য উঠতেন। আমি তাকে উত্তম কথা ছাড়া কথা বলতে দেখিনি। যখন তিনদিন পূর্ণ হলো,

আমার মনে হচ্ছিল এ ব্যক্তি তো খুব কমই আমল করে। তাই আমি তাকে শোধালাম, হে আল্লাহর বান্দা, আমি ও আমার পিতার মাঝে কোনোরূপ মনোমালিন্য ও সম্পর্কহীনতার ঘটনা ঘটেনি। আপনার কাছে আমার আসার কারণ হলো, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে তিনবার এ কথা বলতে শুনেছি, তোমাদের সামনে এখন জান্নাতি লোকের আগমন ঘটবে। আর প্রতিবারেই আপনার আগমন ঘটেছে। তাই আমি আপনার কাছে এসে আপনি কী আমল করেন, তা দেখে নিজেও আমল করার জন্য এসেছিলাম। কিন্তু আপনাকে তো তেমন বড় কোনো আমল করতে দেখলাম না! তাহলে আপনি কী এমন আমল করেন, যার কারণে রাসুলুল্লাহ ﷺ আপনার ব্যাপারে এমন কথা বলেছেন? তিনি বললেন, আপনি যা দেখেছেন, তা ছাড়া তো আমি আর কোনো আমল করি না। এরপর আমি (আব্দুল্লাহ ﷺ) যখন ফিরে আসছিলাম, তখন ডেকে বললেন, আপনি যা দেখেছেন, তা ছাড়া অন্য কোনো আমল আমি করি না, তবে আমি অন্তরে কোনো মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি না এবং কোনো বান্দাকে আল্লাহ যে নিয়ামত দান করেছেন, তা দেখে তার প্রতি হিংসা করি না। তখন আব্দুল্লাহ ﷺ বললেন, এটাই আপনাকে এমন উচ্চ স্তরে পৌঁছে দিয়েছে এবং এই অভ্যাসটাই আমাদের ভেতর আনতে পারছি না।^{৩৪৫}

এ হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয়, হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি মন্দ স্বভাব থেকে অন্তর পরিষ্কার রাখা আখিরাতের কামিয়াবি নিশ্চিত করে এবং আল্লাহর দরবারে মর্যাদা বৃদ্ধি করে। কারণ, তখন আমল কম হলেও তা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয়। হাদিসে বর্ণিত লোকটি অন্তরকে পরিশুদ্ধ রাখার কারণে এবং মানুষকে কষ্টদান থেকে বিরত থাকার কারণে কম আমল করেও জান্নাতের সুসংবাদ পেলেন। পক্ষান্তরে, একটি মেয়ে—যে রাতে নফল ইবাদত করত এবং দিনে রোজা রাখত, কিন্তু প্রতিবেশীদের কষ্ট দিতো—তার সম্পর্কে যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তখন

তিনি উত্তরে বললেন : لَا خَيْرَ فِيهَا، هِيَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ : 'তার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, সে নির্ঘাত জাহান্নামি।' ৩৪৬

এর কারণ হলো, ইসলামের মানদণ্ডে ওই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠত্ব পায়, যে হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাকার মন্দ স্বভাব থেকে পবিত্র হয়; যদিও তার ইবাদত কম হোক। ইবাদত কম হলেও এ ব্যক্তি ইসলামি সমাজের ভিত্তি টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে শক্ত ও পরিচ্ছন্ন ইটের ন্যায়। পক্ষান্তরে যার অন্তরে এ মন্দ স্বভাবগুলো আছে, সে যত বেশি ইবাদত করুক, ইসলামি সমাজে তার উদাহরণ ফোকলা ইটের মতো, যার ওপর ইসলামি সমাজের ভিত্তি খুব ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকে। অনেক সময় তা ভেঙে তছনছ হয়ে যায়।

সত্যিকারের আদর্শ মুসলিম উত্তম ইবাদতের পাশাপাশি অন্তরকে পরিশুদ্ধ রাখে এবং মানুষের সাথে লেনদেন ঠিক রেখে চলে। তার ভেতরের অবস্থা বাইরের অবস্থার অনুরূপ হয়। কথায় কাজে মিল থাকে। এ ধরনের মুসলমান দ্বারাই ইসলাম-নির্দেশিত আদর্শ সমাজ গড়ে ওঠে। যে সমাজ হাদিসের ভাষ্য অনুযায়ী একটি প্রাসাদ, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে।

কল্যাণকামী

প্রকৃত মুসলমান উল্লিখিত মন্দ স্বভাবগুলো থেকে বিরত থাকার পাশাপাশি বিভিন্ন ইতিবাচক গুণাবলি দ্বারাও সজ্জিত থাকে। তন্মধ্যে একটি উত্তম গুণ হলো, সমাজের প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কল্যাণ কামনা করা। হাদিস শরিফে এটিকে দ্বীন অভিহিত করা হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

«الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَيِّمَّةِ
الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»

‘দ্বীন হলো কল্যাণকামিতা। আমরা (উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম)
বললাম, কার জন্য? তিনি বললেন, আল্লাহ, তাঁর কিতাব, রাসুল,

নেতৃস্থানীয় মুসলমান এবং সকল সাধারণ মুসলমানের জন্য।^{৩৪৭}

সাহাবায়ে কিরাম রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে নামাজ ও জাকাতের ব্যাপারে যেভাবে আনুগত্যের শপথ করেছিলেন, তেমনই প্রত্যেক মুসলমানের প্রতি কল্যাণকামিতার ব্যাপারেও আনুগত্যের শপথ করেছিলেন।

জারির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন :

بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ، وَالتَّصَدُّقِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

‘আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট নামাজ কায়েম করা, জাকাত আদায় করা ও প্রত্যেক মুসলমানের জন্য কল্যাণ কামনা করার ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছি।^{৩৪৮}

নামাজ ও জাকাতের সাথে মুসলমানদের কল্যাণকামিতাকে যুক্ত করার কারণে ইসলামে এ বিষয়টির গুরুত্ব কতটুকু, তা অনুমান করা যায়। এজন্য যুগে যুগে প্রত্যেক আদর্শ মুসলমান এ গুণে গুণান্বিত ছিলেন।

কল্যাণকামিতার গুরুত্ব এতটুকুতেই শেষ নয়; বরং হাদিস শরিফের বর্ণনা অনুযায়ী এ কল্যাণকামিতার অভাবেই অনেক সময় মানুষ জাহান্নামে যাবে। যেমন এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ،
إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

‘যদি কোনো বান্দাকে আল্লাহ জনগণের শাসক নিযুক্ত করেন, আর সে তাদের অধিকার হরণ করে এবং খিয়ানতকারী হিসাবে মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।^{৩৪৯}

৩৪৭. সহিহ মুসলিম : ৫৫

৩৪৮. সহিহল বুখারি : ৫৭, ৫২৪; সহিহ মুসলিম : ৫৬

৩৪৯. সহিহ মুসলিম : ১৪২

অপর রিওয়াযাতে আছে :

فَلَمْ يَحْظَهَا بِنَصِيحَةٍ، إِلَّا لَمْ يَجِدْ رَاحَةَ الْجَنَّةِ

‘অতঃপর সে (শাসক) তাদের কল্যাণ কামনা করেনি, সে জান্নাতের সুখ্যাগও পাবে না।’^{৩৫০}

মুসলিম শরিফের অপর এক বর্ণনায় এসেছে :

مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ، وَيَنْصَحُ، إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ

‘যে ব্যক্তি মুসলমানদের যাবতীয় ব্যাপারে শাসক নিযুক্ত হয়ে তাদের কল্যাণ ও নিরাপত্তা বিধান করল না, সে তাদের সাথে জান্নাতে যেতে পারবে না।’^{৩৫১}

হাদিস শরিফের ভাষ্য থেকে বাহ্যিকভাবে কল্যাণকামিতা শাসকদের দায়িত্ব মনে হলেও এটি আসলে সকল মুসলমানের জন্যই প্রযোজ্য। কেননা, প্রত্যেক মুসলমান নিজের অধীনস্থ লোকের জিম্মাদার। রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, ‘তোমাদের প্রত্যেকই জিম্মাদার এবং প্রত্যেকই নিজেদের অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।’ তাহলে বুঝা গেল, সকল মুসলমানের জন্য কল্যাণ কামনা করা প্রতিটি মুসলমানের দায়িত্ব। এ দায়িত্ববোধ যতদিন মুসলমানদের মাঝে থাকবে, ততদিন ইসলামি আদর্শ সমাজ অটুট থাকবে।

ওয়াদা রক্ষাকারী

প্রকৃত মুসলমানের আরেকটি উত্তম স্বভাব হলো ওয়াদা রক্ষা করা। যদি বলি, এটাই সমাজজীবনে মানুষের সুখ ও সমৃদ্ধির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম, তাহলে মোটেও অত্যুক্তি হবে না।

অন্যান্য অনেক মানুষের মধ্যেও এ গুণটি আছে, তবে প্রকৃতপক্ষে এটি ইসলামি চরিত্র। তাই প্রকৃত আমলদার মুসলমানের মাঝে যখন এ গুণটি থাকে, তখন

৩৫০. সহিহুল বুখারি : ৭১৫০

৩৫১. সহিহ মুসলিম : ১৪২

সে এ গুণের দিক দিয়ে সবার সেরা হয়ে ওঠে। এটিই তার ইমান ও ইসলামের পরিচয় বহন করে। অসংখ্য আয়াত ও হাদিসে মুসলমানদের ওয়াদা রক্ষা করার গুণ অবলম্বন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটাকে ইমানি চরিত্র অভিহিত করা হয়েছে এবং ওয়াদা ভঙ্গ করাকে মুনাফিকের আলামত বলা হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

‘মুমিনগণ, তোমরা অঙ্গীকারসমূহ পূর্ণ করো।’^{৩৫২}

অন্য আয়াতে বলেন :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

‘আর অঙ্গীকার পূর্ণ করো। নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।’^{৩৫৩}

আয়াত থেকে বুঝা গেল, ওয়াদা নিছক মুখের কথা নয়; বরং ওয়াদা একটি দায়িত্ব ও জিম্মাদারি। এটি অবশ্যই পালন করতে হবে। এটি সম্পর্কে কিয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশ হবে। কিন্তু বর্তমান সময়ে অধিকাংশ মুসলমান এটিকে মৌখিক একটি আশ্বাস মনে করে। ওয়াদা রক্ষা করার প্রতি তেমন গুরুত্ব দেয় না। এটা মুসলিম উম্মাহর জন্য খুবই দুঃখজনক বিষয়।

অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন :

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ

‘আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করার পর সে অঙ্গীকার পূর্ণ করো।’^{৩৫৪}

এ আয়াতে ওয়াদাকে আল্লাহ নিজের সাথে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। এখান থেকে ওয়াদার গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং তা পালন করা যে ওয়াজিব, তা অনুধাবন করা যায়।

৩৫২. সূরা আল-মায়িদা : ১

৩৫৩. সূরা বনি ইসরাইল : ৩৪

৩৫৪. সূরা আন-নাহল : ৯১



অন্য আয়াতে তিনি বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ
تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

‘হে মুমিনগণ, তোমরা যা করো না, তা কেন বলো? তোমরা যা করো না, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক।’^{৩৫৫}

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, ওয়াদা পালন না করা আল্লাহর ক্রোধকে আবশ্যক করে, যা বান্দার জন্য মোটেই কল্যাণকর নয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

‘মুনাফিকের আলামত তিনটি। এক. যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে। দুই. ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে। তিন. (তার কাছে) আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে।’^{৩৫৬}

সহিহ মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় এসেছে :

وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ

‘...যদিও সে নামাজ-রোজা আদায় করে এবং নিজেকে মুসলমান দাবি করে।’^{৩৫৭}

নামাজ, রোজা, হজ ইত্যাদি ইবাদত পালন করলেই মানুষের ইসলাম পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায় না। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ হওয়ার জন্য ইসলামের উন্নত স্বভাব ও চরিত্রসমূহ অবলম্বন করাও বাঞ্ছনীয়। এজন্যই প্রকৃত মুসলমান এ চরিত্রগুলো অবলম্বন করে থাকে। মিথ্যা, ওয়াদাভঙ্গ, আমানতের খিয়ানত ইত্যাকার খারাপ স্বভাব থেকে নিজেকে যোজন যোজন দূরে রাখে। কেননা, এগুলো ইসলামি চরিত্রের পরিপন্থী এবং মুনাফিকদের স্বভাব।

৩৫৫. সূরা আস-সাফ : ২-৩

৩৫৬. সহিহুল বুখারি : ২৭৪৯, সহিহ মুসলিম : ৫৯

৩৫৭. সহিহ মুসলিম : ৫৯

কিন্তু দুঃখজনক হলেও বাস্তব যে, বর্তমান সময়ে অনেক চাকুরিজীবী, ব্যবসায়ী ও শ্রমজীবী মানুষের মাঝে ওয়াদা ভঙ্গ করার এ দোষ খুব বেশি পাওয়া যায়। যেকোনো বিষয়ে তারা চট করে ওয়াদা দিয়ে বসে, কিন্তু পালন করার ক্ষেত্রে খুবই শিথিলতা করে। আমানত জমা রাখার প্রতি খুব আগ্রহ দেখায়, কিন্তু তাতে বিনা দ্বিধায় খিয়ানত করে। এ ধরনের খারাপ অভ্যাস থেকে বাঁচা খুবই জরুরি। কারণ, এগুলো মুনাফিকদের স্বভাব। আর মুনাফিকদের পরিণাম খুবই ভয়াবহ। তারা জাহান্নামের একদম নিচের স্তরে অবস্থান করবে।

তার চরিত্র সুন্দর

প্রকৃত মুসলমানের চরিত্র সুন্দর। সে নম্র ও ভদ্র ভাষায় কথা বলে। কারণ, এটাই ইসলামের শিক্ষা ও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ।

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর খাদিম আনাস রূবর্ণনা করেন :

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا

‘উন্নত চরিত্রের বিচারে নবিজি ﷺ ছিলেন সর্বোত্তম মানুষ।’^{৩৫৮}

এখানে আনাস রূবর্ণনা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ভালোবাসাবশত মোটেই বাড়িয়ে বলেননি। তিনি আসলেই রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মাঝে অদৃশ্যপূর্ব ও অশ্রুতপূর্ব উত্তম চরিত্রের সমাহার দেখেছিলেন।

অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেন :

خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ، فَمَا قَالَ لِي: أُفُّ،

وَلَا: لِمَ صَنَعْتَ؟ وَلَا: أَلَا صَنَعْتَ

‘আমি দশ বছর যাবৎ নবিজি ﷺ-এর খিদমত করেছি। কখনো তিনি আমাকে “উফ” পর্যন্ত বলেননি। “এটা কেন করেছ, ওটা কেন করোনি”—এমন কথাও কোনোদিন বলেননি।’^{৩৫৯}

৩৫৮. সহিহুল বুখারি : ৬২০৩

৩৫৯. সহিহুল বুখারি : ৬০৩৮

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস ❀ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ❀ অশ্লীলভাষী ছিলেন না। তিনি সাহাবীদের উদ্দেশে বারবার বলতেন :

إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا

‘তোমাদের মধ্যে যাদের চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর, তারাই সর্বোত্তম।’^{৩৬০}

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ ❀ ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ الْفُحْشَ، وَالتَّفَحُّشَ لَيْسَا مِنَ الْإِسْلَامِ، وَإِنَّ أَحْسَنَ النَّاسِ
إِسْلَامًا، أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

‘অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করা এবং অশ্লীলতার আশ্রয় গ্রহণ করা ইসলামে নেই। সেই ব্যক্তির ইসলাম সবচেয়ে সুন্দর, যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর।’^{৩৬১}

অপর এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ ❀ ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنَكُمْ
أَخْلَاقًا، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
الْتَرْتَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيِّهُونَ

‘নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে যাদের চরিত্র সবচেয়ে বেশি সুন্দর, তারাই আমার সবচেয়ে প্রিয় এবং তারাই কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে নিকটে অবস্থান করবে। আর যারা বেশি কথা বলে, কথা বলতে বলতে মানুষকে বিরক্ত করে ফেলে এবং অহংকার করে, তাদের আমি সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করি এবং তারা কিয়ামতের দিন আমার থেকে সবচেয়ে দূরে অবস্থান করবে।’^{৩৬২}

সাহাবায়ে কিরাম ❀ রাসুলুল্লাহ ❀-এর চারিত্রিক মাধুর্য স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর দেখাদেখি তাঁরাও সেসব চরিত্র অবলম্বন করেছিলেন।

৩৬০. সহিহ মুসলিম : ২৩২১

৩৬১. মুসনাদু আহমাদ : ২০৮৩১; আল-মুজামুল কবির, তাবারানি : ২০৭২

৩৬২. সুনানুত তিরমিজি : ২০১৮

এভাবে মানবজাতির ইতিহাসে নজিরবিহীন একটি আদর্শ সমাজ গড়ে উঠেছিল।

আনাস   বলেন :

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحِيمًا، وَكَانَ لَا يَأْتِيهِ أَحَدٌ إِلَّا وَعَدَهُ،
وَأُنْجَزَ لَهُ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَجَاءَهُ أُعْرَابِيٌّ فَأَخَذَ بِثَوْبِهِ
فَقَالَ: إِنَّمَا بَقِيَ مِنْ حَاجَتِي يَسِيرَةٌ، وَأَخَافُ أَنْسَاهَا، فَقَامَ مَعَهُ حَتَّى
فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ فَصَلَّى

‘নবিজি   ছিলেন অতি দয়ালু। তাঁর কাছে যে ব্যক্তিই আসত, তিনি তাকেই দানের প্রতিশ্রুতি দিতেন। তাঁর কাছে তৎক্ষণাৎ দেওয়ার মতো কিছু থাকলে সাথে সাথে সে প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতেন। একদিন নামাজের ইকামত শেষ হয়েছে, এমন সময় জনৈক বেদুইন তাঁর কাপড় টেনে ধরে বললেন, আমার সামান্য একটি কাজ রয়ে গেছে এবং তার কথা আমি ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা করছি। তখন নবিজি   তার সাথে গেলেন এবং তার কাজ সম্পন্ন করলেন। অতঃপর তিনি প্রত্যাবর্তন করলেন এবং নামাজ আদায় করলেন।’^{৩৬৩}

নামাজের ইকামত হয়ে যাওয়ার পরও রাসুলুল্লাহ   বেদুইন লোকটার কথা শুনতে এবং তার প্রয়োজন পূরণ করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। বেদুইন লোকটা যে তাঁর কাপড় টেনে ধরলেন এবং নামাজের আগেই প্রয়োজন পূর্ণ করে দেওয়ার জন্য জোরাজুরি করলেন, এতেও তিনি বিরক্ত হননি। কারণ, তাঁর মাঝে অনুপম চরিত্রের সমাবেশ ছিল। সকল উত্তম গুণ তাঁর মাঝে বিদ্যমান ছিল। কথা ও কাজের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহকে তা শিখিয়ে গেছেন তিনি। সুখ ও সমৃদ্ধিময় সমাজগঠনে তাঁর শিখিয়ে যাওয়া চরিত্রগুলোর বিকল্প নেই কোথাও।

অমুসলিমদের মাঝে তখনই উত্তম চরিত্র আসে, যখন তাকে উত্তমরূপে লালনপালন করা হয় এবং উন্নত শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু মুসলমানদের স্বয়ং তাদের ধর্মই চরিত্র শিক্ষা দেয়। ইসলাম ধর্ম উত্তম চরিত্রকে এত মর্যাদা

দিয়েছে যে, কিয়ামতের দিন আমল পরিমাপের পাল্লায় এটাই সবচেয়ে ভারী হবে। রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ

‘কিয়ামাতের দিন মুমিনের (আমল পরিমাপের) পাল্লায় উত্তম চরিত্রের চেয়ে ভারী কোনো বস্তু রাখা হবে না। আর আল্লাহ তাআলা অশ্লীল ও দুশ্চরিত্র লোকের প্রতি বেজায় অসন্তুষ্ট।’^{৩৬৪}

শুধু তাই নয়, ইসলাম উত্তম চরিত্রকে ইমানের পূর্ণতা আখ্যা দিয়েছে। হাদিস শরিফে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

‘মুমিনদের মধ্যে সেই ব্যক্তির ইমানই সবচেয়ে পরিপূর্ণ, যার চরিত্র সর্বোত্তম।’^{৩৬৫}

এ ছাড়াও উত্তম চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তিকে আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় বান্দা বলা হয়েছে। যেমন উসামা বিন শুরাইক ؓ-এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন :

‘আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে স্থির হয়ে বসে ছিলাম, যেন আমাদের মাথার ওপর পাখি বসে আছে। কেউ কোনো কথা বলছিল না। এমন অবস্থায় কিছু লোক এসে জিজ্ঞাসা করল, আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় বান্দা কে? রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম।’^{৩৬৬}

উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয় বান্দা হওয়ার কারণ হলো, উত্তম চরিত্র ইসলামের অনেক বড় ও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। অধিকন্তু ইতিপূর্বে আমরা হাদিসও পড়ে এসেছি যে, ‘কিয়ামতের দিন মুমিনের আমল পরিমাপের পাল্লায় এটাই সর্বাধিক ভারী বস্তু হবে।’ এ ছাড়াও হাদিস শরিফে উত্তম চরিত্রকে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ দুই রুকন নামাজ ও রোজার সমান বলা হয়েছে।

৩৬৪. সুনানুত তিরমিজি : ২০০২

৩৬৫. সুনানুত তিরমিজি : ১১৬২

৩৬৬. তাবারানি

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَا مِنْ شَيْءٍ يُوَضَّعُ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ، وَإِنَّ صَاحِبَ
حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةً صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ

‘(আমল পরিমাপের) পাল্লায় উত্তম চরিত্রের চেয়ে ভারী কোনো বস্তু রাখা হবে না। আর উত্তম চরিত্রের কারণে বান্দা (নফল) রোজাদার ও (নফল) নামাজ আদায়কারীর সমান মর্যাদায় পৌঁছে যায়।’^{৩৬৭}

এজন্যই রাসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবিগণকে উত্তম চরিত্র অবলম্বন করার প্রতি বেশি জোর দিতেন। কথা ও কাজের মাধ্যমে তাঁদের উত্তম চরিত্রের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন।

এক হাদিসে এসেছে, তিনি আবু জার ﷺ-কে বললেন :

يَا أَبَا ذَرٍّ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى خَصْلَتَيْنِ هُمَا أَخَفُّ عَلَى الظَّهْرِ وَأَثْقَلُ فِي
الْمِيزَانِ مِنْ غَيْرِهِمَا؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْخُلُقِ
وَطُولِ الصَّمْتِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا تَجَمَّلَ الْخَلَائِقُ بِمِثْلِهِمَا»

‘হে আবু জার, আমি কি তোমাকে এমন দুটি বিষয় জানিয়ে দেবো, যা খুবই হালকা কিন্তু (আমল পরিমাপের) পাল্লায় সবচেয়ে ভারী? তিনি বললেন, অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসুল। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, উত্তম চরিত্র অবলম্বন করো এবং (অহেতুক কথা বলা থেকে) চুপ থাকো। কেননা, সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, মানুষের আসল সৌন্দর্য এই দুই বিষয়ের মাঝেই নিহিত।’^{৩৬৮}

অন্য হাদিসে তিনি ইরশাদ করেছেন :

حُسْنُ الْخُلُقِ نَمَاءٌ، وَسُوءُ الْخُلُقِ سُوءٌ، وَالْبِرُّ زِيَادَةٌ فِي الْعُمْرِ، وَالصَّدَقَةُ
تَمْنَعُ مِيتَةَ السَّوْءِ

৩৬৭. সুনানুত তিরমিজি : ২০০৩

৩৬৮. মুসনাদু আবি ইয়ালা : ৩২৯৮

‘উত্তম চরিত্র উন্নতির কারণ, আর খারাপ চরিত্র অশুভ পরিণাম ডেকে আনে। উত্তম আমল বয়স বৃদ্ধি করে এবং সদকা খারাপ মৃত্যু থেকে বাঁচায়।’^{৩৬৯}

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর একটি দুআ ছিল :

اللَّهُمَّ حَسَّنْتَ خُلُقِي فَأَحْسِنْ خُلُقِي

‘হে আল্লাহ, আপনি আমার গঠন সুন্দর করেছেন; সুতরাং আমার চরিত্রও সুন্দর করে দিন।’^{৩৭০}

লক্ষ্য করুন, রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তম চরিত্রের জন্য দুআ করতেন; অথচ তাঁর ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন, ‘নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত।’^{৩৭১} এ থেকে উত্তম চরিত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার আধিক্য প্রতীয়মান হয়। তা ছাড়া তিনি খুব করে চাইতেন যে, উম্মত যেন অধিক হারে উত্তম চরিত্র অবলম্বন করে। এজন্য তার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি তা অর্জন করার দুআও শিখিয়ে দিয়েছেন উম্মাহকে।

‘উত্তম চরিত্র’ একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। মানুষের সকল সুন্দর ও উত্তম গুণাবলি—যেগুলো মানুষের আত্মিক পরিশুদ্ধির পরিচয় বহন করে—সবগুলোকে এ শব্দ অন্তর্ভুক্ত করে। লজ্জা, সহনশীলতা, ক্ষমাগুণ, নম্রতা, বদান্যতা, মানবিকতা, সত্যবাদিতা, আমানতদারিতা, কল্যাণকামিতা, অটলতা, অন্তরের পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি সকল উত্তম গুণ ‘উত্তম চরিত্র’-এর অন্তর্ভুক্ত।

ইসলামি সমাজবিষয়ক কুরআন ও হাদিস অধ্যয়ন করতে গেলে অনুভব হয়, উল্লিখিত গুণাবলির প্রতি ইসলাম কতটা গুরুত্ব দিয়েছে! এগুলো অবলম্বন করার প্রতি মুসলমানদের কীরূপ উদ্বুদ্ধ করেছে!! আসলে একটি আদর্শ সমাজ গঠনে কী কী প্রয়োজন, তার সবটুকুই ইসলাম বাতলে দিয়েছে। এ গুণগুলো তারই অন্তর্ভুক্ত। আদর্শ সমাজ গঠনের এত সুন্দর রূপরেখা ও পদ্ধতি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম প্রণয়ন করতে পারেনি।

৩৬৯. মুসনাদু আহমাদ : ১৬০৭৯

৩৭০. শুআবুল ইমান : ৮১৮৩

৩৭১. সূরা আল-কলম : ৪

ইতিপূর্বে আমরা বিভিন্ন আয়াত ও হাদিসের মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে, প্রকৃত মুসলমান সত্যবাদী হয়। ওয়াদা পালনে সে থাকে বদ্ধপরিকর। প্রতারণা করে না। বিশ্বাসঘাতকতা করে না। খিয়ানত করা তার অভ্যাস নয়। হিংসা-বিদ্বেষ তার মাঝে নেই। মোটকথা, সে আপাদমস্তক একজন উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি। নিম্নে আমরা প্রকৃত মুসলমানের আরও কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করব।

তার ভেতর লজ্জাবোধ আছে

প্রকৃত মুসলমান লাজুক হয়। কেননা, স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ﷺ লজ্জাশীলতার মূর্তপ্রতীক ছিলেন।

আবু সাইদ খুদরি ؓ বর্ণনা করেন :

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ حَيَاءً مِنَ الْعَذْرَاءِ فِي خِذْرِهَا،
فَإِذَا رَأَى شَيْئًا يَكْرَهُهُ عَرَفْنَاهُ فِي وَجْهِهِ

‘নবিজি ﷺ কুমারী মেয়ের চেয়েও অধিক লাজুক ছিলেন। অপছন্দনীয় কোনো বিষয়ের প্রতি যখন তার নজর পড়ত, (তিনি লজ্জার কারণে মুখ ফুটিয়ে বলতে পারতেন না, কিন্তু) আমরা তাঁর চেহারা় তার লক্ষণ দেখতে পেতাম।’^{৩৭২}

লজ্জা এমন একটি গুণ, যা মানুষকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। তাই বিভিন্ন হাদিসে লজ্জাকে কল্যাণ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

ইমরান বিন হুসাইন ؓ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

الْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ

‘লজ্জা কেবল কল্যাণই বয়ে আনে।’^{৩৭৩}

৩৭২. সহিহুল বুখারি : ৬১০২, সহিহ মুসলিম : ২৩২০

৩৭৩. সহিহুল বুখারি : ৬১১৭, সহিহ মুসলিম : ৩৭



মুসলিম শরিফের অপর বর্ণনায় এসেছে :

الْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ قَالَ: أَوْ قَالَ: الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ

‘লজ্জা পুরোটাই কল্যাণজনক অথবা বলেছেন, লজ্জা সকল কল্যাণের
উৎস।’^{৩৭৪}

আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সঃ ইরশাদ করেছেন :

الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ - أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ - شُعْبَةٌ، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَذْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

‘ইমানের সাতাত্তর বা সাতষট্টিরও অধিক শাখা-প্রশাখা রয়েছে।
তন্মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা এবং সর্বনিম্ন
শাখা হলো, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেওয়া। আর লজ্জা
ইমানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা।’^{৩৭৫}

প্রকৃত মুসলমান ভদ্র স্বভাবের হয়। তার থেকে খারাপ কাজ প্রকাশ পায় না।
কোনো মানুষকে সে কষ্ট দেয় না। কারও অধিকার হরণ করে না। এসবের
কারণ হলো, প্রকৃত মুসলমানের মাঝে লজ্জার গুণ সক্রিয় থাকে। তার অন্তরে
আল্লাহর প্রতি লজ্জাবোধ থাকে। লজ্জা পরিত্যাগ করে সে ইমানকে অঙ্গহীন
করতে চায় না। কারণ, লজ্জা ইমানের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আসলে এই বোধটাই
মানুষের অন্তরে লজ্জাকে জিইয়ে রাখে।

এ উত্তম চরিত্রগুলো অনেক সময় অমুসলিমদের মাঝেও পাওয়া যায়,
তবে ইখলাস, অটলতা ও ধারাবাহিকতার দিক দিয়ে মুসলমানদের সাথে
এদের পার্থক্য সৃষ্টি হয়। যত কঠিন সময়ই আসুক এবং যত কঠিন অবস্থার
মুখোমুখিই হোক—প্রকৃত মুসলমান এসব অভ্যাস পরিত্যাগ করে না। আর
লজ্জার ক্ষেত্রে অন্যরা লজ্জা পায় কেবল মানুষকে। তাই যখন একাকী থাকে,
তখন গুনাহ বা খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে না। কিন্তু প্রকৃত মুসলমান

৩৭৪. সহিহ মুসলিম : ৩৭

৩৭৫. সহিহ মুসলিম : ৩৫

মানুষকে যেমন লজ্জা পায়, তার চেয়েও অধিক লজ্জা পায় আল্লাহকে। তাই একাকিত্বের মুহূর্তেও সে গুনাহ থেকে বিরত থাকে। আল্লাহর প্রতি লজ্জাবোধই লজ্জার গুণে গুণান্বিত প্রকৃত মুসলমানকে অন্যদের চেয়ে আলাদা করে।

মানুষের সাথে কোমল আচরণ করে

প্রকৃত মুসলমান কোমলতা ও নম্রতার গুণে গুণান্বিত হয়। কেননা, এ গুণটি মুমিনের উত্তম স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত, যা বান্দার মাঝে থাকাটা আল্লাহ পছন্দ করেন। তা ছাড়া এ গুণটির কারণে মানুষ সমাজে সবার প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠে।

পবিত্র কুরআনে এ গুণ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ - وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

‘সমান নয় ভালো ও মন্দ। জওয়াবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন, আপনার সাথে যার শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। এ চরিত্র তারাই লাভ করে, যারা সবর করে এবং এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা অত্যন্ত ভাগ্যবান।’^{৩৭৬}

একাধিক হাদিসে কোমলতা ও বিনম্রতার ফজিলত বর্ণিত হয়েছে এবং তা অবলম্বন করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। সামাজিক জীবনের জন্য এ গুণটি কতটা গুরুত্বপূর্ণ, এসব হাদিস থেকে তা অনুমান করা যায়। তা ছাড়া স্বয়ং আল্লাহ-ই এই গুণে গুণান্বিত।

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে :

إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ

‘নিশ্চয় আল্লাহ কোমল। তিনি সব বিষয়ে কোমলতাকে পছন্দ করেন।’^{৩৭৭}

৩৭৬. সূরা ফুসসিলাত : ৩৪-৩৫

৩৭৭. সহিহুল বুখারি : ৬৯২৭



এটি এমন এক উত্তম চরিত্র, যার কারণে আল্লাহ তাআলা এমন সাওয়াব দান করেন, যা অন্য কোনো গুণের কারণে দান করেন না।

হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে :

إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفْقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرَّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ،
وَمَا لَا يُعْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ

‘নিশ্চয় আল্লাহ কোমল। তিনি কোমলতাকে পছন্দ করেন। আর কোমলতার কারণে এমন সাওয়াব দান করেন, যা রুষ্টতা বা অন্য কোনো কারণে দান করেন না।’^{৩৭৮}

শুধু এতটুকুই নয়; বরং রাসুলুল্লাহ ﷺ এ গুণটিকে প্রত্যেক বিষয়ের সৌন্দর্যের কারণ আখ্যা দিয়ে বলেন :

إِنَّ الرَّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانُهُ

‘নিশ্চয় কোমলতা যখন কোনো বিষয়ের সাথে থাকে, তখন সেটাকে সুন্দর করে তোলে; আর যখন কোনো বিষয় থেকে কোমলতা দূর হয়ে যায়, তখন তা অসুন্দর হয়ে পড়ে।’^{৩৭৯}

রাসুলুল্লাহ ﷺ কথার মাধ্যমে যেভাবে কোমলতার প্রতি উম্মতকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, তেমনই কাজের মাধ্যমেও কোমলতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

হাদিস শরিফে আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত আছে :

قَامَ أَغْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَتَنَّاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهُ وَهَرِّقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنْوَبًا مِنْ
مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

‘এক বেদুইন লোক মসজিদের ভেতর প্রশ্রাব করে দিল। উপস্থিত সাহাবিগণ তাকে মারার জন্য উদ্যত হলে নবিজি ﷺ বললেন, তাকে

৩৭৮. সহিহ মুসলিম : ২৫৯৩

৩৭৯. সহিহ মুসলিম : ২৫৯৪

ছেড়ে দাও এবং প্রশ্রাবের ওপর এক বাসতি পানি ঢেলে পরিষ্কার করে নাও। কেননা, তোমরা কোমলতা প্রদর্শন করার জন্য প্রেরিত হয়েছ, কঠোরতা দেখানোর জন্য নয়।^{৩৮০}

নম্রতা ও কোমলতা মানুষের পাষাণ হৃদয়ও গলিয়ে দিতে পারে। খুলে ফেলতে পারে অন্তরের বন্ধতালা। কঠোরতা ও শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে যা কখনো সম্ভব হয় না। এজন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ হকের প্রতি লোকদের আহ্বান করার ক্ষেত্রে কোমলতার পন্থা অবলম্বন করতেন। এ ব্যাপারে উম্মতকেও একই নির্দেশ দিয়ে রেখেছেন তিনি।

তিনি ইরশাদ করেছেন :

بَشِّرُوا وَلَا تُنْفَرُوا، وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

‘সুসংবাদ দাও, আতঙ্কিত কোরো না; সহজ করো, কঠিন কোরো না।’^{৩৮১}

এর কারণ হলো, মানুষ কঠোর ও রুক্ষ স্বভাবের লোকদের থেকে পালিয়ে বেড়ায়। তাদের সাথে মিশতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না। পক্ষান্তরে কোমল ও নরম স্বভাবের মানুষের সাথে মানুষ স্বস্তি অনুভব করে। তাদের কাছাকাছি থাকতে চায়। এজন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে আল্লাহ তাআলা রুক্ষ স্বভাবের না হতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

‘পক্ষান্তরে আপনি যদি রাগী ও কঠিন হৃদয়ের হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত।’^{৩৮২}

এটাই সর্বযুগের দ্বীনের দায়ীদের স্বভাব ছিল। কারণ, এর মাধ্যমে মানুষকে দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করা সহজ হয়। এজন্য মুসা ﷺ ও হারুন ﷺ-কেও আল্লাহ তাআলা নম্র কথার মাধ্যমে দাওয়াত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

৩৮০. সহিহুল বুখারি : ২২০, ৬১২৮

৩৮১. সহিহ মুসলিম : ১৭৩২, সহিহুল বুখারি : ৬৯

৩৮২. সূরা আলি ইমরান : ১৫৯

আল্লাহ তাআলা বলেন :

اَذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ - فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ

‘তোমরা উভয়ে ফিরআওনের কাছে যাও; সে খুব উদ্ধত হয়ে গেছে। অতঃপর তোমরা তাকে নম্র কথা বলো। এতে হয়তো সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভীত হবে।’^{৩৮৩}

মোটকথা, নম্রতা ও কোমলতার মধ্যে রয়েছে কল্যাণই কল্যাণ। যার মাঝে এ গুণ আছে, তার মাঝে কল্যাণ আছে। আর যার ভেতর কোমলতা নেই, সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।

জারির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ বর্ণনা করেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

مَنْ يُحَرِّمُ الرَّفْقَ، يُحَرِّمِ الْخَيْرَ

‘যে নম্রতা থেকে বঞ্চিত, সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।’^{৩৮৪}

অন্য হাদিসে আয়িশা ﷺ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন :

يَا عَائِشَةُ، ارْفُقِي، فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا، دَلَّهُمْ عَلَىٰ بَابِ الرَّفْقِ

‘হে আয়িশা, নম্রতার গুণে গুণান্বিত হও। কেননা, আল্লাহ তাআলা যখন কোনো পরিবারের সাথে কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তখন তাদের নম্রতার দিকে পথ প্রদর্শন করেন।’^{৩৮৫}

অপর এক বর্ণনায় আছে :

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِأَهْلِ بَيْتٍ خَيْرًا، أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الرَّفْقَ

৩৮৩. সূরা তহা : ৪৩-৪৪

৩৮৪. সহিহ মুসলিম : ২৫৯২

৩৮৫. মুসনাদু আহমাদ : ২৪৭৩৪

‘যখন আল্লাহ কোনো পরিবারের সাথে কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তখন তাদের মাঝে নম্রতার গুণ ঢুকিয়ে দেন।’^{৩৮৬}

জাবির রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সঃ ইরশাদ করেছেন :

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا أَذْخَلَ عَلَيْهِمُ الرِّفْقَ

‘আল্লাহ তাআলা যখন কোনো জাতির সাথে কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তখন তাদেরকে নম্রতার গুণ দান করেন।’^{৩৮৭}

নম্রতা এমন এক উত্তম গুণ, যা অবলম্বন করলে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। হাদিস শরিফে রাসুলুল্লাহ সঃ ইরশাদ করেছেন :

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النَّارُ، عَلَى كُلِّ قَرِيبٍ هَيِّنٍ سَهْلٍ

‘আমি কি তোমাদের এমন ব্যক্তির পরিচয় দেবো না, যে জাহান্নামের জন্য হারাম আর জাহান্নাম তার জন্য হারাম? প্রত্যেক মিষ্টক, নম্র, কোমল ও সহজ সরল ব্যক্তির জন্য জাহান্নাম হারাম।’^{৩৮৮}

ইসলাম শুধু মানবের প্রতি নম্র হওয়ার কথা বলে না; বরং প্রত্যেক জীবের প্রতিই নম্রতার সবক দেয়। আর এটাকে ‘ইহসান’ (উত্তমরূপে আমল করা) এর অন্তর্ভুক্ত বলা হয়েছে, যা সাধারণত নেককার ও পরহেজকার লোকদের মাঝে থাকে।

এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ সঃ বলেন :

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحَدِّثْ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ

৩৮৬. মুসনাদু আহমাদ : ২৪৪২৭

৩৮৭. কাশফুল আসতার আন জাওয়ায়িদিল বাজ্জার : ১৯৬৫

৩৮৮. সুনানুত তিরমিজি : ২৪৮৮

‘আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যে ইহসান বাধ্যতামূলক করেছেন। সুতরাং তোমরা যখন (হৃদ বা কিসাস হিসাবে) কাউকে হত্যা করবে, তখন উত্তমরূপে হত্যা করবে। আর যখন কোনো জন্তু জবাই করবে, তখন উত্তমরূপে জবাই করবে। তার জন্য জবাই করার পূর্বে ছুরি ভালোভাবে ধার দিয়ে নেবে এবং জবাইকৃত জন্তুকে যথাসম্ভব আরাম দেবে।’^{৩৮৯}

বাকহীন পশুর প্রতি এ দয়াপ্রদর্শন জবাইকারীর কোমলতা গুণের পরিচায়ক। বুঝা গেল, এ হাদিসে রাসুলুল্লাহ ﷺ জীবজন্তুর প্রতিও কোমল হওয়ার আদেশ দিয়েছেন।

দয়ালু

প্রকৃত মুসলমান দয়ালু হয়। তার হৃদয় থেকে অনবরত প্রবাহিত হয় দয়া ও করুণার ফলুধারা। কারণ, সে বিশ্বাস করে, পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করলে আসমানবাসী (আল্লাহ) তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন।

হাদিস শরিফে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

ارْحَمْ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكَ مَنْ فِي السَّمَاءِ

‘পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া করো; তাহলে আসমানের ওপর যিনি আছেন (আল্লাহ), তিনিও তোমার প্রতি দয়া করবেন।’^{৩৯০}

অন্য হাদিসে বর্ণিত হয়েছে :

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ النَّاسَ لَمْ يَرْحَمْهُ اللَّهُ

‘যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহও তার প্রতি দয়া করবেন না।’^{৩৯১}

৩৮৯. সহিহ মুসলিম : ১৯৫৫

৩৯০. আল-মুজামুস সাগির, তাবারানি : ২৮১

৩৯১. মুসনাদু আহমাদ : ১৯১৬৪

আরেক হাদিসে এসেছে :

إِنَّ الرِّحْمَةَ لَا تُزْعُ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ

‘দয়া থাকে না শুধু কপালপোড়াদের অন্তরে।’^{৩৯২}

প্রকৃত মুসলমানের দয়ার পরিধি শুধু স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের অন্তর্ভুক্ত করে তা নয়; বরং সকল মানুষকেই অন্তর্ভুক্ত করে। সকলের প্রতিই সে দয়া করে। কারণ, রাসুলুল্লাহ ﷺ রহমতের ব্যাপকতাকে ইমানের শর্ত বলেছেন।

এ সম্পর্কে আবু মুসা আশআরি ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

«فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تَرَاحُمُوا» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُلُّنَا رَحِمٌ، قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ بِرَحْمَةٍ أَحَدِكُمْ خَاصَّتَهُ، وَلَكِنْ رَحْمَةُ الْعَامَّةِ»

‘তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না পরস্পরকে দয়া করবে। সাহাবিগণ বললেন, আমরা সবাই তো দয়াবান। তিনি বললেন, শুধু প্রিয়জনদের প্রতি দয়া করলে হবে না; বরং সাধারণভাবে সকল মানুষের প্রতিই দয়া করতে হবে।’^{৩৯৩}

ব্যাপকভাবে দয়া প্রদর্শনের এ শিক্ষা ইসলাম এজন্যই দিয়ে থাকে, যেন এর মাধ্যমে ভালোবাসায় ভরপুর একটি সমাজ গড়ে ওঠে। যে সমাজের প্রত্যেক সদস্যের অন্তরে অপর সদস্যদের প্রতি থাকবে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, নিখাদ সহমর্মিতা ও গভীর সৌহার্দ্য।

রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজেই দয়ার অনন্য উদাহরণ ছিলেন। দয়ার গুণ তাঁর মননে ও দেহের প্রতিটি রক্তক্ষণিকায় মিশ্রিত ছিল। তাঁর দয়া-সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করা হলো।

৩৯২. সহিহ ইবনি হিব্বান : ৪৬২

৩৯৩. আস-সুনানুল কুবরা, নাসায়ি : ৫৯২৮, মুস্তাদরাকুল হাকিম : ৭৩১০



আনাস ؓ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنِّي لَأَدْخُلُ الصَّلَاةَ أُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأُخَفِّفُ مِنْ
شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ بِهِ

‘আমি নামাজ শুরু করে তা দীর্ঘ করার ইচ্ছা করলাম। এমতাবস্থায় আমি একটি বাচ্চার কান্না শুনতে পেলাম। তখন তার মায়ের (ওই মা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে নামাজ আদায় করছিলেন) অস্থিরতার কথা চিন্তা করে নামাজ সংক্ষিপ্ত করলাম।’^{৩৯৪}

আরেক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে :

جَاءَ أَغْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَتُقَبِّلُونَ
صِبْيَانَكُمْ؟ فَمَا نُقَبِّلُهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوْ
أَمْلِكُ لَكَ أَنْ تَزَعَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِكَ الرَّحْمَةَ؟»

‘জনৈক বেদুইন নবিজি ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, আপনারা দেখি, বাচ্চাদের চুমু খান! আমরা তো আমাদের বাচ্চাদের চুমু খাই না। তখন নবিজি ﷺ বললেন, তোমাদের অন্তর থেকে আল্লাহ দয়ামায়া তুলে নিয়েছেন বলে কি আমাদের অন্তর থেকেও তুলে নেবেন?’^{৩৯৫}

আবু হুরাইরা ؓ বর্ণনা করেন :

قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ
بُنُ حَابِسِ التَّمِيمِيِّ جَالِسًا، فَقَالَ الْأَقْرَعُ: إِنَّ لِي عَشْرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا
قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ
قَالَ: «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ»

‘রাসুলুল্লাহ ﷺ হাসান ؓ-কে চুমু খেলেন। তখন তাঁর নিকট আকরা বিন হাবিস তামিমি ؓ ছিলেন। তিনি বললেন, আমার দশটি

৩৯৪. সহিহ মুসলিম : ৪৭০

৩৯৫. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৯০, সহিহ মুসলিম : ২৩১৭

বাচ্চা আছে, আমি তাদের কখনো চুমু খাইনি। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, যে দয়া (আদর-স্নেহ) করে না, তাকে দয়া করা হবে না।^{৩৯৬}

উমর ﷺ এক ব্যক্তিকে মুসলমানদের একটি জনপদের প্রশাসক বানাতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় আকরা বিন হাবিস ﷺ বললেন, এ ব্যক্তি তো তার বাচ্চাদের চুমু খায় না। তখন উমর ﷺ তাঁর সিদ্ধান্ত বাতিল করে বললেন, তোমার অন্তরে তো সন্তানদের প্রতিই দয়া নেই, জনগণের প্রতি দয়া কোথেকে আসবে? আল্লাহর কসম, আমি কখনো তোমাকে কোনো দায়িত্ব দেবো না। তারপর নিয়োগপত্রটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললেন।

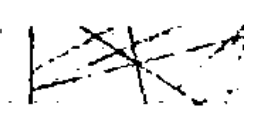
রাসুলুল্লাহ ﷺ দয়ার পরিধি আরও বিস্তৃত করে জীবজন্তুর প্রতি দয়াপরায়ণ হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। বিভিন্ন উপদেশবাণী ও শিক্ষণীয় ঘটনা বলে অবুঝ জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শনের দিকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

বুখারি ও মুসলিম শরিফে আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَوَجَدَ بُئْرًا، فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ، ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبُ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلَ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي، فَنَزَلَ الْبُئْرَ فَمَلَأَ خُفَّهُ مَاءً، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِيَدِهِ حَتَّى رَقِيَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنَّ لَنَا فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا؟ فَقَالَ: فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ

‘এক ব্যক্তি পথ চলতে চলতে তার ভীষণ পিপাসা লেগে গেল। কূপ দেখতে পেল। কূপে নেমে সে পানি পান করল। অতঃপর ওপরে উঠে আসলো। তখন সে দেখল, একটা কুকুর জিহ্বা বের করে হাঁপাচ্ছে এবং পিপাসার কারণে কাদামাটি চাটছে। লোকটি মনে মনে বলল, পিপাসায় কুকুরটির এমনই অবস্থা হয়েছে, যেমনটি

৩৯৬. সহিহুল বুখারি : ৫৯৯৭, সহিহ মুসলিম : ২৩১৮



ইতিপূর্বে আমার হয়েছিল। অতঃপর সে কূপে নেমে মোজায় পানি ভরল এবং মুখ দিয়ে তা কামড়ে ধরে ওপরে উঠে আসলো। তারপর কুকুরকে পানি পান করতে দিল। তার এ কাজ আল্লাহ তাআলা ভীষণ পছন্দ করলেন এবং তাকে ক্ষমা করে দিলেন। সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, জীবজন্তুরে পানাহার করানোতেও কি আমাদের সাওয়াব হবে? তিনি বললেন, প্রত্যেক জীবিত প্রাণীর সেবা-যত্নেই সাওয়াব রয়েছে।^{৩৯৭}

সহিহ বুখারি ও সহিহ মুসলিমে ইবনে উমর রা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সা বলেন :

عُذِّبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا، إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ

‘একটি বিড়াল মারার কারণে একটি নারীকে আজাব দেওয়া হয়েছে। সে বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিল, ফলে (খাবার খেতে না পেরে) বিড়ালটি মারা যায়। এ কারণেই সে জাহান্নামে গেছে। যখন সে বিড়ালটিকে আটকে রেখেছিল, তখন সে এটাকে না দিয়েছিল খাবার, না দিয়েছিল পানি; আর না তাকে ছেড়ে দিয়েছিল, যেন বাইরে গিয়ে কীটপতঙ্গ খেতে পারে।’^{৩৯৮}

আব্দুল্লাহ রা বর্ণনা করেন :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ مَنْزِلًا فَأَخَذَ رَجُلٌ بَيْضَ حُمْرَةٍ، فَجَاءَتْ تَرِفٌ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَيُّكُمْ فَجَعَ هَذِهِ بَبَيْضَتِهَا؟» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا أَخَذْتُ بَيْضَتَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ارْذُدْ، رَحْمَةً لَهَا»

৩৯৭. সহিহ বুখারি : ৬০০৯, সহিহ মুসলিম : ২২৪৪

৩৯৮. সহিহ বুখারি : ২৩৬৫, সহিহ মুসলিম : ২২৪২

‘নবিজি ﷺ একদা সফরকালে যাত্রাবিরতি করলেন। তখন এক ব্যক্তি হুম্মারা পাখির ডিম (তার নীড় থেকে) পেড়ে আনলেন। পাখিটি তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার ওপর দিয়ে উড়তে লাগল। নবিজি ﷺ বললেন, তোমাদের মধ্য থেকে কে পাখিটির ডিম পেড়ে এনে ওকে ব্যথাভুর করেছে? এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আমি ওর ডিম পেড়ে এনেছি। তিনি বললেন, ওর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে ওর ডিম রেখে এসো।’^{৩৯৯}

রাসুলুল্লাহ ﷺ মানুষের প্রতি যেমন দয়ালু ছিলেন, তেমনই অন্যান্য প্রাণীর প্রতিও দয়ালু ছিলেন। কথা ও কাজের মাধ্যমে মুসলমানদেরও তিনি সেই শিক্ষা দিয়েছেন। তাই প্রকৃত মুসলমান হতে হলে আমাদের মাঝে অবশ্যই দয়া থাকতে হবে। তা ছাড়া পৃথিবীবাসীর প্রতি দয়া করলে আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রতি দয়া করবেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

ارْحَمْ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمْكَ مَنْ فِي السَّمَاءِ

‘জমিনবাসীর প্রতি দয়া করো; তাহলে আসমানে যিনি আছেন (অর্থাৎ আল্লাহ) তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।’^{৪০০}

ক্ষমাশীল

প্রকৃত মুসলমান ক্ষমাশীল হয়ে থাকে। কেননা, ক্ষমা মানুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উত্তম চরিত্র। পবিত্র কুরআন ও হাদিসে এ উত্তম গুণটির প্রতি খুব জোর দেওয়া হয়েছে। যাদের মাঝে এ গুণটি আছে, আল্লাহ তাআলা তাদের সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন এবং তাদের তিনি ভালোবাসেন।

মুমিনদের গুণাবলির বর্ণনায় তিনি ইরশাদ করেন :

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

৩৯৯. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৩৮২

৪০০. আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি : ১৩৮৪

‘আর যারা নিজেদের রাগ সংবরণ করে আর মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।’^{৪০১}

এর কারণ হলো, তারা নিজেদের রাগ সংবরণ করেছে। হিংসা ও ঘৃণার বশবর্তী হয়ে প্রতিশোধ নেয়নি; বরং ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন। এতেই তারা নিজেদের অন্তরের পরিচ্ছন্নতার পরিচয় দিয়েছেন। তাই পুরস্কারস্বরূপ আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

ক্ষমা করার এ মহৎ গুণটি অর্জন করা অনেক কঠিন। কারণ, মানুষ স্বাভাবিকভাবেই প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে থাকে। তবে যারা প্রকৃত অর্থে ইসলাম মেনে চলে, ইসলামের সকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিজেদের ভেতর ধারণ করে, তারা এ গুণে গুণান্বিত হতে পারে।

এ গুণটি ধারণ করা খুব কঠিন বিধায় পবিত্র কুরআন সকল ক্ষেত্রে ক্ষমা করাকে বাধ্যতামূলক করেনি। তবে প্রতিশোধ বা বদলা নেওয়ার পরিসীমা নির্ধারণ করে দিয়েছে। যেন প্রতিশোধ নিতে গিয়ে আবার জুলুম হয়ে না যায়।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ۚ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ
مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ٤٠
وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ٤١ إِنَّمَا السَّبِيلُ
عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَٰئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ٤٢ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ٤٣

‘যারা আক্রান্ত হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। আর মন্দের প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই। অতঃপর যে ক্ষমা করে ও আপস করে তার পুরস্কার আল্লাহর কাছে রয়েছে। নিশ্চয় তিনি অত্যাচারীদের পছন্দ করেন না। নিশ্চয় যে অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে, তাদের বিরুদ্ধেও কোনো অভিযোগ নেই। অভিযোগ কেবল তাদের বিরুদ্ধে,



যারা মানুষের ওপর অত্যাচার চালায় এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। অবশ্য যে সবার করে ও ক্ষমা করে নিশ্চয় এটা সাহসিকতার কাজ।^{৪০২}

ক্ষমা করা বাধ্যতামূলক নয়। পরিসীমার ভেতর থেকে প্রতিশোধ ও बदলা নেওয়া যায়, তবে ক্ষমা করে দেওয়াই উত্তম। এজন্যই আয়িশা রাঃ-এর ওপর অপবাদ আরোপের ঘটনার পর আবু বকর রাঃ অপবাদকারীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দিলে আল্লাহ তাআলা নিচের আয়াতটি নাজিল করলেন :

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِيَ الْقُرْبَىٰ
وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ
أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

‘তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চমর্যাদা ও আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন এ শপথ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন, অভাবগ্রস্ত ও আল্লাহর পথে হিজরতকারীদের কিছুই দেবে না। তাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষত্রুটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি কামনা করো না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।’^{৪০৩}

মুমিনদের সমাজ পারস্পরিক ছোট বড় সকল সমস্যায় জবাবদিহির বাধ্যবাধকতা এবং প্রতিশোধ নেওয়ার প্রবণতার ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়; বরং ধৈর্য, সহনশীলতা ও পরস্পর ক্ষমা করে দেওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত। কুরআন ও হাদিসে এর প্রতি মুমিনদের উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে।

কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي
بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ - وَمَا يُلْقَاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا
يُلْقَاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ

৪০২. সূরা আশ-শুরা : ৩৯-৪৩

৪০৩. সূরা আন-নূর : ২২

‘সমান নয় ভালো ও মন্দ। জওয়াবে তাই বলুন যা উৎকৃষ্ট। তখন দেখবেন, আপনার সাথে যে ব্যক্তির শত্রুতা রয়েছে, সে যেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। এ চরিত্র তারাই লাভ করে, যারা সবার করে এবং এ চরিত্রের অধিকারী তারাই হয়, যারা অত্যন্ত ভাগ্যবান।’^{৪০৪}

মন্দের বিপরীতে যদি মন্দ করা হয়, তখন হিংসা-বিদ্বেষের আগুনে ঘি পড়ে। পক্ষান্তরে মন্দের বিপরীতে যদি ভালো কাজ করা হয়, তখন হিংসা-বিদ্বেষ ও ক্রোধের আগুন নিভে যায়। পারস্পরিক শত্রুতা মুহূর্তেই বন্ধুত্বে পরিণত হয়। ফলে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই কুরআন মাজিদে মন্দের বিপরীতে উত্তম আচরণ করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং এর ওপর মূল্যবান পুরস্কারের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

ঘৃণার বিপরীতে ভালোবাসা, হিংসার বিপরীতে কল্যাণকামিতা, শত্রুতার বিপরীতে বন্ধুত্ব, কষ্টদানের বিপরীতে ক্ষমা—এভাবে সকল মন্দের বিপরীতে উত্তম বিনিময় প্রদান করাই মুমিনের স্বভাব। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হলে প্রত্যেক সদস্যের মাঝে এ ধরনের মানসিকতা থাকা জরুরি। কুরআন মাজিদ ও হাদিস শরিফে তাই এর প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। কুরআন মাজিদে আল্লাহ বলেন :

فَاَصْفَحْ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ

‘অতএব পরম ঔদাসীনের সাথে ওদের ক্রিয়াকর্ম উপেক্ষা করো।’^{৪০৫}

অনেক হাদিসে ক্ষমা করার গুণ অর্জন করার প্রতি মুসলমানদের উৎসাহিত করা হয়েছে। এখানে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

আয়িশা রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ،

৪০৪. সূরা ফুসসিলাত : ৩৪-৩৫

৪০৫. সূরা আল-হিজর : ৮৫

فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ
عَزَّ وَجَلَّ

‘রাসুলুল্লাহ ﷺ কাউকে কোনোদিন নিজ হাতে প্রহার করেননি।
এমনকি কোনো স্ত্রী ও খাদিমকেও প্রহার করেননি। কেবল আল্লাহর
পথে জিহাদের ক্ষেত্রে ছিলেন এর ব্যতিক্রম। এ ছাড়া তাঁর ওপর
কখনো (ব্যক্তিগতভাবে) কোনো আঘাত আসলে তিনি প্রতিপক্ষ
থেকে কখনো প্রতিশোধ নেননি। তবে আল্লাহর কোনো বিধান লঙ্ঘন
করলে তিনি কেবল আল্লাহর জন্যই তার প্রতিশোধ নিতেন।’^{৪০৬}

কেননা, আল্লাহ তাআলা তাঁকে এই নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন কুরআনে
ইরশাদ হয়েছে :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

‘আর ক্ষমা করার অভ্যাস গড়ে তোলো, সৎকাজের নির্দেশ দাও
এবং মূর্খ-জাহিলদের থেকে দূরে সরে থাকো।’^{৪০৭}

অন্য আয়াতে তিনি বলেন :

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

‘জবাবে তাই বলো, যা উৎকৃষ্ট।’^{৪০৮}

আনাস র. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَجْرَانِيٌّ
غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ، فَأَذْرَكُهُ أَغْرَابِيٌّ، فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبَذَةً شَدِيدَةً، نَظَرْتُ
إِلَى صَفْحَةِ عُنُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَثَرَتْ بِهَا
حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ، مِنْ شِدَّةِ جَبَذَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مُرِّي مِنْ مَالِ اللَّهِ

৪০৬. সহিছ মুসলিম : ২৩২৮

৪০৭. সূরা আল-আরাফ : ১৯৯

৪০৮. সূরা ফুসসিলাত : ৩৪

الَّذِي عِنْدَكَ، فَالتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَحِكَ،
ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَظَاءٍ

‘আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে পথ চলছিলাম। তাঁর পরনে ছিল নাজরানের তৈরি মোটা আঁচলবিশিষ্ট চাদর। এক বেদুইন তাঁর কাছে আসলো। সে তাঁর চাদর ধরে সজোরে তাঁকে টান দিল। আমি দেখলাম, এর ফলে তাঁর ঘাড়ে দাগ পড়ে গেল। সজোরে তার এই টানের কারণে চাদরের আঁচলও পড়ে গেল। সে (বেদুইন) বলল, হে মুহাম্মাদ, আল্লাহর দেওয়া যেসব মাল তোমার কাছে আছে, তা থেকে আমাকে কিছু দেওয়ার জন্য নির্দেশ দাও। রাসুলুল্লাহ ﷺ তার দিকে তাকিয়ে হেসে দিলেন এবং তাকে কিছু মাল দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।’^{৪০৯}

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ষমার আরেকটি আশ্চর্যজনক দৃষ্টান্ত হলো, তিনি সেই মহিলাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন, যে তাঁকে বিষমেশানো ছাগলের গোশত হাদিয়া দিয়েছিল।

ঘটনাটি সহিহ বুখারি, মুসলিমসহ আরও অনেক হাদিসগ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে :

أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً مَصْلِيَّةً بِخَيْبَرَ، فَقَالَ لَهَا: «مَا هَذِهِ؟» قَالَتْ: هَدِيَّةٌ، وَتَحَذَّرْتُ أَنْ تَقُولَ مِنَ الصَّدَقَةِ فَلَا يَأْكُلُهَا، فَأَكَلَهَا وَأَكَلَ أَصْحَابُهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: «أَمْسِكُوا»، فَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: «هَلْ سَمَّمْتَ هَذِهِ الشَّاةَ؟» قَالَتْ: نَعَمْ قَالَتْ: مَنْ أَخْبَرَكَ؟ قَالَ: «هَذَا الْعَظُمُ»، لِسَاقِهَا وَهُوَ فِي يَدِهِ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: «لِمَ؟» قَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ تَكُنْ كَاذِبًا يَسْتَرِيحُ النَّاسُ مِنْكَ، وَإِنْ كُنْتُ نَبِيًّا لَمْ يَضُرُّكَ قَالَ: وَاحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْكَاهِلِ، وَأَمَرَ أَنْ يَحْتَجَمُوا، فَمَاتَ بَعْضُهُمْ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَسْلَمْتُ فَتَرَكَهَا،

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَمَّا النَّاسُ فَيَذْكُرُونَ أَنَّهُ قَتَلَهَا

‘খাইবারে অবস্থানকালীন এক ইহুদি মহিলা নবিজি ﷺ-এর নিকট ভুনা ছাগলের গোশত হাদিয়া পাঠাল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কী? মহিলা বলল, হাদিয়া। সদকা বলা থেকে বিরত থাকল, অন্যথায় তিনি তা খাবেন না। অতঃপর তিনি ও তাঁর সঙ্গীসাথিগণ খাওয়া শুরু করলেন। একটু পরেই তাদের উদ্দেশে তিনি বলে উঠলেন, সবাই থামো। অতঃপর মহিলাকে বললেন, তুমি কি এ গোশতে বিশ মিশ্রিত করেছ? মহিলা বলল, হ্যাঁ, কিন্তু আপনাকে তা জানাল কে? তিনি তাঁর হাতে থাকা ছাগলের পায়ের নলা দেখিয়ে বললেন, এ হাড়ি। মহিলা বলল, হ্যাঁ, ঠিক আছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কেন এমনটি করলে? সে বলল, আমি চাইছিলাম, আপনি যদি নবুওয়াতের দাবিতে মিথ্যাবাদী হোন, তাহলে মানুষ আপনার কবল থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। আর যদি আপনি প্রকৃতই নবি হোন, তাহলে এ বিষ আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। বর্ণনাকারী বলেন, নবিজি ﷺ তাঁর গ্রীবাসন্ধিতে হিজামা লাগালেন এবং সঙ্গীসাথিদেরও এর আদেশ দিলেন। এরপর তাঁর সঙ্গীদের কেউ (বিষক্রিয়ায়) মৃত্যুবরণ করল। জুহরি ﷺ বলেন, মহিলা ইসলাম গ্রহণ করলে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে ছেড়ে দেন। মামার ﷺ বলেন, কিন্তু লোকেরা বলে বেড়ায় যে, নবিজি ﷺ তাকে হত্যা করেছেন।’^{৪১০}

যখন দাওস গোত্রের লোকেরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ-এর কর্তৃত্ব মেনে না নেওয়ার ঘোষণা দিল, তখন তুফাইল বিন আমর দাওসি ﷺ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বললেন :

إِنَّ دَوْسًا قَدْ عَصَتْ وَأَبَتْ، فَادْعُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ. فَاسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ النَّاسُ: هَلَكُوا. فَقَالَ: اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ، اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَائْتِ بِهِمْ

৪১০. মুসান্নাফু আদ্রির রাজ্জাক : ১০০১৯, জামিউ মামার



‘দাওস গোত্র অবাধ্যতা করেছে এবং (ইসলাম গ্রহণে) অস্বীকৃতি জানিয়েছে; অতএব আপনি আব্বাহর নিকট তাদের জন্য বদদুআ করুন। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ কিবলামুখী হয়ে দুই হাত উত্তোলন করলেন। সাহাবিগণ বলতে লাগলেন, এবার তাদের ধ্বংস অনিবার্য। (কিন্তু রাসুলুল্লাহ ﷺ ছিলেন দয়া ও ক্ষমার মূর্তপ্রতীক। তিনি তাদের ধ্বংসের দুআ না করে উল্টো তাদের থেকে আজাব দূর করার দুআ করলেন।) তিনি দুআয় বললেন, হে আব্বাহ, দাওস গোত্রের লোকদের আপনি হিদায়াত দান করুন এবং তাদের ইসলামে নিয়ে আসুন। হে আব্বাহ, দাওস গোত্রের লোকদের আপনি হিদায়াত দান করুন এবং তাদের ইসলামে নিয়ে আসুন।’^{৪১১}

রাসুলুল্লাহ ﷺ সব সময় মুসলমানদের ক্ষমার গুণ অবলম্বন করার সবক দিতেন। কারণ, ক্ষমা ও নম্রতার দ্বারা লোকদের যতটুকু আকৃষ্ট করা যায়, রুঢ়তা ও কঠোরতা দ্বারা ততটুকু পারা যায় না। এজন্যই উকবা বিন আমির ﷺ যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট ফজিলতপূর্ণ আমল বাতলে দেওয়ার আরজ করলেন, তখন তিনি বললেন :

يَا عُقْبَةُ، صَلِّ مَنْ قَطَعَكَ، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ

‘হে উকবা, তোমার সাথে যে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক কায়েম করো। যে তোমাকে বঞ্চিত করে, তুমি তাকে দান করো। যে তোমার প্রতি জুলুম করে, তাকে তুমি ক্ষমা করে দাও।’^{৪১২}

উদারচিত্তের অধিকারী

প্রকৃত মুসলমান মানুষদের সাথে লেনদেনে উদারতার পরিচয় দেয়। কারণ, সে জানে, দুনিয়া ও আখিরাতের সমূহ কল্যাণ অর্জন করার জন্য উদারতার বিকল্প নেই। তার উদারচিত্ততার কারণে মানুষ তাকে হৃদয়ে জায়গা দেয়। তাকে ভালোবাসে। আব্বাহও এ গুণের কারণে তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন এবং তার প্রতি দয়া করেন। বিভিন্ন হাদিসে এর প্রমাণ পাওয়া যায়।

৪১১. মুসনাদু আহমাদ : ৭৩১৫, সহিহুল বুখারি : ২৯৩৭

৪১২. মুসনাদু আহমাদ : ১৭৩৩৪

জাবির রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সঃ ইরশাদ করেছেন :

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى

‘বেচাকেনা ও দাবি-দাওয়ার সময় যে ব্যক্তি উদারতার পরিচয় দেয়, আল্লাহ তার প্রতি রহম করেন।’^{৪১৩}

আবু মাসউদ আনসারি রাঃ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সঃ ইরশাদ করেছেন :

حُسِبَ رَجُلٌ مِّمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ، وَكَانَ مُوسِرًا، فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ، قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ، تَجَاوَزُوا عَنْهُ

‘তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে এক লোকের হিসাব গ্রহণ করা হয়, কিন্তু তার মধ্যে কোনো প্রকার ভালো আমল পাওয়া যায়নি। তবে সে মানুষের সাথে লেনদেন করত এবং সে ছিল সচ্ছল। তাই দরিদ্র লোকদের প্রতি উদার থাকার জন্য সে তার কর্মচারীদের নির্দেশ দিত। রাসুলুল্লাহ সঃ বলেন, আল্লাহ বললেন, এ ব্যাপারে (অর্থাৎ উদারতার ব্যাপারে) আমি তার চেয়ে অধিক যোগ্য। একে ক্ষমা করে দাও।’^{৪১৪}

দেখুন, আমল পরিমাপের মানদণ্ডে এই গুণটির কত ওজন! কিয়ামতের দিন মানুষ এ গুণটির প্রতি কত মুখাপেক্ষী হবে! আমাদের ভেতর কি এ গুণটি আছে?

সদা হাস্যোজ্জ্বল

নম্রতা ও উদারতা প্রকাশের জন্য মানুষের সাথে সহাস্যবদনে কথা বলা জরুরি। এটিও স্বতন্ত্র একটি উত্তম গুণ ও উত্তম আমল। ইসলাম মানুষকে এর প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।

৪১৩. সহিহুল বুখারি : ২০৭৬

৪১৪. সহিহ মুসলিম : ৩৮৮৯

সহিহ মুসলিমের হাদিসে এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ

‘কোনো উত্তম আমলকে তুচ্ছ মনে করো না; যদিও তা তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করার মতো (ছোট আমল) হোক।’^{৪১৫}

সহিহাইনে জারির বিন আব্দুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন :

مَا حَجَبَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلَا رَأَيْتُ إِلَّا تَبَسَّمَ

‘আমি যখনই রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম দিয়েছি, কোনোবারেই তিনি আমাকে জবাব না দিয়ে থাকেননি। আর আমাকে দেখে সর্বদাই তিনি মুচকি হাসি উপহার দিতেন।’^{৪১৬}

যে সমাজ পারস্পরিক ভালোবাসা, উদারতা ও সহাস্য দেখা-সাক্ষাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেটিই আদর্শ ও শান্তিময় সমাজ। সে সমাজে মানুষকে সম্মান করা হয়। উত্তম চরিত্রের মূল্যায়ন করা হয়। উন্নত মনুষ্যত্বের ভিত্তিতে মানুষ মূল্যায়িত হয়। এটাই ইসলামি সমাজ। সমাজজীবনের এ রূপরেখাই ইসলাম দিয়েছে। পক্ষান্তরে যেসব সমাজে চরিত্রের কোনো দাম নেই, প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি আলাদা কোনো মূল্যায়ন নেই; বরং জাগতিক বিষয় ও ধন-সম্পদের ওপর মানুষের মূল্যায়ন করা হয়, তা বস্তুবাদী সমাজ; ইসলামি সমাজ নয়। এ সমাজে ঐক্য থাকে না। থাকে না তাতে কোনো নিরাপত্তা ও শান্তির হাওয়া।

রসিক

প্রকৃত মুসলমান একটু রসিক প্রকৃতির হয়। তবে রসিকতার ক্ষেত্রে কখনো সীমালঙ্ঘন করে না। এ ধরনের রসিকতা ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। রাসুলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবায়ে কিরাম ﷺ পরস্পরের সাথে বৈধতার সীমার ভেতর থেকে রসিকতা করতেন।

৪১৫. সহিহ মুসলিম : ২৬২৬

৪১৬. সহিহুল বুখারি : ৩০৩৫, সহিহ মুসলিম : ২৪৭৫

একদিন সাহাবায়ে কিরাম রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন :

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تُدَاعِبُنَا؟ قَالَ: «إِنِّي لَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا»

‘আপনি আমাদের সাথে রসিকতা করছেন! তিনি বললেন, সব সময় সত্য কথাই তো বলি। (অর্থাৎ রসিকতা করতে গিয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিই না।)’^{৪১৭}

রাসুলুল্লাহ ﷺ রসিকতা করতেন, তবে রসিকতা করতে গিয়ে মিথ্যা বলতেন না। সাহাবায়ে কিরামও এমনই ছিলেন। বিভিন্ন হাদিসে রাসুলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবিদের মাঝে কৌতুক ও রসিকতার ঘটনা বিবৃত হয়েছে।

তন্মধ্যে একটি ঘটনা বিভিন্ন সিরাত ও ইতিহাসের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। তা হলো, রাসুলুল্লাহ ﷺ আবু উমাইর ^{৪১৮} নামে একটি শিশুর সাথে প্রায় সময় রসিকতা করতেন। তার একটি পাখি ছিল, যার সাথে সে খেলা করত। একদিন রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে চিত্তিত দেখতে পেয়ে বললেন, কী ব্যাপার? আবু উমাইরকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কেন? সাহাবিগণ বললেন, তার খেলার সাথি নুগাইর^{৪১৮} পাখিটি মারা গেছে। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে রসিকতা করে বলতে লাগলেন, আবু উমাইর, কী করল নুগাইর?’^{৪১৯}

এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আরোহণের জন্য একটি উট চাইল। রাসুলুল্লাহ ﷺ রসিকতা করে তাকে বললেন, হ্যাঁ, তোমাকে আরোহণের জন্য একটি উষ্ট্রীর বাচ্চা দেবো। লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসুল, উষ্ট্রীর বাচ্চার ওপর আমি কী করে সওয়ার হব? রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, (বড়) উট কি তাহলে উষ্ট্রীর বাচ্চা নয়?’^{৪২০}

ইমাম আহমাদ ^{৪২১} আনাস ^{৪২২} সূত্রে বর্ণনা করেন যে, জাহির নামে এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি গ্রাম থেকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য হাদিয়া পাঠাতেন। (একদিন হাদিয়া দিয়ে) যখন তিনি ফিরে যাওয়ার জন্য বের হতে লাগলেন, তখন

৪১৭. আল-আদাবুল মুফরাদ : ২৬৫

৪১৮. চড়ুই পাখির মতো দেখতে একটি ছোট পাখি। (অনুবাদক)

৪১৯. হায়াতুস সাহাবা : ৩/১৪৯

৪২০. সুনানুত তিরমিজি : ১৯৯১

রাসুলুল্লাহ ﷺ তার জন্য সামান্য তৈরি করে দিতে দিতে বললেন, নিশ্চয় জাহির আমাদের গ্রাম্য ভাই, আর আমরা তার শহুরে ভাই। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি দেখতে খুব কুৎসিত ছিলেন। একদিন রাসুলুল্লাহ ﷺ তার কাছে গেলেন, তখন তিনি মালপত্র বিক্রি করছিলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ পেছন দিক থেকে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি কে বুঝতে না পেরে বললেন, এই, কে রে, আমাকে ছেড়ে দাও বলছি! পরে ফিরে যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে চিনতে পারলেন, তখন তার পিঠের যে অংশ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বক্ষের সাথে লেগেছে, সে অংশের প্রতি খুব আগ্রহী হয়ে উঠলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, এই গোলামটিকে কেনার কেউ আছে? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, শপথ করে বলছি, আমার দাম অনেক সস্তা হবে। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, কিন্তু আল্লাহর দরবারে তুমি মোটেই স্বল্পমূল্যের নও। অথবা বলেছেন, আল্লাহর নিকট তোমার মূল্য অনেক বেশি।^{৪২১}

এক বৃদ্ধা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, আল্লাহর কাছে দুআ করুন, তিনি যেন আমাকে জান্নাত দান করেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ কৌতুক করে বললেন, হে অমুকের মা, কোনো বৃদ্ধা তো জান্নাতে যাবে না! তখন তিনি কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যাচ্ছিলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাকে বলো যে, বৃদ্ধারা বৃদ্ধাবস্থায় জান্নাতে যাবে না। কেননা, আল্লাহ বলেছেন, ‘আমি জান্নাতি রমণীগণকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তাদের করেছি চিরকুমারী।’

আয়িশা ﷺ বলেন, কোনো এক সফরে আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ছিলাম। আমি তখন খুব হালকা গড়নের কিশোরী ছিলাম। (যাওয়ার পথে একসময়) রাসুলুল্লাহ ﷺ লোকদের বললেন, তোমরা আগে আগে চলো। তারা আগে চলে গেলেন। তখন তিনি আমাকে বললেন, চলো, দৌড় প্রতিযোগিতা করি। প্রতিযোগিতায় আমি জিতলাম। রাসুলুল্লাহ ﷺ কিছুই বলেননি। এরপর (কিছু কাল অতিক্রম হলে) আমি মোটা হলাম এবং প্রতিযোগিতার ঘটনাটি ভুলে গেলাম। তারপর আরেক সফরে আমি তাঁর সাথে বের হলাম। (চলার পথে) তিনি লোকদের বললেন, তোমরা সামনে চলতে থাকো। তারা সামনে এগিয়ে গেলেন। তারপর আমাকে বললেন, চলো, দৌড় প্রতিযোগিতা করি। এবার

আমি হেরে গেলাম। তখন তিনি হাসতে হাসতে বললেন, আগের হারের প্রতিশোধ নিয়ে নিলাম।’

সাহাবায়ে কিরামও পরস্পর রসিকতা করতেন। এটাকে তারা খারাপ মনে করতেন না। কেননা, তারা স্বয়ং তাদের নেতা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে তা করতে দেখেছেন। তিনি তাদের সাথে রসিকতা করতেন। প্রাণবন্ত হয়ে কথা বলতেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের মাঝে এসব ছিল বলেই সে যুগটা এতটা সুন্দর ও সুখের ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন মুসলমানদের পরস্পরের মাঝে রক্ষতা চলে এসেছে, তখন থেকে মুসলিম সমাজের শান্তি ক্রমেই বিনষ্ট হতে শুরু করেছে।

ইমাম বুখারি رحمه الله আল-আদাবুল মুফরাদে বকর বিন আব্দুল্লাহ رحمه الله সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন :

كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَتَبَادَحُونَ بِالْبَطِیْخِ، فَإِذَا
كَانَتْ الْحَقَائِقُ كَانُوا هُمُ الرِّجَالُ

‘নবিজি ﷺ-এর সাহাবিগণ তো একে অপরের প্রতি তরমুজ নিক্ষেপ করেও রসিকতা করতেন। কিন্তু যখন তাঁরা কঠোর বাস্তবতার সম্মুখীন হতেন, তখন তাঁরা বীরপুরুষই প্রতিপন্ন হতেন। (অর্থাৎ অত্যন্ত যোগ্যতার সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতেন।)’^{৪২২}

এটাই ইসলাম-সমর্থিত রসিকতা। এখানে রসিকতা করতে গিয়ে হকের পথ থেকে বিচ্যুত হতে হয় না। পৌরুষের বহিঃশিখা নিভে যায় না। এ রসিকতা কেবল অন্তরের বিনোদনের জন্য এবং মন ফ্রেশ করার জন্য করা হয়।

মজার বিষয় হলো, সাহাবায়ে কিরামের অনেক রসিকতায় স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ﷺ হেসে দিতেন। এ সম্পর্কে ইমাম আহমাদ رحمه الله উন্মে সালামা رحمه الله সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবু বকর رحمه الله বসরার উদ্দেশে সফরে বের হলেন। তাঁর সাথে নুয়াইমান رحمه الله ও সুয়াইবিত বিন হারমালা رحمه الله-ও ছিলেন। উভয়ই ছিলেন বদরি

সাহাবি। (সফরের) পাথেয় সুয়াইবিত ﷺ-এর হাতে ছিল। তাই নুয়াইমান ﷺ তাঁকে বললেন, আমাকে কিছু খাওয়ান। তিনি বললেন, আবু বকর ﷺ আসুক, তারপর খাওয়াব। নুয়াইমান ﷺ রসিকপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি লোকদের নিকট গিয়ে বললেন, তোমরা কি আমার থেকে একটা দক্ষ আরবি গোলাম ক্রয় করবে? তারা বলল, হ্যাঁ, কিনব। তিনি বললেন, গোলামটি ভালোই কথা বলতে পারে, তাই নিজেকে স্বাধীনও দাবি করতে পারে। এটা মাথায় নিয়ে তোমরা যদি তাকে ছেড়ে দাও, তাহলে আমাকে দোষ দিতে যেয়ো না আবার। তারা বলল, না, না, আমরা (তার কথায় কর্ণপাত করব না) তাকে আমরা কিনবই। অতঃপর তারা তাকে দশটি উটের বিনিময়ে কিনে নিল। তারপর তিনি উটগুলোকে হাঁকিয়ে আনতে আনতে (সুয়াইবিত ﷺ-এর দিকে ইঙ্গিত করে) বললেন, এই হলো তোমাদের ক্রয়কৃত গোলাম। সুয়াইবিত ﷺ বলতে লাগলেন, এ মিথ্যা বলছে, আমি স্বাধীন। লোকেরা বলল, আমরা তোমার ব্যাপারে আগে থেকেই জানি বাপু! বলেই তারা তার গলায় রশি বেঁধে তাকে নিয়ে গেল। তখন আবু বকর ﷺ আসলেন। তিনি খবর পেয়ে সঙ্গীদের নিয়ে তাদের নিকট গিয়ে উটগুলো ফিরিয়ে দিয়ে তাকে মুক্ত করে আনলেন। এ খবর যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জানানো হয়, তখন তিনি খুব হাসলেন। সাহাবিরাও তাঁর সাথে হাসলেন।^{৪২৩}

এক বেদুইন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসলেন। তিনি মসজিদের পাশে উটটি বেঁধে মসজিদে প্রবেশ করলেন। কয়েকজন সাহাবি নুয়াইমান বিন আমর আনসারি ﷺ-কে বললেন, তুমি যদি এই উটটিকে জবাই করে দিতে, তাহলে আমরা গোশত খেতে পারতাম। আমাদের খুব গোশত খেতে ইচ্ছে করছে। মূল্য নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না, তা রাসুলুল্লাহ ﷺ চুকিয়ে দেবেন। নুয়াইমান ﷺ উটটি জবাই করে দিলেন। বেদুইন লোকটি বের হয়ে যখন তার বাহনের এমন হাল দেখলেন, তখন চিৎকার দিয়ে উঠলেন, হায় আমার উট, হে মুহাম্মাদ! রাসুলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে এলেন। বললেন, এটা কার কাজ? সাহাবিগণ বললেন, নুয়াইমান ﷺ করেছে। কারণ দর্শানোর জন্য তাকে খুঁজে বের করতে নির্দেশ দিলেন রাসুলুল্লাহ ﷺ। তাকে দুবাআ বিনতে

জুবাইর ؓ-এর বাড়িতে পাওয়া গেল। সেখানে তিনি একটি গর্তে লুকিয়ে ওপরে খেজুর গাছের পাতা ও ডালপালা দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলেন। এক ব্যক্তি সেদিকে আঙুল দ্বারা ইশারা করে তাকে দেখিয়ে দিলেন, কিন্তু মুখে বড় আওয়াজে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমি তাকে দেখিনি। রাসুলুল্লাহ ؐ তাকে সেখান থেকে বের করে আনলেন। খেজুর পাতা ও ডালপালা লেগে তার চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গেল। রাসুলুল্লাহ ؐ তাকে বললেন, তুমি এমন কাজ করতে গেলে কেন? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, যারা আপনাকে আমার ব্যাপারে অবহিত করেছে, তারাই আমাকে তা করতে নির্দেশ দিয়েছে। রাসুলুল্লাহ ؐ তখন তার চেহারা মুছতে মুছতে হেসে দিলেন। তারপর তিনিই উটের মূল্য চুকিয়ে দিলেন।^{৪২৪}

উপর্যুক্ত হাদিসসমূহ দ্বারা এ কথা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়ে গেল যে, ইসলাম চায়, তার অনুসারীরা অন্তরের বিনোদনের জন্য একটু কৌতুক করুক, একটু রসিকতা করুক। কেননা, রসিকতা মানুষের ব্যক্তিসত্তাকে নরম ও কোমল করে তোলে, যা মানুষের হৃদয়সমূহ জয় করে নিতে সক্ষম হয়। এ ধরনের ব্যক্তিসত্তা মুসলমানদের মাঝে থাকাটা আজ খুব জরুরি।

সহনশীল

প্রকৃত মুসলমান সহনশীল ও রাগ হজমকারী হয়ে থাকে। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

‘আর যারা নিজেদের রাগ সংবরণ করে এবং মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।’^{৪২৫}

এর কারণ হলো, ইসলামের দৃষ্টিতে শক্ত পেশিবহুল শরীরের অধিকারী এবং লোকদের মল্লযুদ্ধে অনায়াসে হারিয়ে দেওয়া ব্যক্তি বাহাদুর নয়। বাহাদুর তো সে ব্যক্তি, যে রাগের সময় ধৈর্য ধরতে পারে এবং নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

৪২৪. হায়াতুস সাহাবা : ৩/১৫৪-১৫৫

৪২৫. সূরা আলি ইমরান : ১৩৪

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ
الْغَضَبِ

‘(মল্লযুদ্ধে প্রতিপক্ষকে) ধরাশায়ী করতে পারা ব্যক্তি বাহাদুর নয়;
বরং বাহাদুর তো সে ব্যক্তি, সে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ
করতে পারে।’^{৪২৬}

রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা ব্যক্তির বীরত্ব ও পৌরুষের মানদণ্ড।
কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা আছে বলে রাগের মাথায় যা ইচ্ছা তাই করা চরম নির্বুদ্ধিতা
ও অপরিণামদর্শিতা। এতে কোনো বীরত্ব নেই। ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকার পরও
রাগ হজম করে নিলে এবং নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করলে অনেক ফিতনা ও ঝগড়া
শুরু হওয়ার আগেই বন্ধ হয়ে যায়। লক্ষ্য অর্জনের পথ মসৃণ হয়। আল্লাহর
সন্তুষ্টি ও মানুষের ভালোবাসা অর্জিত হয়। এজন্যই এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ
ﷺ-এর নিকট উপদেশ চাইলে তিনি তাকে কেবল একটি উপদেশই দিলেন
যে, রাগ কোরো না। কয়েকবার আবেদন করলে প্রতিবারেই রাসুলুল্লাহ ﷺ এ
একটি বাক্যই বললেন, রাগ কোরো না।^{৪২৭}

এর কারণ হলো, এ একটি বাক্যেই সকল উত্তম গুণ নিহিত আছে।

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ؓ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ আব্দুল কাইস গোত্রের
আশাজ্জ-কে বললেন :

إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ: الْحِلْمُ، وَالْأَنَاةُ

‘তোমার ভেতর দুটি গুণ আছে, যা আল্লাহ পছন্দ করেন। গুণ দুটি
হলো, সহনশীলতা ও ধীরস্থিরতা।’^{৪২৮}

প্রকৃত মুসলমানও রাগান্বিত হয়, তবে তা নিজ স্বার্থের জন্য নয়; বরং আল্লাহর
জন্যই কেবল সে রাগান্বিত হয়। আল্লাহর সম্মান ও মর্যাদায় আঘাত আসলে,

৪২৬. সহিহুল বুখারি : ৬১১৪, সহিহ মুসলিম : ২৬০৯

৪২৭. সহিহুল বুখারি : ৬১১৬

৪২৮. সহিহ মুসলিম : ১৭

দ্বীনের নিদর্শনের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখলে কিংবা আল্লাহর কোনো বিধান লঙ্ঘিত হতে দেখলে তার রাগ চরমে ওঠে। সীমালঙ্ঘনকারী, অপরাধী, আল্লাহর মর্যাদায় আঘাতকারী এবং আল্লাহর দ্বীন নিয়ে তামাশাকারী লোকেরা তার রাগের আগুনে পুড়ে ভস্ম হয়ে যায়। সহিহ বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হাদিসের ভাষ্যমতে রাসুলুল্লাহ ﷺ-ও হুবহু এমনই ছিলেন।

বর্ণিত হয়েছে :

‘রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজের স্বার্থের জন্য প্রতিশোধ নিতেন না। তবে যখন আল্লাহর মর্যাদা বিনষ্ট হয়—এমন কিছু প্রত্যক্ষ করতেন, তখন আল্লাহর জন্য তার প্রতিশোধ নিতেন।’

দ্বীনের সুখ্যাতি বিনষ্ট হয়—এমন কিছু দেখলে, দ্বীনের বিধান পালন করার ক্ষেত্রে ভুল হতে দেখলে বা দ্বীনের হুদুদ কায়েম করার ব্যাপারে শিথিলতা করতে দেখলে রাসুলুল্লাহ ﷺ রাগান্বিত হতেন। তাঁর মুবারক চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যেত।

সেদিন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর খুব রাগ এসেছিল, যেদিন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলেছিলেন, অমুক লোকের কারণে আমি ফজরের নামাজে দেরিতে উপস্থিত হই। কারণ, সে খুব লম্বা কিরাআত পাঠ করে। সেদিনের মতো আর কোনোদিনের ওয়াজে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে এত রাগান্বিত হতে কেউ দেখেনি।

তিনি বললেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنْفَرِّينَ، فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ
خَلْفَهُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ

‘হে লোকসকল, তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা মানুষদের ভাগিয়ে দেয়। তোমাদের যে কেউ ইমামতি করবে, সে যেন নামাজ সংক্ষেপ করে। কেননা, তার পেছনে বৃদ্ধ, দুর্বল (বালক) এবং বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত লোক থাকে।’^{৪২৯}

৪২৯. সহিহ বুখারি : ৭০৪, সহিহ মুসলিম : ৪৬৬

সেদিন রাসুলুল্লাহ ﷺ খুব রাগান্বিত হয়েছিলেন, যেদিন তিনি সফর থেকে ফিরে আয়িশা ؓ-এর ঘরে একটি পাতলা চাদর দেখতে পেয়েছিলেন, যেটার ওপর ছবি আঁকা ছিল। দেখার পর তিনি সাথে সাথে তা ছিঁড়ে ফেললেন এবং রাগে তাঁর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল। এরপর বললেন :

يَا عَائِشَةُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الَّذِينَ يُضَاهُونَ
بِحُلُقِ اللَّهِ

‘হে আয়িশা, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তি তাদের হবে, যারা আল্লাহর সৃষ্টজীবের প্রতিকৃতি তৈরি করে।’^{৪৩০}

সেদিনও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর খুব রাগ এসেছিল, যেদিন উসামা বিন জাইদ ؓ মাখজুম গোত্রের জনৈকা মহিলার পক্ষে তাঁর নিকট সুপারিশ করেছিলেন। মহিলাটি চুরি করেছিল। রাসুলুল্লাহ ﷺ তার ওপর হদ (শরিয়ত নির্ধারিত হাত কাটার শাস্তি) প্রয়োগ করার দৃঢ় সংকল্প করলেন। লোকেরা বলল, এই মেয়ের পক্ষে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে কথা বলার কি কেউ নেই? তারা বলল, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয়পাত্র একমাত্র উসামা বিন জাইদ ؓ-ই বলতে পারবেন। তখন উসামা ؓ কথা বললেন। এতে রাসুলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন :

أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ؟ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ،
إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ،
وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَابْتَغُوا لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ
بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

‘তুমি কি আল্লাহর হদের ব্যাপারে সুপারিশ করছ? তারপর তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিরা এজন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের সম্ভ্রান্ত কোনো লোক চুরি করলে তাকে ছেড়ে দিত, আর দুর্বল কেউ চুরি করলে তার ওপর হদ জারি করত।

৪৩০. সহিহ মুসলিম : ২১০৭, সহিহুল বুখারি : ৫৯৫৪

আল্লাহর কসম, যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, তবুও
আমি তার হাত কেটে ফেলতাম।^{৪৩১}

এমনই ছিল রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর রাগান্বিত হওয়ার কারণ। ইসলামি শরিয়তে
রাগান্বিত হওয়ার মাপকাঠিও এটাই। অর্থাৎ রাগ করতে হবে আল্লাহর জন্য;
নিজ স্বার্থের জন্য নয়।

গালিগালাজ ও অশ্লীল কথা থেকে বিরত থাকে

মুসলমান যখন রাগ নিয়ন্ত্রণ করার গুণ অর্জন করে নেয়, তখন স্বাভাবিকভাবেই
তার জবান থেকে গালিগালাজ, অসংলগ্ন ও অশ্লীল কথাবার্তা বের হয় না। এ
গুণটি মুসলমানদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মুসলমানদের জিহ্বা গালিগালাজ
ও অশ্লীল ভাষা থেকে মুক্ত থাকা চাই। ইসলাম বিভিন্ন ভাষায় এ গুণ অর্জন
করার প্রতি মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করেছে।

আবু মাসউদ ؓ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

‘মুসলমানকে গালি দেওয়া ফিসকি (অর্থাৎ কবির গুনাহ), আর তার
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কুফরি।’^{৪৩২}

অন্য হাদিসে ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ فَاحِشٍ مُتَفَحِّشٍ

‘নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সকল অশ্লীলভাষী ব্যক্তিকে অপছন্দ করেন।’^{৪৩৩}

অন্য হাদিসে বলেন :

وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ

৪৩১. সহিহ মুসলিম : ১৬৮৮, সহিহুল বুখারি : ৬৭৮৮

৪৩২. সহিহুল বুখারি : ৪৮, সহিহ মুসলিম : ৬৪

৪৩৩. মুসনাদু আহমাদ : ২১৭৬৪

‘নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা অশ্লীলভাষী ও দূশ্চরিত্র লোককে ঘৃণা করেন।’^{৪৩৪}

আরেক হাদিসে বলেন :

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلَا اللَّعَّانِ، وَلَا الْفَاحِشِ، وَلَا الْبَذِيءِ

‘মুমিন অধিক নিন্দাকারী, অধিক অভিশাপকারী, অশ্লীলভাষী ও দূশ্চরিত্র নয়।’^{৪৩৫}

যে মুসলমান ইমানি শোভায় শোভিত, ইসলামের উদারনীতি যাকে স্পর্শ করেছে, তার উচিত এসব খারাপ অভ্যাস থেকে যোজন যোজন দূরে থাকা। প্রকৃত মুসলমান যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মহান আদর্শের মাঝে দেখতে পায় যে, তিনি কোনোদিন এমন কথা উচ্চারণ করেননি, যা শুনতে খারাপ লাগে বা শ্রোতার আবেগ ও মর্যাদায় আঘাত হানে, তখন সে এসব খারাপ অভ্যাস থেকে আরও দূরত্ব বজায় রেখে চলে।

আনাস র. বলেন :

لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا، وَلَا لَعَّانًا، وَلَا سَبَّابًا، كَانَ يَقُولُ عِنْدَ الْمَعْتَبَةِ: «مَا لَهُ تَرَبَّ جَبِينُهُ»

‘রাসুলুল্লাহ ﷺ অশ্লীলভাষী ছিলেন না, অধিক অভিসম্পাত করতেন না, গালিগালাজ করতেন না। কাউকে শাসানোর প্রয়োজন হলে বলতেন, কী হলো তার? ধুলায় মিশ্রিত হোক^{৪৩৬} তার কপাল!’^{৪৩৭}

এমনকি রাসুলুল্লাহ ﷺ কাফিরদের—যাদের অন্তরসমূহ তাঁর দাওয়াত ঠেকাতে রুদ্ধ করে রেখেছিল—অভিশাপ দেওয়া থেকেও বিরত থাকতেন।

৪৩৪. সুনানুত তিরমিজি : ২০০২

৪৩৫. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৩৩২

৪৩৬. এ অংশের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসগণ বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ এ শব্দের মাধ্যমে ওই ব্যক্তির জন্য দুআ করতেন, যেন সে বেশি করে সিজদা করার মাধ্যমে তার কপাল ধুলামিশ্রিত করতে পারে, যেখানে তার পরিভ্রম ও হিদায়াত নিহিত আছে। (অনুবাদক)

৪৩৭. সহিহুল বুখারি : ৬০৪৬

আবু হুরাইরা রাঃ বলেন :

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اذْغُ اللَّهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: «إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَنَاءُ، وَلَكِنْ بُعِثْتُ رَحْمَةً»

‘রাসুলুল্লাহ সঃ-কে বলা হলো, হে আল্লাহর রাসুল, মুশরিকদের জন্য বদদুআ করুন। তিনি বললেন, আমি অভিশাপকারী হিসাবে প্রেরিত হইনি; বরং রহমত হিসাবে প্রেরিত হয়েছি।’^{৪৩৮}

আবু হুরাইরা রাঃ বর্ণনা করেন :

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ، قَالَ: «اضْرِبُوهُ» قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللَّهُ، قَالَ: «لَا تَقُولُوا هَكَذَا، لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ»

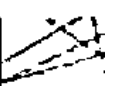
‘এক ব্যক্তি মদ পান করল। তাকে নবিজি সঃ-এর নিকট নিয়ে আসা হলো। তিনি লোকদের বললেন, একে প্রহার করো। তখন আমাদের কেউ হাত দিয়ে, কেউ জুতা দিয়ে, আবার কেউ কাপড় দিয়ে তাকে পিটাতে লাগলাম। যখন সে নড়াচড়া করতে লাগল, তখন কেউ কেউ তাকে বলল, তোকে আল্লাহ লাঞ্ছিত করুক। তখন নবিজি সঃ বললেন, এমন কথা বলা না এবং তার ব্যাপারে শয়তানকে সহযোগিতা করো না।’^{৪৩৯}

মানবিকতার কী প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত! মানুষ গোমরাহ ও চরম পাপিষ্ঠ হতে পারে, কিন্তু রাসুলুল্লাহ সঃ তার প্রতিও অভিসম্পাত করতেন না।

অন্তরসমূহ থেকে মন্দ কাজের প্রবণতা, হিংসা, শত্রুতা ইত্যাদি খারাপ অভ্যাসের মূল উপড়ে ফেলার জন্য রাসুলুল্লাহ সঃ সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন।

৪৩৮. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৩২১

৪৩৯. সহিহুল বুখারি : ৬৭৭৭



এজন্য মুসলমানদের সামনে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি কথার মাধ্যমে মানুষের সম্মান ও মর্যাদায় আঘাত হানবে, তার পরিণতি খুব ভয়াবহ হবে। তার সকল ভালো কর্মের ওপর গালিগালাজ, দোষচর্চা ও জুলুম-অত্যাচার প্রকট হয়ে দেখা দেবে। তখন সে দেউলিয়া ও রিক্তহস্ত হয়ে যাবে। জাহান্নামের আগুন থেকে তাকে বাঁচানোর কেউ থাকবে না।

এ সম্পর্কিত হাদিসটি হলো, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

«أَتَذُرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟» قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ»

‘তোমরা কি জান দেউলিয়া ও কাঙাল কে? লোকেরা বলল, আমাদের মধ্যে তো কাঙাল ওই ব্যক্তি, যার না আছে কোনো টাকা-পয়সা আর না আছে কোনো আসবাবপত্র। রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে তারাই কাঙাল ও দেউলিয়া, যারা কিয়ামতের দিন নামাজ, রোজা ও জাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে, পাশাপাশি দুনিয়ায় সে কাউকে গালি দিয়ে এসেছে, কাউকে হয়তো মিথ্যা দোষারোপ করে এসেছে, কারও সম্পদ অন্যায়ভাবে মেরে দিয়েছে। এসব মাজলুমদের মধ্যে তার সব নেক আমল বণ্টন করে দেওয়া হবে। এরপর যদি তার সব পুণ্য শেষ হয়ে যায় এবং মাজলুমদের পাওনা তখনো বাকি থেকে থাকে, তাহলে ওদের পাপ তার ভাগে ফেলে দিয়ে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।’^{৪৪০}

তাই মুসলমানদের এমন তুচ্ছ কাজ ও ঝগড়া-ফাসাদ থেকে বিরত থাকতে হবে, যেগুলো গালিগালাজ ও অশ্লীল ভাষার দিকে নিয়ে যায়। এ বিষয়গুলোই

মুসলমানদের সমাজ ধ্বংস করার জন্য এবং মানুষের জীবনযাত্রা দুর্বিষহ করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

প্রকৃত ইসলামি ভাবধারার ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজের সদস্যরা গভীরভাবে উপলব্ধি করে যে, তাদের মুখ থেকে উচ্চারিত সকল শব্দের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। তাই তাদের মুখ থেকে কখনো খারাপ কথা বের হতে চাইলে তারা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করে ফেলে; রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এ হাদিসটি স্মরণ করে :

الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا، فَعَلَى الْبَادِي، حَتَّى يَغْتَدِي الْمَظْلُومُ

‘ঝগড়ারত দুই ব্যক্তি পরস্পরকে যত (খারাপ) কথা বলে, উভয়জনের কথার পাপ ঝগড়া সূচনাকারীর ঘাড়ে চাপবে; অবশ্য যদি মাজলুম সীমালঙ্ঘন না করে থাকে।’^{৪৪১}

তাই প্রকৃত মুসলিম নিজের জিহ্বাকে গালিগালাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখে, যদিও তার যথাযথ কারণ পাওয়া যায়। রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখে, যেন গুনাহে পতিত না হতে হয়। অনুরূপ সে অত্যাচারী হওয়া থেকেও বিরত থাকে।

প্রকৃত মুসলমান জীবিতদের গালি দেওয়া থেকে যেমন বিরত থাকে, তেমনই মৃতদের প্রতিও তার জিহ্বা সংযত রাখে। কিন্তু নির্বোধ মূর্খরা জীবিতদের গালিগালাজ তো করেই, মৃতদেরও রেহাই দেয় না। অথচ রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا

‘তোমরা মৃতদের গালি দিয়ো না। কেননা, তারা যা (দুনিয়ার জীবনে ভালো-মন্দ আমল) পেশ করেছে, তার নিকট তা পৌঁছে গেছে।’^{৪৪২}

যাকে তাকে ফাসিক ও কাফির আখ্যা দেয় না

যে মুসলিম নিজের জিহ্বাকে গালিগালাজ ও অশ্লীল কথাবার্তা থেকে বিরত রাখে, সে যেন অহেতুক কাউকে ফাসিক বা কাফির বলা থেকে নিজেকে বিরত

৪৪১. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৪২৪

৪৪২. সহিহুল বুখারি : ১৩৯৩



রাখে। কেননা, এটা অন্যান্য গালিগালাজ থেকে আরও মারাত্মক ও জঘন্য। হাদিস শরিফে এ ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি এসেছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

لَا يَزِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ، وَلَا يَزِمِيهِ بِالْكُفْرِ، إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ،
إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ

‘যে কেউ কাউকে ফাসিক বা কাফির বলবে, তা নিজের বেলায় প্রযোজ্য হবে; যদি (বাস্তবে) সে ব্যক্তি তা (অর্থাৎ ফাসিক বা কাফির) না হয়।’^{৪৪৩}

লাজুক ও দোষ গোপনকারী

প্রকৃত মুসলমানের অন্যতম উত্তম গুণ হলো, সে লাজুক ও গোপনকারী হয়ে থাকে। ইসলামি সমাজে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক, তা সে চায় না। কেননা, মানুষের দোষ চর্চা করে তাদের ইজ্জত-আবরূর ক্ষতি করে, এ ধরনের অনিষ্টকারী লোকদের জন্য পবিত্র কুরআন ও হাদিসে কঠোর শাস্তির হুঁশিয়ারি এসেছে।

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

‘যারা পছন্দ করে যে, ইমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্য ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।’^{৪৪৪}

এজন্যই যে ব্যক্তি সমাজে অশ্লীলতার খবর প্রকাশ করে, সেও অশ্লীলতাকারীর সমান পাপের ভাগী হবে।

৪৪৩. সহিহুল বুখারি : ৬০৪৫

৪৪৪. সূরা আন-নূর : ১৯

এ সম্পর্কে আলি বিন আবু তালিব ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন :

الْقَائِلُ الْفَاحِشَةَ، وَالَّذِي يُشِيعُ بِهَا، فِي الْإِثْمِ سَوَاءٌ

‘অশ্লীল কথা যে বলে এবং যে তা প্রকাশ করে—দুজনই সমান অপরাধী।’^{৪৪৫}

ইসলামি সমাজের সদস্যকে লাজুক ও দোষ গোপনকারী হতে হবে। ছোট ছোট অপরাধ থেকেও নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। ইসলাম তাকে এ শিক্ষা দেয় যে, সে নিজের এবং অন্যের কোনো অপরাধ মানুষের সামনে প্রকাশ করবে না। বাইরে বাইরে বলে বেড়াবে না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

كُلُّ أُمَّتِي مُعَافٍ إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهِرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ، عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ

‘আমার সকল উম্মত মাফ পাবে, তবে প্রকাশকারী ব্যতীত। নিশ্চয় এ বড়ই ধৃষ্টতা যে, কোনো ব্যক্তি রাতে অপরাধ করল, যা আল্লাহ তাআলা গোপন রাখলেন, কিন্তু ভোর হলে সে বলে বেড়াতে লাগল, হে অমুক, আমি আজ রাতে এমন এমন কর্ম করেছি। অথচ সে এমন অবস্থায় রাত অতিবাহিত করল যে, আল্লাহ তার কর্ম গোপন রেখেছিলেন, আর ভোরে উঠে সে তার ওপর থেকে আল্লাহর পর্দা খুলে ফেলল।’^{৪৪৬}

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا، إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

৪৪৫. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৩২৪

৪৪৬. সহিহুল বুখারি : ৬০৬৯

‘দুনিয়াতে যে বান্দা অপর বান্দার দোষ গোপন করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দোষ গোপন রাখবেন।’^{৪৪৭}

একদল লোক উকবা বিন আমির ؓ-এর নিকট এসে বলল :

إِنَّ لَنَا جِيرَانًا يَشْرَبُونَ وَيَفْعَلُونَ، أَفَنَرْفَعُهُمْ إِلَى الْإِمَامِ؟ قَالَ: لَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْ مُسْلِمٍ عَوْرَةً فَسَتَرَهَا، كَانَ كَمَنْ أَحْيَا مَوْتُودَةً مِنْ قَبْرِهَا

‘আমাদের কিছু প্রতিবেশী মদ পান করে এবং খারাপ কর্ম করে। তাদের কি আমরা ইমামের (রাষ্ট্রপ্রধানের) হাতে তুলে দেবো? তিনি বললেন, তা কোরো না। কেননা, আমি রাসুলুল্লাহ ؓ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ দেখার পর তা গোপন রাখল, সে যেন জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলা মেয়ে শিশুকে জীবিত উদ্ধার করল।’^{৪৪৮}

মানুষের মাঝে যে মানবিক দুর্বলতাগুলো থাকে, সেগুলোর চিকিৎসা করার জন্য গোপনীয়তা অবলম্বন করা চাই। লোকসম্মুখে তাদের দোষত্রুটি ও অপরাধ ফাঁস করে দিলে চিকিৎসা হবে না। এতে হিতে বিপরীত হবে। এর কার্যকর চিকিৎসা করতে হলে উত্তম উপায়ে তাদের কানে সত্যের বাণী শুনিয়ে দিতে হবে। তাদের সামনে ইবাদতকে সুন্দররূপে এবং গুনাহকে কদর্যরূপে তুলে ধরতে হবে। এ ক্ষেত্রে নম্রতা ও কোমলতা অবলম্বন করতে হবে। কেননা, নম্রতা হৃদয়ের বন্ধ দুয়ার খুলে দেয়। অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বিনয়ভাব সৃষ্টি করে। মন নরম করে দেয়। এজন্যই ইসলাম আড়ি পাতা ও গোয়েন্দাগিরি করতে নিষেধ করেছে। কুরআনে আল্লাহ বলেন : وَلَا تَجَسَّسُوا ‘তোমরা মানুষের দোষ অন্বেষণ কোরো না।’

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ؓ-এর নিকট এক ব্যক্তিকে আনা হলো এবং তার ব্যাপারে বলা হলো :

৪৪৭. সহিহ মুসলিম : ২৫৯০

৪৪৮. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৭৫৮

هَذَا فَلَانُ تَقْطُرُ لِحَيْتُهُ خَمْرًا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «إِنَّا قَدْ نُهِينَا عَنْ
التَّجَسُّسِ وَلَكِنْ إِنْ يَظْهَرُ لَنَا شَيْءٌ نَأْخُذُ بِهِ»

‘এ লোকটার দাড়ি থেকে শরাব ঝরে ঝরে পড়ে (অর্থাৎ অতিরিক্ত মদ্যপান করে)। তখন তিনি বললেন, মানুষের দোষ অন্ত্রেষণ করতে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে। তবে আমাদের সামনে যা স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়, আমরা তার শাস্তি কার্যকর করি।’^{৪৪৯}

এর কারণ হলো, মুসলমানদের দোষ খুঁজে বেড়ালে এবং তাদের পেছনে গোয়েন্দার মতো লেগে থেকে তাদের দুর্বলতা ও গোপন অপরাধগুলো প্রকাশ করে দিলে তাদের খুব কষ্ট হয়। সমাজের জন্যও এটা ক্ষতিকর। কারণ, বিভিন্ন অপরাধের কথা যখন সমাজের মানুষের মাঝে চর্চা হতে থাকে, তখন এক সময় তা মানুষের সামনে সাধারণ বিষয় মনে হয়। এভাবে নিঃশব্দে সেই অপরাধ অন্যের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। তা ছাড়া অন্যের গোপনীয়তা ফাঁস করলে সমাজে হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা বেড়ে যায়। ঝগড়া-ফাসাদ বৃদ্ধি পায়।

এ বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

إِنَّكَ إِنْ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ، أَوْ كِذْتُ أَنْ تُفْسِدَهُمْ

‘তুমি যদি মুসলমানদের দোষ খুঁজে বেড়াও, তাহলে তুমি তাদের ধ্বংস করে দিচ্ছ, অথবা অচিরেই ধ্বংস করে দেবে।’^{৪৫০}

এজন্যই রাসুলুল্লাহ ﷺ মানুষের ইজ্জত-আবরূর পেছনে পড়া ও তাদের দোষ খুঁজে বেড়ানো থেকে মুসলমানদের কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

তিনি বলেন :

لَا تُؤْذُوا عِبَادَ اللَّهِ، وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ، وَلَا تَطْلُبُوا عَوْرَاتِهِمْ؛ فَإِنَّهُ مَنْ
طَلَبَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ طَلَبَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ فِي بَيْتِهِ

৪৪৯. সুনানু আবি দাউদ : ৪৮৯০

৪৫০. সুনানু আবি দাউদ : ৪৮৮৮

‘আল্লাহর বান্দাদের কষ্ট দিয়ো না, তাদের লজ্জিত কোরো না, তাদের দোষ খুঁজে বেড়িও না। কেননা, যে ব্যক্তি মুসলমানের দোষ খুঁজে বেড়াবে, আল্লাহ তার দোষ খুঁজবেন এবং এক পর্যায়ে তাকে নিজের বাড়িতেই লাঞ্ছিত করবেন।’^{৪৫১}

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ؓ-এর রিওয়াযাতে এদের প্রতি রাসুলুল্লাহ ؐ-এর আরও কঠোরতা বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন :

خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةً أَسْمَعَ الْعَوَاتِقَ فِي خُدُورِهِنَّ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانُ قَلْبَهُ، لَا تُؤْذُوا الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّبِعْ عَوْرَةَ أَخِيهِ يَتَّبِعْ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ يَتَّبِعْ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ، وَلَوْ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ»

‘রাসুলুল্লাহ ؐ একদিন এমনভাবে খুতবা দিলেন যে, তা অন্তরমহলের মেয়েরা পর্যন্ত শুনতে পেল। তিনি বললেন, যারা মুখে ইমান এনেছ, কিন্তু অন্তরে ইমান প্রবেশ করেনি, তারা শোনো! মুমিনদের কষ্ট দিয়ো না এবং তাদের গোপন দোষ-ত্রুটি খুঁজো না। কারণ, যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের গোপন দোষ খোঁজার পেছনে পড়ে, আল্লাহ তার গোপনীয়তা প্রকাশ করে দেন। যে অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ায়, আল্লাহ তাকে লাঞ্ছিত করেন; যদিও সে নিজের ঘরে অবস্থান করুক।’^{৪৫২}

এখানে অন্যের দোষচর্চাকারীদের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ ؐ-এর কঠোরতা লক্ষ্য করুন। তিনি বলেছেন, যারা মুখে ইমান এনেছ, কিন্তু অন্তরে ইমান প্রবেশ করেনি! যে গুনাহের কারণে তিনি অন্তরকে ইমানশূন্য বলেছেন, সে গুনাহ কত মারাত্মক হতে পারে? লোকেরা তা ছোট মনে করতে পারে, কিন্তু আল্লাহর নিকট অনেক বড় সে গুনাহ।

৪৫১. মুসনাদু আহমাদ : ২২৪০২

৪৫২. আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি : ১১৪৪৪

অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় না

প্রকৃত মুসলমান—যে উত্তম ইসলাম পালনে আগ্রহী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে উদ্যোগী—কখনো অহেতুক ও অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় না। মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়সমূহে নাক গলায় না। যা-ই বলা হয় এবং যা-ই প্রচারিত হয়, সব বিষয় নিয়ে চিন্তা করে না। কারণ, ইসলাম তাকে এসব সস্তা পরচর্চা ও বে-ফায়দা ব্যস্ততা থেকে দূরে থাকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ

‘বে-ফায়দা বিষয় বর্জন করা মানুষের উত্তম ইসলামি চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত।’^{৪৫৩}

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ اللَّهَ يَرْضَى لَكُمْ ثَلَاثًا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ ثَلَاثًا، فَيَرْضَى لَكُمْ: أَنْ تَعْبُدُوهُ، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَيَكْرَهُ لَكُمْ: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةُ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةُ الْمَالِ

‘আল্লাহ তাআলা তোমাদের তিন কাজের প্রতি সন্তুষ্ট, আর তিন কাজের প্রতি অসন্তুষ্ট। তোমরা তাঁর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরিক করবে না এবং সম্মিলিতভাবে তাঁর রজ্জুকে আঁকড়ে ধরবে আর বিচ্ছিন্ন হবে না—তোমাদের এ তিন কাজের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট। সব বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন, অধিক প্রশ্ন করা ও ধন-সম্পদ ধ্বংস করা—এ তিন কাজের প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট।’^{৪৫৪}

যে সমাজ ইসলামের দেওয়া রূপরেখা অনুযায়ী চলে, সে সমাজে সব বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন, অধিক প্রশ্ন এবং মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়সমূহে অন্যের

৪৫৩. সুনানুত তিরমিজি : ২৩১৭

৪৫৪. সহিহ মুসলিম : ১৭১৫

নাক গলানোর কোনো সুযোগ নেই। কারণ, এ সমাজের যারা সদস্য, তারা খুব গুরুত্বপূর্ণ ও বড় দায়িত্বে মশগুল থাকে। তারা জমিনে আল্লাহর কালিমা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত থাকে। ভূপৃষ্ঠে আল্লাহর বিধানের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টায় ব্রত থাকে। তারা আল্লাহর বিধান মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য অবিরাম পরিশ্রম করে যায়। এসব বড় বড় ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে যারা ব্যস্ত থাকে, তাদের ওই সব বাজে কাজ করার সময় কোথায়?

গিবত ও চোগলখোরি থেকে দূরে থাকে

প্রকৃত মুসলমান গিবত (পরনিন্দা) ও চোগলখোরি (পরচর্চা) থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। কারণ, তার ভেতর যে ইসলামি মূল্যবোধ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আছে, তা-ই তাকে এসব বাজে কাজ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে। তা ছাড়া কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসুলে যে উন্নত নীতিবোধ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তা সে অবলম্বন করে; আর যেসব অনৈতিক বিষয় থেকে নিষেধ করা হয়েছে, সেসব থেকে বেঁচে থাকে।

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন :

وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
فَكَرَهُتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

‘তোমাদের কেউ যেন কারও পশ্চাতে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুত, তোমরা তো একে ঘৃণাই করো। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয় আল্লাহ তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।’^{৪৫৫}

প্রকৃত মুসলমান যখন আয়াতটি পড়ে, তখন গিবত বা পরনিন্দার প্রতি তার অন্তরে প্রচণ্ড ঘৃণা জন্মায়। পরনিন্দাকারীকে আল্লাহ মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণকারীর সাথে তুলনা করেছেন—এ বিষয়টা তার ভেতর ভীতির সঞ্চার করে। তাই কখনো সে কারও গিবত করে ফেললে সাথে সাথে তাওবা করে নেয়। আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তাআলা তাওবার প্রতি যে ইঙ্গিত

করেছেন, তা এজন্যই করেছেন, যেন কেউ গিবত করে ফেললে দ্রুতই তাওবা করে নেয়।

প্রকৃত মুসলমান নিজেকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিম্নের হাদিস অনুযায়ী গড়ে তোলে। হাদিসটি হলো :

إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ؟
قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

‘এক প্রশ্নকারী রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করলেন, সর্বোত্তম মুসলমান কে? উত্তরে তিনি বললেন, যার জিহ্বা (কথা) ও হাত (কাজ) থেকে মুসলমানরা নিরাপদ থাকে।’^{৪৫৬}

এজন্য প্রকৃত মুসলমান নিজেকে কখনো গিবত বা পরনিন্দার মতো জঘন্য কাজে জড়ায় না। সমাজের কাউকে কোনোরূপ কষ্ট দেয় না; বরং এক ধাপ এগিয়ে সে মানুষের গিবতের লক্ষ্যবস্তু হওয়া মুসলমান ভাইকে উদ্ধার করে নেয়। তার ব্যাপারে বলা খারাপ কথাগুলোর প্রতিবাদ করে। কারণ, রাসুলুল্লাহ ﷺ উম্মতকে এ শিক্ষাই দিয়েছেন।

তিনি ইরশাদ করেছেন :

مَنْ ذَبَّ عَنْ عَرِضِ أَخِيهِ بِالْمَغِيبِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ
يُعْتِقَهُ مِنَ النَّارِ

‘যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার ইজ্জত-আবরূর ওপর আসা আঘাত প্রতিহত করে, আল্লাহর ওপর তার অধিকার হলো, তাকে তিনি জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করবেন।’^{৪৫৭}

প্রকৃত মুসলমান সমাজে চোগলখোরি বা পরচর্চা করে না। কারণ, তার ধর্ম তার মাঝে এ বোধ সৃষ্টি করে দিয়েছে যে, পরনিন্দাকারীরা হলো সমাজের নিকৃষ্ট জীব। মানুষের মাঝে ফাসাদ সৃষ্টি করা ও বন্ধুত্বের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করা ছাড়া তাদের আর কোনো কাজ নেই।

৪৫৬. সহিহ মুসলিম : ৪০

৪৫৭. আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি : ৪৪৩

মুসনাদে আহমাদে আসমা বিনতে ইয়াজিদ ❀ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ
❀ ইরশাদ করেছেন :

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِكُمْ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا،
ذُكِرَ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرَارِكُمْ؟ الْمَشَاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ،
الْمُفْسِدُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ، الْبَاغُونَ لِلْبُرَاءِ الْعَنْتَ

‘আমি কি বলব না, তোমাদের মাঝে কারা উত্তম? সাহাবিগণ বললেন, অবশ্যই হে আল্লাহর রাসুল! তিনি বললেন, যাদের দেখলে আল্লাহকে স্মরণ হয় (তারা উত্তম)। তারপর বললেন, আমি কি বলব না, তোমাদের মাঝে সর্বনিকৃষ্ট কারা? যারা পরচর্চা করে, বন্ধুদের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করে এবং নির্দোষ ব্যক্তিদের দোষ তালাশ করে বেড়ায়, তারাই হলো সর্বনিকৃষ্ট।’^{৪৫৮}

চোগলখোর বা পরচর্চাকারীদের দুনিয়ার লাঞ্ছনা আর আখিরাতের কঠোর পরিণতির প্রমাণের জন্য নিম্নোল্লিখিত একটি হাদিসই যথেষ্ট। যদি তারা নিজেদের এ পাপকর্ম থেকে ফিরে না আসে, তাহলে এ হাদিসটি তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার সকল পথই রুদ্ধ করে দেয়।

হাদিসটি হলো :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَامٌ

‘পরচর্চাকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।’^{৪৫৯}

এ ছাড়াও পরচর্চাকারীকে কবরে রাখার পর থেকেই তার ওপর নেমে আসে কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক আজাব। বুখারি-মুসলিমসহ অনেক হাদিসগ্রন্থে ইবনে আব্বাস রাঃ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে :

مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا هَذَا: فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا هَذَا:

৪৫৮. মুসনাদু আহমাদ : ২৭৫৯৯

৪৫৯. সহিছ মুসলিম : ১০৫

فَكَانَ يَمْشِي بِالتَّمِيمَةِ، ثُمَّ دَعَا بِعَسِيبٍ رَظِي فَشَقَّهُ بِاِثْنَيْنِ، فَغَرَسَ
عَلَى هَذَا وَاحِدًا، وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا، ثُمَّ قَالَ: «لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا
لَمْ يَنْبَسَا»

‘রাসুলুল্লাহ ﷺ দুটি কবরের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেন। তখন বললেন, এ দুই কবরবাসীর ওপর আজাব হচ্ছে। বড় কোনো অপরাধের কারণে তাদের আজাব হচ্ছে এমন নয়। এদের একজন পরচর্চা করে বেড়াত। অপরজন প্রস্তাব করে ভালোভাবে পবিত্রতা অর্জন করত না। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ কাচা খেজুরের একটি ডাল আনিয়ে তা দুই টুকরো করলেন। তারপর উভয় কবরের ওপর একটি করে গেঁড়ে দিলেন। তারপর বললেন, অন্তত এ দুই ডাল শুকিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের আজাব একটু নমনীয় হওয়ার আশা করা যায়।’^{৪৬০}

মিথ্যা বলে না

প্রকৃত মুসলমান মিথ্যা কথা বলে না এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না। কারণ, এটা হারাম। আল্লাহ বলেন :

وَأَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

‘আর মিথ্যা কখন থেকে দূরে সরে থাকো।’^{৪৬১}

মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হারাম তো বটেই, পাশপাশি এটা ব্যক্তির পুরুষত্ব, আমানতদারিতা ও মর্যাদাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে। কাজেই এটা কখনো মুমিনদের স্বভাব হতে পারে না। তাই আল্লাহ তাআলা তাঁর নির্বাচিত বান্দাদের মাঝে এ স্বভাব না থাকার কথা উল্লেখ করেছেন।

তিনি ইরশাদ করেন :

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

৪৬০. সহিহুল বুখারি : ৬০৫২, সহিহ মুসলিম : ২৯২

৪৬১. সূরা আল-হাজ : ৩০

‘আর যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং যখন অসার ক্রিয়াকর্মের সম্মুখীন হয়, তখন মান রক্ষার্থে ভদ্রভাবে চলে যায়।’^{৪৬২}

মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া যে কত বড় মারাত্মক গুনাহ, তা আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাদিস থেকেও জানতে পারি, যেখানে তিনি আল্লাহর সাথে শিরক করা ও পিতা-মাতার অবাধ্যতার পর সবচেয়ে বড় কবির গুনাহ এটাকেই বলেছেন। তারপরও এর ভয়াবহতা বুঝাতে রাসুলুল্লাহ ﷺ খুব উত্তেজিত হয়ে কয়েকবার করে বললেন এ কথা।

তিনি ইরশাদ করেছেন :

أَلَا أُنبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟ ثَلَاثًا، الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ،
وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ - أَوْ قَوْلُ الزُّوْرِ - وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مُتَكِيًّا، فَجَلَسَ فَمَا زَالَ يُكْرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتَهُ سَكَتَ

‘আমি কি সবচেয়ে বড় কবির গুনাহ কী, তা তোমাদের বলে দেবো না? (প্রশ্নটি তিনবার করলেন।) আমরা বললাম, অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসুল! তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে শিরক করা ও পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। তিনি হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন, সেখান থেকে সোজা হয়ে বসে বললেন, আরেকটি হচ্ছে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া—অথবা বললেন—মিথ্যা কথা বলা। (গুরুত্ব বুঝানোর উদ্দেশ্যে) শেষের কথাটি তিনি বারবার বলতে থাকলেন। একপর্যায়ে আমরা (তাঁর অবস্থা দেখে ভীত হয়ে মনেমনে) বলতে থাকলাম, ইশ্! তিনি যদি এবার চুপ হতেন!’^{৪৬৩}

নেতিবাচক ধারণা থেকে বেঁচে থাকে

প্রকৃত মুসলমানের আরেকটি উত্তম গুণ হলো, সে কারও ব্যাপারে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে না। সে নিজের কল্পনার লাগামকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে, যেন তা মানুষের দোষের পেছনে ছুটতে না পারে। কারণ, এর মাধ্যমে

৪৬২. সূরা আল-ফুরকান : ৭২

৪৬৩. সহিহুল বুখারি : ২৬৫৪, সহিহ মুসলিম : ৮৭

সে মানুষের ব্যাপারে এমন সব অপবাদ রটাতে শুরু করবে, যেগুলো তাদের মাঝে বিলকুল নেই। এ শিক্ষাই পবিত্র কুরআন আমাদের দেয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

‘হে মুমিনগণ, তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাকো। নিশ্চয় কতক ধারণা গুনাহ।’^{৪৬৪}

নেতিবাচক ধারণা ও বিচার-বিশ্লেষণ না করে কারও ব্যাপারে ধারণাপ্রসূত কথা বলা থেকে রাসুলুল্লাহ ﷺ আরও কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

তিনি ইরশাদ করেছেন :

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ

‘তোমরা অবশ্যই কুধারণা ও অনুমাননির্ভর কথা বলা থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা, কুধারণা ও অনুমাননির্ভর কথা সবচেয়ে বড় মিথ্যা।’^{৪৬৫}

অনুমাননির্ভর কথাকে রাসুলুল্লাহ ﷺ সবচেয়ে বড় মিথ্যা আখ্যা দিয়েছেন। যেখানে প্রকৃত মুসলমান মিথ্যার গন্ধ পাওয়া যায়—এমন কথা থেকেও বিরত থাকে, সেখানে সবচেয়ে বড় মিথ্যায় নিজেকে জড়ানো তার পক্ষে কী করে সম্ভব!?

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষা হলো, অনুমাননির্ভর কথা বলা থেকে বাঁচতে হবে। তদুপরি তিনি সেটাকে বলেছেন সবচেয়ে বড় মিথ্যা। তাই প্রকৃত মুসলমান মানুষের বাহ্যিক কাজকর্মই শুধু দেখে, তাদের ভেতরের বিষয় নিয়ে কোনোরূপ ধারণা, সন্দেহ, সংশয় ইত্যাদি করা থেকে বেঁচে থাকে। কাজেই মানুষের গোপনীয় ও ব্যক্তিগত বিষয় জানার চেষ্টা করা এবং তাদের প্রাইভেসিতে আঘাত করা কখনো একজন মুসলমানের স্বভাব হতে পারে না।

৪৬৪. সূরা আল-হুজুরাত : ১২

৪৬৫. সহিহুল বুখারি : ৬০৬৪, সহিহ মুসলিম : ২৫৬৩



তাদের গোপন বিষয় সম্পর্কে যা করার তা আল্লাহ-ই করবেন। তিনি প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছুই জানেন। মানুষের দায়িত্ব হলো, তারা শুধু বাইরেরটা দেখবে। আমাদের সালাফে সালিহিন—যাদের গায়ে ধুলোবালিমুক্ত দ্বীনের স্বচ্ছ বাতাস লেগেছিল—এমনটাই করতেন।

আব্দুর রাজ্জাক ❁ আব্দুল্লাহ বিন উতবা বিন মাসউদ ❁ সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন :

‘আমি উমর ❁-কে বলতে শুনেছি, রাসুলুল্লাহ ❁-এর জীবদ্দশায় মানুষ ওহির মাধ্যমে ফয়সালা করতেন। এখন ওহি বন্ধ, তাই এখন তোমাদের বাহ্যিক অবস্থা দেখেই আমরা ফয়সালা করব। যার বাহ্যিক অবস্থা ভালো, তাকে নিরাপত্তা দেবো এবং কাছে টানব। তার ভেতরে কী আছে, তা দেখার দায়িত্ব আমাদের নয়। তার ভেতরের বিষয়ের হিসাব-নিকাশ আল্লাহ করবেন। আর যার বাহ্যিক অবস্থা খারাপ, তার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমরা নেব না। সে যদি দাবি করে যে, তার অভ্যন্তরীণ অবস্থা ভালো, আমরা তা বিশ্বাস করব না।’^{৪৬৬}

এজন্যই প্রকৃত মুসলমান প্রতিটি শব্দ মুখ দিয়ে উচ্চারণ করার সময় খুবই সতর্ক থাকে। পুরোপুরি নিশ্চিত না হয়ে কোনো ফয়সালা করে না। কারণ, আল্লাহর অমীয় এ বাণীটি সম্পর্কে কখনো সে বিস্মৃত হয় না :

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ
كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

‘যে বিষয়ে তোমার কোনো জ্ঞান নেই, তার পেছনে পোড়ো না। নিশ্চয় কান, চক্ষু ও অন্তঃকরণ—এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে।’^{৪৬৭}

মহাজ্ঞানী আল্লাহ তাআলার এ নিষেধবাণী প্রকৃত মুসলমান অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে। সুতরাং জ্ঞান ছাড়া সে কোনো কথা বলে না এবং নিশ্চিত না হয়ে কখনো কোনো বিষয়ে ফয়সালা করে না।

৪৬৬. হায়াতুস সাহাবা : ২/১৫২

৪৬৭. সূরা বনি ইসরাইল : ৩৬

মানুষের গোপনীয়তা অনুসন্ধান করা ও তাদের ব্যাপারে ধারণাপ্রসূত কথা বলার পাপে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচতে হলে কুরআনের নিম্নোল্লিখিত আয়াতটি নিয়ে ফিকির করতে হবে। এ আয়াতে বলা হয়েছে, মানুষের মুখ দিয়ে যে কথাই বের হোক, তা সাথে সাথে রেকর্ড করে নেওয়ার জন্য ফেরেশতা নিয়োজিত আছেন।

ইরশাদ হয়েছে :

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

‘সে যে কথাই উচ্চারণ করুক, তা গ্রহণ করার জন্য তার কাছে সদা প্রস্তুত গ্রহরী রয়েছে।’^{৪৬৮}

যে মুসলমান এসব আয়াত ও হাদিসের অর্থ জানে, সে কথা বলার ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকে। মেপে মেপে কথা বলে। মুখ দিয়ে উচ্চারণ করার পূর্বে প্রতিটা শব্দ ভালোভাবে যাচাই করে নেয়। কারণ, সে ইসলামের এ নির্দেশনা সম্পর্কে জ্ঞান রাখে যে, কথা-ই অনেক সময় আল্লাহর সন্তুষ্টি বা অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাড়ায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ، مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ، يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ يَكْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِهَا سَخَطَهُ إِلَى يَوْمٍ يَلْقَاهُ

‘অনেক সময় মানুষ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে এমন কথা বলে, সে কথা তাকে কোথায় পৌঁছে দেয়, তা সে জানেই না। সে কথার কারণে আল্লাহ তাআলা তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত স্বীয় সন্তুষ্টি লিখে দেন। আবার কোনো সময় আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে এমন কথা কেউ বলে, সে কথা কোথায় গিয়ে ক্রিয়া করে, সে তা জানে না। সে কথার

কারণে আল্লাহ তাআলা তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত স্বীয় অসম্ভুতি
লিখে দেন।^{৪৬৯}

ওপরের আলোচনা থেকে বুঝা গেল, কথা বলা কঠিন এক দায়িত্ব। আর
শ্রুতিনির্ভর ও ধারণাপ্রসূত কথা নিয়ে বকবককারী জিহ্বার কারণে যে গুনাহ
হয়, তা অনেক বড় গুনাহ।

মুত্তাকি ও স্বচ্ছ হৃদয়ের মুসলমান কখনো মানুষের আজেবাজে কথায় কান
দেয় না। বর্তমান সময়ে আমাদের সমাজে অসার কথা ও মিথ্যা সংবাদ
প্রচারের সয়লাব প্রবহমান। এসব তাকে প্রভাবিত করে না। যাচাই বাছাই
না করে শ্রুতিনির্ভর ও ধারণাপ্রসূত কোনো কথা সে বলে না। সে মনে করে,
যাচাই বাছাই না করে যা শোনে, তাই বলে বেড়ানো নিষিদ্ধ মিথ্যা।

রাসুলুল্লাহ ﷺ হাদিস শরিফে ইরশাদ করেছেন :

كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ

‘যা শোনে তাই বলে বেড়ানো মানুষের মিথ্যুক হওয়ার জন্য যথেষ্ট।’^{৪৭০}

গোপনীয়তা রক্ষাকারী

প্রকৃত মুসলমানের আরেকটি উত্তম গুণ হলো, সে গোপনীয়তা রক্ষা করে।
অন্যের গোপনীয়তা—যা তার কাছে আমানত রাখা হয়েছে—কারও সামনে
প্রকাশ করে না। গোপনীয়তা রক্ষা করতে পারা মানুষের পৌরুষ, শক্তিশালী
ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচায়ক। আর এটাই উম্মাহর শ্রেষ্ঠ পুরুষ ও
নারী—যাঁরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শের অমীয়া সুধা পান করেছেন এবং
নিজেদের তাঁর আদর্শ অনুযায়ী পরিচালিত করেছেন—তাঁদের অন্যতম গুণ
ছিল। তাঁদের অসংখ্য উত্তম গুণের মধ্যে এই গুণটিও ছিল। অগণিত সুন্দর
অভ্যাসের মধ্যে এই অভ্যাসটিও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

হাফসা ؓ-এর স্বামী মারা যাওয়ার পর উমর ؓ তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব
দিয়েছিলেন আবু বকর ؓ ও উসমান ؓ-এর নিকট। তখন তারা সুকৌশলে

৪৬৯. মুয়াত্তা মালিক : ৮১৬/৩৬১১

৪৭০. সহিহ মুসলিম : ৪

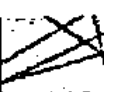
এ সম্পর্কিত রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর একটি গোপন কথা রক্ষা করেছিলেন। এখান থেকে গোপনীয়তা রক্ষার ক্ষেত্রে সাহাবিগণ কতটা সুদৃঢ় ছিলেন, তা অনুমান করা যায়।

বিস্তারিত ঘটনা ইমাম বুখারি رحمه الله ইবনে উমর رحمه الله সূত্রে বর্ণনা করেছেন :

‘উমর رحمه الله বলেন, আমার মেয়ে হাফসা رحمه الله-এর স্বামীর মৃত্যুর পর উসমান বিন আফফান رحمه الله-এর সাথে দেখা করে তার নিকট হাফসাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করলাম। বললাম, আপনি রাজি থাকলে আমি হাফসা বিনতে উমর رحمه الله-কে আপনার সাথে বিবাহ দিতে চাই। তিনি বললেন, আমি একটু ভেবে দেখি। কয়েকদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। তারপর আমার সাথে দেখা করে বললেন, আমার মনে হচ্ছে, আমার এ সময়ে বিয়ে করা ঠিক হবে না। তারপর আমি আবু বকর رحمه الله-এর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তাকে বললাম, আপনি রাজি থাকলে আমি হাফসা বিনতে উমর رحمه الله-কে আপনার সাথে বিয়ে দিতে চাই। তিনি চুপ করে থাকলেন, কোনো উত্তর দিলেন না। এতে উসমান رحمه الله-এর চেয়ে তাঁর ওপর আমার বেশি রাগ আসলো। কয়েকদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। তারপর রাসুলুল্লাহ ﷺ হাফসাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলেন। আমি হাফসা رحمه الله-কে তাঁর সাথে বিয়ে দিয়ে দিলাম। তারপর আবু বকর رحمه الله আমার সাথে দেখা করে বললেন, আপনি হাফসা رحمه الله-কে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন, আর আমি কোনো উত্তর দিইনি—এতে আপনি মনে হয় আমার ওপর খুব রেগে আছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ হাফসা رحمه الله সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন, আর রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যাক, তা আমি চাইনি। এজন্যই আপনাকে কোনো উত্তর দিইনি। যদি রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব না দিতেন, আমি অবশ্যই তাকে গ্রহণ করে নিতাম।

গোপনীয়তা রক্ষা করার এ গুণ শুধু সালাফের পুরুষদের মাঝে ছিল তা নয়, নারী ও শিশুদের মাঝেও ছিল, যারা ইসলামকে নিজেদের মাঝে দ্রবীভূত করে নিয়েছিলেন এবং যাদের হৃদয় ও বিবেক ইসলামের উজ্জ্বল নুর দ্বারা আলোকিত ছিল।

এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা সহিহ মুসলিমে আনাস رحمه الله থেকে বর্ণিত হয়েছে :



عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أَتَى عَلِيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا أَلْعَبُ
مَعَ الْغُلَمَانِ، قَالَ: فَسَلَّمَ عَلَيْنَا، فَبَعَثَنِي إِلَى حَاجَةٍ، فَأَبْطَأْتُ عَلَى أُمِّي،
فَلَمَّا جِئْتُ قَالَتْ: مَا حَبَسَكَ؟ قُلْتُ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ، قَالَتْ: مَا حَاجَتُهُ؟ قُلْتُ: إِنَّهَا سِرٌّ، قَالَتْ: لَا تُحَدِّثَنَّ
بِسِرِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا قَالَ أَنَسُ: وَاللَّهِ لَوْ حَدَّثْتُ
بِهِ أَحَدًا لَحَدَّثْتُكَ يَا ثَابِتُ

‘আনাস   বলেন, আমার নিকট রাসুলুল্লাহ   আসলেন। তখন আমি (সমবয়সী) বালকদের সাথে খেলছিলাম। এসেই তিনি আমাদের সালাম দিলেন। তারপর আমাকে একটা কাজে পাঠালেন। এতে মায়ের কাছে পৌঁছতে আমার দেরি হলো। যখন তার কাছে গেলাম, তখন তিনি বললেন, (এত দেরি কেন?) কীসে তোমাকে বন্দী করে রেখেছিল? আমি বললাম, রাসুলুল্লাহ   আমাকে একটি কাজে পাঠিয়েছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কী কাজ? আমি বললাম, এটা গোপনীয় কাজ (বলা যাবে না)। তিনি বললেন, (ঠিক আছে,) রাসুলুল্লাহ  -এর গোপনীয়তা কখনো কারও সামনে প্রকাশ করবে না। আনাস   বলেন, হে সাবিত, (তাঁর ছাত্রের নাম, যাকে আনাস   এ হাদিসটি বর্ণনা করেছিলেন) আল্লাহর কসম! সেই কাজ সম্পর্কে যদি আমি কাউকে বলে থাকতাম, আজ তোমাকে অবশ্যই তা বলতাম।’^{৪৭১}

এখানে আনাস  -এর মা যখন তার ছেলের মাঝে রাসুলুল্লাহ  -এর গোপনীয়তা রক্ষা করার দৃঢ়তা দেখলেন, তখন তা আরও পাকাপোক্ত করে দিলেন তিনি। কখনো কারও সামনে রাসুলুল্লাহ  -এর গোপনীয়তা ফাঁস না করার প্রতি উৎসাহিত করলেন। এজন্য আনাস   কখনো কাউকে এ গোপনীয়তা ফাঁস করেননি। এমনকি তাবিয়ি সাবিত বুনানি  -কেও বলেননি, যাকে তিনি এ হাদিসটি বর্ণনা করেছিলেন। গোপন বিষয় জানার সহজাত

প্রবণতা আনাস ؓ-এর মাকে ছোট বাচ্চাকে ভুলিয়ে কথা বের করে নেওয়ার প্রতি লালায়িত করেনি। এটাই ইসলামের শিক্ষা। এই শিক্ষাই পুরুষ-নারী-শিশু নির্বিশেষে মানুষকে মর্যাদার উচ্চ শিখরে আরোহণ করায়।

গোপনীয়তা প্রকাশ করা মানুষের অন্যতম খারাপ অভ্যাস। এ জীবনে যা জানা থাকে, সবই বলে দেওয়া যায় না। এমন কিছু বিষয়ও থাকে, যেগুলো গোপনীয়তার চাদরে ঢেকে রাখাই পুরুষত্ব ও মনুষ্যত্বের দাবি। বিশেষ করে দাম্পত্য জীবন-সম্পর্কিত গোপনীয় বিষয় কারও সামনেই প্রকাশ করা যাবে না। এসব বিষয় কেবল সেই প্রকাশ করতে পারে, যার মাথায় গগুগোল আছে এবং যার ব্যক্তিত্ব খুবই তরল ও পাতলা। এজন্যই এ ধরনের কথা রাখতে না পারা ব্যক্তিদের রাসুলুল্লাহ ؐ মন্দ লোকদের দলভুক্ত বলেছেন। আল্লাহর কাছে সর্বনিকৃষ্ট লোক এদেরকেই বলেছেন।

রাসুলুল্লাহ ؐ ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

‘কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি এমন লোক হবে, যে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং স্ত্রীও তার সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়, অতঃপর সে স্ত্রীর গোপন কথা প্রকাশ করে দেয়।’^{৪৭২}

তৃতীয় জনের উপস্থিতিতে দুজনে কানে কানে কথা বলে না

প্রকৃত মুসলমান মানুষের অনুভূতির মর্যাদা দেয়। মানুষের খারাপ লাগে এমন কাজ করা থেকে বেঁচে থাকে। এজন্য সে কথা বলার সময় খুব সতর্কতা ও বিচক্ষণতা অবলম্বন করে। কথা বলার সময় বিচক্ষণতার শ্রেষ্ঠতম দিক হলো, তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে দ্বিতীয় ব্যক্তির সাথে সে কানে কানে কথা বলে না। এটা ইসলামের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিষ্টাচার।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ؓ থেকে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ ؐ ইরশাদ করেছেন :

إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً، فَلَا يَتَنَاجَى رَجُلَانِ دُونَ الْآخِرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا
بِالنَّاسِ، أَجَلَ أَنْ يُحْزَنَهُ

‘যখন তোমরা তিনজন হবে, তখন একজনকে বাদ দিয়ে দুজন ব্যক্তি কানে কানে কথা বলবে না, যতক্ষণ না মানুষের সাথে মিশে যাও। কারণ, এতে তৃতীয় ব্যক্তি কষ্ট পায়।’^{৪৭৩}

ইসলাম যে মুসলমানের অনুভূতিকে শাণিত করেছে এবং যার মাঝে সৃষ্টি করেছে উন্নত মানসিকতা, বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তা, সে কখনো এমন স্থানে কানে কানে কথা বলে না, যেখানে তিনজনের বেশি মানুষ উপস্থিত না থাকে। যেন তৃতীয় ব্যক্তির অনুভূতিতে আঘাত না আসে। অবশ্য দুই ব্যক্তির কথা বলা খুব বেশি জরুরি হলে তৃতীয় জনের অনুমতি নিয়ে কথা বলা যায়। তবে কথা খুব সংক্ষেপ করতে হবে এবং তৃতীয় ব্যক্তির কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে।

সাহাবায়ে কিরাম—ইসলাম যাঁদের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করেছিল এবং ইসলামের চরিত্র ও শিক্ষা যাঁদের রক্তের সাথে মিশে গিয়েছিল—মানুষের সাথে সম্পর্ক ও দেখা-সাক্ষাতের ক্ষেত্রে এ ধরনের স্পর্শকাতর বিষয় থেকে কখনো উদাসীন থাকতেন না। অসংখ্য হাদিসে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি ইমাম মালিক رحمته তাঁর রচিত মুয়াত্তায় আব্দুল্লাহ বিন দিনার رحمته সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

আব্দুল্লাহ বিন দিনার رحمته বলেন :

كُنْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عِنْدَ دَارِ خَالِدِ بْنِ عُقْبَةَ الَّتِي بِالسُّوقِ،
فَجَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ، وَلَيْسَ مَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَحَدٌ غَيْرِي
وَعَبْدُ الرَّجُلِ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُنَاجِيَهُ، فَدَعَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَجُلًا
حَتَّى كُنَّا أَرْبَعَةً، فَقَالَ لِي وَلِلرَّجُلِ الَّذِي دَعَا: اسْتَخِرَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ.

‘আমি ও আব্দুল্লাহ বিন উমর ؓ খালিদ বিন উকবা ؓ-এর বাড়ির নিকট ছিলাম। বাড়িটি বাজারের মধ্যে ছিল। এমন অবস্থায় এক ব্যক্তি এসে তার সাথে কানে কানে কথা বলতে চাইলেন। সেখানে ইবনে উমর ؓ-এর সাথে আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। তখন ইবনে উমর ؓ আরেকজন ব্যক্তিকে ডেকে আনলেন যেন আমরা চারজন হয়ে যাই। তারপর আমাকে এবং ডেকে আনা লোকটিকে বললেন, তোমরা এখানে থাকো। কেননা, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তৃতীয়জনকে বাদ দিয়ে দুই ব্যক্তি কানে কানে কথা বলো না।’^{৪৭৪}

এখানে ইবনে উমর ؓ তৃতীয় ব্যক্তির সামনে হঠাৎ আসা লোকটির সাথে কানে কানে কথা বলতে রাজি হননি; বরং আরেকজন লোক ডেকে চারজন করে তারপর কথা বললেন। কারণ, তৃতীয় ব্যক্তির সামনে দুই ব্যক্তি কানে কানে কথা বললে তৃতীয় ব্যক্তির কষ্ট হয়। তার অনুভূতিতে আঘাত লাগে। তাই তিনি প্রাণ্টিক্যালি আমল করার পাশাপাশি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাদিস সবাইকে শুনিয়ে প্রমাণ করে দিলেন, এটাই রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সুনাত।

অহংকারী নয়

প্রকৃত মুসলমান অহংকারী নয়। মানুষকে অবজ্ঞা করে না। লজ্জা দেয় না। কারণ, কুরআনের বাণী তার কানে ও হৃদয়ে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়, এ নশ্বর পৃথিবীতে যারা অহংকারী, অবিনশ্বর আখিরাতে তাদের ধ্বংস অনিবার্য।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا
فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ

‘এই পরকাল আমি তাদের জন্য নির্ধারিত করি, যারা দুনিয়ার বুকে উদ্ধত্য প্রকাশ করতে ও অনর্থ সৃষ্টি করতে চায় না। আর আল্লাহভীরুদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম।’^{৪৭৫}

৪৭৪. মুয়াত্তা মালিক : ৮২০/৩৬২৩

৪৭৫. সূরা আল-কাসাস : ৮৩

তার কানে এ বাণীও বাজে যে, আল্লাহ তাআলা দাঙ্গিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না, যে মানুষকে অবজ্ঞা করে এবং দম্ভভরে পৃথিবীতে বিচরণ করে।

তিনি ইরশাদ করেন :

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

‘অহংকারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে গর্বভরে পদচারণা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ কোনো দাঙ্গিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না।’^{৪৭৬}

অন্তরসমূহ থেকে অহংকার সমূলে উপড়ে ফেলার জন্য হাদিসে এত বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে, এ সম্পর্কিত হাদিসসমূহ অধ্যয়ন করলে রীতিমতো অবাক হতে হয়। এসব হাদিসে অহংকারকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করা হয়েছে। অণু পরিমাণ অহংকার থাকলেই আখিরাত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ভয় দেখানো হয়েছে। জান্নাত হারাম হয়ে যাওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبَرُ بَطْرُ الْحَقِّ، وَغَمَطُ النَّاسِ

‘যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার আছে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এক ব্যক্তি আরজ করলেন, মানুষ তো নিজের কাপড় ও জুতো উত্তম হওয়াকে পছন্দ করে! (তাহলে এটাও কি অহংকারের অন্তর্ভুক্ত হবে?) রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। (তাই এটাকে অহংকার বলা যাবে না। প্রকৃত অর্থে) অহংকার তো সত্যকে গোপন করা ও মানুষকে অবজ্ঞা করাকে বলা হয়।’^{৪৭৭}

৪৭৬. সূরা লুকমান : ১৮

৪৭৭. সহিহ মুসলিম : ৯১

হারিসা বিন ওয়াহাব ؓ বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: كُلُّ غُثَّلٍ جَوَّازٍ مُسْتَكْبِرٍ

‘আমি কি তোমাদের জাহান্নামবাসী লোকদের পরিচয় দেবো না?
(তারা হলো) প্রত্যেক রুম্ম স্বভাবের, দাঙ্গিক ও অহংকারী ব্যক্তি।’^{৪৭৮}

কিয়ামতের দিন অহংকারীদের লাঞ্ছনার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সেদিন আল্লাহ তাআলা তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদের সাথে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্র করবেন না। এটা হবে তাদের অহংকার ও দাঙ্গিকতার মানসিক শাস্তি। এ শাস্তি শারীরিক শাস্তির চেয়ে অনেকগুণ বেশি কষ্টদায়ক ও যন্ত্রণাদায়ক হবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطْرًا

‘কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তির দিকে তাকাবেন না, যে ব্যক্তি অহংকারবশত তার নিম্নবস্ত্র মাটিতে হেঁচড়ে টেনে চলে।’^{৪৭৯}

অন্য হাদিসে ইরশাদ করেছেন :

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ - قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ:
وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ - وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخُ زَانَ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ
مُسْتَكْبِرٌ

‘তিন ব্যক্তির সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা কথা বলবেন না, তাদের পবিত্র করবেন না (গুনাহ ক্ষমা করবেন না), তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদের জন্য থাকবে বেদনাদায়ক শাস্তি।
(তারা হলো) এক. ব্যভিচারী বৃদ্ধ, দুই. মিথ্যুক শাসক, তিন. অহংকারী দরিদ্র।’^{৪৮০}

৪৭৮. সহিহ মুসলিম : ২৮৫৩

৪৭৯. সহিহল বুখারি : ৫৭৮৮

৪৮০. সহিহ মুসলিম : ১০৭

অহংকার এত জঘন্য অপরাধ হওয়ার কারণ হলো, তা আল্লাহর একক বৈশিষ্ট্য। এটা মানবজাতির সাথে সম্পর্কিত কোনো বৈশিষ্ট্য বা স্বভাব নয়। তাই যারা অহংকার করে, তারা যেন মানবত্বের সীমা ছাড়িয়ে প্রভুত্বের সীমায় অবৈধ অনুপ্রবেশ করতে চায়। মহান প্রভুর একক অধিকার নিয়ে টানাটানি শুরু করে। ফলে তাদের কঠিন ও মর্মন্তদ শাস্তি দেওয়া মোটেই অবিচার হবে না।

এ সম্পর্কে হাদিসে কুদসিতে ইরশাদ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা বলেন :

الْعِزُّ إِزَارِي، وَالْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي، فَمَنْ نَازَعَنِي بِشَيْءٍ مِنْهُمَا عَذَّبْتُهُ

‘গৌরব আমার নিম্নবস্ত্র। অহংকার আমার চাদর। এ দুবিষয়ে যে ব্যক্তি আমার সাথে ঝগড়া করবে, তাকে আমি শাস্তি প্রদান করব।’^{৪৮১}

এজন্য পবিত্র সূন্যাহর অসংখ্য জায়গায় মুমিনদের অহংকার পরিত্যাগ করার প্রতি জোর তাকিদ দেওয়া হয়েছে এবং তা বর্জন না করলে শাস্তির হুমকি দেওয়া হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَنْ تَعَظَّمَ فِي نَفْسِهِ، أَوْ اخْتَالَ فِي مَشِيَّتِهِ، لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ

‘যে নিজেকে বড় মনে করে অথবা দম্ভভরে চলাফেরা করে, সে আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে, যখন তিনি তার প্রতি ক্রোধান্বিত থাকবেন।’^{৪৮২}

বিনয়ী

অহংকারীদের কঠিন শাস্তি সম্পর্কে যেমন অসংখ্য আয়াত ও হাদিস রয়েছে, তেমনই বিনয়ীদের পুরস্কারের ব্যাপারেও এমন অনেক বাণী রয়েছে। এতে বিনয়-নম্রতার প্রতি মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে আর বলা হয়েছে, যে যত

৪৮১. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৫৫২

৪৮২. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৫৪৯

বিনয়ী, তার মর্যাদা আল্লাহর কাছে তত বেশি। বিনয়-সম্পর্কিত নুসুস থেকে এখানে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ

‘কেউ আল্লাহর জন্য বিনয় অবলম্বন করলে, আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন।’^{৪৮৩}

আরেক হাদিসে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ

‘আল্লাহ তাআলা আমার নিকট এ মর্মে ওহি প্রেরণ করেছেন যে, তোমরা বিনয়ী হও, যেন তোমাদের একজন অপরজনের সাথে অহংকার না করে এবং একজন আরেকজনের প্রতি অন্যায় না করে।’^{৪৮৪}

রাসুলুল্লাহ ﷺ ছিলেন বিনয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ও মূর্তপ্রতীক। দয়া, বিনম্রতা ও উদারতা তাঁর চরিত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। তিনি যখন খেলাধুলায় মত্ত শিশুদের পাশ দিয়ে যেতেন, তখন তাদের সালাম দিতেন। তাদের সাথে উদারচিত্তে সহাস্যে কথা বলতেন। নবুওয়াতের শান এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা তাঁর বিনয়ী ও উদার আচরণ করায় প্রতিবন্ধক হতো না। এ সম্পর্কে হাদিসে বর্ণিত আছে যে, একবার আনাস ﷺ বাচ্চাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের সালাম দিলেন এবং বললেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ-ও এমন করতেন।

আনাস ﷺ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বিনয় সম্পর্কে আরেক হাদিসে বর্ণনা করেন :

إِنْ كَانَتِ الْأُمَّةُ مِنْ إِمَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، لَتَأْخُذُ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنْطَلِقُ بِهِ حَيْثُ شَاءَتْ

৪৮৩. সহিহ মুসলিম : ২৫৮৮

৪৮৪. সহিহ মুসলিম : ২৮৬৫

‘(রাসুলুল্লাহ ﷺ এতই বিনয়ী ছিলেন যে,) মদিনার কোনো দাসী (নিজের প্রয়োজন জানানোর জন্য) রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাত ধরে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারত।’^{৪৮৫}

তামিম বিন উসাইদ ﷺ ইসলামের বিবিবিধান সম্পর্কে জানতে মদিনায় এলেন। একজন অপরিচিত ভিনদেশি হওয়া সত্ত্বেও ইসলামি রাষ্ট্রের বাদশা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সরাসরি সাক্ষাৎ করতে তার কোনো বেগ পেতে হয়নি। রাসুলুল্লাহ ﷺ মিসরে বসে লোকদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিচ্ছিলেন, তখন তামিম বিন উসাইদ ﷺ সরাসরি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে বিভিন্ন বিষয় জিজ্ঞাসা করলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ তার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে খুবই বিনয় ও উদারতার সাথে তার জিজ্ঞাসার জবাব দিলেন।

চলুন, বিস্তারিত ঘটনা খোদ তামিম বিন উসাইদ ﷺ-এর মুখেই শুনি :

انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَخْطُبُ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ غَرِيبٌ، جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ، لَا يَذَرِي مَا دِينُهُ، قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَأَتَى بِكُرْسِيِّ، حَسَبْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا، قَالَ: فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ، ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ، فَأَتَمَّ آخِرَهَا

‘আমি যখন নবিজি ﷺ-এর নিকট আসলাম, তখন তিনি লোকদের ভাষণ দিচ্ছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, এক ভিনদেশি তার দ্বীন সম্পর্কে জানতে এসেছে। সে দ্বীন সম্পর্কে কিছুই জানে না। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ আমার দিকে ফিরে তাকালেন এবং ভাষণ বন্ধ করে আমার নিকট আসলেন। একটি চেয়ার এনে তাতে বসে আমাকে জ্ঞান দান করলেন, যা তিনি আল্লাহর কাছ থেকে পেয়েছেন। তারপর আবার লোকদের মাঝে ফিরে গিয়ে বাকি ভাষণ শেষ করলেন।’^{৪৮৬}

৪৮৫. সহিহুল বুখারি : ৬০৭২

৪৮৬. সহিহ মুসলিম : ৮৭৬

বিনয়ের এ মহান গুণ—যা ব্যক্তির উদারতা, দয়া ও সাদা মনের পরিচয় দেয়—রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর সাহাবিদের মাঝেও বিকশিত করার চেষ্টা করেছেন। তাই তাদের উদ্দেশে তিনি বলেন :

لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ

‘আমাকে যদি কেবল একটি হাত অথবা পায়ের একটি হাড়ি খাওয়ারও দাওয়াত দেওয়া হয়, তবুও আমি সে দাওয়াত কবুল করি। আর যদি কেবল একটি হাত অথবা পায়ের একটি হাড়ি হাদিয়া দেওয়া হয়, তা-ও আমি গ্রহণ করি।’^{৪৮৭}

সুবহানাল্লাহ! বিনয়ের কী উজ্জ্বল নমুনা! উন্নত মনুষ্যত্বের কী জ্যোতির্ময় দৃষ্টান্ত! কী আলোকিত আদর্শ!

কারও সাথে বিদ্রূপ করে না

প্রকৃত মুসলমান—যার মাঝে বিনয়ের মহান গুণ বিদ্যমান—কখনো কাউকে অবজ্ঞা করে না এবং কারও সাথে বিদ্রূপ করে না। কারণ, তার কুরআন তাকে বিনয় অবলম্বন করতে যেমন নির্দেশ দেয়, তেমনই অহংকার, অবজ্ঞা ও বিদ্রূপ থেকে দূরে থাকতে নির্দেশ দেয়।

কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

‘হে মুমিনগণ, কোনো দল যেন অপর দলকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে এবং কোনো নারী যেন অপর নারীকে উপহাস না করে। কেননা, সে উপহাসকারিণী

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ
কোরো না এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। কেউ বিশ্বাস
স্থাপন করলে তাদের মন্দ নামে ডাকা গুনাহ। যারা এহেন কাজ
থেকে তাওবা না করে, তারাই জালিম।^{৪৮৮}

তা ছাড়া রাসুলুল্লাহ ﷺ কোনো মুসলমানকে হেয় প্রতিপন্ন করাকে আগাগোড়া
মন্দ বলেছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন :

بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ

‘মানুষ মন্দ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে কোনো মুসলমানকে
হেয় প্রতিপন্ন করবে।’^{৪৮৯}

বড় ও মর্যাদাবান লোকদের সম্মান করে

ইসলাম মানুষকে সম্মান করার প্রতি উৎসাহিত করে, অবজ্ঞা ও হেয় প্রতিপন্ন
করার প্রতি নয়। বিশেষ করে যারা সম্মান ও মর্যাদার যোগ্য, তাদের সম্মান
করার প্রতি ইসলাম বিশেষভাবে উৎসাহিত করে। শুধু তাই নয়; বরং বয়স্ক,
আলিম ও মর্যাদাবান ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাকে ইসলাম তার চারিত্রিক
মূলনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধারা বলে অভিহিত করেছে, যে মূলনীতির
ওপর ইসলামি আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত। যার মধ্যে এ গুণ অনুপস্থিত, তাকে
ইসলামি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ঘোষণা করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর উম্মত
হওয়ার গর্বিত পরিচয় তার থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

لَيْسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ لَمْ يُجِلِّ كَبِيرَنَا، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيَعْرِفَ لِعَالِمِنَا

‘যে ব্যক্তি আমার উম্মতের বড়দের সম্মান করে না, ছোটদের স্নেহ
করে না এবং আলিমদের মর্যাদা ও অধিকার বুঝে না, সে আমার
(সত্যিকার) উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।’^{৪৯০}

৪৮৮. সূরা আল-হুজুরাত : ১১

৪৮৯. সহিহ মুসলিম : ২৫৬৪

৪৯০. মুসনাদু আহমাদ : ২২৭৫৫

সমাজে বড়দের সম্মান করা এবং ছোটদের চেয়ে বড়দের বেশি মূল্যায়ন করা সমাজের উন্নতির আলামত। যে সমাজের প্রত্যেক সদস্যের মাঝে মানবিক চরিত্র বিদ্যমান এবং মানসিকতা উন্নত, সে সমাজেই বড়দের সম্মান করা হয় এবং তাদের বেশি মূল্যায়ন করা হয়। এজন্য ইসলামি সমাজব্যবস্থার নীতিনির্ধারক রাসুলুল্লাহ ﷺ বড়দের সম্মান করার এ মহান গুণটির প্রতি মুসলমানদের খুব তাগিদ দিয়েছেন।

তার একটি জ্বলন্ত প্রমাণ হলো, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একদল লোক আসলেন। তাদের পক্ষ থেকে তাদের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য আব্দুর রহমান বিন সাহল ﷺ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে কথা বলতে গেলে তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে যে লোক সবার বড়, সে-ই কথা বলো। তখন আব্দুর রহমান ﷺ চুপ হয়ে গেলেন এবং বড় আরেকজন কথা বললেন।^{৪৯১}

রাসুলুল্লাহ ﷺ বড় ও মর্যাদাবান ব্যক্তির সম্মান প্রতিষ্ঠা করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন। বড়দের সম্মান করাকে তিনি আল্লাহকে সম্মান করার নামান্তর বলেছেন।

তিনি বলেন :

إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ
الْغَالِي فِيهِ وَالْجَانِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ

‘আল্লাহকে সম্মান করার একটি উপায় হলো, বৃদ্ধ মুসলমান, কুরআনের বাহক—যে কুরআনের সীমা লঙ্ঘন করে না এবং তার তিলাওয়াত ও তদনুযায়ী আমল করা থেকে বিরত থাকে না এবং ন্যায়পরায়ণ বাদশাকে সম্মান করা।’^{৪৯২}

আগের প্রজন্মের মুসলমানদের মাঝে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এ প্রচেষ্টা পুরোপুরি সফল হয়েছিল। এজন্য তাদের মাঝে এসব মহান গুণ পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। বড় ও মর্যাদাবান ব্যক্তিকে সম্মান করার বিষয়ে তারা ছিলেন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

৪৯১. সহিহুল বুখারি : ৩১৭৩, সহিহ মুসলিম : ১৬৬৯

৪৯২. সুনানু আবি দাউদ : ৪৮৪৩



উদাহরণস্বরূপ আবু সাইদ সামুরা বিন জুনদুব -এর কথাটা শোনা যাক।
 তিনি বলেন :

لَقَدْ كُنْتُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلَامًا، فَكُنْتُ أَحْفَظُ عَنْهُ، فَمَا يَمْنَعُنِي مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا أَنْ هَا هُنَا رِجَالًا هُمْ أَسَنُّ مِنِّي

‘রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জীবদ্দশায় আমি ছোট ছিলাম, কিন্তু তাঁর কথা মনে রাখতে পারতাম। তবে একমাত্র এ কারণে তা আলোচনা করতে আমার বিবেক আমাকে বাধা দিত যে, তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে আমার চেয়ে বয়সে বড় অনেক লোক উপস্থিত থাকতেন।’^{৪৯০}

বড় ও মর্যাদাবান ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আরেকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন আব্দুল্লাহ বিন উমর রাঃ। একদিন তিনি রাসুলুল্লাহ সঃ-এর দরবারে উপস্থিত ছিলেন। তখন সেখানে আবু বকর রাঃ ও উমর রাঃ-ও উপস্থিত ছিলেন। সেখানে রাসুলুল্লাহ সঃ এমন একটি প্রশ্ন করলেন, যার উত্তর ইবনে উমর রাঃ-এর জানা ছিল। কিন্তু আবু বকর ও উমর রাঃ-এর প্রতি সম্মানবশত তিনি উত্তর দেননি।

বিস্তারিত খোদ ইবনে উমর -এর মুখেই শুনুন :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَخْبِرُونِي بِشَجَرَةٍ مِثْلَهَا مِثْلُ الْمُسْلِمِ، تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، وَلَا تَحْتُ وَرَقَهَا» فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ، وَثَمَّ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَلَمَّا لَمْ يَتَكَلَّمَا، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هِيَ النَّخْلَةُ»، فَلَمَّا خَرَجْتُ مَعَ أَبِي قُلْتُ: يَا أَبَتَاهُ، وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، قَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَهَا، لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: مَا مَنَعَنِي إِلَّا أَنِّي لَمْ أَرَكَ وَلَا أَبَا بَكْرٍ تَكَلَّمْتُمَا فَكَرِهْتُ

‘রাসুলুল্লাহ ﷺ (একদিন উপস্থিত সবাইকে) বললেন, বলো তো দেখি সে কোন গাছ, যার উপমা মুসলমানের সাথে দেওয়া চলে। সব সময় সে তার প্রভুর নির্দেশে ফলদান করে এবং তার পাতা কখনো ঝরে যায় না। তখন আমার মনে আসলো, নিশ্চয় তা খেজুর গাছ। তবে আবু বকর ﷺ ও উমর ﷺ-এর উপস্থিতিতে আমি কথা বলা সংগত মনে করলাম না। যখন তাঁরা (আবু বকর ﷺ ও উমর ﷺ) কোনো উত্তর দিলেন না, তখন নবিজি ﷺ বললেন, তা হচ্ছে খেজুর গাছ। এরপর যখন আমি আমার পিতার সাথে মজলিস থেকে বের হয়ে আসলাম, তখন তাঁকে বললাম, আবু, আমার মনে এসেছিল যে, ওটা খেজুর গাছ। তখন তিনি বললেন, তাহলে তা বলতে কী বাধা ছিল তোমার? তুমি যদি তা বলতে, তাহলে অমুক অমুক বস্তুর চেয়েও আমার কাছে তা প্রিয়তর হতো। আমি বললাম, তেমন কোনো বাধা ছিল না, তবে আমি দেখলাম, আপনি আর আবু বকর ﷺ কেউ-ই উত্তর দিচ্ছেন না, তাই (আপনাদের সম্মানার্থে) আমি উত্তর দেওয়া সমীচীন মনে করিনি।’^{৪৯৪}

ইসলাম সমাজে মানুষকে যথাযোগ্য মূল্যায়ন করার কথা বলে। সহিহ মুসলিমে আয়িশা ﷺ সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন :

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُثَرِّلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ

‘রাসুলুল্লাহ ﷺ মানুষকে যথাযোগ্য মূল্যায়ন করার নির্দেশ দিয়েছেন।’^{৪৯৫}

যথাযোগ্য মূল্যায়ন করার অর্থ হলো, প্রত্যেক মানুষের মর্যাদা উপলব্ধি করে, সে অনুযায়ী স্তরবিন্যাস করে মূল্যায়ন করা। সুতরাং প্রথম মূল্যায়ন করতে হবে ক্রমান্বয়ে উলামায়ে ইসলাম, কুরআনের হাফিজ ও সুস্থ বুদ্ধি ও বিবেকসম্পন্ন লোকদের।

কেননা, ইসলামি সমাজে আলিমদের মর্যাদা সবার ওপরে। তবে শর্ত হলো, তাদের আল্লাহর শরিয়তের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে, সত্যপথে

৪৯৪. সহিহুল বুখারি : ৬১৪৪, সহিহ মুসলিম : ৬৪

৪৯৫. শুআবুল ইমান : ১০৪৮৯, সহিহ মুসলিম (মুকাদ্দামায়) ১/৬

অবিচল থাকতে হবে এবং ইসলামের নিদর্শনগুলো সংরক্ষণ করতে হবে।
স্বয়ং আল্লাহ-ই আলিমদের এ মর্যাদা দিয়েছেন।

তিনি বলেন :

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو
الْأَلْبَابِ

‘বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে?
চিন্তা-ভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান।’^{৪৯৬}

অনুরূপভাবে ইসলামি সমাজে কুরআনের বাহক তথা কারি ও হাফিজদের
বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। একাধিক সহিহ হাদিসে এর প্রমাণ পাওয়া
যায়। তাদেরকে নামাজের ইমামতির অধিক যোগ্য এবং সভা-মজলিসে
সভাপতিত্বের অধিক হকদার বলা হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

يَوْمُ الْقَوْمِ أَقْرَوْهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً، فَأَعْلَمُهُمْ
بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي
الهِجْرَةِ سَوَاءً، فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا، وَلَا يُؤَمِّنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ،
وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

‘যে সর্বাপেক্ষা বেশি কুরআনি জ্ঞানের অধিকারী, সে লোকজনের
ইমামতি করবে। সবাই যদি কুরআনের জ্ঞানে সমপর্যায়ের হয়, সে
ক্ষেত্রে যে ব্যক্তি সুন্নাহ সম্পর্কে অধিক পরিজ্ঞাত হবে, সে ইমামতি
করবে। সুন্নাহর জ্ঞানেও সবাই সমান হলে হিজরতে যে অগ্রগামী,
সে ইমামতি করবে। কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির নিজস্ব
প্রভাবাধীন এলাকায় ইমামতি করবে না কিংবা তার অনুমতি ছাড়া
তার বাড়িতে তার নির্দিষ্ট আসনে বসবে না।’^{৪৯৭}

৪৯৬. সূরা আজ-জুমার : ৯

৪৯৭. সহিহ মুসলিম : ৬৭৩

একটু পূর্বে আমরা এ সম্পর্কিত রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আরেকটি হাদিস উল্লেখ করেছি। তা হলো :

إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ
الْغَالِي فِيهِ وَالْجَانِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ

‘আল্লাহকে সম্মান করার একটি উপায় হলো, বৃদ্ধ মুসলমান, কুরআনের বাহক—যে কুরআনের সীমা লঙ্ঘন করে না এবং তার তিলাওয়াত ও তদনুযায়ী আমল করা থেকে বিরত থাকে না এবং ন্যায়পরায়ণ বাদশাকে সম্মান করা।’^{৪৯৮}

বর্ণিত আছে :

‘উহুদ যুদ্ধের শহিদগণকে এক কবরে দুজন করে দাফন করা হয়েছিল। কবর দেওয়ার সময় রাসুলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করতেন, ‘أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذَاً لِلْقُرْآنِ؟’ এ দুজনের মধ্যে কুরআন কার আয়ত্তে বেশি ছিল? যার দিকে ইশারা করা হতো, তাকেই প্রথমে কবরে রাখতেন।’^{৪৯৯}

মানুষকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে ও মূল্যায়ন করতে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আরেকটি বিচক্ষণ ও বাস্তববাদী নির্দেশনা তিনি নামাজের পূর্বমুহূর্তে কাতার সোজা করার সময় দিয়েছেন।

ইরশাদ করেছেন :

لِيَلْنِي مِنْكُمْ أَوْلُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى

‘মর্যাদাসম্পন্ন বিবেকবানরাই (নামাজে) আমার কাছাকাছি থাকবে।’^{৫০০}

এ একটিমাত্র নির্দেশনায় রয়েছে অনেক শিক্ষা। সর্বপ্রথম শিক্ষা হলো, প্রত্যেক মানুষকে তার মর্যাদা ও সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী মূল্যায়ন করতে হবে এবং সে অনুসারেই স্তরবিন্যাস করত হবে। নামাজের মধ্যে সুষ্ঠু বিবেকসম্পন্ন

৪৯৮. সুনানু আবি দাউদ : ৪৮৪৩

৪৯৯. সুনানু আবি দাউদ : ৩১৩৮

৫০০. সহিছ মুসলিম : ৪৩২



লোকদের রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পেছনে প্রথমে রাখার মাধ্যমে মূলত মুসলমানদের বিভিন্ন দায়িত্ব তাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য মনোনীত করেছেন। প্রত্যেক বিবেকসম্পন্ন মানুষকে স্ব-স্ব যোগ্যতা, শক্তি ও বিশেষত্ব অনুযায়ী ইসলামি সমাজের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ আদব প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে এবং কোনো কিছু বণ্টন করার ক্ষেত্রে দুইনি বিষয়ে মর্যাদা ও ফজিলতসম্পন্ন ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দিতেন। প্রত্যেক জাতির সম্মানিত ব্যক্তিকে তিনি সম্মান করতেন। তাকেই সে জাতির গভর্নর নিযুক্ত করতেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মজলিসে শ্রেষ্ঠ ও ন্যায়বান মুমিনদের অগ্রাধিকার ছিল, যারা তাকওয়ার দিক দিয়ে অন্যদের চেয়ে এগিয়ে ছিলেন। বড়দের সম্মান করতেন। ছোটদের স্নেহ করতেন। অভাবীদের স্বার্থে আপন স্বার্থ বিসর্জন দিতেন। ভিনদেশি অপরিচিতজনদের হিফাজত করতেন।

যে ব্যক্তি উপরোল্লিখিত বাস্তবসম্মত বিষয়সমূহ পূর্ণরূপে অনুধাবন করে সাধারণভাবে সমাজের সকল মানুষের সাথে; বিশেষভাবে আলিম-উলামা, মুত্তাকি ও মর্যাদাবান মানুষদের সাথে সে অনুযায়ী সমাজজীবন পরিচালনা করে, সে-ই হচ্ছে প্রকৃত মুসলমান।

ভালো মানুষদের সান্নিধ্যে থাকে

প্রকৃত মুসলমানের অন্যতম সৎগুণ হলো, নেককারদের সাথে সম্পর্ক রাখা; তাদের নৈকট্য অর্জন করা এবং তাদের থেকে দুআ চাওয়া। উচ্চ পদমর্যাদা, উন্নত সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি বিষয় এ মহৎ গুণের পথে তার প্রতিবন্ধক হয় না কখনো।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ
وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ
أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

‘আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। যার মনকে আমার সুরণ থেকে উদাসীন করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আপনি তার অনুগত্য করবেন না।’^{৫০১}

নেককার লোকদের সাথে সম্পর্ক রাখাটা এ জন্যই গুরুত্বপূর্ণ যে, এতে মানুষের মাঝে কল্যাণ, তাকওয়া ও কথায়-কাজে যথার্থতা সৃষ্টি হয়। দ্বীনি বোধশক্তি তীক্ষ্ণ হয়। সত্যের প্রতি আগ্রহ প্রবল হয়। এভাবে একসময় তারাও নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

কবি বলেন :

بعشرتكم الكرام تعد منهم * فلا ترين لغيرهم ألؤفا

‘ভালো মানুষের সংশ্রবে থাকলে তুমি ভালো মানুষদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। তাই ভালো মানুষ ছাড়া অন্য কারও সাথে ঘনিষ্ঠতা অবলম্বন করো না।’

আল্লাহর নবি মুসা ﷺ আল্লাহর নেককার বান্দার সংশ্রবে থেকে ইলম অর্জন করার চেষ্টা করেছেন। তার কাছে গিয়ে তিনি বিনয় ও আদব সহকারে বলেছেন :

هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا

‘আমি কি এ শর্তে আপনার অনুসরণ করতে পারি, সত্যপথের যে জ্ঞান আপনাকে শেখানো হয়েছে, তা থেকে আমাকে কিছু শিক্ষা দেবেন?’^{৫০২}

উত্তরে নেককার সে বান্দা বললেন :

إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا

৫০১. সূরা আল-কাহফ : ২৮

৫০২. সূরা আল-কাহফ : ৬৬

‘আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না।’^{৫০৩}

এর উত্তরে মুসা ﷺ আরও বিনয়াবনত হয়ে বললেন :

سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا

‘আল্লাহ চাহেন তো আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন এবং আমি আপনার কোনো আদেশ অমান্য করব না।’^{৫০৪}

প্রকৃত মুসলমান ভালো মানুষ ব্যতীত অন্য কারও সাথে ঘনিষ্ঠতা করে না। কারণ তার শরিয়ত তাকে বলে, মানুষ হলো খনির মতো, যার কিছু থেকে মূল্যবান পদার্থ বের হয়, আর কিছু থেকে বের হয় নিম্নমানের পদার্থ। তা ছাড়া ভালো মানুষ তো কেবল ভালো মানুষের সাথেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقَّهُوا، وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ
مِنْهَا اثْتَلَفَ، وَمَا تَنَازَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ

‘মানুষ সোনা ও রূপার খনির মতো। তাদের মধ্যে জাহিলি যুগে যারা উত্তম, ইসলামের যুগেও তারাই উত্তম প্রমাণিত হতে পারে—যদি তারা তা (ইসলাম) সম্পূর্ণরূপে অনুধাবন করতে পারে। আত্মারা রুহের জগতে বিভিন্ন দলে বিভক্ত ছিল। যারা সেখানে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও পরিচিত ছিল, দুনিয়াতে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি হয় এবং যারা সেখানে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও সম্পর্কহীন ছিল, এখানে তারা সম্পর্কহীন থাকে।’^{৫০৫}

প্রকৃত মুসলমান এটাই জানে যে, সঙ্গী দুধরনের রয়েছে। ভালো সঙ্গী ও মন্দ সঙ্গী। ভালো সঙ্গী সুগন্ধি বিক্রেতার মতো। তার পাশে থাকলে সুঘ্রাণ ও

৫০৩. সূরা আল-কাহফ : ৬৭

৫০৪. সূরা আল-কাহফ : ৬৯

৫০৫. সহিহ মুসলিম : ২৬৩৮

আনন্দ পাওয়া যায়। মন্দ সঙ্গী হাপরে ফুকদানকারী কামারের মতো। তার পাশে থাকলে পাওয়া যায় আগুনের তেজ, ধোঁয়া, দুর্গন্ধ ও কষ্ট।

হাদিসে ভালো ও মন্দ সঙ্গীর এমন যথার্থ উদাহরণই দিয়েছেন রাসুলুল্লাহ ﷺ।
তিনি বলেছেন :

إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ، وَالْجَلِيسِ السَّوِّءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ،
وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُخْذِيكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ،
وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ،
وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً

‘ভালো সঙ্গী ও মন্দ সঙ্গীর উদাহরণ হলো, সুগন্ধি বিক্রেতা ও হাপরে ফুকদানকারী। সুগন্ধিওয়ালা হয়তো তোমাকে উপহারস্বরূপ সুগন্ধি দেবে অথবা তার কাছ থেকে তুমি কিনে নেবে। তা-ও না হলে অন্তত সুগন্ধি নিজেই তোমার কাছে পৌছে যাবে। আর হাপরে ফুকদানকারী হয়তো তোমার কাপড় পুড়িয়ে ফেলবে অথবা তোমাকে দুর্গন্ধ দেবে।’^{৫০৬}

এজন্যই সাহাবায়ে কিরাম পরস্পরকে উদ্ধুদ্ধ করতেন এমন নেককার লোকদের সাক্ষাৎলাভ ও সুহবতের, যারা সর্বদা আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকতেন; যাদের অন্তর হতো কোমল ও নরম; আর যাদের চোখ থেকে প্রবাহিত হতো আল্লাহতীতির অশ্রুধারা।

এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা আনাস র. বর্ণনা করেছেন :

قَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لِعُمَرَ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمِّ أَيْمَنَ نَزُورُهَا، كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُورُهَا، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ، فَقَالَا لَهَا: مَا
يُبْكِيكِ؟ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَتْ: مَا

৫০৬. সহিহ মুসলিম : ২৬২৮

أُبْكِي أَنْ لَا أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ أُبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ، فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ. فَجَعَلَا يَبْكِيَانِ مَعَهَا

‘রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর পর আবু বকর ﷺ ও উমর ﷺ-কে বললেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ যেভাবে উম্মে আইমান ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে যেতেন, চলুন আমরাও তদ্রূপ তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করে আসি। (বর্ণনাকারী বলেন,) আমরা যখন তাঁর কাছে পৌঁছলাম, তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন। আবু বকর ﷺ ও উমর ﷺ তাঁকে বললেন, আপনি কাঁদছেন কেন? আল্লাহর কাছে তো তাঁর রাসুল ﷺ-এর জন্য কল্যাণকর জিনিসই রয়েছে। তিনি উত্তরে বললেন, আল্লাহর কাছে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য কল্যাণ রয়েছে, তা না জানা থাকার কারণে কাঁদছি না। বরং আমি এজন্যই কাঁদছি যে, আসমান থেকে ওহি আসা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল। (বর্ণনাকারী বলেন,) তাঁর এ কথায় তাঁদের দুজনের (আবু বকর ﷺ ও উমর ﷺ) কান্না এসে গেল এবং তাঁরাও তাঁর সাথে কাঁদতে লাগলেন।’^{৫০৭}

তা ছাড়া নেককারদের সাথে সুহবতের মজলিসকে ফেরেশতারা বেষ্টন করে রাখেন। আল্লাহ তাআলা সে মজলিসকে তাঁর রহমতের ছায়ায় ঢেকে নেন। তারপর এতে মানুষের ইমান মজবুত হয়। আত্মা পরিচ্ছন্ন হয়। কলব পরিশুদ্ধ হয়। মোটকথা, নেককার লোকদের সুহবতে থাকলে কল্যাণই কল্যাণ। নিজের জন্য, পরিবারের জন্য, সমাজের জন্য—সবার জন্যই কল্যাণ। ইসলাম মানুষদের ব্যক্তিগতভাবে ও সামগ্রিকভাবে এ কল্যাণের দিকেই আহ্বান করে।

মানুষের উপকার করতে এবং তাদের কষ্ট লাঘব করতে সচেষ্ট থাকে

প্রকৃত মুসলমান—যে ইসলামি শরিয়ার দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী লালিত হয়েছে এবং ইসলামের পবিত্র সরোবরে সিক্ত হয়েছে—সমাজে লোকদের উপকার করতে এবং তাদের কষ্ট দূর করতে সদা সচেষ্ট থাকে। কারণ, সত্য

ও কল্যাণের যে নীতিমালার ওপর সে প্রতিষ্ঠিত, সে নীতিমালাই তাকে এ মহৎ কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। ভালো কাজ করার জন্য সে সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় বসে থাকে না। যখন তখন, যেখানে সেখানে সে ভালো কাজ করে চলে। কারণ, সে বিশ্বাস করে, ভালো কাজ সফলতা বয়ে আনে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

‘আর সৎকাজ সম্পাদন করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।’^{৫০৮}

প্রকৃত মুসলমান ভালো কাজের দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয়। কারণ, সে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, ভালো কাজে তার প্রতি কদমে কদমে সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ، قَالَ:
تَعْدِلُ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا،
أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، قَالَ: وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ
خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ

‘প্রত্যেক ব্যক্তির শরীরের প্রতিটি গ্রন্থির ওপর প্রতিদিনের জন্য সদকা ধার্য রয়েছে। দুই ব্যক্তির মধ্যে ইনসাফ করে দেওয়া একটি সদকা। কোনো ব্যক্তিকে বাহনের ওপর আরোহণে সাহায্য করা অথবা তার মালামাল বাহনের ওপর তুলে দেওয়া একটি সদকা। তিনি আরও বলেন, সকল প্রকার ভালো কথাই এক একটি সদকা। নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদে যেতে যতটি পদক্ষেপ ফেলা হয় তার প্রতিটিই এক একটি সদকা এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করাও একটি সদকা।’^{৫০৯}

৫০৮. সূরা আল-হাজ : ৭৭

৫০৯. সহিছ মুসলিম : ১০০৯



মুসলমানের সামাজিক কল্যাণমূলক কাজ আর নামাজের জন্য মসজিদে গমন করার মধ্যে কী অদ্ভুত মিল! এজন্যই রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, দ্বীন মানবজাতির দুনিয়া ও আখিরাতের সকল বিষয়ের কল্যাণ ও যথার্থতার জন্য প্রবর্তিত হয়েছে। দ্বীন মানুষের দুনিয়া ও আখিরাত; একাকী জীবন ও সামষ্টিক জীবন—সকল ক্ষেত্রেই কার্যকর। তাই পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের ওপর চলে এমন প্রকৃত মুসলমানের সকল কাজই ইবাদতে পরিণত হয়, যখন সে তা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তে করে।

ফলে প্রকৃত মুসলমানের সামনে কল্যাণের অনেক দরজা উন্মুক্ত থাকে, যেটা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করতে পারে সে। তার ওপর আল্লাহর রহমতের ছায়া বিস্তৃত থাকে। অর্জন করতে পারে অনেক অনেক সাওয়াব।

জাবির থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

‘প্রত্যেক ভালো কাজ সদকা।’^{৫১০}

আবু হুরাইরা থেকে রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন :

الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ

‘ভালো কথা সদকা।’^{৫১১}

শুধু তাই নয়, যে ব্যক্তি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ওপর সোপর্দ করে দিয়েছে এবং নিয়তকে বিশুদ্ধ করে নিয়েছে, সে ভালো কাজ করতে পারলে তো সাওয়াব পায়-ই, করতে না পারলেও সাওয়াব পায়। তবে শর্ত হলো, মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

এ সম্পর্কে আবু মুসা থেকে সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

«عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ» قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ «يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ
فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ» قَالَ قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: «يُعِينُ

৫১০. সহিহুল বুখারি : ৬০২১

৫১১. সহিহুল বুখারি (তালিক) : بَابُ طَيْبِ الْكَلَامِ উত্তম কথার অধ্যায়-

ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفِ» قَالَ قِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِيعْ؟ قَالَ: «يَأْمُرُ
بِالْمَعْرُوفِ أَوْ الْخَيْرِ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: «يُمْسِكُ عَنِ
الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ»

‘প্রত্যেক মুসলমানের ওপর সদকা ওয়াজিব। সাহায্যে কিরাম
বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, যদি কেউ সদকা করার সামর্থ্য না
রাখে, তখন কী করবে? বললেন, সে হাত দ্বারা কাজ করবে। এতে
তার উপকারও হবে এবং সদকা করারও সামর্থ্য আসবে। তারা
বললেন, যদি তারও সামর্থ্য না রাখে; অথবা বললেন, যদি তা-ও
করতে না পারে, তখন কী করবে? বললেন, সে অভাবী দুঃখী
মানুষকে সাহায্য করবে। তারা বললেন, যদি তা-ও না করে, তখন
কী করবে? বললেন, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ
থেকে নিষেধ করবে। তারা বললেন, যদি তা-ও সম্ভব না হয়, তখন
কী করবে? তিনি বললেন, সে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে।
কারণ এটাও তার জন্য সদকা হবে।’^{৫১২}

রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রথমে ‘সকল মুসলমানের ওপর সদকা ওয়াজিব’ বলে কথা
শুরু করলেন। তারপর একের পর এক ভালো ও নেক আমলের ফিরিস্তি তুলে
ধরলেন, যেগুলোর মাধ্যমে বান্দা সে সদকার ক্ষতিপূরণ করতে পারবে।
সুতরাং মুসলমানের ওপর সদকা করা ওয়াজিব মানে তার ওপর সমাজে বিভিন্ন
কল্যাণমূলক কাজ করা ওয়াজিব। যদি তা করতে সক্ষম না হয়, কিংবা কোনো
কারণে না করে, তাহলে সে অন্তত তার জিহ্বা ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে
খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে। এটাও তার সদকার ক্ষতিপূরণ করবে।
এজন্যই বলা হয়, প্রকৃত মুসলমানের কর্মতৎপরতা (অর্থাৎ ভালো কাজ করা)
এবং অবসর (অর্থাৎ খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকা)—উভয়টিই সমাজের
জন্য কল্যাণকর।

এজন্যই তো রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রকৃত মুসলমানের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন :

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

‘প্রকৃত মুসলমান ওই ব্যক্তি, যার জিহ্বা ও হাত (-এর অনিষ্ট) থেকে মুসলমানরা নিরাপদ থাকে।’^{৫১৩}

এতটুকুই নয় শুধু, রাসুলুল্লাহ ﷺ তো সেই ব্যক্তিকেই সমাজের সর্বোত্তম মুসলমান বলেছেন, যার থেকে কল্যাণের আশা করা যায় এবং যার অকল্যাণ থেকে নিরাপদ থাকা যায়।

হাদিসটি ইমাম আহমাদ ﷺ বর্ণনা করেছেন :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى نَاسٍ جُلُوسٍ، فَقَالَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِكُمْ مِنْ شَرِّكُمْ؟» فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَأَعَادَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ، وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ، وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ، وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ»

‘বসে থাকা একদল লোকের সামনে দাঁড়িয়ে নবিজি ﷺ বললেন, আমি কি তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম ব্যক্তি ও সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি কে, তা জানিয়ে দেবো? লোকজন চুপ করে রইল। নবিজি ﷺ প্রশ্নটি একে একে তিনবার করলেন। তারপর তাদের একজন বলল, অবশ্যই জানাবেন হে আল্লাহর রাসুল। তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম হলো সে ব্যক্তি, যার কল্যাণের আশা করা যায় এবং অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকা যায়। আর তোমাদের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট হলো, যার কল্যাণের আশা করা যায় না এবং অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকা যায় না।’^{৫১৪}

মুসলমান সমাজের কল্যাণ ব্যতীত অন্য কিছু করে না। তা করতে না পারলে অন্তত খারাপ কাজ ও কাউকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকে। আর প্রকৃত মুসলমান সব সময় ভালো ও কল্যাণকর কাজ করে। খারাপ কোনো কাজ তার থেকে প্রকাশ পায় না। কারণ, সে সব সময় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এ হাদিসের ওপর আমল করে :

৫১৩. সহিহুল বুখারি : ১০, সহিহ মুসলিম : ৪১

৫১৪. মুসনাদু আহমাদ : ৮৮১২

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

‘তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না নিজের জন্য যা পছন্দ করো, অপর মুমিন ভাইয়ের জন্যও তাই পছন্দ করবে।’^{৫১৫}

যে মুসলমান নিজের জন্য যা পছন্দ করে, অন্যের জন্যও তা পছন্দ করে অর্থাৎ নিজের উপকার লাভের জন্য ও নিজের কষ্ট দূর করার জন্য যেমন চেষ্টা করে, তেমনই অন্য ভাইয়ের উপকারের জন্য এবং তাদের কষ্ট দূর করার জন্যও চেষ্টা করে, সে ইসলামি সমাজে আলাদা মর্যাদায় ভূষিত হয়। মুসলমান ভাইদের প্রতি তার এ খিদমতের কারণে স্বয়ং আল্লাহকেই সে তার সাহায্যকারী হিসাবে পেয়ে যায়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

لَا يَزَالُ اللَّهُ فِي حَاجَةِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ

‘আল্লাহ তাআলা ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার প্রয়োজনে পাশে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার ভাইয়ের প্রয়োজনে পাশে থাকে।’^{৫১৬}

অন্য হাদিসে ইরশাদ করেন :

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

‘মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। একজন আরেকজনের প্রতি জুলুম করতে পারে না এবং শত্রুর হাতে তুলে দিতে পারে না। যে ব্যক্তি তার (মুসলমান) ভাইয়ের প্রয়োজনে পাশে থাকবে, তার প্রয়োজনে আল্লাহ তার পাশে থাকবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের একটি

৫১৫. সহিহুল বুখারি : ১৩

৫১৬. আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি : ৪৮০১



কষ্ট দূর করে দেবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিনের কষ্টসমূহ থেকে তার একটি কষ্ট দূর করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন।^{৫১৭}

অন্য হাদিসে বলেন :

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

‘যে ব্যক্তি কোনো মুমিনের দুনিয়ার কষ্টসমূহ থেকে একটি কষ্ট দূর করে দেবে, আল্লাহ তাআলা তার কিয়ামতের কষ্টসমূহ থেকে একটি কষ্ট দূর করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত মানুষের জন্য সহজ করবে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়া ও আখিরাতে তার জন্য সহজ করবেন।’^{৫১৮}

রাসুলুল্লাহ ﷺ সমাজে পারস্পরিক সাহায্য করার ফজিলতকে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এটাকে তিনি দীর্ঘ ইতিকারের চেয়েও উত্তম বলেছেন। যেমন ইবনে আব্বাস ؓ রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَنْ مَشَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنْ اعْتِكَافٍ عَشْرِ سِنِينَ، وَمَنْ اعْتَكَفَ يَوْمًا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ ثَلَاثَ خَنَادِقَ، كُلُّ خَنْدَقٍ أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ

‘যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য হাঁটবে, এ হাঁটা তার জন্য বিশ বছর ইতিকারে অবস্থান করার চেয়েও উত্তম। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে একদিন ইতিকার করবে, আল্লাহ

৫১৭. সহিহ মুসলিম : ২৫৮০

৫১৮. সহিহ মুসলিম : ২৬৯৯

তাআলা তার ও জাহান্নামের মাঝে তিন পরিখার আড়াল করে দেন।
প্রত্যেক পরিখার পরিধি পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের দূরত্বের সমান।’^{৫১৯}

শক্তি ও সামর্থ্য থাকার পরেও মানুষের সেবা করতে বিরক্তিবোধ করলে
নিয়ামত চলে যাওয়ার হুমকি এসেছে। যেমন ইবনে আব্বাস ؓ-এর হাদিসে
বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

‘যে বান্দাকে আল্লাহ তাআলা কোনো নিয়ামত দান করলেন, অতঃপর তা
পূর্ণ করলেন, তারপর তার সামনে মানুষের প্রয়োজন পেশ করা হলে সে
তাতে বিরক্তিবোধ করল, সে যেন তার সেই নিয়ামত চলে যাওয়ার জন্য
প্রস্তুত করে দিল।’^{৫২০}

সহিহ হাদিসে জান্নাতবাসীদের সুখের যেসব চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে, তন্মধ্যে
একটি হলো, এক ব্যক্তি জান্নাতের নিয়ামত ও সুখের ওপর গড়াগড়ি খাচ্ছে।
কারণ, সে মুসলমানদের রাস্তা থেকে একটি গাছ কেটে ফেলেছিল, যে গাছ
থাকার কারণে মুসলমানদের পথ চলতে কষ্ট হচ্ছিল।

হাদিসটি হলো :

لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ، فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ،
كَأَنَّهُ تُؤْذِي النَّاسَ

‘আমি এক ব্যক্তিকে দেখলাম, সে জান্নাতে (নিয়ামতসমূহের ওপর)
গড়াগড়ি খাচ্ছে। এটা (নিয়ামতপ্রাপ্তি) রাস্তার ওপর থেকে এমন একটি
গাছ কাটার প্রতিদানস্বরূপ, যেটার কারণে মুসলমানদের কষ্ট হতো।’^{৫২১}

কাজের মাধ্যমে মুসলমানদের উপকার করার একটি পদ্ধতি হলো, তাদের
থেকে কষ্ট দূর করে দেওয়া। যে ব্যক্তি মুসলমানদের থেকে কষ্ট দূর করে
এবং যে তাদের উপকার করে—উভয়জনই সমান। উভয়জনই মুসলমানদের

৫১৯. আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি : ৭৩২৬

৫২০. আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি : ৭৫২৯

৫২১. সহিহ মুসলিম : ১৯১৪

উপকার করে। সাওয়াব, রহমত ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের ক্ষেত্রে উভয়জন বরাবর। এজন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশনার মধ্যে উভয় বিষয় উঠে এসেছে। সমাজের উন্নতি ও সদস্যদের পারস্পরিক হৃদয়তা উভয় বিষয়ের ওপরই নির্ভর করে।

মুসলমানদের কষ্ট দূর করা সম্পর্কে একাধিক হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো, আবু বারজা ؓ বর্ণনা করেন :

قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَلَّمَنِي شَيْئًا أَنْتَفِعُ بِهِ، قَالَ: اغْزِلِ الْأَذَى، عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ

‘আমি বললাম, হে আল্লাহর নবি, আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন, যা থেকে আমি উপকৃত হতে পারব। তিনি বললেন, মুসলমানদের রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করো।’^{৫২২}

আরেক রিওয়াযাতে বর্ণিত হয়েছে :

يَا رَسُولَ اللَّهِ ذُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ؟ قَالَ: أَمِطِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ

‘হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে এমন আমল বাতলে দেন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। তিনি বললেন, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো।’

যে সমাজ ইসলামের দেওয়া রূপরেখা অনুযায়ী পরিচালিত হয় এবং যে সমাজের প্রতিজন সদস্য বিশ্বাস করে যে, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেললে আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হয় এবং জান্নাত অর্জিত হয়, সে সমাজের চেয়ে উন্নত আর কোনো সমাজ কি থাকতে পারে? নিঃসন্দেহে ইসলামি সমাজই পৃথিবীর বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ। কারণ, এ সমাজের সদস্যরা রাস্তায় ময়লা-আবর্জনা, খাবারের পচা উচ্ছিষ্ট ইত্যাদি ফেলার কথা কল্পনাই করতে পারে না, যে বিষয়গুলোর কারণে বর্তমান সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা কর্তৃপক্ষ লোকদের শাস্তি দিয়ে থাকে এবং রাস্তা থেকে এসব নোংরা-আবর্জনা সরানোর জন্য বিরাট অঙ্কের ব্যয় বহন করে।

৫২২. সহিহ মুসলিম : ২৬১৮

আল্লাহর দেওয়া রূপরেখা অনুযায়ী পরিচালিত সমাজ আর অন্যান্য সমাজের মাঝে কত বড় পার্থক্য! ইসলামি সমাজে মানুষ আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে এবং সাওয়াবের আশায় রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলে। আর অন্যান্য সমাজে লোকজন নিজেরাই বাড়ির জানালা ও ছাদ থেকে ময়লা-আবর্জনা ইত্যাদি কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তায় নিক্ষেপ করে।

পাশ্চাত্য সমাজ এসব বিষয়ের জন্য আইন প্রণয়ন করেছে এবং জনগণের মনে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তৈরি করার ও তা বাস্তবায়ন করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে ইসলামি সমাজে মানুষের মনে আইনের প্রতি যে শ্রদ্ধাবোধ আছে এবং যে রূপ আন্তরিকতার সহিত তারা তা বাস্তবায়ন করে, পাশ্চাত্য সমাজে তেমনটি পরিলক্ষিত হয় না। কারণ, ইসলামি সমাজের সদস্যরা বিশ্বাস করে যে, এ আইন লঙ্ঘন করা মানে আল্লাহর নাফরমানি করা। এ আইন লঙ্ঘন করলে কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে, যেদিন ধন-সম্পদ আর সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না। তবে যে পরিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে উপস্থিত হবে, সে ব্যতিক্রম। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য সমাজের সদস্যরা আইন লঙ্ঘন করাকে এত বড় গুনাহ বা অপরাধ মনে করে না। আইন অমান্য করতে গেলে তাদের বিবেক কখনো তিরস্কার করে, কখনো করে না। শেষমেষ অবশ্য আইন অমান্য করেই ফেলে। বিশেষ করে কর্তৃপক্ষ যদি এ ক্ষেত্রে একটু নমনীয় হয়, তাহলে তো কথাই নেই।

মুসলমানদের মাঝে মীমাংসা করে দেওয়ার চেষ্টা করে

মুসলমানদের মাঝে মনোমালিন্য দেখা দিলে মীমাংসা করে দেওয়া উপকার করা এবং কষ্ট দূর করে দেওয়ার-ই প্রকারভুক্ত। এ সম্পর্কিত আয়াত ও হাদিস অসংখ্য রয়েছে, যার সবগুলো এখানে একত্র করা সম্ভব নয়। তন্মধ্যে একটি হলো, আল্লাহ তাআলা বলেন :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ



‘যদি মুমিনদের দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবে। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের ওপর চড়াও হয়, তবে তোমরা আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি ফিরে আসে, তবে তোমরা তাদের মধ্যে ন্যায্যানুগ পন্থায় মীমাংসা করে দেবে এবং ইনসাফ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন।’^{৫২৩}

আয়াতটি লড়াইরত দুই দলের মাঝে সন্ধি করে দেওয়া সম্পর্কে আল্লাহর চূড়ান্ত ফয়সালা। এমনকি সন্ধি ও মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য অত্যাচারী দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উপনীত হতে হলেও তা করতে হবে।

এরপর মুসলমানদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের ঘোষণা দিয়ে বলেন :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

‘মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই। অতএব তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে, যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও।’^{৫২৪}

রাসুলুল্লাহ ﷺ দাওয়াতের কষ্ট ও ব্যস্ততার ফাঁকেও লড়াইরত দুই দলের মাঝে মীমাংসা করে দেওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করতেন। এর মাধ্যমে মুসলমানদের সামনে তিনি মীমাংসা করে দেওয়ার আবশ্যিকতা স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

এ সম্পর্কে আবুল আব্বাস সাহল বিন সাদ সায়িদি ৞ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট খবর পৌঁছল যে, বনু আমর বিন আওফের মাঝে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয়েছে। তখন তিনি কয়েকজন লোক সাথে নিয়ে তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য বের হলেন। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত ঘটনা একটি দীর্ঘ সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে।

৫২৩. সূরা আল-হুজুরাত : ৯

৫২৪. সূরা আল-হুজুরাত : ১০

রাসুলুল্লাহ ﷺ মুমিনদের মাঝে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সৃষ্টি করার সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন। পারস্পরিক সুসম্পর্ক ও বুঝাপড়ার মাধ্যমে জীবনযাপন করার ব্যাপারে উৎসাহ দিতেন। এজন্য তিনি কথা ও কাজের মাধ্যমে মুসলমানদের মাঝে ভালো কাজ, উদারতা, নম্রতা ইত্যাকার উত্তম গুণাবলি সৃষ্টি করার চেষ্টা করতেন। তারবিয়াতের সময় এ দিকটির প্রতি খুব গুরুত্ব দিতেন। হঠাৎ রাগান্বিত হওয়া, কঠোরতা ইত্যাদি বিষয়কে মুচকি হাসি, উদারতা ইত্যাদি দ্বারা পরিবর্তন করে দিতেন।

এ সম্পর্কে আয়িশা রা. থেকে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন :

سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ غَالِيَةً أَصْوَاتُهُمَا، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْآخَرَ، وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَيْءٍ، وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَفْعَلُ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَيُّنَ الْمُتَأَلَّى عَلَى اللَّهِ، لَا يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ؟ فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبُّ

‘রাসুলুল্লাহ ﷺ দরজার পাশে দুই বিবাদমান ব্যক্তির উঁচু স্বর শুনতে পেলেন। তাদের একজন অপরজনকে ঋণের কিছু অংশ ছেড়ে দিতে বলছে এবং তার সহানুভূতি কামনা করছে। প্রত্যুত্তরে অপরজন বলছে, আল্লাহর শপথ! আমি তা করব না। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের নিকট বেরিয়ে আসলেন এবং বললেন, সে লোকটি কোথায় যে আল্লাহর শপথ করে বলছে যে, সে ভালো কাজ করবে না? প্রতিপক্ষ লোকটি (লজ্জা পেয়ে) বলল, আমি, হে আল্লাহর রাসুল! (আমার ভুল হয়ে গেছে; অতএব) সে যা চায় তা-ই হবে।’^{৫২৫}

মানুষের মাঝে মীমাংসা করে দেওয়া সহজ করার জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ এমন অনেক কথার অনুমতি দিয়েছেন, যেসব কথায় ঘৃণাপূর্ণ ও কঠোর অন্তরকে নরম করার জন্য একটু বাড়িয়ে বলা হয়। এসব কথাকে নিষিদ্ধ মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত করেননি। যারা এ উদ্দেশ্যে একটু বাড়িয়ে বলে তাদের মিথ্যাবাদী



সাব্যস্ত করেননি। উম্মে কুলসুম বিনতে উকবা বিন আবু মুআইত ؓ-এর হাদিসে এমনটিই বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ؐ-কে বলতে শুনেছি, :

لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَنْبِي خَيْرًا، أَوْ يَقُولُ خَيْرًا

‘ওই ব্যক্তি মিথ্যুক নয়, যে মানুষের মাঝে মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য বাড়িয়ে বাড়িয়ে উত্তম কথা বলে।’^{৫২৬}

মুসলিমের রিওয়াযাতে অতিরিক্ত এসেছে :

وَلَمْ أَسْمَعْ يُرَخَّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الْحَرْبُ، وَالْإِصْلَاحُ بَيْنَ النَّاسِ، وَحَدِيثُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَحَدِيثُ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا

‘আমি রাসুলুল্লাহ ؐ-কে তিনটি জায়গা ব্যতীত আর কোনো জায়গায় মিথ্যা বলার অনুমতি দিতে দেখিনি। সে জায়গাগুলো হলো—যুদ্ধ, মানুষের মাঝে মীমাংসা করে দেওয়া এবং স্বামী তার স্ত্রীকে বা স্ত্রী তার স্বামীকে (ভালোবাসা সৃষ্টি বা বিশেষ প্রয়োজনে মিথ্যা) কোনো কথা বলা।’^{৫২৭}

সত্যের দিকে আহ্বান করে

প্রকৃত মুসলমান দ্বীনের দাওয়াত দেওয়াকে নিজের ব্রত বানিয়ে নেয়। সব সময় সে দাওয়াত দেয়। কোনো বিপদ বা বাধা তাকে দাওয়াতের এ মেহনত থেকে বিরত রাখতে পারে না। একনিষ্ঠ দায়ীদের জন্য আল্লাহ যে পুরস্কার তৈরি করে রেখেছেন, তার আশায় সে অবিরাম দাওয়াতের মেহনতে লিপ্ত থাকে।

দায়ীদের পুরস্কার সম্পর্কে হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ ؐ আলি ؓ-কে বলেন :

فَوَاللَّهِ لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ

৫২৬. সহিহুল বুখারি : ২৬৯২

৫২৭. সহিহ মুসলিম : ২৬০৫

‘আল্লাহর কসম! তোমার মাধ্যমে আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে হিদায়াত দান করা তোমার জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম।’^{৫২৮}

পথচ্যুত ব্যক্তির কানে দ্বীনের প্রকৃত দায়ি যখন উত্তম কথা শোনায়ে এবং এর মাধ্যমে তার অন্তরে হিদায়াতের বীজ বপিত হয়, তখন দায়ি এমন সাওয়াব পায়, যা লাল উটের চেয়ে বেশি মূল্যবান। তখনকার সময়ে লাল উট সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ বলে গণ্য করা হতো। এ ছাড়াও হিদায়াতপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেসব সাওয়াব অর্জন করতে থাকবে, দায়িও তার অনুরূপ সাওয়াব পেতে থাকবে।

এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ
ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا .

‘যে হিদায়াতের পথের দিকে দাওয়াত দেয়, সে তার অনুসারীদের (যারা তার দাওয়াত পেয়ে হিদায়াতের পথে এসেছে) সাওয়াবের অনুরূপ সাওয়াব পাবে। কিন্তু এতে তাদের সাওয়াব থেকেও কোনো অংশ কমবে না।’^{৫২৯}

দায়িদের ধৈর্য ও আল্লাহর রাস্তার কঠিন পরীক্ষায় দৃঢ়পদ থাকা সত্যিই ঈর্ষণীয়। তারা নিজেদের সম্পদ ও সময় পথচ্যুত ব্যক্তিদের দাওয়াতের পেছনে ব্যয় করে চলে। এজন্যই তাদের প্রতি ঈর্ষা করতে রাসুলুল্লাহ ﷺ উৎসাহিত করেছেন।

ইরশাদ হয়েছে :

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكْتِهِ فِي
الْحَقِّ، وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

‘কেবল দুই ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষা করা যায়। এক. যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন, আর সে তা হকের পথে ব্যয় করে। দুই.

৫২৮. সহিহুল বুখারি : ২৯৪২

৫২৯. সহিহ মুসলিম : ২৬৭৪

যাকে আল্লাহ হিকমত বা প্রজ্ঞা দান করেছেন, আর সে তা দ্বারা ফয়সালা করে এবং লোকজনকে তা শিক্ষা দেয়।'৫৩০

প্রকৃত মুসলমান দাওয়াতের জন্য দ্বীনি ইলমের কোনো অংশকেই ছোট মনে করে না। সত্যের একটি বাণীও যদি তার নিকট পৌঁছে, তা সে অপরজনের কাছে পৌঁছে দেয়। কারণ, রাসুলুল্লাহ ﷺ এমনই নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি বলেন :

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

‘তোমরা আমার নিকট থেকে লোকদের মাঝে প্রচার করো; যদিও তা একটি আয়াতই হোক।’৫৩১

এর কারণ হলো, অনেক সময় মানুষের হিদায়াত একটিমাত্র আয়াতের ওপর নির্ভর করে থাকে। যখনই সে আয়াত উক্ত ব্যক্তির নিকট পৌঁছে যায়, তখনই তার অন্তর হিদায়াতের আলোয় আলোকিত হয়ে যায়।

প্রকৃত মুসলমান পরোপকারী হয়। সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে অন্যের জন্যও তা পছন্দ করে। সব সময় মুসলমানদের সার্বিক অবস্থা নিয়ে ফিকির করে। এভাবেই সে আল্লাহ, রাসুল, মুসলমানদের নেতৃস্থানীয় লোক এবং সাধারণ মুসলমানদের প্রতি কল্যাণকামী সাব্যস্ত হয়। যেমনটি উপরোল্লিখিত হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। এ বোধ থেকেই সে নিজের হিদায়াতের পাশাপাশি পরিবারের অন্যান্য লোকসহ সকল মানুষের হিদায়াতের ফিকির করে। কারণ, সে নিজের ও পরিবারের জন্য যেমন জান্নাত পছন্দ করে, তেমনই সকল মানুষের জন্যও জান্নাত পছন্দ করে। এজন্য সে সর্বদা তাদের এমন বিষয়ের প্রতি আহ্বান করতে থাকে, যা তাদের জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবে। একজন দায়ির মাঝে এ বোধ ও গুণাবলি থাকে বলেই তারা অন্যদের চেয়ে আলাদা মর্যাদার অধিকারী হয়। দাওয়াত দেওয়া এতই উত্তম ও উন্নত কাজ যে, স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ﷺ দায়িদের প্রশংসা ও তাদের জন্য দুআ করেছেন।

৫৩০. সহিহুল বুখারি : ১৪০৯, সহিহ মুসলিম : ৮১৬

৫৩১. সহিহুল বুখারি : ৩৪৬১

ইরশাদ করেছেন :

نَظَرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَغَهُ كَمَا سَمِعَ، فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ.

‘আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তিকে উজ্জ্বল করুন, যে আমার কাছ থেকে কোনোকিছু শুনে তা যেভাবে শুনেছে, সেভাবেই অন্যের নিকট পৌঁছে দেয়। কারণ, যাদের নিকট পৌঁছে দেওয়া হয়, তাদের মাঝে এমন অনেক ব্যক্তিও থাকতে পারে, যারা আমার থেকে সরাসরি শ্রবণকারী ব্যক্তির চেয়ে বেশি সংরক্ষণ করার ক্ষমতা রাখে।’^{৫৩২}

ইসলামি সমাজটাই এমন যে, সেখানে একজনের প্রতি অপরজনের দায়িত্ব রয়েছে। এ ছাড়াও প্রত্যেককে আল্লাহর সামনে তাদের এ দায়িত্বের হিসাব দিতে হবে। কিন্তু এ দায়িত্ববোধ আজ মুসলমানদের মাঝে নেই বিধায় তাদের সমাজে শান্তি উধাও হয়ে গেছে। আজ যদি তাদের মাঝে সামাজিক সে দায়িত্ববোধ থাকত এবং আল্লাহর সামনে জবাবদিহির ভয় থাকত, তাহলে মুসলমানদের আজকের এ অধঃপতন হতো না। নিজেদের দীন থেকেও তারা এত দূর সরে আসত না।

এজন্যই দাওয়াতের উপায়-উপকরণ থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি দাওয়াত দেওয়া থেকে বিরত থাকে এবং আল্লাহ তাআলা তাকে যে ইলম দান করেছেন, তা অন্যের নিকট থেকে গোপন করে (অর্থাৎ অন্যদের শিক্ষা না দিয়ে) পার্থিব মর্যাদাবৃদ্ধি ও ধ্বংসশীল দুনিয়ার সম্পদ অর্জনের মাধ্যম বানায়, তার জন্য কঠিন শাস্তির হুমকি রয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرَفَ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. يَغْنِي رِيحَهَا

‘যে ব্যক্তি এমন জ্ঞান অর্জন করেছে, যে ইলম দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায়, কিন্তু সে তা অর্জন করেছে কেবল দুনিয়াবি সম্পদ

অর্জন করার জন্য, সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের সুঘাণও পাবে না।’^{৫৩৩}

অন্য হাদিসে ইরশাদ করেছেন :

مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

‘কারও কাছ থেকে ইলম জানতে চাওয়া হলো, আর সে (জানা সত্ত্বেও) তা গোপন করল, কিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের লাগাম পরানো হবে।’^{৫৩৪}

সৎ কাজের আদেশ করে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে

আল্লাহর দ্বীনের দিকে দাওয়াত দেওয়ার অন্যতম দিক হলো সৎ কাজের আদেশ দেওয়া আর মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা। এজন্য প্রকৃত দায়ি মুসলমান হিকমত ও বুদ্ধিবৃত্তিক উপায়ে সৎ কাজের আদেশ দেয় আর মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। সুযোগ ও সামর্থ্য অনুযায়ী পাপাচার বা মন্দ কাজ দূরীভূত করার চেষ্টা করে। পাপাচার ও মন্দ কাজ দূর করতে গিয়ে নতুন ফিতনা সৃষ্টি করে না। সামর্থ্য থাকলে হাত দিয়ে দূরীভূত করে। আর যদি সে পরিমাণ সামর্থ্য না থাকে, তাহলে জবান ও কথার মাধ্যমে তা প্রতিহত করে। তারও সামর্থ্য না থাকলে অন্তর দিয়ে অস্বীকার ও ঘৃণা করে এবং তা সমূলে মূলোৎপাটন করার প্রস্তুতি নিতে থাকে। এটাই রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এ হাদিসটির মর্ম :

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

‘তোমাদের কেউ যদি গর্হিত কাজ দেখতে পায়, সে যেন হাত দিয়ে তা প্রতিরোধ করে। যদি সে সামর্থ্য না থাকে, তাহলে জবান দ্বারা প্রতিহত করে। তারও সামর্থ্য না থাকলে অন্তর দ্বারা যেন ঘৃণা করে। আর এটা হচ্ছে ইমানের দুর্বলতম স্তর।’^{৫৩৫}

৫৩৩. সুনানু আবি দাউদ : ৩৬৬৪

৫৩৪. সুনানু আবি দাউদ : ৩৬৫৮

৫৩৫. সহিহ মুসলিম : ৪৯

আসলে মুসলমান যখন সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে, তখন প্রকৃতপক্ষে সে মুসলমানদের কল্যাণ কামনা করে। আর দ্বীন হলো কল্যাণ কামনা করা। যেহেতু কল্যাণকামনার নামই দ্বীন। তাই সৎ কাজের আদেশ আর মন্দ কাজের নিষেধ করে কল্যাণকামনা বাস্তবায়ন করতে হবে।

এ কল্যাণকামনা সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

«الدِّينُ النَّصِيحَةُ» قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأُئِمَّةِ
الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»

‘দ্বীন হলো কল্যাণকামিতা। আমরা (উপস্থিত সাহাবায়ে কিরাম) বললাম, কার জন্য? তিনি বললেন, আল্লাহ, তাঁর কিতাব, রাসুল, নেতৃস্থানীয় মুসলমান এবং সকল সাধারণ মুসলমানের জন্য।’^{৫৩৬}

এ কল্যাণকামিতা এবং সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ করার গুণ প্রকৃত স্বাধীনচেতা মুসলমানকে জালিমের সামনে প্রকাশ্যে সত্যের বাণী উচ্চারণ করার সাহস জোগায়। মুসলিম উম্মাহ শৌর্যবীর্য নিয়ে বেঁচে থাকার কারণও এমন স্বাধীনচেতা ব্যক্তিত্বদের অস্তিত্ব, যারা জালিমের সামনে বুক চেতিয়ে বলতে পারে, ‘তুমি জালিম’। উম্মাহর মধ্যে যখন এ ধরনের বীর-সাহসীরা আর থাকবে না, তখন তাদের আপন অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হবে, তাদের আর কোনোরূপ সাহায্য করা হবে না।

এটাই রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এ হাদিসটির মর্ম :

إِذَا رَأَيْتَ أُمَّتِي تَهَابُ الظَّالِمَ أَنْ تَقُولَ لَهُ: أَنْتَ ظَالِمٌ، فَقَدْ تُودَّعَ مِنْهُمْ

‘যখন তুমি উম্মাতকে দেখবে, তারা জালিমকে জালিম বলতে ভয় পাচ্ছে, তখন (জেনে নিও) তাদের (আসমানি নুসরাত ও সাহায্য করা থেকে) বিদায় জানানো হবে।’^{৫৩৭}

৫৩৬. সহিহ মুসলিম : ৫৫

৫৩৭. মুসনাদু আহমাদ : ৬৭৮৪



রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অনেক হাদিস মুসলমানদের অন্তরে বাতিলের বিরুদ্ধে সাহসিকতার বীজ বুনে দেয়। তাদের এ বিষয়ে নিশ্চয়তা দেয় যে, জালিম বাতিলের সামনে সাহসিকতা দেখালে কারও রিজিক কমে যায় না এবং কারও মৃত্যু ত্বরান্বিত হয় না।

একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে :

لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ رَهْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقِّ إِذَا رَأَاهُ، أَوْ يُذَكِّرَ بِعَظِيمٍ، فَإِنَّهُ لَا يَقْرَبُ مِنْ أَجَلٍ، وَلَا يُبَاعِدُ مِنْ رِزْقٍ

‘মানুষের ভয় যেন তোমাদেরকে সত্য বলা থেকে বিরত না রাখে। কেননা, তা মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে না এবং রিজিক থেকেও দূরে রাখে না।’^{৫৩৮}

অপর একটি হাদিসে বর্ণিত হয়েছে :

قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ النَّاسِ أَقْرَوُهُمْ وَأَتْقَاهُمْ وَأَمْرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَأَنْتَهُاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأَوْصَلُهُمْ لِلرَّحِمِ»

‘নবিজি ﷺ মিম্বরে উপবিষ্ট ছিলেন, ইতিমধ্যে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি, যে তাদের মাঝে শ্রেষ্ঠ কারি, শ্রেষ্ঠ মুত্তাকি, সৎ কাজের আদেশ আর মন্দ কাজের নিষেধের ক্ষেত্রে সবার অগ্রগামী এবং সবচেয়ে বেশি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষাকারী।’^{৫৩৯}

প্রকৃত মুসলমানদের অন্তরে ইসলামি সমাজে সৎ কাজের আদেশ, মন্দ কাজের নিষেধ প্রতিষ্ঠা এবং বাতিলের বিরুদ্ধে ও মজলুমের পক্ষে সাহসী পদক্ষেপ নেওয়ার শক্ত মনোবল থাকতে হবে।

৫৩৮. আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি : ২৮০৪

৫৩৯. মুসনাদু আহমাদ : ২৭৪৩৪

এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَا مِنْ أَمْرٍ يَخْذُلُ أَمْرًا مُسْلِمًا عِنْدَ مَوْطِنٍ تُنْتَهَكَ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَضُ فِيهِ مِنْ عَرَضِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نَصْرَتَهُ، وَمَا مِنْ أَمْرٍ يَنْصُرُ أَمْرًا مُسْلِمًا فِي مَوْطِنٍ يُنْتَقَضُ فِيهِ مِنْ عَرَضِهِ وَيُنْتَهَكَ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نَصْرَتَهُ

‘যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে এমন জায়গায় সাহায্য করে না, যেখানে তার ইজ্জত-আবরু ও মর্যাদা লঙ্ঘিত হয়, তাকে আল্লাহ তাআলা এমন জায়গায় সাহায্য করবেন না, যেখানে সে আল্লাহর সাহায্য কামনা করবে। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানকে এমন জায়গায় সাহায্য করে, যেখানে তার ইজ্জত-আবরু ও মর্যাদা লঙ্ঘিত হয়, তাকে আল্লাহ তাআলা এমন জায়গায় সাহায্য করবেন, যেখানে সে তাঁর সাহায্য কামনা করবে।’^{৫৪০}

এজন্য বিচার করার অধিকারপ্রাপ্ত প্রকৃত মুসলমান বাতিলের মোকাবেলায় চুপ থাকে না। সত্যকে সাহায্য না করে বসে থাকে না। সমাজে জুলুমের প্রসার সে একদম সহ্য করতে পারে না। সমাজ থেকে অশ্লীলতা ও পাপাচার দূরীকরণে সর্বাত্মক চেষ্টা করে। কারণ, সমাজ থেকে পাপাচার ও অশ্লীলতা দূরীকরণের চেষ্টা করা না হলে পুরা সমাজের ওপর আল্লাহর আজাব নেমে আসবে।

কাইস বিন আবু হাজিম ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন :

قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَأُونَ هَذِهِ الْآيَةَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: ১০০]، وَإِنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَرَ لَا يُغَيِّرُونَهُ، أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللَّهُ بِعِقَابِهِ

৫৪০. মুসনাদু আহমাদ : ১৬৩৪৮



‘আবু বকর ﷺ মিসরে আরোহণ করে আল্লাহর হামদ ও প্রশংসা করে বললেন, হে লোকসকল, তোমরা এ আয়াতটি পড়ে থাকো :
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ
 “হে মুমিনগণ, إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ”
 তোমরা নিজেদের চিন্তা করো। তোমরা যখন সৎ পথে রয়েছ, তখন কেউ পথভ্রান্ত হলে তাতে তোমাদের কোনো ক্ষতি নাই। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদের বলে দেবেন, যা কিছু তোমরা করতে।” [সূরা আল-মায়িদা : ১০৫]
 কিন্তু আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, মানুষ অশ্লীল কাজ দেখার পর তা প্রতিরোধ না করলে অচিরেই তাদের ওপর আল্লাহর আজাব নেমে আসবে।’^{৫৪১}

প্রকৃত মুসলমান—যার ইসলাম সত্য ও ইমান জীবন্ত—দ্বীনি কোনো বিষয়কে তুচ্ছ মনে করে না। সৎ কাজের আদেশ দেওয়া থেকে উদাসীন থাকে না। মন্দ কাজ ও পাপাচারে স্বস্তিবোধ করে না। সমাজে তা টিকে থাকতে দেয় না। যথাসম্ভব তা প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা নেয়। কারণ, দ্বীনের সকল বিষয় দৃঢ় সংকল্প ও চাহিদা অনুযায়ী হতে হয়; হাসি ও ঠাট্টার ছলে নয়। রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের ইহুদিদের মতো দ্বীনি বিষয়ে উদাসীন হওয়া থেকে নিষেধ করেছেন। যেন এ কারণে তাদের ওপর যে আজাব এসেছিল, তা আমাদের ওপর না আসে।

এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা আবু মুসা ^{৫৪২} রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন :

إِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا إِذَا عَمِلَ الْعَامِلُ مِنْهُمْ بِالْخَطِيئَةِ نَهَاةُ
 النَّاهِي تَعْذِيرًا، حَتَّى إِذَا كَانَ الْغَدُ جَالَسَهُ وَوَاكَلَهُ وَشَارَبَهُ، كَأَنَّهُ لَمْ
 يَرَهُ عَلَى خَطِيئَةٍ بِالْأُمْسِ، فَلَمَّا رَأَى اللَّهُ ذَلِكَ مِنْهُمْ ضَرَبَ قُلُوبَ

৫৪১. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪০০৫

৫৪২. এখানে বর্ণনাকারী হিসাবে আবু মুসা রা.-এর নাম বলা হয়েছে। কিন্তু এটা সঠিক নয়। এ হাদিসের বর্ণনাকারী হলেন আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা., যা তাবারানির বর্ণনায় স্পষ্টভাবে এসেছে। (অনুবাদক)

بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، ثُمَّ لَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ
مَرْيَمَ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ،
لَتَأْمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَتَأْخُذَنَّ عَلَى يَدَيِ
الظَّالِمِ، وَلَتَأْطُرَنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا، أَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِكُمْ
عَلَى بَعْضٍ، ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ

‘তোমাদের পূর্ববর্তী বনি ইসরাইলের মধ্যে যখন কেউ পাপকর্ম করত, তখন কোনো নিষেধকারী তিরস্কার করে তা থেকে বাধা দিত। কিন্তু পরেরদিন সেই নিষেধকারীই তাদের সাথে ওঠাবসা করতে শুরু করত এবং তাদের সাথে পানাহার করত, যেন আগের দিন তাদের কোনো পাপকর্ম সে দেখেইনি! তাদের এ অবস্থা দেখে আল্লাহ তাআলা তাদের এক দলের অন্তরকে অন্য দলের অন্তরের ওপর চাপিয়ে দিলেন। অতঃপর তাদের নবি দাউদ   ও ইসা  -এর জবানে তাদের অভিসম্পাত করলেন। এটা একমাত্র তাদের পাপের কারণেই হয়েছে। আর তারা ছিল সীমালঙ্ঘনকারী জাতি। সে সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ করবে, মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। অপরাধীকে শক্তভাবে প্রতিহত করবে। সত্য পথে দৃঢ়পদ ও অবিচল থাকবে। অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের মাঝে অমিল ও অনৈক্য সৃষ্টি করে দেবেন এবং তাদের ওপর যেভাবে অভিসম্পাত করেছিলেন, তেমনই তোমাদের ওপরও করবেন।’^{৫৪৩}

দাওয়াতের সময় চাতুর্য ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়

প্রকৃত মুসলমান লোকদের আল্লাহর পথে দাওয়াত দেওয়ার সময় বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করে। প্রচুর সময় নিয়ে তাদের দ্বীনের বিধানসমূহ শিক্ষা দেয়। দাওয়াতের ক্ষেত্রে সে আল্লাহর এ বাণীর ওপর পূর্ণাঙ্গ আমল করে :

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

৫৪৩. আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি : ১০২৬৮



‘আপন পালনকর্তার পথে আহ্বান করুন উত্তমরূপে জ্ঞানের কথা
বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে।’^{৫৪৪}

এর কারণ হলো, আল্লাহর পথের দায়ীদের গুরুত্বপূর্ণ একটি গুণ হলো, অন্তরসমূহে খুব ভালোভাবে কথা ঢুকিয়ে দিতে পারা। যাতে তাদের নিকট ইমান পছন্দনীয় হয়ে ওঠে এবং দীন কবুল করার প্রতি আগ্রহ প্রবল হয়। মানুষের বিরক্তিবোধ, কষ্ট বা রাগ আসে—এমন কোনো কাজ দায়িরা করে না। তাই সে একবারেই সব কথা বলে দেয় না। একদিনেই টেনে হিঁচড়ে হিদায়াতের পথে নিয়ে আসার চেষ্টা করে না। কয়েকবার করে ধাপে ধাপে দাওয়াত দেয়। একটু একটু করে অন্তরে অনুভূতি জাগ্রত করে। যাদের দাওয়াত দিচ্ছে, তাদের মাঝে বিরক্তিবোধ যেন না আসে, তার প্রতি খুব সজাগ থাকে। দাওয়াতের সময় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কর্মপন্থা এমনই ছিল।

আবু ওয়ায়িল রাঃ থেকে বর্ণিত হয়েছে :

كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُذَكِّرُ النَّاسَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا عَبْدِ
الرَّحْمَنِ لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ؟ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ
أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أُمْلِكَكُمْ، وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا، مَخَافَةَ السَّامَةِ عَلَيْنَا

‘আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাঃ প্রতি বৃহস্পতিবার লোকদের ওয়াজ করতেন। এক ব্যক্তি তাকে বলল, হে আবু আব্দুর রহমান, আমি চাই, আপনি প্রতিদিন আমাদের ওয়াজ করবেন। তিনি বললেন, আমি এজন্যই তা করি না যে, এতে তোমাদের মাঝে বিরক্তিবোধ সৃষ্টি হবে। আমি তোমাদের কয়েকদিন পর পর ওয়াজ করি, যেভাবে নবিজি সঃ আমাদের মাঝে বিরক্তিবোধ আসার আশঙ্কায় কয়েকদিন পর পর ওয়াজ করতেন।’^{৫৪৫}

৫৪৪. সূরা আন-নাহল : ১২৫

৫৪৫. সহিহুল বুখারি : ৭০

দায়ীদের বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার অন্যতম দিক হলো, খুতবা বা ওয়াজ বেশি দীর্ঘ না করা; বিশেষ করে তা যদি বড় সমাবেশের সামনে হয়, যেখানে বৃদ্ধ, দুর্বল (বালক) ও রোগীও উপস্থিত থাকে। তাই খুতবা বা ওয়াজ সংক্ষিপ্ত করতে পারার যোগ্যতা দাওয়াতের ক্ষেত্রে খতিব বা ওয়াজকারীর ইলমি তাত্ত্বিকতার পরিচয় বহন করে।

এজন্য আম্মার বিন ইয়াসির ؓ-কে রাসুলুল্লাহ ﷺ নির্দেশনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন :

إِنَّ طَوْلَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ، مِثْنَةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأُطِيلُوا الصَّلَاةَ،
وَأَقْصُرُوا الْخُطْبَةَ

‘নিশ্চয় নামাজ দীর্ঘ করা এবং খুতবা সংক্ষিপ্ত করা ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। তাই নামাজকে দীর্ঘ করো আর খুতবাকে সংক্ষিপ্ত করো।’^{৫৪৬}

বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ দায়ীদের অন্যতম কর্মপন্থা হলো, তারা দাওয়াতের সময় খুব নম্রতা অবলম্বন করে। লোকদের অজ্ঞতা, ভুল ও বিরক্তিকর প্রশ্নগুলো বরদাশত করে। দাওয়াতের বিষয় তাদের সামনে পরিপূর্ণরূপে বুঝিয়ে দেয়, কোনোরূপ অস্পষ্টতা রাখে না। দায়িরা আসলে এ ক্ষেত্রে দায়ীদের সর্দার সর্বশেষ নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর অনুসরণ করে। প্রশ্নকারীদের প্রতি তিনি ছিলেন উদার। তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে এবং তাদের শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে খুবই নম্র ও কোমল থাকতেন। তাদের প্রতি ভালোবাসা ও স্বস্তিবোধ নিয়ে পূর্ণ মনোযোগ দান করতেন। যতক্ষণ তারা পরিপূর্ণরূপে বুঝতে সক্ষম না হতো, ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো ধরনের বিরক্তিবোধ ছাড়াই উদারচিত্তে তাদের বুঝিয়ে দিতেন।

এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা মুআবিয়া বিন হাকাম সুলামি ؓ বর্ণনা করেছেন :

بَيْنَا أَنَا أَصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ
مِنَ الْقَوْمِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ، فَقُلْتُ:

৫৪৬. সহিহ মুসলিম : ৮৬৯



وَأَكُلْ أُمِّيَاةَ، مَا شَأْنُكُمْ؟ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ، فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَادِهِمْ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، فَوَاللَّهِ، مَا كَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي، قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الْكُفَّانَ، قَالَ: «فَلَا تَأْتِيهِمْ» قَالَ: وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ، قَالَ: «ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ، فَلَا يَصُدَّنَّهُمْ - قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ: فَلَا يَصُدَّنَّكُمْ

‘একদিন আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে নামাজ পড়ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি হাঁচি দিলে আমি তার জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ (আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন!) বললাম। লোকেরা আমার দিকে রুষ্ট দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। আমি বললাম, আমার মা আমার বিয়োগব্যথায় কাতর হোক। (অর্থাৎ এভাবে আমি নিজেই নিজেকে ভৎসনা করলাম।) তোমাদের কী হলো? আমার দিকে অমন করে তাকাচ্ছ কেন? তখন তারা তাদের হাত দিয়ে উরুর ওপর আঘাত করে শব্দ করতে লাগল। আমি যখন বুঝতে পারলাম যে, তারা আমাকে চুপ হতে বলছে, তখন আমি চুপ হয়ে গেলাম। পরে রাসুলুল্লাহ ﷺ নামাজ শেষ করলে আমি তাকে সবকিছু বুঝিয়ে বললাম। আমার পিতা ও মা তার জন্য কুরবান হোক! আমি ইতিপূর্বে বা এর পরে আর কখনো কাউকে তার চেয়ে উত্তম পন্থায় শিক্ষা দিতে দেখিনি। আল্লাহর শপথ করে বলছি, তিনি আমাকে ধমকালেন না, মারলেন না, বকাঝকাও করলেন না; বরং বললেন, নামাজের মধ্যে কথাবার্তা ধরনের কিছু বলা যথোচিত নয়; বরং নামাজ হলো তাসবিহ, তাকবির ও কুরআন পাঠ করার নাম। অথবা



রাসুলুল্লাহ ﷺ যেরূপ বলেছেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আমি সবেমাত্র জাহিলিয়াত বর্জন করেছি এবং আল্লাহ আমাকে ইসলাম গ্রহণের তাওফিক দিয়েছেন। আমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা গণকদের কথায় বিশ্বাস করে। তিনি বললেন, তুমি গণকদের কাছে যেয়ো না। আমি বললাম, আমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে, যারা শুভ-অশুভ নির্ধারণ করে থাকে। তিনি বললেন, এটা তাদের হৃদয়ের বদ্ধমূল বিশ্বাস। এজন্য তারা এ থেকে বিরত থাকে না (আসলে এর কোনো ভিত্তি নেই)।^{৫৪৭}

মানুষের প্রতি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কোমলতা সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি মন্দ কাজকারীকে তার মন্দ কাজের ব্যাপারে সরাসরি বলতেন না। কারণ, এতে তার অনুভূতিতে আঘাত লাগতে পারে বা তার মর্যাদাহানি ঘটতে পারে। বরং তিনি তাওরিয়া বা পরোক্ষ উল্লেখের আশ্রয় নিয়ে তার মন্দ কাজের প্রতিবাদ করতেন এবং তাকে সতর্ক করতেন। এ পদ্ধতি অন্তরে খুব প্রভাব ফেলে এবং ভুল শুধরাতে খুব সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

আয়িশা সিদ্দিকা ؓ বলেন :

‘রাসুলুল্লাহ ﷺ কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির (কোনো খারাপ কথার) ব্যাপারে জানলে “কী হলো অমুকের? সে এমন বলল কেন?”—এমনটি বলতেন না; বরং বলতেন, “লোকদের কী হলো? তারা এমন কথা বলছে কেন?”’^{৫৪৮}

সফল দায়ীদের আরেকটি গুণ হলো, শ্রোতার সামনে স্পষ্ট কথা বলা। একাধিকবার বলে তাদের অন্তরে বদ্ধমূল করে দেওয়া। রাসুলুল্লাহ ﷺ এমনটাই করতেন।

আনাস ؓ বর্ণনা করেন :

إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلَاثًا، حَتَّى تُفْهَمَ عَنْهُ، وَإِذَا أَتَى عَلَى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا

৫৪৭. সহিহ মুসলিম : ৫৩৭

৫৪৮. হায়াতুস সাহাবা : ৩/১২৯

‘রাসুলুল্লাহ ﷺ কোনো কথা বললে তা তিনবার বলতেন, যাতে শ্রোতারা বুঝতে পারে। আর কোনো জাতির নিকট গেলে তাদের তিনবার সালাম দিতেন।’^{৫৪৯}

আয়িশা ﷺ বলেন :

كَانَ كَلَامُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَامًا فَضْلًا يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ

‘রাসুলুল্লাহ ﷺ স্পষ্ট ভাষায় কথা বলতেন। প্রত্যেক শ্রোতাই তাঁর কথা হৃদয়ংগম করতে পারত।’^{৫৫০}

শঠতা করে না

প্রকৃত মুসলমান শঠতা, চাটুকারিতা, আপাত সৌহার্দ্য দেখানো, মিথ্যা প্রশংসা ইত্যাকার হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয় থেকে দূরে অবস্থান করে। কেননা, তার দ্বীনের শিক্ষা তাকে এ ধরনের হীন ও গর্হিত কর্মের প্রতি যেতে বাধা প্রদান করে। বর্তমান সময়ে অধিকাংশ মানুষ এসব হীন ও গর্হিত কর্মে লিপ্ত। আজ মানবসমাজ যে এত নিচে চলে এসেছে, তার অন্যতম প্রধান কারণ ধ্বংসকারী শঠতা।

শঠতা ও চাটুকারিতার ধোঁকায় পড়ে অধঃপতনে না যাওয়ার জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। বনু আমির যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রশংসা করে বলল, আপনি আমাদের সর্দার, তখন তিনি বললেন, সর্দার হলেন আল্লাহ। তারা বলল, আপনি আমাদের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাবান আর সবচেয়ে বেশি সামর্থ্যবান। তিনি বললেন, তোমরা সংযত কথা বলো (বাড়িয়ে কথা বলো না)। এ ক্ষেত্রে তোমরা শয়তানের প্রতিনিধি হয়ো না (অর্থাৎ শয়তানের কথা অনুযায়ী বাড়িয়ে কথা বলো না)। আল্লাহ তাআলা আমাকে যে স্তরে রেখেছেন, সেখান থেকে তোমরা আমাকে ওপরে তোলো—তা আমি চাই না। আমি আব্দুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ এবং আল্লাহর বান্দা ও রাসুল।’^{৫৫১}

৫৪৯. সহিহুল বুখারি : ৯৫

৫৫০. সুনানু আবি দাউদ : ৪৮৩৯

৫৫১. হায়াতুস সাহাবা : ৩/৯৯

এই হাদিসটির মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রশংসায় অতিরঞ্জনের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন। তিনি তাঁর সর্দার, মর্যাদাবান ও সামর্থ্যবান হওয়ার গুণ নিয়ে প্রশংসাকারীদের নিষেধ করেছেন; অথচ নিঃসন্দেহে তিনি মুসলমানদের সর্দার ও সর্বাধিক মর্যাদাবান ব্যক্তি। কারণ, তিনি জানতেন যে, প্রশংসার ধারা যদি শুরুতেই বন্ধ করে দেওয়া না হয়, তাহলে পরবর্তী সময়ে সে দরজা দিয়ে নিফাক বা শঠতার মতো মারাত্মক বিষয় প্রবেশ করবে, স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন ইসলামে যার কোনো জায়গা নেই।

রাসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণকে কারও সামনাসামনি প্রশংসা করতে বারণ করতেন। কারণ, এতে প্রশংসাকারীর ভেতর নিফাক বা শঠতা ঢুকে যেতে পারে। কিংবা প্রশংসিতের মাঝে আত্মতুষ্টি ও নিজেকে বড় মনে করার বিধ্বংসী মানসিকতা তৈরি হতে পারে।

ইমাম বুখারি رحمه الله ও ইমাম মুসলিম رحمه الله আবু বাকরা رضي الله عنه থেকে বর্ণনা করেছেন :

أَتْنِي رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : «وَيْلَكَ قَطَعْتَ عُتُقَ صَاحِبِكَ ، قَطَعْتَ عُتُقَ صَاحِبِكَ» مِرَارًا ، ثُمَّ قَالَ : «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَادِحًا أَخَاهُ لَا مَحَالَةَ ، فَلْيُقْلُ أَحْسِبُ فُلَانًا ، وَاللَّهُ حَسِيبُهُ ، وَلَا أُزَيِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا أَحْسِبُهُ كَذًا وَكَذًا ، إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ»

‘এক ব্যক্তি নবিজি ﷺ-এর নিকট অপর এক ব্যক্তির প্রশংসা করলে তিনি বললেন, ধিক! তুমি তো তোমার সঙ্গীর গর্দান কেটে দিয়েছ! কথাটি তিনবার বললেন। তারপর বললেন, যদি তোমাদের কেউ তার সঙ্গীর একান্তই প্রশংসা করতে হয়, তবে তার এরূপ বলা উচিত, “অমুক সম্পর্কে আমার ধারণা এমন, তবে আল্লাহ-ই তার প্রকৃত অবস্থা নিরূপণকারী। আমি কাউকে আল্লাহর ওপর দিয়ে পবিত্রতা ঘোষণা করছি না। আমি শুধু তার সম্পর্কে এরূপ এরূপ ধারণা করি”—যদি সে (বাস্তবেই) তদ্রূপ জানে।’^{৫৫২}

সুতরাং একান্তই যদি কারও প্রশংসা করতে হয়, তাহলে সত্য, যথার্থ ও বাস্তবভিত্তিক প্রশংসা করতে হবে। কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি বা অতিরঞ্জন

করা যাবে না। অন্যথায় সমাজে নিফাক, মিথ্যা, লৌকিকতা, কপটতা, ছলনা ইত্যাকার সমাজবিধ্বংসী বিষয়সমূহ ছড়িয়ে পড়বে।

ইমাম বুখারি   তাঁর আল-আদাবুল মুফরাদে মিহজান আসলামি   থেকে বর্ণনা করেন :

‘একদিন রাসুলুল্লাহ   ও মিহজান আসলামি   মসজিদে ছিলেন। তখন রাসুলুল্লাহ   মসজিদে এক ব্যক্তিকে নামাজ, রুকু ও সিজদারত অবস্থায় দেখলেন। তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ ব্যক্তি কে? তখন মিহজান   তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বলতে লাগলেন, এ ব্যক্তির এমন এমন গুণ আছে। তখন রাসুলুল্লাহ   বললেন, থামো, তাকে গুনিয়ে না, নতুবা তুমি তার সর্বনাশ করে ফেলবে।’^{৫৫৩}

মুসনাদে আহমাদের রিওয়াযাতে এভাবে এসেছে :

‘হে আল্লাহর নবি, এ হচ্ছে মদিনার সর্বাধিক উত্তম আমলকারী ব্যক্তি। অথবা বললেন, মদিনাবাসীদের মধ্যে সর্বাধিক নামাজ আদায়কারী। তখন রাসুলুল্লাহ   বললেন, তাকে গুনিয়ে না; নচেৎ তুমি তার সর্বনাশ করবে। কথাটি দুবার বা তিনবার বললেন। (তারপর বললেন,) তোমরা এমন উম্মত, যাদের সাথে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সহজ ও সরলতার ইচ্ছা করা হয়েছে।

কাউকে গুনিয়ে তার প্রশংসা করাকে রাসুলুল্লাহ   তাকে ধ্বংস করার নামান্তর বলেছেন। কেননা, এতে মানুষের মাঝে নিজের প্রশংসা শোনার যে মানবিক দুর্বলতা আছে, তা আরও প্রকট হয়ে ওঠে। তখন প্রশংসিত ব্যক্তিটি মিথ্যে অহমিকায় ডুবে যায়। তার মাঝে সৃষ্টি হয় অহংকার, আত্মগরিভা ও আত্মতুষ্টি। মুনাফিক ও প্রতারক প্রশংসাকারীরা যখন বারবার প্রশংসা করতে থাকে—তারা অধিকাংশ সময় প্রশাসক, উচ্চ দায়িত্বশীল ও শাসকদের প্রশংসা করে থাকে—তখন প্রশংসা শোনাটা তাদের নেশায় পরিণত হয়। প্রশংসা শোনার জন্য অধীর আগ্রহ নিয়ে তারা বসে থাকে। এজন্য উপদেশ ও বাস্তবভিত্তিক সমালোচনা তাদের মোটেও পছন্দ হয় না। প্রশংসায় যত

বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন হয়, ততই তাদের ভালো লাগে। এই যদি হয়ে যায় মানুষের অবস্থা, তখন সত্য, ইনসাফ, মনুষ্যত্বের মর্যাদা ও সমাজ ধ্বংস হয়ে যাওয়াটা মোটেই আশ্চর্যের কিছু হবে না।

এজন্যই রাসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবীগণকে অতিরঞ্জিত প্রশংসাকারীদের মুখে বালি নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। যেন সমাজে এ ধরনের লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি না পায় এবং তাদের কারণে সমাজে নিফাক, চাটুকারিতা ও বাল্য-মুসিবত বৃদ্ধি না পায়।

ইমাম বুখারি رحمه الله, ইমাম মুসলিম رحمه الله, ইমাম আহমাদ رحمه الله ও ইমাম তিরমিজি رحمه الله একাধিক সনদে বর্ণনা করেছেন :

‘এক ব্যক্তি জনৈক শাসকের সম্মুখে তার প্রশংসা শুরু করলে মিকদাদ رحمه الله তার মুখে বালি নিক্ষেপ করলেন। আর বললেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যখন তোমরা (অতিরঞ্জিত) প্রশংসাকারীদের দেখবে, তখন তাদের মুখে বালি নিক্ষেপ করবে।’^{৫৫৪}

এজন্যই সাহাবায়ে কিরাম رحمه الله প্রশংসা এড়িয়ে চলতেন। কাউকেই তাঁদের প্রশংসা করতে দিতেন না; অথচ নিঃসন্দেহে তাঁরা ছিলেন প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য ও হকদার। তবুও চাটুকারিতার ফাঁদে আটকা পড়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ভয়ে তাঁরা প্রশংসা এড়িয়ে চলতেন। তাঁরা বাস্তবভিত্তিক ইসলামি চরিত্রে নিজেদের সাজাতেন, যা এ ধরনের সস্তা প্রশংসা ও জনপ্রিয়তা থেকে মুক্ত।

এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা নাবি رحمه الله বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : ‘এক ব্যক্তি ইবনে উমর رحمه الله-কে “হে সর্বোত্তম লোক” অথবা “হে সর্বোত্তম লোকের ছেলে” বলে সম্বোধন করল। তখন ইবনে উমর رحمه الله বললেন, আমি সর্বোত্তম লোক বা সর্বোত্তম লোকের সন্তান নই। আমি আল্লাহর একজন বান্দা। আল্লাহর নিকট (রহমতের) আশা করি এবং তাঁকে (অর্থাৎ তাঁর আজাবকে) ভয় করি। আল্লাহর শপথ! তোমরা তো দেখছি, কোনো ব্যক্তির প্রশংসা করতে করতে তাকে ধ্বংসই করে ছাড়বে!’^{৫৫৫}

৫৫৪. সহিহ মুসলিম : ৩০০২

৫৫৫. হায়াতুস সাহাবা : ৩/১০৩

এটি মহান ইসলামের মর্ম অনুধাবনকারী এবং ভেতরে ও বাইরে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শে সজ্জিত এক মহান সাহাবির প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী।

আসলে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর কথা ও কাজকে নিফাক থেকে দূরে রাখার কারণে সাহাবিদের মাঝে একটি সুস্ব স্ববিবেচনাবোধ সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁরা বুঝতে পারতেন, কোনটি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য আর কোনটিতে নিফাক ও তোষামোদ মিশ্রিত আছে।

আব্দুল্লাহ বিন উমর ؓ থেকে বর্ণিত আছে, লোকেরা তাঁকে বলল, আমরা যখন আমাদের শাসকদের নিকট যাই, তখন তাদের এমন কথা বলি, যা তাদের অগোচরে বলা কথার সম্পূর্ণ বিপরীত। তখন ইবনে উমর ؓ বললেন: ‘نَبِيَّ جِي -এর كُنَّا نَعُدُّ هَذَا نِفَاقًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: জীবদ্দশায় আমরা এটাকে নিফাক মনে করতাম।’^{৫৫৬}

রিয়া ও অহংকার থেকে দূরে থাকে

প্রকৃত মুসলমান রিয়া (লৌকিকতা) থেকে অনেক দূরে থাকে। কারণ, রিয়া প্রতিদান ধ্বংস করে দেয়; আমল বাতিল করে দেয় এবং রাব্বুল আলামিনের সামনে দাঁড়ানোর দিনে লাঞ্ছনাকে আবশ্যক করে।

দ্বীন ইসলামের মগজ হলো, কথা ও কাজে ইখলাস তথা একমাত্র আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতা। আর ইনসান ও জিন সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর ইবাদত।

কুরআনে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

‘আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।’^{৫৫৭}

এ ইবাদত তখনই কবুল করা হবে, যখন তা একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহর জন্য করা হবে।

৫৫৬. মুসনাদু আবি দাউদ তায়ালিসি : ২০৬৭

৫৫৭. সূরা আজ-জারিয়াত : ৫৬

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

‘তাদের এ ছাড়া কোনো নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে
একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে।’^{৫৫৮}

তাই ইবাদতের সাথে রিয়া (লৌকিকতা) ও প্রকাশ পাওয়ার আশ্রয় যখনই
মিশ্রিত হবে, সাথে সাথে তা বাতিল হয়ে যাবে এবং তার প্রতিদান নষ্ট
হয়ে যাবে। এর প্রমাণ আমরা সেসব লোকের প্রতি আল্লাহর ভীতিপ্রদর্শনের
মধ্যে পাই, যারা গরিবদের দান করার পর খোঁটা দেয় এবং বলে, আমরাই
তোমাদের স্বাবলম্বী করেছি, তোমাদের অভাব আমরাই দূর করেছি, তোমাদের
প্রয়োজনগুলো আমরাই পূরণ করেছি। এভাবে খোঁটা দিয়ে তারা গরিবদের
সম্মানে আঘাত হানতে থাকে।

আল্লাহ তাআলা বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ
مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ
عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا
كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

‘হে ইমানদারগণ, তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট
দিয়ে নিজেদের দান-খয়রাত বরবাদ কোরো না সে ব্যক্তির মতো, যে
নিজের ধন-সম্পদ লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে ব্যয় করে এবং আল্লাহ
ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে না। অতএব এ ব্যক্তির দৃষ্টান্ত একটি
মসৃণ পাথরের মতো, যার ওপর কিছু মাটি পড়েছিল। অতঃপর এর
ওপর প্রবল বৃষ্টি বর্ষিত হলো, অনন্তর তাকে সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে
দিল। তারা ওই বস্তুর কোনো সাওয়াব পায় না, যা তারা উপার্জন
করেছে। আর আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।’^{৫৫৯}

৫৫৮. সূরা আল-বাইয়িনা : ৫

৫৫৯. সূরা আল-বাকারা : ২৬৪

আয়াত থেকে বুঝা গেল, গরিবদের দান করার পর তাদেরকে খোঁটা দেওয়া দানের সাওয়াবকে এমনভাবে নিঃশেষ করে দেয়, যেমনিভাবে প্রবাহিত পানি মসৃণ পাথরের ওপর থাকা ধুলোবালি নিঃশেষ করে দেয়। আয়াতের শেষে সবচেয়ে ভীতিকর কথাটি বলেছেন আল্লাহ তাআলা। যার মর্ম হলো, খোঁটা দেওয়া লোকেরা অর্থাৎ লোক দেখানোর জন্য যারা আমল করে, তারা আল্লাহর হিদায়াতের অযোগ্য এবং কাফিরদের দলভুক্ত।

তিনি বলেছেন :

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

‘আর আল্লাহ কাফির-সম্প্রদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।’

এর কারণ হলো, লোক দেখানো ইবাদতকারী এসব লোকের আসল উদ্দেশ্য হলো, মানুষের সামনে নেক আমলের প্রদর্শনী। আল্লাহর সন্তুষ্টি তাদের উদ্দেশ্য নয়।

এদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন :

يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا

‘(তারা নামাজ পড়ে) লোক দেখানোর জন্য। বস্তুত, তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে।’^{৫৬০}

তাদের আমল তাদের দিকেই ছুড়ে মারা হয়। কেননা, তারা আল্লাহর সাথে অন্যকে শরিক করে। আর আল্লাহ তাআলা কেবল সে আমলই কবুল করেন, যা একনিষ্ঠভাবে তাঁর জন্য করা হয়।

আবু হুরাইরা রাঃ-এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সঃ-কে বলতে শুনেছি :

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشُّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشُرْكَهُ

৫৬০. সূরা আন-নিসা : ১৪২

‘আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, আমি শরিকদের শরিক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে ব্যক্তি এমন কোনো কাজ করে, যাতে আমার সাথে অন্যকে শরিক করে, আমি তাকে ও তার শরিককে প্রত্যাখ্যান করি।’^{৫৬১}

এ বিষয়টিকে রাসুলুল্লাহ ﷺ আরও খোলাখুলিভাবে আলোচনা করেছেন। কিয়ামতের ভয়ংকর দিনে—যেদিন পরিশুদ্ধ কলব ছাড়া সম্পদ ও সন্তানাদি কোনো কাজে আসবে না—এসব লোক দেখানো ইবাদতকারীর কী ধরনের লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার শিকার হতে হবে, তা তিনি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এ হাদিসটিও আবু হুরাইরা ﷺ বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَىٰ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتُ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتُ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ، وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتُ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكَتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ،

‘কিয়ামতের দিন প্রথমে এমন এক ব্যক্তির ব্যাপারে ফয়সালা হবে, যে শহিদ হয়েছিল। তাকে আনা হবে এবং তাকে যেসব সুযোগ-

সুবিধা দেওয়া হয়েছিল, তা-ও তার সামনে পেশ করা হবে। সে তা চিনতে পারবে। আল্লাহ তাআলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, আমি যে সমস্ত নিয়ামত তোমাকে দিয়েছিলাম, তার বিনিময়ে তুমি কী কাজ করেছ? সে বলবে, আমি আপনার পথে লড়াই করে শহিদ হয়েছি। তিনি বলবেন, তুমি মিথ্যা বলেছ। বরং তুমি এজন্য লড়াই করেছ যে, লোকেরা তোমাকে বীর-বাহাদুর বলবে! আর তা বলা হয়ে গেছে। অতঃপর তার সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হবে এবং তাকে উপড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর আরেক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে, যে ইলম অর্জন করেছে, তা লোকদের শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন পাঠ করেছে। তাকে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে দেওয়া সুযোগ-সুবিধাগুলোও তার সামনে তুলে ধরা হবে। সে তা দেখে চিনতে পারবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি তোমার নিয়ামতের সদ্যবহার করেছ? সে বলবে, আমি ইলম অর্জন করেছি, লোকদের তা শিক্ষা দিয়েছি এবং আপনার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন পাঠ করেছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। বরং তুমি এ উদ্দেশ্যেই বিদ্যা অর্জন করেছিলে যে, লোকেরা তোমাকে আলিম বা বিদ্বান বলবে এবং কুরআন এজন্য পাঠ করেছিলে যে, তোমাকে কারি বলা হবে। আর তা বলাও হয়ে গেছে। অতঃপর তার সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হবে এবং তাকে মুখের ওপর উপড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর আরেক ব্যক্তিকে আনা হবে, তাকে অজস্র ধন-দৌলত দান করেছেন এবং নানা প্রকারের ধন-সম্পদ দিয়েছেন। তাকে দেওয়া সুযোগ-সুবিধাগুলো তার সামনে তুলে ধরা হবে। সে তা চিনতে পারবে। আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, তোমার এ সম্পদ দ্বারা তুমি কী কাজ করেছ? সে বলবে, যেখানে ব্যয় করলে আপনি সন্তুষ্ট হবেন, এমন কোনো খাত আমি বাদ দিইনি; বরং সেখানেই খরচ করেছি আপনার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে। মহান আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। বরং তুমি এজন্যই দান করেছ যে, লোকেরা তোমাকে দানবীর বলবে। আর তা বলাও হয়ে গেছে। অতঃপর নির্দেশ দেওয়া হবে এবং তাকে উপড় করে টেনে নিয়ে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে।^{৫৬২}

হাদিসে এমন বিষয়গুলোর উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোতে সাধারণত রিয়া, অহংকার এবং আমলের মাধ্যমে দাস্তিকতা প্রদর্শন বেশি সংঘটিত হয়। অর্থাৎ বীরত্ব, ইলম ও দানশীলতা। এসব বিষয়ে যারা রিয়া করে, তাদেরকে লোকদের সামনে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করা হবে, যাদের মধ্যে এমন লোকও থাকবে, যারা এদেরকে প্রশংসিত স্থানের অধিকারী মনে করত। হাদিসে তাদের বড় ধ্বংসের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদেরকে তাদের আমলের বিনিময়ে চিরস্থায়ী জান্নাতের আরাম-আয়েশে রাখা তো দূরের কথা, উল্টো তাদেরকে উপড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

প্রকৃত মুসলমান—যে দ্বীনের বিধানাবলির ব্যাপারে সচেতন এবং ইসলামের আদর্শ সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করে—সে তার সকল আমলে রিয়া থেকে বেঁচে থাকে। সকল আমল একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে করার চেষ্টা করে। কারণ, সে পরিপূর্ণরূপে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এ হাদিস অনুযায়ী আমল করে, যে হাদিসে ইরশাদ করা হয়েছে :

مَنْ سَمِعَ سَمِعَ اللَّهُ بِهِ، وَمَنْ يُرَآئِي يُرَآئِي اللَّهُ بِهِ

‘যে ব্যক্তি লোক-শোনানো আমল করবে, আল্লাহ (কিয়ামতের দিন) তার লোক-শোনানোর উদ্দেশ্য প্রকাশ করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি লোক-দেখানো আমল করবে, আল্লাহ তাআলা তার লোক-দেখানোর উদ্দেশ্য প্রকাশ করে দেবেন।’^{৫৬৩}

দৃঢ়সংকল্প ও অটল

প্রকৃত মুসলমান স্পষ্টবাদী ও দৃঢ়সংকল্প হয়। প্যাঁচানো, অস্পষ্টতা, অনিশ্চয়তা, কপটতা ইত্যাদি শব্দ তার অভিধানে নেই। সমাজজীবনে আকস্মিকভাবে যেসব বিপদ ও দুর্দশার সম্মুখীন হতে হয়, সেসবে সে দৃঢ়পদ ও অবিচল থাকে।

অটলতার এ গুণ সহজাত নয়। মানুষ চাইলে নিজের মধ্যে এটা আনতে পারে, আবার না-ও আনতে পারে। প্রকৃত মুসলমান নিজের মাঝে এ গুণ অর্জন করে

৫৬৩. সহিহুল বুখারি : ৬৪৯৯, সহিহ মুসলিম : ২৯৮৬

নেয়। কারণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ তাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন। গুরুত্বের বিবেচনায় অটলতাকে ইমানের পরেই স্থান দেওয়া হয়েছে অনেক আয়াতে।

যেমন ইরশাদ হচ্ছে :

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ
أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۝ ٣٠ نَحْنُ
أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي
أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۝ ٣١ نُزِّلَ مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ۝ ٣٢

‘নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় কোরো না, চিন্তা কোরো না এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত জান্নাতের সুসংবাদ শোনো। ইহকালে ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু। সেখানে তোমাদের জন্য আছে, যা তোমাদের মন চায় এবং সেখানে তোমাদের জন্যে রয়েছে, যা তোমরা দাবি করো। এটা ক্ষমাশীল করুণাময়ের পক্ষ থেকে সাদর আপ্যায়ন।’^{৫৬৪}

অটল ব্যক্তিদের সাওয়াব কত বড়! কিয়ামতের দিন তাদের আপ্যায়ন কত মর্যাদাপূর্ণ হবে! ফেরেশতারা তাদের নিকট কত সুন্দর সুসংবাদ বহন করে আনবেন!

অটলতা ও অবিচলতা অনেক উঁচু ও কঠিন এক স্তর। তাতে কেবল সেসব মুমিনই পৌছতে পারে, যারা মুক্তাকি ও একনিষ্ঠ এবং যারা গাইরুল্লাহ তথা সম্পদ, পদমর্যাদা, ক্ষমতা, আরাম-আয়েশ, উপভোগের উপকরণ ইত্যাকার মানুষের আশ্রয়ের বিষয়সমূহের দাসত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তাই অটল ও অবিচল ব্যক্তিদের প্রতিদান বড় হওয়াতে আশ্চর্যের তেমন কিছু নেই। তাদের স্থান আল্লাহর অতি নিকটে হওয়াটাই স্বাভাবিক।

৫৬৪. সূরা ফুসসিলাত : ৩০-৩২

অটলতা ও অবিচলতার মর্যাদা যে কত বড় এবং তা অর্জন করা যে কতটা কষ্টকর, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মাঝে তার গভীর প্রভাব দেখলে বুঝে আসে, যার অনুভূতিশক্তি প্রখর, যিনি অটলতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত এবং মানুষের মাঝে তা বাস্তবায়ন করার দুর্বোধ্যতা বিষয়ে ওয়াকিফহাল। এর বিস্তারিত বিবরণ ইবনে আব্বাস ؓ থেকে বর্ণিত এ আয়াতের ব্যাখ্যায় এসেছে।

আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসুল ﷺ-কে অটল থাকার আদেশ দিয়ে বলেন :

فَاسْتَقِمُّ كَمَا أُمِرْتَ

‘অতএব তুমি অটল থাকো, যেমনটি তোমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’^{৫৬৫}

এ আয়াতের ব্যাপারে ইবনে আব্বাস ؓ বলেন :

مَا نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةٌ هِيَ أَشَدُّ وَلَا أَشَقُّ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَيْهِ، وَلِذَلِكَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ حِينَ قَالُوا لَهُ: لَقَدْ أَسْرَعَ إِلَيْكَ الشَّيْبُ! فَقَالَ: شَيَّبَنِي هُوْدٌ وَأَخَوَاتُهَا

‘রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর এ আয়াত (فَاسْتَقِمُّ كَمَا أُمِرْتَ) এর চেয়ে কঠিন ও কষ্টকর কোনো আয়াত অবতীর্ণ হয়নি। এজন্যই যখন সাহাবায়ে কিরাম রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বললেন, আপনি দ্রুতই বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছেন, তিনি বললেন, আমাকে সুরা হুদ এবং তার আয়াতসমূহ বৃদ্ধ করে দিয়েছে।’^{৫৬৬}

এ কথার মাধ্যমে তিনি আল্লাহর বাণী ‘অতএব তুমি অটল থাকো, যেমনটি তোমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’ এর দিকেই ইঙ্গিত করেছেন।’

আল্লাহ তাআলার বাণী ‘নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ, অতঃপর তাতেই অবিচল থাকে।’ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর একটি সংক্ষিপ্ত, অথচ ব্যাপক অর্থবোধক বাণী আছে, যা তিনি সুফইয়ান বিন

৫৬৫. সুরা হুদ : ১১২

৫৬৬. তাফসিরুল কুরতুবি : ৯/১০৭

আব্দুল্লাহ সাকাফি ﷺ-কে বলেছিলেন। বাণীটি হলো : ‘বলো, আমি আল্লাহর ওপর ইমান এনেছি, অতঃপর এ কথার ওপর অবিচল থাকো।’

কথাটি তিনি তখনই বলেছিলেন, যখন সুফইয়ান ﷺ তাঁকে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে ইসলাম সম্পর্কে এমন একটি কথা বলেন, যাতে আপনার পরে অন্য কারও নিকট আমাকে প্রশ্ন করতে না হয়।’

এজন্যই ইমাম মুসলিম ৫৬৭ অটলতা-সম্পর্কিত অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন, ‘ইসলামের সকল গুণের সমন্বয়কারী গুণের অধ্যায়’। সারকথা হলো, আল্লাহর প্রতি ইমান আনার পর তার ওপর অটল ও অবিচল থাকা সকল ফজিলত ও শ্রেষ্ঠত্বকে একত্র করে দিয়েছে। অটলতা মানুষের চারিত্রিক সৌন্দর্যের সার্টিফিকেট। এ একটি গুণ জন্ম দেয় অসংখ্য ভালো গুণের। সহজ করে দেয় অনেক নেক আমল।

অটলতার শ্রেষ্ঠত্বের আরেকটি দিক হলো, এর মাধ্যমে মানুষ এক কথা ও এক নীতির হয়ে থাকে। অষ্টোপাসের মতো ক্ষণে ক্ষণে রং বদলায় না, যেমনটি চাটুকার ও ধোঁকাবাজরা করে থাকে, যাদের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ ﷺ হুমকি উচ্চারণ করেছেন।

ইরশাদ হয়েছে :

تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَوْلًا
بِوَجْهِهِ، وَهَوْلًا بِوَجْهِهِ

‘তুমি কিয়ামতের দিন দ্বিমুখী লোকদের আল্লাহর নিকট সর্বনিকৃষ্ট লোক হিসাবে দেখতে পাবে, যারা একদলের কাছে যায় এক মুখ নিয়ে এবং আরেকদলের কাছে যায় ভিন্ন মুখ নিয়ে।’৫৬৮

৫৬৭. ইমাম মুসলিম রহ. নয়; এখানে ইমাম নববি রহ. হবে। কেননা, ইমাম মুসলিম রহ. তাঁর সহিহ মুসলিম গ্রন্থে অধ্যায় বা কোনো শিরোনাম ব্যবহার করেননি। বর্তমানে যে অধ্যায়সমূহের নাম দেখা যায়, তা পরবর্তীকালে ইমাম নববি রহ. কর্তৃক সংযোজিত। (অনুবাদক)

৫৬৮. সহিহুল বুখারি : ৬০৫৮

অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যায়

প্রকৃত মুসলমান অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যায়। এটাকে সে গুরুত্বপূর্ণ একটি দীনি দায়িত্ব মনে করে, যার প্রতি ইসলাম উৎসাহিত করেছে। রোগীর প্রতি অনুগ্রহ ও করুণা মনে করে না এটাকে। কারণ, অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার নির্দেশ স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ﷺ দিয়েছেন।

তিনি ইরশাদ করেছেন :

أَطْعِمُوا الْجَائِعَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِي

‘ক্ষুধার্তকে খাওয়াও, রোগীকে দেখতে যাও এবং (নিরপরাধ) বন্দীকে মুক্ত করো।’^{৫৬৯}

বারা বিন আজিব ﷺ বর্ণনা করেন :

أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِزْرَارِ الْقَسَمِ، أَوْ الْمُقْسِمِ، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ

‘রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের রোগী দেখতে যেতে, জানাজার অনুসরণ করতে, হাঁচিদাতার জবাব দিতে (হাঁচিদাতা আল-হামদুলিল্লাহ বললে তার জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলতে), প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে, মাজলুমের সাহায্য করতে, দাওয়াত কবুল করতে এবং সালামের প্রসার করতে নির্দেশ দিয়েছেন।’^{৫৭০}

শুধু তাই নয়, রোগী দেখতে যাওয়া ইসলামি সমাজব্যবস্থার একটি মূলনীতি, যা প্রণয়ন করেছেন রাসুলুল্লাহ ﷺ। রোগী দেখতে যাওয়া এক মুসলমানের ওপর আরেক মুসলমানের অধিকার। কেউ যদি এ হক ও অধিকার আদায় না করে, তাহলে সে গুনাহগার হবে। যদি কোনো মুসলমান তা না করে, তাহলে তা দাবি করার অধিকারও রয়েছে।

৫৬৯. সহিহুল বুখারি : ৫৩৭৩

৫৭০. সহিহ মুসলিম : ২০৬৬



রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَاذَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ
الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ

‘এক মুসলমানের ওপর আরেক মুসলমানের অধিকার পাঁচটি। যথা: সালামের জবাব দেওয়া, রোগী দেখতে যাওয়া, জানাজার অনুসরণ করা, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচিদাতার উত্তর দেওয়া।’^{৫৭১}

আরেক রিওয়াযাতে আছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ، قِيلَ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: إِذَا لَقِيْتُهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَأَنْصَحْ لَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَاصْحَبْهُ

‘এক মুসলমানের ওপর আরেক মুসলমানের অধিকার ছয়টি। প্রশ্ন করা হলো, কী সেগুলো? নবিজি ﷺ বললেন, যদি তুমি তার (মুসলমানের) সাথে সাক্ষাৎ করো, তখন তাকে সালাম করবে; যদি সে তোমাকে দাওয়াত দেয়, তা কবুল করবে; যদি তোমাকে উপদেশ দেয়, তাহলে উপদেশ গ্রহণ করবে; যদি সে হাঁচি দেওয়ার পর আল-হামদুলিল্লাহ বলে, তুমি তার জবাব দেবে; সে অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাবে, আর যদি সে মারা যায়, তখন (দাফন-কাফন-জানাজায়) তার সঙ্গী হবে।’^{৫৭২}

প্রকৃত মুসলমান যখন কোনো মুসলমান রোগী দেখতে যায়, তখন সে এটাকে একটি কর্তব্য পালন করছে—এমন ধারণা করে না শুধু; বরং এতে সে এক ধরনের আত্মিক প্রশান্তিও অনুভব করে। এ আত্মিক প্রশান্তি অনুভব করতে হলে নিম্নের চমৎকার হাদিসটি গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়তে হবে। এ হাদিসে রোগী দেখতে যাওয়ার মাহাত্ম্য এবং এর মাঝে কী কী কল্যাণ নিহিত রয়েছে, তা বিবৃত হয়েছে সবিস্তারে।

৫৭১. সহিহুল বুখারি : ১২৪০

৫৭২. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৯৯১

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: يَا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أَعُودُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فُلَانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ؟ يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَطَعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي، قَالَ: يَا رَبِّ وَكَيْفَ أَطْعِمُكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطَعَمَكَ عَبْدِي فُلَانٌ، فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي، يَا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي، قَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ أُسْقِيكَ؟ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فُلَانٌ فَلَمْ تَسْقِهِ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي

‘কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা বলবেন, হে আদম-সন্তান, আমি রোগাক্রান্ত হয়েছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে আসোনি। সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক, আপনি তো বিশ্বজগতের প্রভু, আমি কী করে আপনাকে দেখতে যেতে পারি? আল্লাহ বলবেন, তোমার কি মনে নেই যে, আমার অমুক বান্দা রোগাক্রান্ত হয়েছিল? তখন তুমি তার খোঁজখবর নাওনি! যদি তুমি তার খোঁজখবর নিতে, তাহলে সেখানে আমাকে পেতে। অতঃপর অপর এক ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা বলবেন, হে আদম-সন্তান, আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে খেতে দাওনি। সে বলবে, হে প্রতিপালক, আপনি তো সারা জাহানের মালিক। আমি কীভাবে আপনাকে খাওয়াতে পারি? আল্লাহ বলবেন, তোমার কি স্মরণ নেই যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে খেতে দাওনি? তোমার কি এ কথা জানা ছিল না যে, যদি তুমি তাকে খেতে দাও, তাহলে এর সাওয়াব তুমি আমার কাছে পাবে? অতঃপর তিনি (অপর একজনকে) বলবেন, হে আদম-সন্তান, আমি তোমার কাছে পানি চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। সে বলবে, হে প্রভু, আমি আপনাকে কীভাবে

পান করাতে পারি? আপনি তো বিশ্বজাহানের প্রতিপালক! আল্লাহ বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল, তুমি তাকে পানি দাওনি। যদি তুমি তখন তাকে পানি পান করাতে, তাহলে এখন আমার কাছে তার প্রতিদান পেতে।’^{৫৭৩}

হাদিসটি প্রমাণ করে, রোগীর সেবা করা ও রোগীকে দেখতে যাওয়া কত বেশি বরকতপূর্ণ ও ফজিলতপূর্ণ আমল! কত বড় সে আমল, যেখানে বান্দা যখন দুর্বল অসুস্থ ভাইয়ের নিকট দাঁড়াবে, তখন সে স্বয়ং আল্লাহর সামনেই দাঁড়াবে! তার এ মহান আমলের সাক্ষী থাকবেন খোদ আল্লাহ-ই! তিনিই এর উত্তম প্রতিদান দেবেন! এর চেয়ে বড় আর কোনো আমল আছে কি, যেটাকে স্বয়ং আল্লাহ মর্যাদাবান ও বরকতপূর্ণ করেছেন এবং তার প্রতি উদ্ধুদ্ধ করেছেন!?

পক্ষান্তরে রোগী দেখতে না যাওয়ার চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য, সর্বনাশ ও লাঞ্ছনা আর কী হতে পারে, যখন আল্লাহ সকল মানুষের সামনে ঘোষণা করবেন :

‘হে আদম-সন্তান, আমি রোগাক্রান্ত ছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে আসোনি!... তোমার কি মনে নেই আমার অমুক বান্দা রোগাক্রান্ত হয়েছিল, আর তুমি তাকে দেখতে যাওনি? তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে দেখতে যেতে, তাহলে তার নিকট আমাকে পেতে!?’

চোখ বন্ধ করে ভেবে দেখুন তো, অসুস্থ ভাইকে দেখতে না যাওয়ার কারণে কিয়ামতের দিন সবার সামনে যে লজ্জা, অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করতে হবে, তা কতটা তীব্র ও কষ্টদায়ক হবে!

ইসলামি সমাজে অসুস্থ ব্যক্তি তার কঠিন ও কষ্টকর মুহূর্তে নিজেকে একা ও অসহায়বোধ করে না। তার চারপাশে সে এমন লোকদের সহমর্মিতা অনুভব করে, যারা তাকে দেখতে আসে এবং তার সেবা-শুশ্রূষা করে তার কষ্ট হালকা করার চেষ্টা করে। এটাই (অর্থাৎ রোগীকে দেখতে যাওয়া, কঠিন মুহূর্তে তার পাশে থাকা, তার সেবা-শুশ্রূষা করা) মানবিকতার শ্রেষ্ঠত্বের শীর্ষচূড়া,

মানবতাবোধের শীর্ষ স্তর। পরস্পর সহমর্মিতার সুন্দর এ সংস্কৃতি ও সামাজিক দায়িত্বের প্রতি ইসলাম যেভাবে উদ্বুদ্ধ করেছে, অন্য কোনো সমাজব্যবস্থা তার ছিটেফোঁটাও করেনি।

পাশ্চাত্য সমাজে রোগীরা চিকিৎসা-সেবার জন্য হাসপাতাল পায়, যাতে তাকে ভর্তি করা হয়; ডাক্তার পায়, যে তার চিকিৎসা করে এবং তার জন্য ওষুধ প্রেসক্রাইব করে দেয়। কিন্তু মমতার পরশ, রোগ কমিয়ে দেওয়া মিষ্ট ভাষা, ভুবন-ভোলানো মুচকি হাসি, একনিষ্ঠ দুআ, নির্ভেজাল সহমর্মিতা নিয়ে কারও পাশে বসে থাকা—এসব একেবারেই বিরল।

কারণ, পুঁজিবাদী দর্শন পশ্চিমাদের জীবনের সুখ ছিনিয়ে নিয়েছে। মানবিক সহমর্মিতার আলো নিভে গেছে তাদের জীবন থেকে। তাদের মাঝে নেই ভ্রাতৃত্ববোধের নির্মলতা। জাগতিক কাজ বাদ দিয়ে ভালো কোনো কাজ করার সময় তাদের নেই।

পাশ্চাত্য সমাজে মানুষ রোগী দেখতে যাওয়ার জন্য কোনো প্রেরণা খুঁজে পায় না। কারণ, তার সমাজব্যবস্থা তাকে রোগী দেখতে যাওয়ার ইহকালীন বা পরকালীন কোনো লাভ বা উপকারের কথা বলে না। পক্ষান্তরে মুসলমান তার ধর্মের মাঝে রোগী দেখতে যাওয়ার প্রেরণা পায়। সেই সাওয়াব ও প্রতিদানের আশায় সে রোগী দেখতে যায়, যা রোগী দেখতে যাওয়া লোকদের জন্য আল্লাহ তৈরি করে রেখেছেন।

এ সম্পর্কিত অসংখ্য হাদিস রয়েছে, যেগুলো মানুষের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধের ঝরনাধারা প্রবাহিত করে এবং মানুষকে রোগী দেখতে যাওয়ার জন্য হৃদয়ের গভীর থেকে তাড়িত করে। এখানে এ সম্পর্কিত কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করা হলো।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجَعَ

‘মুসলমান যখন তার (রোগাক্রান্ত) মুসলমান ভাইকে দেখতে যায়, তখন সে ফিরে আসা পর্যন্ত জান্নাতের শস্যখেতে বিচরণ করতে থাকে।’^{৫৭৪}

৫৭৪. সহিহ মুসলিম : ২৫৬৮



আরেক হাদিসে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غُدْوَةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ
حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى
يُصْبِحَ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ

‘কোনো মুসলমান যখন সকালে কোনো (রোগাক্রান্ত) মুসলমানকে দেখতে যায়, তখন সন্ধ্যা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য রহমতের দুআ করতে থাকে। যদি সন্ধ্যায় দেখতে যায়, তাহলে সকাল পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য রহমতের দুআ করতে থাকে। আর জান্নাতে তার জন্য একটি ফলের বাগান তৈরি হয়।’^{৫৭৫}

রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে অনুধাবন করতে পারতেন রোগী দেখতে গেলে রোগী ও তার পরিবারের ওপর কীরূপ ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। তাই তিনি রোগী দেখতে যেতে এবং তাদের দুআ ও সহমর্মিতামূলক বাক্য শোনাতে একটুও অবহেলা করতেন না। এমনকি তাঁর খিদমতকারী এক ইহুদি বালক অসুস্থ হলে তাকেও দেখতে যান তিনি।

ঘটনাটি আনাস র. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন :

كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: «أَسْلِمَ»،
فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: أَطِيعْ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: «الْحَمْدُ
لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ»

‘এক ইহুদি বালক নবিজি ﷺ-এর সেবা করত। বালকটি অসুস্থ হয়ে পড়লে নবিজি ﷺ তাকে দেখতে গেলেন। তার শিয়রে বসে তিনি বললেন, ইসলাম গ্রহণ করো। সে তার পাশে থাকা পিতার দিকে তাকাল। পিতা বলল, আবুল কাসিমের (নবিজি ﷺ-এর) কথা

মেনে নাও। বালকটি মুসলমান হয়ে গেল। তখন নবিজি ﷺ “সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন” বলতে বলতে বের হয়ে এলেন।’৫৭৬

অসুস্থ ইহুদি বালককে দেখতে গিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করেননি। কারণ, তিনি জানতেন, তাঁর দেখতে যাওয়ার কারণে বালক এবং তার পিতার মাঝে তাঁর ভদ্রতা, মমতা ও সহমর্মিতার ইতিবাচক একটা প্রভাব পড়বে। ফলে তাঁর কথা মেনে নিতে তারা অস্বীকৃতি জানাবে না। বাস্তবেও তাই ঘটল। দেখতে যাওয়াটা বালকটির হিদায়াতের কারণ হলো আর রাসুলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর প্রশংসা করতে করতে ঘর থেকে বের হলেন যে, তাঁর মাধ্যমে তিনি একজন মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেছেন। কী মহান মানব ছিলেন আল্লাহর রাসুল ﷺ! কী বিচক্ষণ ও চতুর দ্বীনের দায়ি ছিলেন তিনি!

রোগী দেখতে যাওয়াকে রাসুলুল্লাহ ﷺ অনেক গুরুত্ব দিতেন। এজন্য তিনি রোগী দেখার নিয়ম ও সুনাত প্রণয়ন করেছেন। সাহাবায়ে কিরাম ﷺ তা সংরক্ষণ করেছেন এবং পবিত্র হাদিসগ্রন্থে তা সজ্জিত আকারে বর্ণিত হয়েছে।

তন্মধ্যে একটি সুনাত হলো, রোগীর শিয়রে বসা। যেমনটি আমরা ইহুদি বালককে দেখতে যাওয়ার হাদিসে দেখেছি। এ ছাড়াও আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﷺ নবিজি ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন :

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَادَ الْمَرِيضَ جَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ، ثُمَّ قَالَ سَبْعَ مَرَّاتٍ: «أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، أَنْ يَشْفِيكَ»

‘নবিজি ﷺ যখন কোনো রোগীকে দেখতে যেতেন, তখন তার শিয়রে বসতেন। তারপর সাতবার বলতেন, মহান আরশের অধিপতি মহান আল্লাহর নিকট আমি প্রার্থনা করছি, যেন তিনি তোমাকে শিফা দান করেন।’৫৭৭

৫৭৬. সহিহুল বুখারি : ১৩৫৬

৫৭৭. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৫৩৬

আরেকটি সুন্নাত হলো, ডান হাত রোগীর শরীরে বুলানো এবং তার জন্য দুআ করা। এ সম্পর্কে আয়িশা   বর্ণনা করেন :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِيهِ، يَمْسَحُ بِيَدِهِ
الْيُمْنَى وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبِ الْبَاسَ، اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي،
لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءٌ لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

‘নবিজি   তাঁর পরিবারের একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন। তখন তাঁর ডান হাত রোগীর শরীরে বুলাতে বুলাতে বললেন, হে আল্লাহ, হে মানুষের প্রভু, কষ্ট দূর করে দিন এবং এমন শিফা দান করুন, যেন এর পরে আবার রোগাক্রান্ত না হয়ে পড়ে। আপনিই শিফা দানকারী। আপনি ব্যতীত শিফা দান করার সাধ্য আর কারও নেই।’^{৫৭৮}

ইবনে আব্বাস   বর্ণনা করেন :

‘রাসুলুল্লাহ   এক বেদুইন রোগীকে দেখতে গেলেন। আর তিনি কোনো রোগী দেখতে গেলে বলতেন : لَا بَأْسَ ظُهُورُكَ إِنِّ شَاءَ اللَّهُ : অর্থাৎ চিন্তা করো না, তোমার রোগ তোমাকে গুনাহ থেকে পবিত্র করবে ইনশাআল্লাহ।’^{৫৭৯}

রোগী দেখার এ মহান সুন্নাতের ওপর প্রকৃত মুসলমানরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম আমল করে আসছে। এটা মুসলমানদের সামাজিক জীবনে তাদের পারস্পরিক হৃদয়তা, বন্ধুত্ব, সহমর্মিতা ও সমবেদনা জ্ঞাপনের অন্যতম মূলনীতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এর মাধ্যমে দুর্দশাগ্রস্তের দুর্দশা, চিন্তাক্রিষ্টের চিন্তা এবং দুঃখীর দুঃখ অনেকাংশে কমে যায়। পারস্পরিক ভালোবাসা ও হৃদয়তার ভিত্তি শক্ত হয়। ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় হয়। অঙ্গীকার পালন ও পরস্পর আশা-ভরসার পথ খুলে যায়।

৫৭৮. সহিহুল বুখারি : ৫৭৪৩

৫৭৯. সহিহুল বুখারি : ৩৬১৬

জানাজায় অংশগ্রহণ করে

প্রকৃত মুসলমান সমাজের মানুষের জানাজায় অংশগ্রহণ করে এবং তাকে বিদায় জানাতে তার লাশের সাথে গমন করে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ
الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ

‘এক মুসলমানের ওপর আরেক মুসলমানের অধিকার পাঁচটি। যথা : সালামের জবাব দেওয়া, রোগী দেখতে যাওয়া, জানাজার অনুসরণ করা, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচিদাতার উত্তর দেওয়া।’^{৫৮০}

মৃত্যুর পর লাশকে ঘিরে যে বিদআত ও কুসংস্কার সমাজে প্রচলিত আছে, সেসব থেকে সে বেঁচে থাকে। যেমন : নামাজ-দুআ বাদ দিয়ে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করে ক্রন্দন করা ইত্যাদি। এসব বাদ দিয়ে সে এ ক্ষেত্রে ইসলামি আদর্শ অনুযায়ী কাজ করে। মৃতের কাফন-দাফন, তাকে বিদায় জানানো ও তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করার ক্ষেত্রে প্রকৃত মুসলমান ইসলামের সঠিক আদর্শ অনুসরণ করে।

সুতরাং যখন কারও মৃত্যুপূর্ববর্তী অবস্থা গুরু হয়, তখন সে মৃত্যুপথযাত্রী রোগীর নিকট গিয়ে তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পড়তে থাকে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

‘তোমরা তোমাদের মৃত্যুপথযাত্রী লোকের নিকট তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ” পড়তে থাকো।’^{৫৮১}

যখন রুহ চলে যায়, তখন তার জন্য এমনভাবে দুআ করে যেভাবে রাসুলুল্লাহ ﷺ আবু সালামা রা. -এর জন্য তার মৃত্যুর পরপর দুআ করেছিলেন।

৫৮০. সহিহুল বুখারি : ১২৪০

৫৮১. সহিহ মুসলিম : ৯১৬

দুআটি নিম্নরূপ:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي
الْغَابِرِينَ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّزْ لَهُ فِيهِ

‘হে আল্লাহ, আপনি আবু সালামাকে ক্ষমা করে দিন, হিদায়াতপ্রাপ্তদের মাঝে তার মর্যাদা বুলন্দ করে দিন, অবশিষ্টদের মাঝে তার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করে দিন। হে বিশ্বজাহানের প্রভু, আমাদের ও তার সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিন এবং তার কবর প্রশস্ত ও আলোকিত করে দিন।’^{৫৮২}

তারপর সে শোকাহত পরিবারের লোকজনকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সেসব হাদিস শোনায়, যেগুলো বিপদগ্রস্তদের বিপদকে সহজ করে দেয় এবং যেসব হাদিসে প্রিয়জন হারিয়ে ধৈর্য ধরার ফজিলত ও ধৈর্যশীলদের বড় প্রতিদানের কথা বর্ণিত হয়েছে।

এ সম্পর্কিত একটি হাদিসে কুদসি আবু হুরাইরা রা থেকে রাসুলুল্লাহ স সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তাআলা বলেন :

مَا لِعَبْدِي الْمُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ، إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّةً مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا
ثُمَّ احْتَسَبَهُ، إِلَّا الْجَنَّةَ

‘আমি দুনিয়াতে কোনো বান্দার প্রিয়জনকে মৃত্যু দেওয়ার পর সে বান্দা যদি ধৈর্যধারণ করে এবং আমার নিকট সাওয়াবের প্রত্যাশা রাখে, তাহলে আমার নিকট তার একমাত্র প্রতিদান জান্নাত।’^{৫৮৩}

স্বজন হারানোর পর মুমিনদের কী অনুভূতি রাখা উচিত, তা সে মৃত ব্যক্তির স্বজনদের স্মরণ করিয়ে দেয়। এ ক্ষেত্রে সে রাসুলুল্লাহ স-এর নিচের হাদিসটির ওপর আমল করে।

৫৮২. সহিহ মুসলিম : ৯২০

৫৮৩. সহিহল বুখারি : ৬৪২৪

হাদিসটি উসামা বিন জাইদ   থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন :

فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ إِحْدَى بَنَاتِهِ تَدْعُوهُ، وَتُخْبِرُهُ أَنَّ صَبِيًّا لَهَا، أَوْ ابْنًا لَهَا فِي الْمَوْتِ، فَقَالَ لِلرَّسُولِ: ارْجِعْ إِلَيْهَا، فَأَخْبِرْهَا: أَنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أُعْطِيَ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، فَمَرَّهَا فَلْتَضْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ

‘রাসুলুল্লাহ  -এর এক কন্যা তাঁর নিকট এ খবর পাঠিয়ে তাঁকে ডাকতে দূত পাঠালেন যে, তার এক সন্তান মৃত্যুবরণ করেছে। রাসুলুল্লাহ   দূতকে বললেন, তার নিকট ফিরে যাও এবং তাকে বলো, যা নিয়ে গেছেন এবং যা দান করেছেন—সবই আল্লাহর। আল্লাহর নিকট প্রত্যেক বস্তুর নির্দিষ্ট একটি মেয়াদ আছে। তাই তাকে সবার করতে বলো এবং আল্লাহর নিকট প্রতিদানের আশা রাখতে বলো।’^{৫৮৪}

এমন বেদনাদায়ক মুহূর্তেও প্রকৃত মুসলমানের উচিত হলো, সে বিলাপ করা, কাপড় ছিঁড়ে ফেলা, কপোল চাপড়ানো, বড় আওয়াজে কথা বলে বলে ক্রন্দন করা ইত্যাকার বিষয় থেকে লোকদের নিষেধ করবে। বিশেষ করে মূর্খ ও অশিক্ষিত লোকদের নিষেধ করবে। তাদের বুঝাতে হবে যে, এতে মৃত ব্যক্তি কবরে কষ্ট পায় এবং যারা এমন কাজ করে তাদের অনেক বড় গুনাহ হয়।

হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে :

الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيَحَ عَلَيْهِ فِي رَوَايَةٍ مَا نِيَحَ عَلَيْهِ

‘মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করার কারণে তাকে কবরে আজাব দেওয়া হয়।’

আরেক রিওয়াযাতে এসেছে :

‘মৃত ব্যক্তির জন্য কৃত বিলাপক্রন্দন কবরে তাকে কষ্ট দেয়।’^{৫৮৫}

৫৮৪. সহিহ মুসলিম : ৯২৩

৫৮৫. সহিহুল বুখারি : ১২৯২, সহিহ মুসলিম : ৯২৭

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُذُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ
'যে ব্যক্তি (কারও মৃত্যুর পর) গাল চাপড়ায় অথবা কাপড় ছিঁড়ে
ফেলে অথবা জাহিলি যুগের মতো শব্দ করে ডাকে, সে আমাদের
দলভুক্ত নয়।' ৫৮৬

উম্মে আতিয়া নুসাইবা ؓ বলেন :

أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الْبَيْعَةِ، أَلَّا نَنُوحَ
'বাইআতের সময় রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের থেকে বিলাপক্রন্দন না
করার ব্যাপারে অঙ্গীকার নিয়েছেন।' ৫৮৭

অন্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ
قَطْرَانٍ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ

'বিলোপকারিণী মহিলা যদি তার মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করে, তাকে
কিয়ামতের দিন এমনভাবে ওঠানো হবে যে, তার গায়ে আলকাতরার
একটি জামা এবং খোস-পাঁচড়ার একটি বর্ম থাকবে।' ৫৮৮

তবে যে অশ্রু নিজের অজান্তেই চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে, তা শোকের আগুনে
অন্তর দন্ধ হওয়ার বার্তা বহন করে। এ কান্না নিষিদ্ধ নয়। অর্থাৎ যে কান্নায়
বিলাপ, চিৎকার ও নিষিদ্ধ বিষয় থাকবে না, সে কান্নায় কোনো গুনাহ নেই।

ইবনে উমর ؓ-এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন :

اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكْوَى لَهُ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَعَبْدِ

৫৮৬. সহিহুল বুখারি : ১২৯৭

৫৮৭. সহিহ মুসলিম : ৯৩৬

৫৮৮. সহিহ মুসলিম : ৯৩৪

اللَّهُ بْنُ مَسْعُودٍ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ فِي غَشِيَّةٍ، فَقَالَ: أَقَدْ قَضَى؟
قَالُوا: لَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا
رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَوْا، فَقَالَ: أَلَا
تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ، وَلَا بِحُزْنِ الْقَلْبِ، وَلَكِنْ
يُعَذِّبُ بِهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ - أَوْ يَرْحَمُ

‘সাদ বিন উবাদা ❷ অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসুলুল্লাহ ❷ তাকে দেখতে গেলেন। তাঁর সাথে আব্দুর রহমান বিন আওফ ❷, সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ❷ ও আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ❷ ছিলেন। সেখানে পৌঁছে তাঁকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, মারা গেছে? লোকেরা বলল, না, ওহ আল্লাহর রাসুল! তাকে এভাবে দেখে তিনি কেঁদে দিলেন। আর রাসুলুল্লাহ ❷-কে কাঁদতে দেখে লোকেরাও কান্না জুড়ে দিল। তখন রাসুলুল্লাহ ❷ বললেন, তোমরা কি শোনোনি যে, আল্লাহ তাআলা চোখের অশ্রু ও অন্তরের ব্যথার কারণে কাউকে আজাব দেবেন না? কিন্তু (জিহ্বার দিকে ইঙ্গিত করে) এ অঙ্গটির কারণে আজাব দেবেন অথবা রহম করবেন।’^{৫৮৯}

উসামা বিন জাইদ ❷ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ❷-এর এক কন্যার ছেলে মৃত্যুবরণ করলে তিনি সেখানে উপস্থিত হলেন। তখন তাঁর দুচোখ বেয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হলো। তখন সাদ ❷ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি কাঁদছেন যে! তিনি বললেন :

هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحْمَاءَ

‘এটা দয়া, যা আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের অন্তরে সৃষ্টি করেছেন। আর আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের মধ্যে কেবল তাদের প্রতিই রহম করবেন, যাদের মাঝে দয়া আছে।’^{৫৯০}

৫৮৯. সহিহুল বুখারি : ১৩০৪, সহিহ মুসলিম : ৯২৪

৫৯০. সহিহ মুসলিম : ৯২৩, সহিহুল বুখারি : ১২৮৪

আনাস ؓ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ তাঁর ছেলে ইবরাহিম ؑ-এর মৃত্যুর পর তার নিকট গেলেন। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দুচোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলে আব্দুর রহমান বিন আওফ ؓ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আপনিও কাঁদছেন!? তখন তিনি বললেন :

يَا ابْنَ عَوْفٍ إِنَّهَا رَحْمَةٌ، ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأُخْرَى، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْعَيْنَ تَذْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ

‘হে ইবনে আওফ, এটা রহমত ও দয়া। তারপর বললেন, চক্ষু অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছে, আর অন্তর ব্যথাতুর হয়ে আছে তা ঠিক, কিন্তু আমরা কেবল এমন কথাই বলছি, যা আমাদের রবকে সন্তুষ্ট করে। হে ইবরাহিম, তোমার বিরহে আজ আমরা শোকাহত।’^{৫৯১}

প্রকৃত মুত্তাকি মুসলমান দাফনকার্য শেষ করা পর্যন্ত মৃতদেহের সাথে থাকতে চেষ্টা করে। কারণ, এতে অনেক বড় সাওয়াব রয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ

‘যে ব্যক্তি মৃতদেহের সাথে থেকে তার জানাজা পড়ে, সে এক কিরাত সাওয়াব পায়। আর যে দাফনকার্য সমাপ্ত করা পর্যন্ত তার সাথে থাকে, সে দুই কিরাত সাওয়াব পায়। জিজ্ঞাসা করা হলো, দুই কিরাত কী? বললেন, বড় বড় দুটি পাহাড়ের সমপরিমাণ।’^{৫৯২}

কোনো মুসলমান মারা গেলে তার দাফন পর্যন্ত তার সাথে থেকে তাকে বিদায় জানাতে ইসলাম উদ্বুদ্ধ করে। কারণ, এর মাধ্যমে মুসলমানদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধন

৫৯১. সহিহুল বুখারি : ১৩০৩

৫৯২. সহিহ মুসলিম : ৯৪৫

সুদৃঢ় হয় এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি অটুট থাকে। তা ছাড়া এতে শোকাহত পরিবার ধৈর্য ধরার শক্তি পায়। সান্ত্বনার স্নিগ্ধতা অনুভব করতে পারে তারা। বিশেষ করে তারা যখন জানতে পারে যে, সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যারা তাদের স্বজনের জানাজা পড়ছে, তারা আল্লাহর নিকট তার জন্য সুপারিশ করছে, তখন তারা মনে আরও বেশি প্রশান্তি ও সান্ত্বনা অনুভব করে।

হাদিস শরিফে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ

‘কোনো মুসলমান মৃত্যুবরণ করার পর এমন চল্লিশজন ব্যক্তি যদি তার জানাজা পড়ে, যারা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করে না, তখন আল্লাহ তাআলা মৃত ব্যক্তির জন্য তাদের সুপারিশ কবুল করবেন।’^{৫৯৩}

মুসলমানকে অবশ্যই জানাজার নামাজের নিয়ম জানা থাকতে হবে। জানাজা পড়ার জন্য যেসব দুআ রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত আছে, তা মুখস্থ থাকতে হবে। সুতরাং যখন জানাজা পড়ানোর জন্য মৃতদেহ মাটিতে রাখা হবে এবং মানুষ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে, তখন ইমাম প্রথমে তাকবির বলবে। তারপর আউজুবিল্লাহ পড়ে সুরা ফাতিহা তিলাওয়াত করবে।^{৫৯৪} তারপর দ্বিতীয় তাকবির বলবে। দ্বিতীয় তাকবির বলার পর দরুদে ইবরাহিম (নামাজে যে দরুদ পড়া হয়) পড়বে। তারপর তৃতীয় তাকবির বলবে এবং তাকবিরের পর মৃত ও সকল মুসলমানদের জন্য দুআ করবে। এখানে পড়ার জন্য সর্বাধিক বিশুদ্ধ রিওয়াযাতে বর্ণিত দুআটি আওফ বিন মালিক রাঃ বর্ণনা করেছেন।

৫৯৩. সহিহ মুসলিম : ৯৪৮

৫৯৪. এটা অন্য মাজহাবের আমল। কিন্তু হানাফি মাজহাব অনুসারে প্রথম তাকবিরের পর সুরা ফাতিহা না পড়ে নামাজের প্রথম রাকআতে যে সানা পড়ে, সেটাই পড়বে। সাথে ‘ওয়া জাল্লা সানাউকা’ অতিরিক্ত পড়বে। এভাবে বলবে, ‘সুবহানাকাল্লাহুমা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকাসমুকা ওয়া তাআলা জাদুকা ওয়া জাল্লা সানাউকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুক’। (অনুবাদক)



তিনি বলেন :

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ
وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ، اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ،
وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا
نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا
خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ
عَذَابِ الْقَبْرِ - أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ - قَالَ: حَتَّى تَمْنَيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا
ذَلِكَ الْمَيِّتَ

‘রাসুলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তির জানাজা পড়লেন। সেখানে তিনি বললেন, হে আল্লাহ, তাকে ক্ষমা করুন এবং তার প্রতি রহম করুন। তাকে নিরাপদে রাখুন এবং তার গুনাহ ক্ষমা করুন। তাকে সাদরে আপ্যায়ন করুন এবং তার কবরকে প্রশস্ত করুন। তাকে পানি, বরফ ও কুয়াশার পানি দ্বারা ধৌত করুন (অর্থাৎ তার গুনাহসমূহ রহমত ও করুণা দ্বারা ধুয়ে ফেলুন)। তাকে গুনাহসমূহ থেকে এমনভাবে পরিচ্ছন্ন করুন, যেমনভাবে সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পরিচ্ছন্ন করেছেন। তাকে তার ঘরের চেয়ে উত্তম ঘর দান করুন। তার পরিবারের চেয়ে উত্তম পরিবার দান করুন। তার স্ত্রীর চেয়ে উত্তম স্ত্রী দান করুন। তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। তাকে কবর ও জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করুন। বর্ণনাকারী বলেন, এমন দুআ শুনে আমার আকাজক্ষা হলো, ইশ্, আমিই যদি এ মৃত ব্যক্তির জায়গায় হতাম!’^{৫৯৫}

এরপর চতুর্থ তাকবির বলবে এবং এ দুআটি পাঠ করবে :

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ

‘হে আল্লাহ, তার প্রতিদান থেকে আমাদের বঞ্চিত করবেন না এবং তার পরে আমাদের ফিতনায় নিপতিত করবেন না। আর তার ও আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন।’^{৫৯৬}

দুআটি পড়ার পর সালাম ফেরাবে।^{৫৯৭}

জানাজা পড়ার পর দলবদ্ধ হয়ে কবরের দিকে যাবে এবং লাশ কবরে রাখবে। যখন দাফনকার্য সম্পন্ন হবে, তখন তার মাগফিরাত ও (মুনকার-নাকিরের প্রশ্নের সময়) অটলতার জন্য দুআ করবে। রাসুলুল্লাহ ﷺ এমনটিই করতেন এবং করতে নির্দেশ দিতেন।

উসমান বিন আফফান ﷺ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ মৃত ব্যক্তির দাফনকার্য সম্পন্ন করার পর কবরের নিকট দাঁড়িয়ে বলতেন :

اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَسَلُّوا لَهُ بِالتَّثْبِيتِ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ

‘তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করো এবং তার অটলতার জন্য দুআ করো। কারণ, এখনই তাকে প্রশ্ন করা হবে।’^{৫৯৮}

আমর বিন আস ﷺ বলেছেন :

فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا، ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقَسَّمُ لَحْمُهَا، حَتَّى أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ، وَأَنْظُرَ مَاذَا أَرَا جُعْ بِهِ رُسُلَ رَبِّي

‘যখন তোমরা আমাকে দাফন করবে, তখন আমার কবরের নিকট ততক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে, যতক্ষণ সময়ে একটি উট জবাই করে তার গোশত বণ্টন করা যায়। যাতে তোমাদের উপস্থিতিতে আমি কিছুটা স্বস্তি অনুভব করতে পারি এবং এবং চিন্তা করতে পারি

৫৯৬. এ দুআটি সব হাদিসের কিতাবে لَا تَحْرِمُنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنْنَا بَعْدَهُ اللهُ এতটুকুই বর্ণিত হয়েছে। শেষের وَاعْفِرْ لَنَا اللهُ অংশটি আমি কোথাও খুঁজে পাইনি। (অনুবাদক)

৫৯৭. আমাদের হানাফি মাজহাব মতে চতুর্থ তাকবিরের পর আর কোনো দুআ পড়বে না, তাকবিরের পরপরই সালাম ফেরাবে। (অনুবাদক)

৫৯৮. সুনানু আবি দাউদ : ৩২২১



যে, আমার প্রতিপালকের দূতের (মুনকার-নাকির ফেরেশতার) কী
জবাব দেবো।^{৫৯৯}

শাফিয়ি মাজহাব অনুসারে, দাফনের পর কবরের নিকট দাঁড়িয়ে কুরআনের
কিছু অংশ তিলাওয়াত করা মুসতাহাব। পূর্ণাঙ্গ কুরআন খতম করতে পারলে
আরও ভালো।^{৬০০}

এ কাজসমূহে মুসলমানের অংশগ্রহণ সামাজিক জীবনকে পূর্ণাঙ্গরূপে অনুধাবন
করতে পারার পরিচায়ক। কারণ, জীবন শুধু সুখ ও সমৃদ্ধি নিয়েই গঠিত নয়।
জীবনে আনন্দ যেমন রয়েছে, তেমনই বেদনাও আছে। খুশি যেমন আছে,
তেমনই পেরেশানিও আছে। সচ্ছলতা যেমন আছে, তেমনই আছে দুর্ভিক্ষ।
সব মিলিয়েই জীবন। প্রকৃত মুসলমানের জীবনে এসবের প্রতিটি বিষয়ই
থাকে। কারণ, তার নিকট মানবজীবনের প্রতিটি অংশের জন্য বার্তা আছে,
যা তাকে পৌঁছে দিতে হয়। প্রতিটি অংশের জন্য কথা আছে, যা তাকে বলে
দিতে হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে দায়িত্ব আছে, যা তাকে আনজাম দিয়ে যেতে হয়।

উপকারের বিনিময় প্রদান করে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে

প্রকৃত মুসলমানের আরেকটি উত্তম গুণ হলো, সে উপকারের বিনিময় প্রদান
করে, তা অস্বীকার করে না। তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, ভুলে যায় না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الشَّنَاءِ

‘কেউ কাউকে উপকার করল, আর উপকৃত ব্যক্তি উপকারকারীকে
বলল, আল্লাহ তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন, তখন সে পরিপূর্ণ
প্রশংসা করল।’^{৬০১}

অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেছেন :

৫৯৯. সহিহ মুসলিম : ১২১

৬০০. আল-মাজমু শারহুল মুহাজ্জাব : ৫/২৫৪

৬০১. সুনানুত তিরমিজি : ২০৩৫

مَنْ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ فَأَعِيدُوهُ... وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ

‘কেউ তোমাদের নিকট মাগফিরাতের দুআ চাইলে তার জন্য তোমরা মাগফিরাতের দুআ করবে। ...আর কেউ তোমাদের উপকার করলে তোমরা উপকারের বিনিময় দেবে।’^{৬০২}

মুসলমান উপকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তার ধর্মের অনুশাসন হিসাবেই। মেকি সামাজিকতা দেখাতে নয়, যেখানে স্বার্থ ও পার্থিব উপকারের লোভ থাকে। তাই কেউ আন্তরিকভাবে উপকার করার চেষ্টা করলে; যদিও উপকার করতে না পারুক, প্রকৃত মুসলমান তার সে প্রচেষ্টার ওপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

কেননা, কেউ আন্তরিকভাবে উপকার করার চেষ্টা করলেই সে কৃতজ্ঞতা পাওয়ার অধিকার রাখে। কৃতজ্ঞতা পাওয়ার জন্য উপকার সম্পন্ন করার প্রয়োজন নেই। এটাই ইসলামের শিক্ষা।

উপকারকারীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার গুণটি মুসলমানদের মাঝে আনার জন্য ইসলামে খুব জোর দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, উপকারকারীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা পরিপূর্ণ হয় না। তাই যে ব্যক্তি উপকারকারীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চায় না এবং মুখ দিয়ে এমন কোনো বাক্য বের করে না, যা উপকারকারীর হৃদয়ে প্রশান্তির হাওয়া বইয়ে দেয় এবং তার মাঝে উপকার করার প্রবণতা আরও বৃদ্ধি করে, সে ব্যক্তি চরম নাশোকর ও অকৃতজ্ঞ। তার মাঝে নিয়ামতের কদর ও মর্যাদা নেই। তাই সে ব্যক্তি মহান নিয়ামতদাতা আল্লাহর গুরুরিয়া আদায় করার যোগ্যতা ও অধিকার রাখে না।

এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ

‘যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না, সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে না।’^{৬০৩}

৬০২. সুনানু আবি দাউদ : ১৬৭২

৬০৩. সুনানু আবি দাউদ : ৪৮১১

এর কারণ হলো, কেউ আপনার উপকার করলে আপনি যদি তার প্রশংসা করেন, এর মাধ্যমে ভালো কাজের প্রসার ও বিস্তার ঘটবে। সে আরও ভালো কাজ করার উৎসাহ ও প্রেরণা পাবে। এভাবে মানুষের মাঝে উপকার ও ভালো কাজের স্বীকৃতি দেওয়ার মানসিকতা তৈরি হবে। এ ছাড়াও এর মাধ্যমে সমাজে পারস্পরিক ভালোবাসা ও হৃদয়তার বন্ধন মজবুত হবে। হৃদয়সমূহে ভালোবাসার দ্বার উন্মুক্ত হবে এবং ভালো কাজ করার প্রতি সবাই মন থেকে প্রেরণা অনুভব করবে। মোটকথা, ইসলাম যেসব বিষয় সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, সেখান থেকে অনেক বিষয় উপকারের কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যমে সহজভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠা পায়।

মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকে এবং তাদের থেকে কষ্ট পেলে সবার করে

প্রকৃত প্র্যাক্টিসিং মুসলমান মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকে এবং তাদের থেকে কোনো কষ্ট পেলে তার ওপর সবার করে। কারণ, সে একজন ইসলামের বার্তাবাহক ও দায়ি। এমন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যার কাঁধে অর্পিত, তাকে অবশ্যই এ দায়িত্বের জন্য কুরবানি দিতে হবে। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পাওয়া কষ্টগুলোর ওপর ধৈর্য ধরতে হবে। দাওয়াত দিতে গিয়ে মানুষের অবাঞ্ছিত প্রশ্ন হজম করতে হবে। তাদের মন্দ ব্যবহার সহ্য করতে হবে। তাদের ভ্রান্ত ধারণা ও বোধের মোকাবেলা করতে হবে ধৈর্য ও চাতুর্যের সাথে। এভাবে তাদের মাঝে থেকে তাদের সকল কষ্ট সহ্য করতে হবে, ধৈর্য ধরতে হবে। এজন্যই তো রাসুলুল্লাহ ﷺ ঘোষণা দিয়েছেন, যারা দাওয়াতের কঠিন পথে ধৈর্যধারণ করে, তারা তাদের চেয়ে উত্তম, যারা অধৈর্য।

ইরশাদ করেছেন :

الْمُؤْمِنُ الَّذِي يُخَالِطُ النَّاسَ، وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ، خَيْرٌ مِنَ الَّذِي لَا
يُخَالِطُ النَّاسَ، وَلَا يَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ

‘যে ব্যক্তি মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকে এবং তাদের পক্ষ থেকে পাওয়া কষ্টগুলোর ওপর ধৈর্যধারণ করে, সে ওই ব্যক্তির চেয়ে

উত্তম, যে মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকে না এবং তাদের থেকে পাওয়া কষ্টগুলোর ওপর ধৈর্য ধরে না।^{৬০৪}

রাসুলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর পূর্ববর্তী সকল নবি ﷺ লোকদের অমনোযোগিতা, মিথ্যা প্রতিপন্নতা ও উপহাসসহ তাদের পক্ষ থেকে পাওয়া সব ধরনের কষ্ট সহ্য করার ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য রকমের দৃঢ় ছিলেন। এভাবে কষ্ট ও শত্রুতার কারণে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠলেও প্রকৃত দায়িগণকে নবিগণের মতো ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করতে হবে।

নবিগণের ধৈর্যের একটি উদাহরণ সহিহ বুখারি ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে :

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِسْمَةً كَبِغَضٍ مَا كَانَ يَقْسِمُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: وَاللَّهِ إِنَّهَا لَقِسْمَةٌ مَا أُريدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ، قُلْتُ: أَمَّا أَنَا لَأَقُولَنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ فَسَارَرْتُهُ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَغَضِبَ، حَتَّى وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَخْبَرْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: قَدْ أُوزِي مُوسَى بِأَكْثَرٍ مِنْ ذَلِكَ فَصَبَرَ

‘আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, নবিজি ﷺ নিয়মতান্ত্রিকভাবে কিছু বস্তু বন্টন করলেন। তখন এক আনসারি ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম, এ বন্টন আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী হয়নি। আমি তার এ ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা ব্যাপারে কানে কানে নবিজি ﷺ-কে অবহিত করলাম। তখন তিনি খুব ব্যথিত হলেন এবং রাগে তাঁর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল। এমনকি, আমি মনে মনে বললাম, ইশ্! তাঁকে না বললেই বুঝি ভালো হতো! তারপন তিনি বললেন, মুসা ﷺ-কে এর চেয়ে বেশি কষ্ট দেওয়া হয়েছিল, তবুও তিনি ধৈর্য ধরেছিলেন।^{৬০৫}

একটিমাত্র বাক্য বলে রাসুলুল্লাহ ﷺ রাগ সংবরণ করে নিলেন এবং তাঁর চিরাচরিত উদারচেতার পরিচয় দিলেন।

৬০৪. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৩৮৮

৬০৫. সহিহুল বুখারি : ৬১০০, সহিহ মুসলিম : ১০৬২

সর্বযুগে ও সর্বজায়গায় নবিগণ ও সত্যিকারের দায়ীদের স্বভাব এমনই ছিল। তারা মানুষের দেওয়া কষ্ট, তাদের মিথ্যা প্রতিপন্নতা ও কটু কথার ওপর ধৈর্যধারণ করেছেন। কারণ, এ গুণ না থাকলে দাওয়াতের ধারাবাহিকতা থাকবে না। দায়িরাও টিকতে পারবে না দাওয়াতের মাঠে।

প্রকৃত মুসলমান নির্বোধ মানুষের সাথে সুন্দর আচরণ করতে এবং তাদের অশ্লীল ভাষা ও অনিষ্টতা থেকে বাঁচতে শিথিলতা করে না। প্রকৃত মুসলমান মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকার সময় ও তাদের সাথে কথা বলার সময় অত্যন্ত চালাকি ও চতুরতার পরিচয় দেয়। মানুষ তার মাঝে দুর্ব্যবহার ও কঠোরতা পায় না। অভদ্রতা ও রুঢ়তা তার মাঝে দেখতে পায় না। রাসুলুল্লাহ ﷺ-ও ঠিক এমনই ছিলেন।

ইমাম বুখারি رحمه الله আয়িশা رضي الله عنها থেকে বর্ণনা করেন :

أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ائْذِنُوا لَهُ، فَلَبِثَسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ، أَوْ بِئْسَ رَجُلٌ الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ أَلَانَ لَهُ الْقَوْلَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتُ لَهُ الَّذِي قُلْتُ، ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ؟ قَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَنْ وَدَّعَهُ، أَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ

‘এক ব্যক্তি নবি ﷺ-এর নিকট প্রবেশ করার অনুমতি চাইল। তিনি বললেন, তাকে অনুমতি দাও। সে তার বংশের নিকৃষ্ট সন্তান। অথবা বললেন, সে তার গোত্রের নিকৃষ্টতম ভাই। যখন সে প্রবেশ করল, তখন তিনি তার সাথে নম্রভাবে কথাবার্তা বললেন। আমি (আয়িশা رضي الله عنها) বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি এর সম্পর্কে যা বলার তা বলেছেন, এখন আপনি তার সাথে নম্রভাবে কথা বললেন যে!?’ তিনি বললেন, হে আয়িশা, আল্লাহর কাছে মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তি, যার অশালীন আচরণ থেকে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ তার সংশ্রব ত্যাগ করে।’ ৬০৬

আবু দারদা   বলতেন :

إِنَّا لَنَكْثِرُ فِي وُجُوهِ أَقْوَامٍ، وَإِنَّ قُلُوبَنَا لَتَلْعَنُهُمْ

‘আমরা অনেক মানুষের সাথে হাসিমুখে কথা বলতাম; অথচ আমাদের অন্তর তাদের প্রতি অভিসম্পাত করত।’^{৬০৭}

দায়িরা মানুষের কাছ থেকে সব সময় বিরূপ আচরণই পায় তা নয়। অনেক সময় তাদের কাছ থেকে এমন অনেক আচরণ প্রকাশ পায়, যা মন ভালো করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। তাই তাদের পক্ষ থেকে কোনো কষ্ট পেলে তার ওপর দায়িদের সবর করা এবং তাদের সাথে আচরণে ও হকের পথে আহ্বান করার ক্ষেত্রে বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করা বাঞ্ছনীয়।

লোকদের আনন্দ দেয়

প্রকৃত মুসলমান—যার অন্তরে ইসলামের আলো প্রোজ্জ্বলমান—যে এলাকায় বসবাস করে, সেখানকার অধিবাসীদের আনন্দ দিতে সচেষ্ট থাকে। সবার মাঝে হৃদয়তা, বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা সৃষ্টি করার প্রয়াস চালায়। ইসলামের গঞ্জির ভেতর থেকে মানুষকে আনন্দ দেওয়া শরিয়তে পছন্দনীয়। এর প্রতি ইসলাম তার অনুসারীদের উদ্বুদ্ধ করে। যাতে ইসলামি সমাজে পারস্পরিক ভালোবাসা ও হাসি-আনন্দ থাকে। এজন্য ইসলাম সেই ব্যক্তির জন্য সাওয়াব নির্ধারণ করেছে, যে মুসলমানদের অন্তরে আনন্দের সঞ্চার করে।

রাসুলুল্লাহ   ইরশাদ করেছেন :

مَنْ لَقِيَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ بِمَا يُحِبُّ لَيْسَرَهُ بِذَلِكَ سَرَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

‘যে ব্যক্তি মুসলমান ভাইয়ের সাথে আল্লাহর পছন্দনীয় বিষয়ের মাধ্যমে আনন্দ দেওয়ার জন্য সাক্ষাৎ করে, আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন আনন্দিত করবেন।’^{৬০৮}

৬০৭. সহিহুল বুখারি (তালিক) : بَابُ الْمَدَارَاةِ مَعَ النَّاسِ (মানুষের সাথে সৌজন্যপূর্ণ আচরণের অধ্যায়)

৬০৮. আল-মুজামুস সাগির, তাবারানি : ১১৭৮



আনন্দ দানের অনেক বৈধ পন্থা রয়েছে, মুসলমান চাইলে তার যেকোনো একটির মাধ্যমে মুসলমান ভাইদের মনে আনন্দের সঞ্চার করতে পারে। যেমন উত্তম ও সুন্দর কথা বলা, ভালোবাসাপূর্ণ হাসি উপহার দেওয়া, আনন্দদায়ক সুসংবাদ দেওয়া, সমবেদনাজ্ঞাপক সহমর্মিতা, নিঃস্বার্থ সাক্ষাৎ, আন্তরিক সহযোগিতা ইত্যাদি বিষয়, যেগুলো অন্তরে ভালোবাসার সৃষ্টি করে এবং হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা ঝোঁটিয়ে বিদায় করে।

মুসলমানের মাঝে যখন এ গুণটি স্বাভাবিক হয়ে যায়, তখন সে তার স্বাভাবিক সকল কর্মেই নেক আমলের পরিধির মধ্যে থাকে, যা তাকে আল্লাহর নৈকট্যশীল করে তোলে এবং মানুষের নিকট তাদের প্রিয়ভাজনে পরিণত করে।

কল্যাণের পথ দেখায়

যেসব উত্তম আমলের মাধ্যমে প্রকৃত মুসলমানের পরিচয় পাওয়া যায়, সেসবের একটি হলো কল্যাণের পথ দেখানো। কাউকেই সে কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করতে চায় না। মানুষের কাছ থেকে এমন কোনো বিষয় সে গোপন করে না, যাতে মানুষের উপকার ও কল্যাণ বিদ্যমান থাকে। কারণ, তার দীন তাকে এ শিক্ষা দেয় যে, যে ব্যক্তি ভালো কাজের পথ দেখায়, সে আমলকারীর অনুরূপ সাওয়াব পাবে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

‘যে ব্যক্তি ভালো কাজের পথ দেখাবে, সে আমলকারীর অনুরূপ সাওয়াব পাবে।’^{৬০৯}

প্রকৃত মুসলমান ভালো ও কল্যাণকে নিজের কাছে কুক্ষিগত করে রাখে না। সে নিজে যেমন ভালো কর্ম করে, তেমনই অন্যকেও তার দিকে পথনির্দেশ করে। এভাবে সে দুটি প্রতিদান লাভ করে। তা ছাড়া এর মাধ্যমে সমাজে ভালো কাজ ও কল্যাণের প্রসার ঘটে। সাধ্য ও সুযোগ অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি

৬০৯. সহিহ মুসলিম : ১৮৯৩

ভালো ও কল্যাণের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। আবার এসব করতে গিয়ে সে মোটেই দাঙ্গিকতা প্রদর্শন ও সুখ্যাতি অর্জনের নিয়ত করে না।

বর্তমান সময়ে সমাজ থেকে ভালো ও কল্যাণের কাজ কমে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হলো, যারা ভালো কাজ করে, তারা চায় না যে, অন্যরা তাদের মতো ভালো কাজ করুক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সমাজের জন্য তাদের ভালো কর্ম যথেষ্ট নয়। এভাবে সমাজ থেকে কল্যাণ বিদায় নিচ্ছে। উপকারের পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সমাজ বঞ্চিত হচ্ছে কল্যাণ থেকে, যা গুটিকয়েক মানুষের মাঝে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। যারা ভালো কাজ করছে, তারা নিজেরাই সমাজের সর্বত্র কল্যাণ করার ঠিকাদারি নিয়ে বসে আছে। অন্যদের কল্যাণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করছে না। এভাবেই সময় চলে যাচ্ছে, আর গুটিকয়েক মানুষ ব্যতীত সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে কল্যাণ থেকে। প্রকৃত মুসলমান সমাজকে এ বিপদ থেকে উদ্ধারের চেষ্টা করে। সে নিজে যেমন ভালো ও কল্যাণমূলক কাজ করে, তেমনই অন্যদেরও তার প্রতি উৎসাহিত করে, পথনির্দেশ করে। এভাবে সমাজে ব্যাপক কল্যাণ হওয়ার পাশাপাশি সাওয়াবও সে দ্বিগুণ লাভ করে।

সহজ করে, কঠিন করে না

প্রকৃত মুসলমান সব বিষয়ে সহজকরণ ও সরলতা অবলম্বন করে। কাঠিন্য ও জটিলতা তার অভিধানে নেই। কারণ, সকল বিষয়ে সহজকরণ মুমিনদের চরিত্র। বান্দাদের জন্য আল্লাহও এটাই পছন্দ করেন।

তিনি ইরশাদ করেন :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

‘আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান, তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না।’^{৬১০}

এজন্য মুসলমানদের সহজকরণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং জটিলতা থেকে নিষেধ করে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

৬১০. সূরা আল-বাকারাহ : ১৮৫

عَلَّمُوا وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ

‘তোমরা শিক্ষা দাও এবং সহজ করো, কঠিন কোরো না। আর তোমাদের যখন রাগ আসবে, তখন চুপ হয়ে যাবে।’^{৬১১}

জটিলতা ও কাঠিন্য কেবল সে ব্যক্তির নিকট আশা করা যায়, যার স্বভাবে বক্রতা আছে, চরিত্রে কার্পণ্য আছে এবং যার লালনপালনে ত্রুটি আছে। ইসলামি চরিত্রে চরিত্রবান ব্যক্তির মাঝে জটিলতা ও দুর্বোধ্যতা থাকে না। সে স্বেচ্ছায় জটিলতা ও কাঠিন্য বেছে নিয়ে নিজের জন্য কল্যাণের পথ রুদ্ধ করতে চায় না। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর স্বভাবও এমন (জটিলতামুক্ত) ছিল।

উম্মুল মুমিনিন আয়িশা ؓ বর্ণনা করেন :

مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ، فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا

‘রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে দুটি বিষয়ের যেকোনো একটি গ্রহণ করার ইচ্ছাধিকার দেওয়া হলে তিনি তুলনামূলক সহজটি গ্রহণ করতেন, যদি তাতে গুনাহ না থাকে। আর যদি তাতে গুনাহ থাকে, তাহলে তিনি তা থেকে সবচেয়ে দূরে থাকতেন। আর রাসুলুল্লাহ ﷺ নিজের জন্য কখনো প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। তবে আল্লাহর (বিধানের) মর্যাদা ব্যাহত হতে দেখলে তিনি আল্লাহর জন্য তার बदলা নিতেন।’^{৬১২}

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নবুওয়াতি দৃষ্টিভঙ্গি এমনটাই ছিল। কারণ, তিনি মানুষের দুর্বলতা, কষ্টসহনশীলতা ও ধৈর্যের ক্ষেত্রে তাদের তারতম্য অনুধাবন করতে পারতেন। এজন্য তাদের জন্য যথাযোগ্য ও উপযোগী বিষয়টিই তিনি বেছে নিতেন। কঠিন ও জটিল বিষয় বেছে নিয়ে তাদের মাঝে কষ্ট ও ভীতি সৃষ্টি

৬১১. আল-আদাবুল মুফরাদ : ২৪৫

৬১২. সহিহুল বুখারি : ৩৫৬০

করতেন না। ফলে দেখা যায়, রাসুলুল্লাহ ﷺ সহজ বিষয়টিকেই মুসলিম উম্মাহর জন্য শরিয়ত ও সুন্নাহ হিসাবে প্রবর্তন করেছেন। যেন তাদের জীবন কাঠিন্য ও জটিলতার মারপ্যাচে পড়ে দুর্বিসহ না হয়ে ওঠে।

ন্যায়বিচারক

প্রকৃত হিদায়াতপ্রাপ্ত মুসলমান বিচার-ফয়সালার ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ হয়। যত কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখিই হোক, সে কারও প্রতি জুলুম ও অন্যায় করে না এবং কারও ন্যায়্য অধিকার হরণ করে না। কারণ, ন্যায়পরায়ণতা ও অন্যায় থেকে বিরত থাকা তার দ্বীন ও আকিদার মৌলিক অংশ। পবিত্র কুরআন ও হাদিসের একাধিক জায়গায় এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ইনসাফ বা ন্যায়পরায়ণতা এমন এক বিষয়, যেখানে শিথিলতা করা বা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার কোনো সুযোগ নেই।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দেন, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানতসমূহ প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও। আর যখন তোমরা মানুষের কোনো বিচার-মীমাংসা করতে আরম্ভ করো, তখন মীমাংসা করো ন্যায়ভিত্তিক।’^{৬১৩}

মুসলমান ব্যক্তি ও ইসলামি সমাজ ইনসাফ বা ন্যায়পরায়ণতা বলতে যা বোঝে, তা সম্পূর্ণ খাঁটি ও নিরেট। বন্ধুত্ব বা শত্রুতা তাতে কোনো ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে না। আত্মীয়তার সম্পর্ক তার স্বচ্ছতায় দাগ লাগাতে পারে না।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

৬১৩. সূরা আন-নিসা : ৫৮

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

‘হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানের
ব্যাপারে অবিচল থাকবে এবং কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতার কারণে
কখনো ন্যায়বিচার পরিত্যাগ করো না। সুবিচার করো; এটাই
আল্লাহভীতির অধিক নিকটবর্তী। আল্লাহকে ভয় করো। তোমরা যা
করো, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে খুব জ্ঞাত।’^{৬১৪}

অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন :

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

‘যখন তোমরা কথা বলো, তখন সুবিচার করো; যদিও সে আত্মীয় হয়।’^{৬১৫}

রাসুলুল্লাহ ﷺ ন্যায়বিচারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, যখন উসামা
বিন জাইদ ؓ তাঁর নিকট মাখজুম গোত্রের এক নারী চোরের হদ (আল্লাহর
নির্ধারিত শাস্তি) মওকুফের সুপারিশ করেছিলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ তার হাত
কর্তন করার দৃঢ় ইচ্ছা করার পর উসামা ؓ সুপারিশ করতে এলে তিনি
বললেন :

أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ?... وَآيُمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ
سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

‘তুমি কি আল্লাহর নির্ধারিত হদ (শাস্তিবিধান) এর ব্যাপারে সুপারিশ
করতে এসেছ? ...আল্লাহর শপথ করে বলছি, যদি মুহাম্মাদের কন্যা
ফাতিমাও চুরি করত, তবুও আমি তার হাত কেটে ফেলতাম।’^{৬১৬}

ইনসাফ ও ন্যায়বিচার তাকেই বলে, যা বড়-ছোট, ধনী-গরিব, মুসলিম-
অমুসলিম সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হয় এবং যার পাকড়াও থেকে

৬১৪. সূরা আল-মায়িদা : ৮

৬১৫. সূরা আল-আনআম : ১৫২

৬১৬. সহিহুল বুখারি : ৩৪৭৫, সহিহ মুসলিম : ১৬৮৮

কেউই রক্ষা পায় না। ইসলামি সমাজের ইনসাফ ও ন্যায়বিচার এবং অন্যান্য সমাজের ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের মধ্যে এই বিষয়টিই পার্থক্য সৃষ্টি করে দেয়। ইসলামের ইতিহাসে এমন অনেক নজির রয়েছে, যেখানে ন্যায়বিচারের ক্ষেত্রে কারও সম্মান ও পদমর্যাদা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা কাজি গুরাইহ رحمہ اللہ-এর বিচারালয়ে তৎকালীন আমিরুল মুমিনিন আলি رحمہ اللہ ও জনৈক ইহুদির মাঝে সংঘটিত হয়েছিল। ইহুদি লোকটা আলি رحمہ اللہ-এর একটি বর্ম চুরি করেছিল। কাজি গুরাইহ আলি رحمہ اللہ-এর নিকট তাঁর দাবির স্বপক্ষে দলিল পেশ করতে বললে তিনি দলিল পেশ করতে পারেননি। তাই কাজি গুরাইহ আলি رحمہ اللہ-এর বিপক্ষে রায় দিয়ে দিলেন। আমিরুল মুমিনিনের বড়ত্ব ও তাঁর পদমর্যাদা মুসলিম বিচারকের মাঝে কোনোরূপ প্রভাব বিস্তার করেনি।

প্রকৃত মুসলমান তার সকল কথা ও কাজে ন্যায়বান হয়ে থাকে। কারণ, সত্যকে সে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে, ন্যায়বিচার তার সমাজে প্রতিষ্ঠিত এবং ইনসাফ তার আকিদা-বিশ্বাসে মর্যাদার আসনে সমাসীন।

অন্যায় করে না

প্রকৃত মুসলমান যথাসম্ভব জুলুম ও অন্যায় থেকে বিরত থাকে। কারণ, আখিরাতে জুলুম নিকষকালো অন্ধকার হয়ে জুলুমকারীদের ঢেকে নেবে।

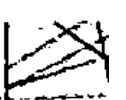
রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

‘তোমরা জুলুম থেকে বেঁচে থাকো। কেননা, জুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকারে পরিণত হবে।’^{৬১৭}

জুলুমের চূড়ান্ত নিষেধাজ্ঞা নিম্নে হাদিসে কুদসিতে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদিসে জুলুমকে এমন অকাট্যভাবে হারাম করা হয়েছে যে, তাতে আর কোনো ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সুযোগ রাখা হয়নি।

৬১৭. সহিহ মুসলিম : ২৫৭৮



আল্লাহ তাআলা হাদিসে কুদসিতে ইরশাদ করেন :

يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا،
فَلَا تَظَالَمُوا

‘আমার বান্দারা, আমি নিজের ওপর জুলুমকে হারাম করেছি এবং তোমাদের জন্যও তা হারাম করলাম। তাই পরস্পর জুলুম করবেনা।’^{৬১৮}

জুলুম এমন এক বিষয়, যা স্বয়ং আল্লাহ নিজের ওপর হারাম করে নিয়েছেন। অথচ তিনি সৃষ্টিকর্তা, রাজাধিরাজ, পবিত্র, পরাক্রমশালী, একচ্ছত্র ক্ষমতা ও বড়ত্বের অধিকারী মহান সত্তা। বান্দাদের জন্যও তিনি জুলুম হারাম করেছেন। এতদসত্ত্বেও আল্লাহর দ্বীন আঁকড়ে ধরে আছে—এমন কোনো মুসলমানের পক্ষে কখনো জুলুম ও অন্যায় করার কোনো সুযোগ কি থাকতে পারে?

প্রকৃত মুসলমান যতই প্রতিকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হোক, কখনো তার থেকে জুলুম ও অন্যায় প্রকাশ পায় না। এজন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ মুসলমানের গুণাবলি বর্ণনা করার সময় মুসলমানের মাঝে জুলুম না থাকার কথা খুব জোরালোভাবে ঘোষণা করেছেন।

ইরশাদ করেছেন :

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ
كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا
كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

‘মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। একজন আরেকজনের প্রতি জুলুম করতে পারে না এবং শত্রুর হাতে তুলে দিতে পারে না। যে ব্যক্তি তার (মুসলমান) ভাইয়ের প্রয়োজনে পাশে থাকবে, তার প্রয়োজনে আল্লাহ পাশে থাকবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের একটি কষ্ট দূর করে দেবে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিনের কষ্টসমূহ থেকে

তার একটি কষ্ট দূর করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন।^{৬১৯}

রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রকৃত মুসলমানের মাঝে জুলুম না থাকার ঘোষণা দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি; বরং সে যে মুসলমানকে দুশমনের হাতে ছেড়ে দেয় না, তা-ও উল্লেখ করে দিয়েছেন। কেননা, কোনো মুসলমানকে শত্রুর হাতে ছেড়ে দেওয়াও একপ্রকার জুলুম। এর পরে তিনি মুসলমানকে অপর মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজনে পাশে থাকার, তার কষ্ট দূর করার এবং তার দোষ গোপন করার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। যেন বুঝাতে চেয়েছেন, এসব ফজিলতপূর্ণ কাজ থেকে বিরত থাকাও এক ধরনের জুলুম এবং ইসলামি ভ্রাতৃত্বের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে অবহেলা ও শিথিলতার লক্ষণ।

পূর্বের পরিচ্ছেদে আমরা সেসব আয়াত ও হাদিস উল্লেখ করেছি, যেগুলোতে ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং তাকে বন্ধুত্ব, শত্রুতা ও আত্মীয়তার প্রভাবমুক্ত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর এ পরিচ্ছেদে আমরা সেসব আয়াত ও হাদিস উল্লেখ করেছি, যেগুলোতে জুলুম ও অন্যায়কে নিষেধ করা হয়েছে। উভয় বিষয়ের নুসুসকে একত্র করলে ইসলামের মূলনীতি স্থির হয় যে, ইসলাম মানুষের মাঝে কোনোরূপ ভেদাভেদ ছাড়া সকলের প্রতি ন্যায়বিচার করার এবং কোনোরূপ ভেদাভেদ ছাড়া সকল মানুষের প্রতি জুলুম ও অন্যায় না করার নির্দেশ দেয়। আল্লাহ তাআলা ইনসাফ ও ভালো কর্মের নির্দেশ দেন এবং জুলুম ও মন্দ কর্ম থেকে নিষেধ করেন।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

‘ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেনি এবং তোমাদের দেশ থেকে বহিস্কৃত করেনি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও

ইনসাফ করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ
ইনসাফকারীদের ভালোবাসেন।^{৬২০}

গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ পছন্দ করে

প্রকৃত মুসলমান সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সর্বদা উন্নত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ
পছন্দ করে। সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তি কোনো নীচ ও হীন উদ্দেশ্যের ওপর
সে রাখে না। কারণ, গুরুত্বহীন ও তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মাথা ঘামানোর যে তার
কোনো সময়ই নেই। তা ছাড়া আল্লাহর কিতাব ও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ
তাকে সিরিয়াস হতে বলে এবং গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়কে তামাশাচ্ছলে
গ্রহণ করতে নিষেধ করে। সে উন্নতির দিকে অগ্রসর হয় এবং অবনতি থেকে
পালিয়ে বেড়ায়। এটাই পুরুষদের চরিত্র হিসাবে আল্লাহর পছন্দনীয়।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ اللَّهَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ وَيُحِبُّ مَعَائِي الْأَخْلَاقِ وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا

‘নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা মহানুভব। তিনি মহানুভবতা পছন্দ করেন।
তিনি ভালোবাসেন উত্তম চরিত্রসমূহ এবং অপছন্দ করেন নিম্নমানের
বিষয়সমূহ।’^{৬২১}

অতিরিক্ত গুরু উচ্চারণ ও অধিক সাহিত্য সহকারে কথা বলে না

প্রকৃত মুসলমান বাড়াবাড়ি পর্যায়ে গুরু উচ্চারণ ও অতিরিক্ত সাহিত্যসমৃদ্ধ
কথা বলে না। অর্থাৎ খ্যাতি অর্জন ও মানুষকে তার দিকে আকৃষ্ট করার জন্য
কথা বলার সময় উচ্চারণ ও বাচনভঙ্গিতে বাড়াবাড়ি করে না। এ ধরনের
বাড়াবাড়ি ও বাচালতা প্র্যাগ্টিসিং মুসলমানদের স্বভাব নয়, যারা গুরুত্বপূর্ণ
বিষয়সমূহ নিয়ে ফিকির করে এবং গুরুত্বহীন বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায়
না। এটা এমন লোকদের স্বভাব, যাদের সুখ্যাতি অর্জন, আত্মপ্রদর্শন ও
লোকজনকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করা ছাড়া খেয়েদেয়ে আর কোনো কাজ

৬২০. সূরা আল-মুমতাহিনা : ৮

৬২১. মুসতাদরাবুল হাকিম : ১৫১

নেই। এজন্যই রাসুলুল্লাহ ﷺ এসব অতিরঞ্জনকারী লোকদের প্রতি কঠোর ছিলেন এবং তাঁর দেখাদেখি বড় দুই সাহাবি আবু বকর ﷺ ও উমর ﷺ-ও তাদের প্রতি কঠোর ছিলেন।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বলেন :

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَشَدَّ عَلَى الْمُتَنَطِّعِينَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَّ عَلَيْهِمْ بَعْدَهُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ، وَإِنِّي لَأُظُنُّ عُمَرَ كَانَ أَشَدَّ أَهْلِ الْأَرْضِ خَوْفًا عَلَيْهِمْ أَوْ لَهُمْ

‘সে সত্তার নামে কসম করে বলছি, যিনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, বাড়াবাড়ি পর্যায়ে গুঁহ উচ্চারণ ও অতিরিক্ত সাহিত্যসমৃদ্ধ করে যারা কথা বলে, তাদের প্রতি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর চেয়ে বেশি কঠোর আমি আর কাউকে হতে দেখিনি। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পর তাদের প্রতি সবচেয়ে কঠোর দেখেছি আবু বকর ﷺ-কে। আর আমার ধারণা, উমর ﷺ-ও তাদের প্রতি পৃথিবীবাসীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি কঠোর ছিলেন।’^{৬২২}

অন্যের বিপদে খুশি হয় না

প্রকৃত মুসলমান অন্যের বিপদ ও দুর্দশা দেখে আনন্দিত ও উল্লসিত হয় না। কারণ, অন্যের বিপদ দেখে খুশি হওয়া খুব খারাপ স্বভাব, যা থেকে ইসলাম নিষেধ করেছে এবং এর শাস্তিস্বরূপ আনন্দিত ব্যক্তিকে উক্ত বিপদে পতিত হওয়ার ভয় দেখিয়েছে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

لَا تُظْهِرِ السَّمَاتَةَ لِأَخِيكَ فَيَرْحَمَهُ اللَّهُ وَيَبْتَليكَ

‘তোমার ভাইয়ের বিপদ দেখে আনন্দ প্রকাশ কোরো না। তাহলে আল্লাহ তার প্রতি সদয় হয়ে তোমাকেই সে বিপদে আক্রান্ত করবেন।’^{৬২৩}

৬২২. মুসনাদু ইবনি আবি শাইবা : ৪২৮, সুনানুদ দারিমি : ১৪০, মুসনাদু আবি ইয়ালা : ৫০২২

৬২৩. সুনানুত তিরমিজি : ২৫০৬

প্রকৃত মুসলমান—যার অন্তর ইসলামি আদর্শের সুখা পান করেছে—কখনো অন্যের বিপদে আনন্দিত হতে পারে না; বরং সে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি সমবেদনা ও সহমর্মিতা জ্ঞাপন করে এবং তার বিপদ লাঘব করার যথাসাধ্য চেষ্টা করে। অন্যের বিপদে কেবল তারাই আনন্দিত হয়, যাদের অন্তর অসুস্থ এবং ইসলামের সুমহান আদর্শ থেকে বঞ্চিত। যাদের অন্তর চরম আকারের প্রতিশোধপরায়ণ ও অন্যকে কষ্ট দেওয়ার জন্য লালায়িত, কেবল তারাই অন্যের কষ্ট দেখে আনন্দ প্রকাশ করে।

উদারচিত্ত ও দানশীল

প্রকৃত মুসলমান—যে দ্বীনি শিক্ষার আলোয় আলোকিত এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একনিষ্ঠভাবে তা বাস্তবায়ন করে—উদারচিত্ত ও দানশীল হয়। তার উভয় হাত উন্মুক্ত থাকে এবং সেগুলো থেকে সমাজের লোকদের জন্য বিভিন্ন প্রকারের কল্যাণ ও উপকার ঝরে ঝরে পড়ে।

সে বিশ্বাস করে, দান কখনো ধ্বংস হয় না; বরং তা সর্বজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ আল্লাহর নিকট সংরক্ষিত থাকে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

‘আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করো, সে সম্পর্কে আল্লাহ জ্ঞান রাখেন।’ ৬২৪

দান করার সময় সে নিশ্চিত থাকে যে, যা দান করা হচ্ছে, তা বড় উপকার ও ব্যাপক কল্যাণের রূপ নিয়ে তার কাছে পুনরায় ফিরে আসবে। দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ তাআলা এ দানকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দেবেন।

কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

‘যারা আল্লাহর রাস্তায় স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, তাদের উদাহরণ একটি বীজের মতো, যা থেকে সাতটি শীষ জন্মায়। প্রত্যেকটি শীষে একশ করে দানা থাকে। আর আল্লাহ অতি দানশীল, সর্বজ্ঞ।’^{৬২৫}

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন :

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ

‘তোমরা যা কিছু ব্যয় করো, তিনি তার বিনিময় দেন।’^{৬২৬}

অন্যত্র ইরশাদ করেন :

وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

‘যে মাল তোমরা ব্যয় করো, তা নিজ উপকারার্থেই করো। আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যয় করো না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে, তার পুরস্কার পুরোপুরি পেয়ে যাবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না।’^{৬২৭}

প্রকৃত মুসলমান এ বিশ্বাস নিয়ে দান করে যে, এ দানের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতেই তাকে বরকত, প্রবৃদ্ধি ও উত্তম বদলা দান করবেন। আর যদি সে কৃপণতা করে এবং দানের হাত প্রসারিত না করে গুটিয়ে রাখে, তখন আল্লাহ তাআলা সম্পদে ক্ষতি ও লোকসান দিয়ে তাকে বিপদে ফেলবেন।

নিম্নের হাদিসটি তার বিশ্বাসের সত্যায়ন করে :

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ، إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا:
اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْسِكًا تَلَفًا

‘প্রতিদিন বান্দারা যখন সকালে উপনীত হয়, তখন দুজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। তাদের একজন বলেন, হে আল্লাহ দানশীল ব্যক্তিকে

৬২৫. সূরা আল-বাকারা : ২৬১

৬২৬. সূরা সাবা : ৩৯

৬২৭. সূরা আল-বাকারা : ২৭২

উত্তম বদলা দান করুন। অপরজন বলেন, হে আল্লাহ, কৃপণ ব্যক্তির ক্ষতি করুন।^{৬২৮}

হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন :

أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ

‘দান করো, বিনিময়ে আমিও তোমাকে (উত্তম বদলা) দান করব।’^{৬২৯}

আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল মুসলমানের অন্তরে কখনো এ সন্দেহ উদ্বেক হয় না যে, আল্লাহর রাস্তায় দান করলে তার সম্পদ কমে যাবে। কারণ, সদকা করলে সম্পদ বৃদ্ধি পায়; কমে না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ

‘সম্পদ থেকে সদকা করলে সম্পদ কমে না।’^{৬৩০}

এ ছাড়াও একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যা দান করা হয়, তার সাওয়াব বর্ণনা ও গণনার উর্ধ্বে। আল্লাহ তাআলা তা বহুগুণে বৃদ্ধি করবেন। এজন্যই রাসুলুল্লাহ ﷺ সেই সম্পদকে জমা আছে মনে করতেন, যা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা হয়েছে।

এ সম্পর্কিত হাদিসটি আয়িশা ؓ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :

أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَقِيَ مِنْهَا؟
قَالَتْ: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا قَالَ: بَقِيَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا

‘সাহাবিগণ একটি ছাগল জবাই করলেন (এবং তার কাঁধের অংশ ছাড়া সবকিছু সদকা করে দিলেন)। তখন নবিজি ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, কিছু বাকি আছে? আয়িশা ؓ উত্তর দিলেন, কাঁধ ব্যতীত

৬২৮. সহিহুল বুখারি : ১৪৪২, সহিহ মুসলিম : ১০১০

৬২৯. সহিহুল বুখারি : ৪৬৮৪

৬৩০. সহিহ মুসলিম : ২৫৮৮

কিছুই অবশিষ্ট নেই। নবিজি ﷺ বললেন, বস্তুত কাঁধ ব্যতীত সবকিছুই (আল্লাহর নিকট) অবশিষ্ট আছে।^{৬৩১}

রাসুলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদের মাঝে বদান্যতার গুণ সৃষ্টি করার প্রতি খুব জোর দিয়েছেন। এ গুণের ব্যাপারে পরস্পর প্রতিযোগিতা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন।

তিনি ইরশাদ করেছেন :

لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسُلَّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

‘কেবল দুই ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষান্বিত হওয়া যাবে। প্রথমত, সে ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ তাআলা সম্পদ দান করেছেন, আর সে হকের পথে তা ব্যয় করেছে। দ্বিতীয়ত, সে ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ প্রজ্ঞা দান করেছেন, আর তার মাধ্যমে সে উত্তম বিচার-ফয়সালা করে এবং লোকদের তা শিক্ষা দেয়।’^{৬৩২}

রাসুলুল্লাহ ﷺ হকের পথে সম্পদ ব্যয় করা এবং হিকমত অনুযায়ী ফয়সালা করা ও তা শিক্ষা দেওয়া—এ দুই বিষয়কে এক সমান বলেছেন। তিনি বলেছেন, এ দুই বিষয়ে ঈর্ষা করা বৈধ। এর কারণ হলো, হকের পথে সম্পদ ব্যয় করার মধ্যে মুসলমানদের সামাজিক জীবনের অনেক উপকারিতা নিহিত রয়েছে। সম্পদ জীবনের জাগতিক সমস্যা সমাধানের উপকরণ। আর হকের পথে তা ব্যয় করা অনেক বড় আমল। একজন প্রজ্ঞাবান মানুষ আল্লাহপ্রদত্ত প্রজ্ঞার সাহায্যে মানুষের যে উপকার সাধিত করে, হকের পথে ব্যয়িত সম্পদের উপকার তার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

প্রকৃত মুসলমান সম্পদ ব্যয় করার ক্ষেত্রে লক্ষ রাখে, কোথায় ব্যয় করলে সাওয়াব বেশি হবে। এজন্য এমনভাবে দান করে, যেভাবে দান করলে সাওয়াব বেশি পাওয়া যাবে। অর্থাৎ ওয়ারিশদের একেবারে বঞ্চিত করে সব সম্পদ দান

৬৩১. সুনানুত তিরমিজি : ২৪৭০

৬৩২. সহিহুল বুখারি : ৭৩, সহিহ মুসলিম : ৮১৬

করে দেয় না, আবার একদম দান না করে হাত গুটিয়ে বসেও থাকে না। এ ক্ষেত্রে সে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে। এটাই ইসলামের শিক্ষা। ইসলাম চায়, বান্দার নিকট ওয়ারিশদের জন্য মিরাস হিসাবে (প্রয়োজনাতিরিক্ত) ধনাঢ্যতা রেখে যাওয়ার চেয়ে আল্লাহর রাস্তায় দান করা পছন্দনীয় হোক। কারণ, আল্লাহর রাস্তায় যা দান করা হবে, তা তার আমলনামায় সংরক্ষিত থাকবে।

এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

أَيُّكُمْ مَالٌ وَارِثُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ، قَالَ: فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالٌ وَارِثُهُ مَا أَخَّرَ

‘তোমাদের মধ্যে কার কাছে নিজের সম্পদের চেয়ে ওয়ারিশদের সম্পদ অধিক প্রিয়? সাহাবিগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, আমাদের প্রত্যেকের নিকট নিজের সম্পদই অধিক প্রিয়। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, (তাহলে শোনো) নিজের সম্পদ হলো, যা আল্লাহর রাস্তায় দান করা হয়েছে। আর ওয়ারিশদের সম্পদ হলো, যা দান করা হয়নি।’^{৬৩৩}

বদান্যতা ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গুণ ও সামাজিক জীবনে মুসলমানদের অন্যতম সুন্দর স্বভাব। এজন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে যখন এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন :

أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ: تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ

‘সর্বোত্তম ইসলাম কী? তিনি উত্তরে বললেন, খানা খাওয়ানো এবং পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম করা।’^{৬৩৪}

তবে লক্ষ রাখতে হবে, বদান্যতার ক্ষেত্রে যেন বাড়াবাড়ি করা না হয়। ওয়ারিশদের জন্য কিছুই না রেখে সব সম্পদ দান করে দেওয়া ইসলাম সমর্থন করে না। ইসলামের সকল বিধান ভারসাম্যপূর্ণ। একজনের প্রতি

৬৩৩. সহিহুল বুখারি : ৬৪৪২

৬৩৪. সহিহুল বুখারি : ১২, সহিহ মুসলিম : ৩৯

উদার হতে গিয়ে আরেকজনের ওপর জুলুম করার নীতি অবলম্বন করা ইসলামি শিক্ষা নয়। তাই ভালো কাজে দান করা যেমন কর্তব্য, তেমনিই সন্তান-সন্ততিদের দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্ত রাখাও জরুরি। এজন্য সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস ؓ-এর মৃত্যুপূর্ববর্তী অসুস্থতার সময় রাসুলুল্লাহ ؐ যখন তাকে দেখতে গেলেন, তখন তিনি রাসুলুল্লাহ ؐ-কে বললেন :

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالًا كَثِيرًا، وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي؟ قَالَ: لَا قَالَ: قُلْتُ: فَالشَّطْرُ؟ قَالَ: لَا قُلْتُ: الثُّلُثُ؟ قَالَ: الثُّلُثُ كَبِيرٌ، إِنَّكَ إِنْ تَرَكْتَ وَلَدَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَتْرُكَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى اللَّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ

‘হে আল্লাহর রাসুল, আমার অনেক সম্পদ রয়েছে। এদিকে আমার ওয়ারিশ বলতে কেবল একটি মেয়েই আছে। আমি কি আমার দুই-তৃতীয়াংশ সম্পদ সদকা করে দেবো? রাসুলুল্লাহ ؐ বললেন, না। সাদ ؓ বললেন, তাহলে অর্ধেক? রাসুলুল্লাহ ؐ বললেন, তা-ও না। সাদ ؓ বললেন, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ? রাসুলুল্লাহ ؐ বললেন, হ্যাঁ, এক-তৃতীয়াংশ সদকা করবে পারবে, যদিও এক-তৃতীয়াংশ সম্পদও বেশি হয়ে যায়। তারপর রাসুলুল্লাহ ؐ বললেন, তোমার সন্তানদের ধনী হিসাবে রেখে যাওয়া তাদের গরিব ও মানুষের নিকট হাত পাতার অবস্থায় রেখে যাওয়ার চেয়ে উত্তম। তা ছাড়া তুমি (বৈধ ক্ষেত্রে) যা-ই ব্যয় করবে, তার সাওয়াব দেওয়া হবে। এমনকি খাবারের যে লুকমা তুমি স্ত্রীর মুখে তুলে দাও, তারও সাওয়াব দান করা হবে।’^{৬৩৫}

রাসুলুল্লাহ ؐ বদান্যতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন। তিনি দান না করে হাত গুটিয়ে বসে থেকেছেন কিংবা কোনো ভিখারিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন, এমনটি কখনোই হয়নি।



এ সম্পর্কে জাবির ؓ বলেন :

مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ لَا

‘কখনো এমন হয়নি যে, রাসুলুল্লাহ ؓ থেকে কোনো কিছু চাওয়া হয়েছে আর তিনি “না” বলেছেন।’^{৬৩৬}

মানুষের অন্তরে সম্পদের কী প্রভাব পড়ে, তা রাসুলুল্লাহ ؓ জানতেন; তাই তিনি দান করাকে তার প্রতি অন্তরসমূহ আকৃষ্ট করার এবং ইসলামের প্রতি তাদের দুর্বল করার উপায় হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

দাওয়াতের জন্য অধিক থেকে অধিকতর সম্পদ ব্যয় করতেও তিনি কুষ্ঠাবোধ করতেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রাথমিকভাবে সম্পদের টানে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলেও হিদায়াতের গভীরে যখন সে প্রবেশ করবে, তখন তার ইমান সবচেয়ে মজবুত হয়ে যাবে এবং তার ইসলাম সবার চেয়ে সুন্দর হয়ে যাবে।

এ সম্পর্কে আনাস বিন মালিক ؓ বর্ণনা করেন :

مَا سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإِسْلَامِ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ، قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: يَا قَوْمِ أَسْلِمُوا، فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ فِي رِوَايَةِ لَهُ: فَقَالَ أَنَسٌ: إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيُسْلِمُ مَا يُرِيدُ إِلَّا الدُّنْيَا، فَمَا يُسْلِمُ حَتَّى يَكُونَ الْإِسْلَامُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا

‘রাসুলুল্লাহ ؓ-এর কাছে ইসলামের শর্ত সাপেক্ষে যা কিছু চাওয়া হয়েছে, তিনি অবশ্যই তা দান করেছেন। তাঁর নিকট এক ব্যক্তি এসে কিছু চাইলে তিনি তাকে এত বিপুল সংখ্যক বকরি দান করলেন যে, সেগুলো দ্বারা দুই পাহাড়ের মাঝখান ভরে যাবে। লোকটি তা নিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের নিকট গিয়ে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা ইসলাম গ্রহণ করো। কেননা, মুহাম্মাদ ؓ এমন উজাড় করে দান

করেন যে, অভাব-অনটনের কোনো পরোয়া করেন না। (আনাস রা বলেন) কোনো ব্যক্তি যখন কেবল দুনিয়ার উদ্দেশ্যেই ইসলাম গ্রহণ করত (প্রকৃতপক্ষে আন্তরিকতা দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করত না), কিছুদিন যেতে না যেতেই ইসলাম তার কাছে দুনিয়া ও দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদ থেকে অধিকতর প্রিয় হয়ে যেত।^{৬৩৭}

এজন্য রাসুলুল্লাহ স তাঁর কাছে যা আসত, সবটুকু লোকদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন। নিজের জন্য ও নিজের পরিবারের জন্য কিছুই রাখতেন না। এভাবে তিনি মানুষের বদ্ধ হৃদয়ের তালা খুলতেন এবং মানুষের মনে বদান্যতার গুণ আনার চেষ্টা করতেন। এজন্যই পৃথিবীর বুকে বদান্যতা ও দানশীলতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে রাসুলুল্লাহ স-কে উপস্থাপন করা মোটেই বাড়াবাড়ি হবে না।

জুবাইর বিন মুতইম রা বর্ণনা করেন :

أَنَّهُ بَيْنَنَا هُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ النَّاسُ، مُقْبِلًا مِنْ حُنَيْنٍ، عَلِقَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَغْرَابُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى اضْطَرُّوهُ إِلَى سَمُرَةٍ، فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ، فَوَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَعْطُونِي رِدَائِي، فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاءِ نَعْمًا، لَقَسَمْتُهِ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لَا تَجِدُونِي بِخِيَلًا، وَلَا كَذُوبًا، وَلَا جَبَانًا

‘হুনাইন থেকে ফেরার পথে তিনি রাসুলুল্লাহ স-এর সাথে পথ চলছিলেন। তাঁর সঙ্গে আরও অনেক সাহাবি ছিলেন। এমন সময় কিছু গ্রাম্য লোক এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরল এবং তাদের কিছু দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। এমনকি তারা তাঁকে একটি গাছের কাছে নিয়ে গেল এবং তাঁর চাদর (গাছের কাঁটায়) আটকে গেল। নবিজি স সেখানে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, আমার চাদরটি ফিরিয়ে দাও। আমার কাছে যদি এ সব কাঁটায়ুক্ত গাছের সমপরিমাণ বকরি থাকত, তাহলে এর সবই তোমাদের ভাগ করে

দিতাম। অতঃপর তোমরা আমাকে কৃপণ, মিথ্যাবাদী ও কাপুরুষ হিসাবে দেখতে পাবে না।^{৬৩৮}

বদান্যতার যে উন্নত রূপের ওপর রাসুলুল্লাহ ﷺ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেটাই স্বার্থ ও লোভ থেকে মুক্ত নির্ভেজাল বদান্যতা। রাসুলুল্লাহ ﷺ বাস্তব জীবনে তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন, যেন মানবতার জন্য তা আদর্শ হয়। তিনি এ গুণের উচ্চ স্তরে উন্নীত হওয়ার পন্থাও জানিয়ে দিয়েছেন। তা হলো, মানুষের অন্তরে ইমান যত গভীর হবে, বদান্যতার গুণে সে তত এগিয়ে যাবে। এজন্য বান্দা যতই আল্লাহর অধিক নৈকট্যশীল হয়, ততই তার কাছ থেকে বদান্যতার গুণ প্রকাশ পায়। যখনই সে তার প্রতি আল্লাহর নিয়ামতরাজিকে অনুভব করে, তখনই বদান্যতার গুণ তার মাঝে প্রকট হয়ে ওঠে। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক যার যত গভীরে পৌঁছায়, ততই সে বদান্যতার গুণে উন্নতি করতে থাকে। রমজান মাসে জিবরাইল ﷺ যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে বিশেষ সাক্ষাৎ করতেন, তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর বদান্যতার অবস্থাও এমনই হতো। অন্যান্য মাসের তুলনায় এ মুবারক মাসটিতে তিনি বেশি বেশি দান করতেন। রমজান মাসের প্রতি রাতে জিবরাইল ﷺ যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন, তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে কল্যাণমূলক সকল বিষয় বেশি বেশি প্রকাশ পেত। তার উদারতা, দানশীলতা ও বদান্যতা সে সময় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলত।

এ সম্পর্কে ইবনে আব্বাস রা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَلْقَاهُ، فِي كُلِّ سَنَةٍ، فِي رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ، فَيَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ

‘রাসুলুল্লাহ ﷺ কল্যাণকর বস্তু দান করার ব্যাপারে সবার চেয়ে অগ্রসর ছিলেন। আর তিনি সর্বাধিক দানশীলতার পরিচয় দিতেন রমজান মাসে। জিবরাইল ﷺ প্রতি বছর রমজানে তাঁর সাথে মিলিত হতেন। মাসের সমাপ্তি পর্যন্ত এভাবে নিয়মিত সাক্ষাৎ হতো। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ জিবরাইল ﷺ-এর নিকট কুরআন উপস্থাপন করতেন। যে সময় জিবরাইল ﷺ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন, সে সময় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দানশীলতা প্রবল বেগে বয়ে চলা বাতাসের গতির চেয়েও গতিশীল হতো।’^{৬৩৯}

আমরা প্রাথমিক প্রজন্মের মুসলমানগণকে বদান্যতার এ শীর্ষ স্তরের নিকটবর্তী দেখতে পাই। তাদের কাউকে আমরা দেখি, তিনি তার সমুদয় সম্পত্তি আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিচ্ছেন; যেমনটি আবু বকর ﷺ করেছেন। কাউকে দেখি, তার অর্ধেক সম্পদ দান করে দিচ্ছেন; যেমনটি উমর ﷺ করেছেন। আর কাউকে দেখি, সৈন্যদলের রসদপাতি একাই জোগাড় করে দিচ্ছেন; যেমনটি উসমান ﷺ করেছেন। কাউকে দেখা যায়, তিনি তার সম্পদের সবচেয়ে উত্তম ও উন্নত বস্তুটাই আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিচ্ছেন; যেমনটি করেছেন আবু দাহদাহ ﷺ। তিনি তার সবচেয়ে উত্তম ও সুন্দর বাগানটি আল্লাহর রাস্তায় দান করেছিলেন। যখন তার স্ত্রী এ কথা জানতে পারলেন, তখন তিনি হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় আনন্দচিত্তে বললেন, আবু দাহদাহ, তুমি সত্যিই অনেক লাভজনক ব্যবসা করেছ! এ ছাড়াও যারা আখিরাতকে দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য দিতেন, তাদের মাঝে এ ধরনের নজির ভুরিভুরি আছে। তারা তাদের ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিতেন।

এর কারণ হলো, তারা ছিলেন আল্লাহর সাথে সত্যবাদী। সব সময় আল্লাহর সাথে সম্পর্ক রাখতেন। এজন্যই তারা বদান্যতার আসল স্বরূপ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন এবং বাস্তব জীবনে তা বাস্তবায়ন করেছিলেন। বর্তমান সময়ের অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি একাধিকবার দান করতে যেভাবে কুণ্ঠাবোধ করে, তারা এমন ছিলেন না। আবার দান করে খ্যাতি ও সুনামও অর্জন করতে চাইতেন না তারা—যেমনটি বর্তমান সময়ের অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তির মাঝে দেখা যায়।

৬৩৯. সহিহ মুসলিম : ২৩০৮



বর্তমান সময়ে যারা মিলিয়ন বিলিয়ন সম্পত্তির মালিক, তারা যদি অন্তত ফরজ জাকাত আদায় করত, সমাজ থেকে আজ দারিদ্র্যের অভিশাপ দূর হয়ে যেত। কিন্তু আফসোস, তারা জাকাত আদায় করা থেকে হাত গুটিয়ে বসে আছে। অথচ তারা জানে, এটা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ এক ফরজ বিধান এবং ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম স্তম্ভ। তবে তাদের বিভিন্ন মৌসুম ও উৎসব উপলক্ষে নির্দিষ্ট সংখ্যক টাকা দান করতে দেখা যায়। অথবা কোনো মুসলিম ভূখণ্ডে সীমিত সংখ্যক গরিবদের মাঝে খাদদ্রব্য বণ্টন করতে দেখা যায়। তারা যখন দান করে, তখন তাদের বাড়ির সামনে গরিব-মিসকিনদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে রাখে। এর মাধ্যমে তারা আবার নিজেদের ‘মহান দানবীর’ ও ‘গরিব-দুঃখী-মেহনতি মানুষের পরম বন্ধু’ ইত্যাদি অভিধায় ভূষিত করতে ভালোবাসে। অথচ হিসাব করলে দেখা যাবে, তারা যা দান করছে, তা তাদের ওপর যে পরিমাণ সম্পদ দান করা ফরজ হয়েছে, তার ক্ষুদ্র একটা অংশের সমানও নয়। আসলে এসব ধনীরা মাঝেমাঝে গরিবদের মাঝে সীমিত সংখ্যক যা টাকা-পয়সা দান করে, তা নিজেদের আল্লাহর আনুগত্যশীল বান্দা ও আল্লাহর রাস্তায় দানকারী মহান দানবীর হিসাবে পরিচয় দেওয়ার জন্য করে থাকে। তাদের এসব বিষয় সম্পর্কে গরিব-ধনীর প্রভু ও গোটা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক মহান আল্লাহ অজ্ঞ নন।

এ ধরনের লোকদের ব্যাপারেই তো তিনি ইরশাদ করেছেন :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ - يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا
جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا
كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

‘আর যারা সোনা ও রূপা জমা করে রাখে এবং তা ব্যয় করে না আল্লাহর পথে, তাদের কঠোর আজাবের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন। সেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশকে দগ্ধ করা হবে (সেদিন বলা হবে), এগুলো যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা রেখেছিলে; সুতরাং

এক্ষণে জমা করে রাখার স্বাদ গ্রহণ করো।^{৬৪০}

ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করে যারা সম্পদশালী হয়েছে, তাদের কৃপণতা ও সম্পদের প্রতি লোভ-লালসার কারণেই আজ ইসলামি দেশসমূহে অন্যান্য অর্থব্যবস্থা ও বামপন্থী চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। যদি তারা তাদের সম্পদে আল্লাহর অধিকার কী, তা জেনে পুরোপুরি আদায় করে দিত, তাহলে মুসলমানদের সমাজে কমিউনিজম ও সমাজতন্ত্রের দিকে দাওয়াত দেওয়ার দুঃসাহস কেউ দেখাতে পারত না। বামপন্থী দলসমূহ যখন ধনী-গরিবের মাঝে শ্রেণিবৈষম্যের বীজ বপন করল, তখন সমাজতন্ত্র এসে মিলিয়নারদের এবং তাদের আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ফতুর করে ছাড়ল। তাদের মিলিয়ন মিলিয়ন টাকা ছিনিয়ে নিল। তারা তলিয়ে গেল ধ্বংসের অতল গহ্বরে। অথচ তাদের সমৃদ্ধির সময়ে তারা অধিকাংশ সময় গরিব শ্রমিকদের তাদের সাপ্তাহিক বা মাসিক বেতনের সাথে বোনাস হিসাবে অর্ধ লিরা বাড়িয়ে দিতে কার্পণ্য করত লাভ কমে যাওয়ার ভয়ে। শ্রমিকরা অতিরিক্ত কিছু বাইনা করলে দুনিয়া ওলটপালট করে দিত তারা। অথচ যখন তাদের সন্তানরা আমোদ-প্রমোদ ও বেশ্যাদের পেছনে কোটি কোটি টাকা ওড়াত, তখন দেখেও না দেখার ভান করে থাকত। কখনো কখনো তাদের কোনো সন্তান নাচের একটি শোর সব টিকিট একাই কিনে নিয়েছিল যেন সুন্দরী নর্তকীদের কোমরদোলানো নৃত্য সে একাই উপভোগ করতে পারে।

প্রকৃত ইসলামি সমাজের অভিধানে ধনী কর্তৃক গরিবকে শোষণ করা এবং ধনীর প্রতি গরিবের ঘৃণা ও হিংসার কোনো শব্দ নেই। প্রকৃত ইসলামি সমাজে ধনী হয় উদার ও দানশীল। সে তার সম্পদে গরিবের অধিকার সম্পর্কে সচেতন। তাই তার অধিকার হরণ করে না। গরিবের প্রতি সাহায্য, সহযোগিতা ও ইনসাফের হাত বাড়াতে অবহেলা করে না। অপরদিকে গরিব ব্যক্তি ধনী ব্যক্তির দিকে সে তার চেয়ে বেশি সম্পদশালী বলে হিংসা ও ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকায় না। এর কারণ হলো, ইসলামি সমাজে ধনী হারাম পন্থায় সম্পদশালী হয় না। হালাল ও বৈধ পন্থায় চেষ্টা-মেহনত করে সম্পদের অধিকারী হয়। তা ছাড়া ইসলামি সমাজ তার সকল সদস্যকে সমান সুযোগ

প্রদান করে। ফলে গরিব ব্যক্তি ইচ্ছা করলে কঠোর অধ্যবসায় ও চেষ্টা-মেহনতের মাধ্যমে সে-ও ধনী হতে পারে। দরজা সবার জন্য উন্মুক্ত। উচ্চাঙ্গ ইচ্ছাশক্তির অধিকারী ও কর্মঠ ব্যক্তিমাত্রই তা দিয়ে অর্থের জগতে প্রবেশ করে সম্পদশালী হতে পারে। ফলে কাউকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে তার প্রতি হিংসা ও ঘৃণাবোধ লালন করার কোনো সুযোগ এখানে নেই। ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ইসলামি সমাজে হিংসুক, ঘৃণা পোষণকারী ও প্রতিশোধপরায়ণ লোকদের কোনো ঠাই নেই।

রাসুলুল্লাহ ﷺ সব সময় সাহাবিগণকে দান করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। সম্পদ জমা করার ভালোবাসা তাঁদের অন্তর থেকে সমূলে উপড়ে ফেলতেন। যাতে ধনাঢ্যতা সকল মানুষের মাঝে বণ্টিত হয়ে ব্যাপকভাবে সবার জীবনে সচ্ছলতা আসে। যেন জমা করে রাখা সম্পদ তার মালিকের দিকে অশুভ আজাব ও আল্লাহর ক্রোধের রূপ নিয়ে ফিরে না আসে কিয়ামত দিবসে। আবার এ বিষয়ে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ ﷺ-ই তাদের কাছে উত্তম আদর্শ ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছিলেন।

একদিন রাসুলুল্লাহ ﷺ জান্নাতুল বাকি নামক কবরস্থানের দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে আবু জার ﷺ-ও তাঁর সাথে মিলিত হলেন। চলার পথে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمُ الْمُقْلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا ‘আজ যাদের দুনিয়ায় সম্পদের প্রাচুর্য রয়েছে, কাল কিয়ামতে তারা হবে দৈন্যগ্রস্ত। অবশ্য যারা এরূপ এরূপ দান-খয়রাত করবে, তাদের অবস্থা এমন হবে না।’ অতঃপর তাদের সামনে উহুদ পাহাড় পড়ল। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আবু জার। আবু জার ﷺ বললেন, আমি হাজির হে আল্লাহর রাসুল! আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি হোক! আমার প্রাণ আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক! তারপর বললেন, مَا يَسُرُّنِي أَنْ أُحْدَا لِي مُحَمَّدٌ ذَهَبًا، فَيُمِسِّي عَنْدَهُمْ ‘এ উহুদ পাহাড় যদি মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবারের জন্য স্বর্ণ হয়ে যায়, তবে সন্ধ্যার সময় তাদের নিকট তা থেকে এক দিনার বা এক মিসকালও অবশিষ্ট থাকবে, তা-ও আমি পছন্দ করি না।’^{৬৪১}

৬৪১. সহিহুল বুখারি : ৬৬৪৩, আল-আদাবুল মুফরাদ : ৮০৩

সম্পদ জমা করা যে ইসলামে অপছন্দীয়, তা কুরাইশের ধনীদের ব্যাপারে উমর রাঃ-এর অবস্থান থেকে আরও স্পষ্ট হয়। যুদ্ধের ব্যস্ততা থেকে ফারোগ হয়ে কুরাইশের ধনীরা যখন ব্যবসার মাধ্যমে সম্পদ বাড়ানোয় মনোনিবেশ করল এবং তাদের সম্পদে সমৃদ্ধি আসতে লাগল, তখন উমর রাঃ তাদের ব্যাপারে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন এবং ঘোষণা দিলেন, 'সাবধান! কুরাইশরা আল্লাহর সম্পদকে তাদের মাঝে পুঞ্জিভূত করে নিতে চায়। সাবধান! খাতাবের পুত্র এখনো জীবিত আছে। সাবধান! আমি মদিনার প্রস্তরময় মরুপথে দাঁড়িয়ে থাকব এবং তাদের জমা করে রাখা সম্পদ কেড়ে নেব, যা তারা জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করতে যাচ্ছে।' ৬৪২

উমর রাঃ-এর এমন অবস্থানের কারণ দুটি। একটি হলো, সীমিত সংখ্যক মানুষের হাতে অধিকাংশ সম্পদ জমা করে রাখা ইসলামে নিষিদ্ধ। কারণ, তাদের হাতে এ সম্পদ জমা করে রাখা মানে সমাজের অধিকাংশ লোকদের হাত থেকে তা ছিনিয়ে নেওয়া। যার ফলশ্রুতিতে প্রতারণা, শ্রেণিবৈষম্য, সম্পদশালী হওয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও জুলুম সমাজে বিস্তার লাভ করে, যে বিষয়গুলো ইসলামি সমাজে নিষিদ্ধ। দ্বিতীয় কারণ হলো, উমর রাঃ ঘোষণা দিলেন যে, তিনি মদিনার মরুপথে দাঁড়িয়ে থাকবেন এবং কুরাইশের ধনীদের হাত থেকে মাল কেড়ে নেবেন। তাদের সম্পদ মজুতদারি করতে দেবেন না তিনি। তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতেই তিনি এমনটি করলেন। তাদের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষপরায়ণ হয়ে নয়; যেভাবে বস্তুবাদী সমাজে গরিবদের অন্তরে ধনীদের প্রতি হিংসা, বিদ্বেষ ও ঘৃণা বিরাজ করে। সমানভাবে ধনী-গরিব উভয়ের কল্যাণের জন্য ইসলাম সমাজ থেকে ইনসাফ ও ন্যায় দাবি করে। এভাবে সম্পদ পুঞ্জিভূত করা ও মজুতদারি নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে শ্রেণিবৈষম্য, হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই বন্ধ করে দিয়েছে ইসলাম।

সারকথা হলো, ধনী ও গরিব উভয়ের জন্য দুটি ক্ষতির কারণে উমর রাঃ সম্পদ মজুতদারি করতে নিষেধ করেছেন। একটি দুনিয়াবি ক্ষতি, যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আরেকটি দ্বীনি ক্ষতি, যা এখন আলোচনা করা

হয়েছে। অর্থনীতির বিশ্বে দুনিয়া ও আখিরাতের মাঝে এমন সমন্বয় ও ভারসাম্য কেবল ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই দেখাতে পেরেছে।

প্রকৃত মুসলমান উদার ও দানশীল হয়; যদিও সে অভাবী হয়। ইসলাম তার মাঝে তার চেয়ে অভাবী লোকদের প্রতি দয়া ও করুণা সৃষ্টি করে। সে অন্যের কষ্ট-দুর্দশা ও বঞ্চিত থাকার হতাশা অনুভব করতে পারে। এজন্য ইসলাম গরিব ও অভাবী লোকদেরও সাধ্যমতো দান করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। যাতে তারা ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য রক্ষার মহান কাজে নিজেদের शामिल করতে পারে। আর যারা নিজেদের অভাব-অনটন থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর রাস্তায় সদকা করে, আল্লাহ তাআলা তাদের সদকার প্রতিদান দেওয়ার ও সম্পদ বাড়িয়ে দেওয়ার ওয়াদা করেছেন। তবে শর্ত হলো, সদকা করতে হবে হালাল উপায়ে কামাইকৃত পবিত্র মাল থেকে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَذْلِ ثَمَرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ،
وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيَهَا لِصَاحِبِهِ، كَمَا يُرِّي أَحَدُكُمْ
فَلْوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ

‘যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর পরিমাণ সদকা করবে, (আল্লাহ তা কবুল করবেন) এবং আল্লাহ কেবল পবিত্র মাল কবুল করেন আর তাঁর ডান হাত দিয়ে তা গ্রহণ করেন। এরপর আল্লাহ দাতার কল্যাণার্থে তা প্রতিপালন করেন, যেমন তোমাদের কেউ তার অশ্বশাবক প্রতিপালন করে থাকে। অবশেষে সেই সদকা পাহাড় বরাবর হয়ে যাবে।’^{৬৪৩}

সামাজিক কর্মে সবাইকে শরিক করার জন্য; পারস্পরিক ভালোবাসা ও কল্যাণকামিতার পথ বন্ধ না হওয়ার জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ গরিব ও অভাবী লোকদেরও সাধ্যমতো দান করতে উৎসাহিত করেছেন। অভাব-অনটনের অজুহাতে নিজেদের দান-খয়রাত ও সামাজিক কর্ম থেকে একদম দূরে থাকতে নিষেধ করেছেন। কেননা, এর কারণে ধ্বংস ও আজাব নেমে আসতে পারে।

৬৪৩. সহিহুল বুখারি : ১৪১০

তিনি ইরশাদ করেছেন :

اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ

‘জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাকো; খেজুরের একটি অংশ সদকা করার মাধ্যমে হলেও।’^{৬৪৪}

আল্লাহ তাআলা চান যে, মুসলমান ধনী হোক বা গরিব, সে যেন সুষ্ঠু সমাজ বিনির্মাণে এবং সমাজে কল্যাণ প্রতিষ্ঠার কর্মে নিজেকে শরিক করে। এজন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ ধনী-গরিব সকল মুসলমানকে নিজেদের সাধ্যমতো ভালো কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রত্যেক ভালো কাজকে তিনি সদকা বলে অভিহিত করেছেন।

ইরশাদ করেছেন :

عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: يَغْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالَ قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: يُعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ قَالَ قِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ: يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ الْخَيْرِ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ

‘প্রত্যেক মুসলমানের ওপর সদকা ওয়াজিব। সাহায্যে কিরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, যদি কেউ সদকা করার সামর্থ্য না রাখে, তখন কী করবে? বললেন, সে হাত দ্বারা কাজ করবে। এতে তার উপকারও হবে এবং সদকা করারও সামর্থ্য আসবে। তারা বললেন, যদি তারও সামর্থ্য না রাখে, অথবা বললেন, যদি তা-ও করতে না পারে, তখন কী করবে? বললেন, সে অভাবী দুঃখী মানুষকে সাহায্য করবে। তারা বললেন, যদিও তা-ও না করে, তখন কী করবে? বললেন, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। তারা বললেন, যদি তা-ও সম্ভব না হয়, তখন কী করবে? তিনি বললেন, সে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকবে। কারণ, এটাও তার জন্য সদকা হবে।’^{৬৪৫}

৬৪৪. সহিহুল বুখারি : ১৪১৭

৬৪৫. সহিহ মুসলিম : ১০০৮

ইসলাম কল্যাণের পরিধিকে অনেক প্রশস্ত করেছে, যেন প্রত্যেক মুসলমান তাতে প্রবেশ করতে পারে। ফলে গরিব ব্যক্তি ধন-সম্পদ না থাকার কারণে নিজেকে সমাজের কল্যাণমূলক কাজ থেকে বঞ্চিত মনে করে না। সামাজিক কল্যাণমূলক কাজে শরিক হওয়ার দরজা তার জন্যও উন্মুক্ত রেখেছে ইসলাম। তা এভাবে যে, গরিব ব্যক্তি কোনো উপকারী ভালো কর্ম করলে সেটা তার জন্য সদকা বলে অভিহিত করা হয়েছে, যার ওপর সাওয়াব দেওয়া হবে, যেভাবে ধনীকে তার দানের বিনিময়ে সাওয়াব দান করা হয়।

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে :

كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

‘প্রত্যেক ভালো কাজই সদকা।’^{৬৪৬}

এভাবে ইসলাম ধনী-গরিব সকলকে সুষ্ঠু সমাজ বিনির্মাণে এবং সমাজসেবামূলক কাজে ভূমিকা রাখার সুযোগ করে দিয়েছে। প্রত্যেকের মনে একপ্রকার আনন্দের সঞ্চার করেছে, যা সে সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করার গৌরব অর্জন ও এর বিনিময়স্বরূপ সাওয়াব পাওয়ার মাঝে অনুভব করে।

ইসলাম বরাবরের মতো এ বিষয়েও মুসলমানদের প্রতি সদয় থেকেছে। তাদের কাছ থেকে এমন কোনো কিছু দাবি করেনি, যা দিতে তারা অসমর্থ। তাদের নিকট কেবল প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার দাবি জানিয়েছে। আর অভাবী লোকদের দান না করার কারণে তিরস্কার করা হয়নি। তবে তাদেরকে অন্যের কাছে হাত না পেতে নিজেদের প্রয়োজন নিজেরাই পূরণ করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে। কেননা, ইসলামে ওপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম। তবে প্রয়োজন পূরণ করার পর যে সম্পদ অতিরিক্ত থাকে, তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করার কথা বলে ইসলাম। প্রকৃত মুসলমান সকল কল্যাণমূলক খাতে ব্যয় করে থাকে। কারণ, তার ধর্ম তাকে এ সবকিছু দেয় যে, ব্যয় করলে কল্যাণ আর ব্যয় না করলে অকল্যাণ।

হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে :

يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ، وَأَنْ تُنْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ، وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

‘হে আদম-সন্তান, তোমার কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত যে মালামাল রয়েছে, তা খরচ করতে থাকো। এটা তোমার জন্য উত্তম হবে। আর যদি তুমি তা দান না করে কুক্ষিগত করে রাখো, তাহলে এটা তোমার জন্য অকল্যাণ বয়ে আনবে। তবে প্রয়োজন পরিমাণ রাখায় কোনো দোষ নেই। এজন্য তোমাকে ভর্ৎসনাও করা হবে না। যাদের প্রতিপালনের দায়িত্ব তোমার ওপর রয়েছে, তাদের দিয়েই দান শুরু করো। ওপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম।’^{৬৪৭}

প্রকৃত মুসলমান তার নিজের ও পরিবারের প্রয়োজন পূরণ করার পর যা অবশিষ্ট থাকে, তা সাথে সাথে দান করে দেয়। ভবিষ্যতের সম্ভাব্য অভাবের কথা ভেবে অথবা প্রাচুর্যতায় এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার জন্য জমা করে রাখে না; বরং সে মনে করে, এমন অবস্থায় সদকা করলে তা সর্বোত্তম সদকা হবে এবং এর সাওয়াবও বেশি পাওয়া যাবে।

হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে, আবু হুরাইরা রাঃ বলেন :

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَكْثَرُ أَجْرًا؟ قَالَ: أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَاحِبُ شَيْءٍ تَخْشَى الْفَقْرَ، وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلَا تُمِيلُ حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ الْحُلُقُومَ، قُلْتَ لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ

‘এক ব্যক্তি নবিজি সঃ-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, সাওয়াবের দিক বিবেচনায় কোন সদকা বেশি উত্তম? তিনি বললেন, সে সদকাই সর্বোত্তম, যা তুমি সুস্থ অবস্থায় করো, যখন তোমার অন্তরে কার্পণ্যভাব থাকে; তুমি দৈন্যতার ভয় করো এবং (দান

না করলে) ধনাঢ্যতার আশা রাখো। দানের ব্যাপারে তুমি এমন সময়ের অপেক্ষায় বসে থাকো না, যখন তোমার প্রাণ কণ্ঠগত হবে, তখন তুমি বলবে, অমুকের জন্য এতটা আর তমুকের জন্য অতটা; অথচ প্রকৃতপক্ষে তা অমুক-তমুকের জন্যই হয়েই গিয়েছে।^{৬৪৮}

প্রকৃত দানশীল মুসলমান তার দানের জন্য ওই শ্রেণির লোকদের নির্দিষ্ট করে, যারা দান ও সাহায্য-সহযোগিতার যথোপযুক্ত। তাই সে অনুগ্রহের মুখাপেক্ষী এমন বঞ্চিত মিসকিনদের খুঁজে বের করে, যারা কাকুতি-মিনতি করে মানুষের কাছে ভিক্ষা চায় না এবং কারও নিকট সাহায্য না চাওয়ার কারণে লোকেরা তাদের সচ্ছল মনে করে। সে তাদের ঘরে গিয়ে দরজার কড়া নাড়ে। অতঃপর তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য পর্যাপ্ত হাদিয়া দেয়। আর এ সবকিছু লোকদের অগোচরে করে, যেন সমাজে তাদের সম্মান ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে।

কারণ, এ ধরনের মিসকিনরাই—যারা কারও নিকট সাহায্য চেয়ে বেড়ায় না—অনুদান ও উপহার পাওয়ার অধিক হকদার। এ ধরনের মিসকিনদের দান করার প্রতি রাসুলুল্লাহ ﷺ গুরুত্বারোপ করেছেন।

তিনি ইরশাদ করেছেন :

‘মিসকিন সে নয়, যে একটি বা দুটি খেজুর অথবা একটি বা দুটি খাবারের লুকমা পেলে (খুশি হয়ে) ফিরে যায়। (প্রকৃত) মিসকিন তো সে ব্যক্তি, যে যাচনা করা তথা কারও নিকট কিছু চাওয়া থেকে বিরত থাকে।’

বুখারি ও মুসলিমের রিওয়াযাতে বর্ণিত হয়েছে :

لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ تَرْدُهُ اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ،
وَالثَّمَرَةُ وَالثَّمَرَتَانِ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، وَلَا
يُفْظَنُ بِهِ، فَيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلُ النَّاسَ

৬৪৮. সহিহুল বুখারি : ১৪১৯

শেষোক্ত কথাটির ব্যাখ্যা হলো, জীবনের অন্তিম মুহূর্তে যখন নিজের ভোগ-দখলের সময় অতিবাহিত হয়ে সম্পত্তি অন্যের ভোগ-দখলে যাওয়ার সময় হয়, তখন আর দান করার স্বার্থকতা কোথায়? দান যা করার, সুস্থ অবস্থায় করা উচিত, মৃত্যুশয্যায় নয়। (অনুবাদক)

‘প্রকৃত মিসকিন সে নয়, যে মানুষের কাছে ভিক্ষার জন্য ঘুরে বেড়ায় এবং এক-দুই লুকমা অথবা এক-দুটি খেজুর পেলে ফিরে যায়। বরং প্রকৃত মিসকিন সে ব্যক্তি, যার এতটুকু সম্পদ নেই, যাতে তার প্রয়োজন মেটাতে পারে এবং তার বাহ্যিক অবস্থা দেখে বুঝা যায় না যে, সে সদকার যোগ্য; আবার এদিকে সে মানুষের কাছে যাচনাও করে বেড়ায় না।’^{৬৪৯}

প্রকৃত মুসলমান তার দান-খয়রাতের পাত্র হিসাবে এতিমকে বেছে নেয়। যথাসাধ্য এতিমের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয়। তার খোরপোশসহ বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণ করার জিম্মাদারি নেয়। চাই সে এতিম তার নিকটাত্মীয় হোক, কিংবা না হোক। এ কাজ করে সে এতিমের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেওয়া লোকের জন্য আল্লাহ তাআলা যে উচ্চ মর্যাদা নির্ধারিত করেছেন, তা পাওয়ার আশা রাখে এবং জান্নাতে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতিবেশিত্বের মর্যাদায় ভূষিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা লালন করে।

সাহল বিন সাদ রা থেকে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ স ইরশাদ করেছেন :

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى، وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

‘আমি ও এতিমের ভরণপোষণের দায়িত্ব গ্রহণকারী ব্যক্তি জান্নাতে এভাবে থাকব। কথাটি বলার সময় রাসুলুল্লাহ স শাহাদাত আঙুল ও মধ্যমা আঙুলের মাঝে সামান্য ফাঁক রেখে আঙুলদ্বয় দিয়ে ইশারা করেন।’^{৬৫০}

একইভাবে মুত্তাকি, পরোপকারী ও দানশীল মুসলমান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় বিধবা ও নিঃস্বদের উপকার সাধনের চেষ্টা করে। কারণ, তার দীন তাকে এ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। তা ছাড়া বিধবা ও মিসকিনদের উপকার সাধন করলে আল্লাহ তাআলা এমন সাওয়াব দান করেন, যা রোজাদার, নফল ইবাদতকারী, এমনকি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী ব্যক্তির সাওয়াবের চেয়েও বেশি।

৬৪৯. সহিহুল বুখারি : ১৪৭৯

৬৫০. সহিহুল বুখারি : ৫৩০৪

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينَ، كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْسِبُهُ
قَالَ : كَالْقَائِمِ لَا يَفْئُرُ، وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ

‘বিধবা ও নিঃস্বের উপকার সাধনকারী আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীর সমতুল্য। (বর্ণনাকারী বলেন,) আমার ধারণা, তিনি এ কথাও বলেছেন, সেই নফল নামাজ আদায়কারীর সমতুল্য, যে নিরলসভাবে নামাজ আদায় করতে থাকে এবং সেই রোজাদারের সমতুল্য, যে বিরতিহীনভাবে রোজা রাখে।’^{৬৫১}

প্রকৃত দানশীল মুসলমান তার দানশীলতা ও বদান্যতা এভাবে প্রকাশ করে। তার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি। আসলে এভাবে দান করলেই তা নেক আমলের অন্তর্ভুক্ত হবে, যার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যায়। বর্তমান সময়ে ওলিমাসহ বিভিন্ন উপলক্ষে ধনী ও সম্পদশালী লোকদের দাওয়াত করে প্রচুর ব্যয়বহুল যে খাবারের আয়োজন করা হয়—এ ধরনের বদান্যতা প্রকৃত মুসলমানের স্বভাব নয়। এ ধরনের আয়োজনের উদ্দেশ্য মোটেই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন নয়; বরং খ্যাতি, সুনাম ও উপকার-উপটোকন পাওয়ার জন্যই এমন আয়োজন করা হয়। এজন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ এমন আয়োজনের নিন্দা করেছেন।

তিনি ইরশাদ করেছেন :

بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، يُدْعَى إِلَيْهِ الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْمَسَاكِينُ

‘সবচেয়ে খারাপ খাবার হলো সেই ওলিমার খাবার, যেখানে ধনীদের দাওয়াত করা হয় আর গরিবদের বঞ্চিত করা হয়।’

বিধবা ও নিঃস্বের উপকার সাধন করা, এতিমের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেওয়া ও তার প্রতি অনুগ্রহ করা—এসব কাজে বড় ধরনের সাওয়াব তো অর্জিত হয়-ই, পাশাপাশি এ ধরনের কাজ দানকারীর অন্তরকে পরিচ্ছন্ন করে এবং

তার মাঝে মানবতাবোধ বৃদ্ধি করে। তার হৃদয়কে নরম ও কোমল করে। দান করার মাঝে যে স্বাদ রয়েছে, তা সে অনুভব করতে পারে। এভাবে সে আরও ভালো কাজ করতে উৎসাহিত হয়। এজন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ অন্তরের কঠোরতা রোগের চিকিৎসাস্বরূপ উক্ত কাজগুলো করার নির্দেশ দিতেন। এ সম্পর্কে আবু ছরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সঃ-এর নিকট অন্তরের কঠোরতার অভিযোগ করলে তিনি বললেন :

امْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ، وَأُطْعِمِ الْمِسْكِينَ

‘এতিমের মাথায় হাত বুলাও এবং নিঃস্বকে খাবার খাওয়াও।’^{৬৫২}

দান করার পর খোঁটা দেয় না

প্রকৃত মুসলমান দান করার পর সে দানের খোঁটা দেয় না। প্রকৃত মুসলমান সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হতে চায়, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

‘যারা স্বীয় ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে, এরপর ব্যয় করার পর সে অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে না এবং কষ্টও দেয় না, তাদেরই জন্য তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে পুরস্কার এবং তাদের কোনো ভয় নেই আর তারা চিন্তিতও হবে না।’^{৬৫৩}

তা ছাড়া সে জানে যে, খোঁটা দেওয়া ও কষ্ট দেওয়া—এ দুটি বিষয় আমলকে সবচেয়ে বেশি ধ্বংস করে এবং সাওয়াবকে সবচেয়ে বেশি বিনষ্ট করে দেয়। খোঁটা দিলে আমল ও সাওয়াব ধ্বংস হয়ে যায়, এ কথা স্বয়ং আল্লাহ-ই পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহর সে নিষেধবাণী ও ঘোষণা তার কানে বাজতে থাকে এবং তার ভেতরকে আন্দোলিত করে। ফলে সে খোঁটা দেওয়া ও কষ্ট দেওয়ার কথা কল্পনাই করতে পারে না।

৬৫২. মুসনাদু আহমাদ : ৯০১৮

৬৫৩. সূরা আল-বাকারাহ : ২৬২

আয়াতটি হলো :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى

‘হে ইমানদারগণ, তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান-খয়রাত বরবাদ কোরো না।’^{৬৫৪}

গরিব অভাবী মানুষকে দান করার পর খোঁটা দিলে তার মানবসত্তাকে চরমভাবে অপমানিত করা হয় এবং তার সম্মানের ওপর বড় ধরনের আঘাত হানা হয়। এ বিষয়গুলো ইসলামি শরিয়তে নিষিদ্ধ। ইসলাম দাতা ও গ্রহীতা উভয়কে পরস্পর ভাই বলে। তাকওয়া ও নেক আমলের তারতম্য ব্যতীত তাদের মাঝে কোনো ভেদাভেদ নেই। আর ভাই তার ভাইকে কী করে খোঁটা দিতে পারে? কীভাবে তার সম্মানে আঘাত হানতে পারে? এজন্য যারা উপকার করার পর খোঁটা দেয়, তাদের প্রতি রাসুলুল্লাহ ﷺ কঠিন হুমকি বাণী উচ্চারণ করেছেন। তাদের তিনি সেসব কপালপোড়া লোকের দলভুক্ত বলেছেন, যাদের সাথে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা কথা বলবেন না, যাদের দিকে তাকাবেন না, যাদের গুনাহ থেকে পবিত্র করবেন না এবং যাদের জন্য থাকবে মর্মভ্রদ শাস্তি।

হাদিসটি হলো, আবু জার ﷺ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ
وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ: فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ: خَابُوا وَخَسِرُوا، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:
الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنْفِقُ سِلْعَتُهُ بِالْحُلْفِ الْكَاذِبِ

‘কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তিন শ্রেণির লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না এবং তাদের (গুনাহ থেকে) পবিত্র করবেন না; বরং তাদের জন্য রয়েছে ভয়ানক শাস্তি। বর্ণনাকারী বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ এ কথাটি তিনবার বললেন। আবু

জার ﷺ বলে উঠলেন, তারা তো ধ্বংস হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহর রাসুল, এরা কারা? তিনি বললেন, যে লোক পায়ের গোছার নিচে কাপড় ঝুলিয়ে রাখে, যে লোক দান করার পর তার খোঁটা দেয় এবং যে লোক মিথ্যা শপথ করে পণ্যদ্রব্য বিক্রি করে।’^{৬৫৫}

অতিথিপরায়ণ

প্রকৃত মুসলমান—যার মাঝে সত্যিকার অর্থে বদান্যতার গুণ আছে—অবশ্যই অতিথিপরায়ণ হয়। মেহমানকে হর্ষোৎফুল্লতার সহিত বরণ করে নেয় এবং সম্মান করে। কারণ, ইসলাম এ গুণটিকে আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ইমান থাকার অন্যতম আলামত সাব্যস্ত করেছে।

হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ

‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ইমান রাখে, যে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে।’^{৬৫৬}

অতিথিপরায়ণ ব্যক্তি তার কর্মের মাধ্যমে এ কথা প্রমাণ করে যে, সে আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের প্রতি ইমান রাখে। মেহমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাকে মেহমানের ন্যায্য অধিকার বলা হয়েছে ইসলামে। এটা মেহমানের প্রতি মেজবানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশও বটে। কারণ, মেহমান আসায় সে একটি নেক আমল (মেহমানকে সম্মান প্রদর্শন) করতে পেরেছে এবং তার ইমানকে সত্যায়িত করার সুযোগ পেয়েছে।

এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتُهُ قَالَ: وَمَا جَائِزَتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهِ

৬৫৫. সহিহ মুসলিম : ১০৬

৬৫৬. সহিহল বুখারি : ৬০১৮, সহিহ মুসলিম : ৪৭

‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের (কিয়ামতের) ওপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন মেহমানকে সম্মান করার মাধ্যমে তার ন্যায্য অধিকার আদায় করে দেয়। লোকেরা বলল, হে আল্লাহর রাসুল, তার ন্যায্য অধিকার কী? তিনি বললেন, এক দিন ও এক রাত তার মেহমানদারি করা। মেহমানদারি হলো (সর্বোচ্চ) তিন দিন। এর অতিরিক্ত করলে তা হবে সদকা অর্থাৎ অতিরিক্ত বদান্যতা।’^{৬৫৭}

আতিথেয়তা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল, যা প্রকৃত মুসলমানের নিকট খুবই প্রিয়। এ আমলের জন্য সাওয়াব প্রদান করা হয়। তাই ইসলাম এর জন্য বিধান প্রণয়ন করে দিয়েছে। এক দিন, এক রাত মেহমানদারি করা মেহমানের অধিকার। তিন দিন, তিন রাত মেহমানদারি করা ওয়াজিব। এর চেয়ে অতিরিক্ত সময় মেহমানদারি করা সদকা বা অতিরিক্ত বদান্যতা। মেজবানের আমলনামায় তার সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে।

আতিথেয়তা ইসলামে ঐচ্ছিক কোনো বিষয় নয়। ব্যক্তিস্বার্থের প্রতি লক্ষ রেখে কারও মেহমানদারি করবে, আর কারও করবে না—এ সুযোগ ইসলামে নেই। এটা মুসলমানদের ওপর ওয়াজিব ও আবশ্যিক। কোনো মেহমান বাড়িতে উপস্থিত হলে অবশ্যই তার মেহমানদারি করতে হবে মুসলমানকে।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ، فَإِنْ شَاءَ اقْتَضَاهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ

‘রাতের বেলায় আগত মেহমানের মেহমানদারি করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ওয়াজিব। আর যদি তার নিকট মেহমানের ভোর হয় (অর্থাৎ ভোর পর্যন্ত যদি মেহমান সেখানে অবস্থান করে), তখন সকালের মেহমানদারি মেজবানের নিকট মেহমানের পাওনাস্বরূপ। মেহমান ইচ্ছা করলে এ পাওনা শোধ করে নিতে পারে, ইচ্ছা করলে তা ছেড়ে দিতে পারে।’^{৬৫৮}

৬৫৭. সহিহুল বুখারি : ৬০১৯

৬৫৮. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৭৪৪

যারা মেহমানদারি করতে কুষ্ঠাবোধ করে এবং বাড়ির দরজা মেহমানের জন্য খুলে দেয় না, তাদের মাঝে কোনো কল্যাণ নেই।

হাদিস শরিফে এমনটাই বলা হয়েছে :

لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يُضِيفُ

‘সে লোকের মাঝে কোনো কল্যাণ নেই, যে মেহমানদারি করে না।’^{৬৫৯}

ইসলাম প্রত্যেক মুসলমানের ওপর মেহমানদারি আবশ্যক করেছে। এটাকে মেহমানের হক ও অধিকার সাব্যস্ত করেছে। এ অধিকার আদায়ে অবহেলা করা মুসলমানের জন্য উচিত নয়। কোনো গোত্রের লোকেরা যদি কৃপণতা করে মেহমানদারি করতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে ইসলাম মেহমানকে এ অনুমতি দেয় যে, সে চাইলে তার অধিকার আদায় করতে তাদের বাধ্য করতে পারবে।

এ সম্পর্কিত একটি হাদিস ইমাম বুখারি رحمہ اللہ ও ইমাম মুসলিম رحمہ اللہ উকবা বিন আমির رحمہ اللہ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন :

إِنَّكَ تَبْعُنَا، فَتَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يَقْرُونَا، فَمَا تَرَى فِيهِ؟ فَقَالَ لَنَا: إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ، فَأَمَرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَأَقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ

‘(আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম,) আপনি কখনো কখনো আমাদের এমন সম্প্রদায়ের লোকের নিকট প্রেরণ করেন, যারা আমাদের মেহমানদারি করে না। এমতাবস্থায় আমরা কী করব? উত্তরে রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, যদি তোমরা কোনো এলাকায় গিয়ে পৌঁছো, তখন মেহমানদারিস্বরূপ তারা যা কিছু তোমাদের দেয়, তা সাদরে গ্রহণ করবে। আর যদি তারা তা না করে, তখন মেহমানদারির অধিকার তাদের থেকে (যেকোনো উপায়ে) আদায় করে নেবে।’^{৬৬০}

মেহমানদারি ইসলামের একটি মৌলিক উত্তম চরিত্র। এজন্য প্রকৃত মুসলমানকে—তার আর্থিক অবস্থা যেমনই হোক—মেহমানদারি করতে

৬৫৯. মুসনাদু আহমাদ : ১৭৪১৯

৬৬০. সহিহুল বুখারি : ২৪৬১, সহিহ মুসলিম : ১৭২৭



কার্পণ্য করতে দেখা যায় না। কারণ, ইসলাম তাকে জানিয়ে দিয়েছে যে, দুজনের খাবার তিনজনের জন্য যথেষ্ট হয়, আর তিনজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট হয়। ফলে সে হঠাৎ আসা মেহমানের মেহমানদারি করতেও কোনোরূপ সংকোচবোধ করে না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

طَعَامُ الْإِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلَاثَةِ، وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَافِي الْأَرْبَعَةِ

‘দুজনের খাবার তিনজনের জন্য যথেষ্ট হয়, আর তিনজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট হয়।’^{৬৬১}

জাবির র. বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

طَعَامُ الرَّجُلِ يَكْفِي رَجُلَيْنِ، وَطَعَامُ رَجُلَيْنِ يَكْفِي أَرْبَعَةً، وَطَعَامُ
أَرْبَعَةٍ يَكْفِي ثَمَانِيَةً

‘একজনের খাবার দুজনের জন্য যথেষ্ট, দুজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট, আর চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট হয়।’^{৬৬২}

প্রকৃত মুসলমান তার সাথে বেশি মানুষ খানা খাওয়াকে ভয় পায় না। অথচ পাশ্চাত্য সমাজে পূর্ব-আমন্ত্রণ ব্যতীত হঠাৎ কেউ উপস্থিত হলে মেজবান বিব্রতবোধ করে। এমন কোনো ব্যক্তিকে সে আপ্যায়ন করে না, যার জন্য পূর্ব থেকে খাবার তৈরি করা হয়নি। কিন্তু মুসলমান অপ্রত্যাশিত মেহমানকে সাদরে বরণ করে নেয় এবং তার সাথে খাবারে শরিক করে। এতে তার পেটে কয়েক লুকমা খাবার কম গেলেও সে কোনো সমস্যা অনুভব করে না। কেননা, প্রকৃত মুসলমানের কাছে ক্ষুধার চেয়ে মেহমানের মেহমানদারি অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এটাই আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ-এর নির্দেশ। তা ছাড়া আল্লাহ তাআলা একজনের খাবারে বরকত দান করে দুজনের জন্য যথেষ্ট করেছেন, দুজনের খাবারে বরকত দান করে চারজনের জন্য যথেষ্ট করেছেন। কিন্তু বস্তুবাদী সমাজের লোকেরা অপ্রত্যাশিত মেহমানকে মেহমানদারি করার কোনো প্রেরণা

৬৬১. সহিহুল বুখারি : ৫৩৯২

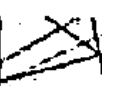
৬৬২. সহিহ মুসলিম : ২০৫৯

তাদের সমাজব্যবস্থা থেকে পায় না। তাই তারা প্রকৃত মুসলমানের মতো মেহমানদারির এমন নজির দেখাতে পারে না।

আমাদের সালাফে সালিহিন মেহমানদারির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। এমনকি সালাফের মধ্য হতে কারও মেহমানদারি দেখে খোদ আল্লাহ তাআলাই আশ্চর্যান্বিত হয়েছেন। ঘটনাটি ইমাম বুখারি رحمہ اللہ ও মুসলিম رحمہ اللہ আবু হুরাইরা رضی اللہ عنہ থেকে বর্ণনা করেছেন :

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَعَثَ إِلَى نِسَائِهِ فَقُلْنَ: مَا مَعَنَا إِلَّا الْمَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ يَضُمُّ أَوْ يُضِيفُ هَذَا»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: أَنَا، فَاذْطَلَقَ بِهِ إِلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ: أَكْرِمِي ضَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: مَا عِنْدَنَا إِلَّا قُوْثٌ صَبْيَانِي، فَقَالَ: هَيَّيْ طَعَامَكَ، وَأَصْبِحِي سِرَاجَكَ، وَنَوِّمِي صَبْيَانَكَ إِذَا أَرَادُوا عَشَاءً، فَهَيَّأْتُ طَعَامَهَا، وَأَصْبَحْتُ سِرَاجَهَا، وَنَوَّمْتُ صَبْيَانَهَا، ثُمَّ قَامَتْ كَأَنَّهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا فَأُظْفَأَتْ، فَجَعَلَ يُرِيَانِهِ أَنَّهُمَا يَأْكُلَانِ، فَبَاتَا طَاوِيَيْنِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «ضَحِكَ اللَّهُ اللَّيْلَةَ، أَوْ عَجِبَ، مِنْ فَعَالِكُمَا» فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [الحشر: ٩]

‘এক ব্যক্তি নবিজি ﷺ-এর নিকট আসলো। তিনি তাঁর স্ত্রীদের নিকট (মেহমানের জন্য খাবার আনতে) লোক পাঠালেন। তারা জানালেন যে, আমাদের নিকট পানি ছাড়া খাওয়ার মতো কিছুই নেই। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, কে এ ব্যক্তিকে মেহমান বানাবে? তখন আনসার সাহাবিদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললেন, আমি। তারপর তিনি তাকে নিয়ে গেলেন এবং স্ত্রীকে বললেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মেহমানের আপ্যায়ন করো। স্ত্রী বললেন, ‘ছেলেমেয়ের রাতের খাবার ছাড়া ঘরে তো আর কিছুই নেই। তিনি বললেন, খাবার



প্রস্তুত করো এবং বাতি জ্বালিয়ে রাখো। আর ছেলেমেয়েরা রাতের খাবার খেতে চাইলে তাদের প্রবোধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। মহিলাটি স্বামীর কথামতো খাবার প্রস্তুত করলেন, বাতি জ্বালিয়ে রাখলেন এবং সন্তানদের ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। তারপর মেহমানের সামনে বাতি ঠিক করার ছুতোয় তা নিভিয়ে দিলেন; যেন মেহমান মনে করে, অন্ধকারে তারাও খাচ্ছে। এভাবে তারা স্বামী-স্ত্রী উপোস থেকে রাত কাটালেন। অতঃপর যখন সকালে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে গেলেন, তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা তোমাদের গতরাতের কার্যকলাপে হেসে দিয়েছেন অর্থাৎ তা খুবই পছন্দ করেছেন এবং আয়াত অবতীর্ণ করেছেন, ‘আর নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদের অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম [সূরা আল-হাশর : ৯]।’^{৬৬৩}

এখানে বাতি নিভিয়ে দিয়ে খুবই বুদ্ধিমত্তার কাজ করেছেন তিনি। যদি তা না করতেন, তাহলে মেহমান বুঝতে পারতেন যে, তাদের খাওয়ার মতো আসলে কিছুই নেই। তখন তার কারণে মেজবান কষ্ট পাচ্ছে দেখে তিনি খুব ব্যথা পেতেন এবং বিব্রতবোধ করতেন। কেননা, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُّسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ؟ قَالَ: يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ يَقْرِيهِ بِهِ

‘কোনো মুসলমানের জন্য এটা হালাল নয় যে, তার কোনো ভাইকে পাপে লিপ্ত করে তার নিকট অবস্থান করবে। সাহাবিগণ প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, তাকে পাপে লিপ্ত করার অর্থ কী? উত্তরে তিনি বললেন, তার কাছে এমন অবস্থায় মেহমান হওয়া, যখন মেহমানাদারি করার মতো কোনো বস্তুই তার কাছে থাকে না।’^{৬৬৪}

বুখারি শরিফের রিওয়াযাতে বর্ণিত হয়েছে :

وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُخْرِجَهُ

৬৬৩. সহিহুল বুখারি : ৩৭৯৮

৬৬৪. সহিহ মুসলিম : ৪৮



‘তার জন্য এটা হালাল নয় যে, অপর ভাইকে কষ্ট দিয়ে তার নিকট অবস্থান করবে।’^{৬৬৫}

আর প্রকৃত মুসলমান কখনো তার মেজবান ভাইকে পাপে লিপ্ত করতে বা কষ্ট দিতে চায় না। মুসলমান মেহমান ভদ্র ও চরিত্রবান হয়। একজন মেহমানের কী কী চরিত্র ও আদব থাকা চাই, সে শিক্ষা ইসলাম তাকে দিয়েছে। সুতরাং সে মেজবানের ওপর যথাসম্ভব সহজ করার চেষ্টা করে। মেজবান তার সাধ্য অনুযায়ী যা দিয়েই আপ্যায়ন করে, তা-ই বিনা দ্বিধায় ও কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করে নেয়।

নিজের ওপর অন্যকে অগ্রাধিকার দেয়

প্রকৃত মুসলমান অন্যকে নিজের ওপর অগ্রাধিকার দেয়; যদিও এতে নিজের ক্ষতি হওয়ার ভয় থাকুক। কারণ, ইসলাম তার অনুসারীদের এ গুণ অবলম্বন করতে উদ্বুদ্ধ করে। এটাকেই প্রকৃত মুসলমানের একটি মৌলিক চরিত্র বলে অভিহিত করেছে ইসলাম। এ চরিত্রের মাধ্যমেই অন্যান্য মানুষের মাঝে প্রকৃত মুসলমানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায়।

অগ্রাধিকার দেওয়ার গুণটি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পরে সবচেয়ে বেশি ছিল আনসার সাহাবিদের মাঝে। তাদের এ গুণের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আয়াতও অবতীর্ণ হয়েছে। অন্যকে নিজের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়ার যে মহান কর্ম তারা সম্পাদন করেছেন, তা প্রজন্মের পর প্রজন্ম মানবতার ইতিহাসে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। আহ, কেমন সে অগ্রাধিকার! মুহাজিরগণ তাদের নিকট গিয়েছিলেন কোনো কিছু ছাড়াই, কিন্তু আনসারগণ তাদের সবকিছুই দিয়ে দিয়েছেন!

এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ



‘যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদিনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালোবাসে। মুহাজিরদের যা দেওয়া হয়েছে, তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদের অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।’^{৬৬৬}

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মাঝে অগ্রাধিকার দেওয়ার গুণ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। এজন্য তিনি প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের মাঝে এ গুণটি বদ্ধমূল করে দিতে এবং এটাকে তাদের স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এ সম্পর্কে সাহল বিন সাদ ؓ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন :

أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبُرْدَةٍ مَنْسُوجَةٍ، فِيهَا حَاشِيَتُهَا، أَتَذُرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ قَالُوا: الشَّمْلَةُ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: نَسَجْتُهَا بِيَدِي فَجِئْتُ لِأَكْسُوكَهَا، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا إِزَارُهُ، فَحَسَنَتَا فُلَانٌ، فَقَالَ: اكْسِينِيهَا، مَا أَحْسَنَتَا، قَالَ الْقَوْمُ: مَا أَحْسَنَتْ، لِبِسَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا إِلَيْهَا، ثُمَّ سَأَلْتُهُ، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَا يَرُدُّ، قَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ، مَا سَأَلْتُهُ لِأَلْبَسَهُ، إِنَّمَا سَأَلْتُهُ لِتَكُونَ كَفَنِي، قَالَ سَهْلٌ: فَكَأَنْتَ كَفَنُهُ

‘এক মহিলা নবিজি ﷺ-এর নিকট ঝালরবিশিষ্ট একটি বুরদাহ আনলেন। সাহল ؓ বললেন, তোমরা জানো, বুরদাহ কী? তারা বলল, চাদর। সাহল ؓ বললেন, হ্যাঁ। মহিলাটি বলল, চাদরটি আমি নিজ হাতে বুনেছি এবং তা আপনার পরিধানের জন্য নিয়ে এসেছি। রাসুলুল্লাহ ﷺ তা গ্রহণ করলেন এবং তাঁর চাদরের প্রয়োজনও ছিল। তারপর তিনি তা ইজাররূপে (লুঙ্গি) পরিধান করে আমাদের সামনে আসলেন। তখন জনৈক ব্যক্তি তার সৌন্দর্য বর্ণনা করে বললেন, বাহ! এ যে কত সুন্দর! আমাকে তা পরার জন্য দান করুন। তিনি বললেন, ঠিক আছে। এরপর নবিজি ﷺ মজলিসে কিছুক্ষণ বসে

আবার ফিরে গেলেন। তারপর চাদরটি খুলে সে ব্যক্তির নিকট পাঠিয়ে দিলেন। সাহাবিগণ তাকে বললেন, কাজটি তুমি ভালো করোনি। নবিজি ﷺ তা তাঁর প্রয়োজনে পরেছেন, তবুও তুমি তা চেয়ে বসলে! অথচ তুমি জানো যে, তিনি কাউকে বিমুখ করেন না। লোকটি বলল, আল্লাহর কসম! আমি তা পরার উদ্দেশ্যে চাইনি। আমার চাওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, যেন তা আমার কাফন হয়। সাহল ﷺ বলেন, শেষে এ চাদরটাই তার কাফন হয়েছিল।^{৬৬৭}

রাসুলুল্লাহ ﷺ অগ্রাধিকার প্রদানের যে চারা মুসলমানদের অন্তরে বপন করেছেন, তার ফল দেখতে পেলে তিনি মনে খুব আনন্দ পেতেন। কারও ভেতর এ গুণটি দেখতে পেলে তার প্রশংসা করতেন এবং তাকে আরও উৎসাহিত করতেন। যেমন আশআরি গোত্রের লোকদের অগ্রাধিকার দেওয়ার গুণ সম্পর্কে তিনি ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ، فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ

‘মদিনায় আশআরি গোত্রের লোকেরা যখন যুদ্ধে অপারগ হয়ে পড়ে অথবা তাদের পরিবার ও সন্তানদের খাদ্যের অভাব দেখা দেয়, তখন তারা নিজেদের কাছের অবশিষ্ট খাদ্য একটি কাপড়ে জমা করে। অতঃপর তা পরস্পরের মধ্যে সমান অংশে বন্টন করে নেয়। এরা আমারই লোক, আর আমিও তাদের লোক (অর্থাৎ তাদের এ কর্মটি আমারই আদর্শ)।’^{৬৬৮}

অভাবগ্রস্তকে সময় দেয়

প্রকৃত মুসলমান লেনদেনের ক্ষেত্রে উদারমনস্ক ও চরিত্রবান হয়। গরিব অভাবী মানুষ থেকে ঋণ পেয়ে থাকলে আদায় করার ক্ষেত্রে তাকে নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে অতিরিক্ত সময় দেয়।

৬৬৭. সহিহুল বুখারি : ১২৭৭

৬৬৮. সহিহুল বুখারি : ২৪৮৬, সহিহ মুসলিম : ২৫০০

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ

‘যদি ঋণী ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত সময় দেওয়া উচিত।’^{৬৬৯}

ইসলাম মুসলমানকে হকের অধিকারী হওয়ার পূর্বে একজন মানুষ হতে বলে। তাই যখন সে তার ঋণগ্রহীতা ভাইয়ের মাঝে অভাব দেখতে পায়, তখন তার ওজর কবুল করে নেয় এবং সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত তাকে সময় দেয়। অথবা পারলে ঋণের কিছু অংশ বা পুরো অংশ ক্ষমা করে দেয়। এর মাধ্যমে সে মূলত আল্লাহর নির্দেশই পালন করে। তাই তার এ উত্তম আমলের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা কিয়ামত দিবসের কষ্ট থেকে তাকে মুক্তি দান করবেন এবং আরশে আজিমের ছায়াতলে স্থান দেবেন। সেদিন আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُنَجِّيَهُ اللَّهُ مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَلْيُنْفُسْ عَنْ مُعْسِرٍ،
أَوْ يَضَعْ عَنْهُ

‘যে ব্যক্তি কামনা করে যে, আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামত দিবসের কষ্ট থেকে মুক্তি দেবেন, সে যেন অভাবী ঋণগ্রস্তকে সময় দেয় অথবা ঋণের কিছু অংশ বা পুরো অংশ ক্ষমা করে দেয়।’^{৬৭০}

আবু হুরাইরা র. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ لَهُ، أَظَلَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِهِ
يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ

‘যে ব্যক্তি অভাবী ঋণগ্রস্তকে সময় দেয় অথবা ক্ষমা করে দেয়, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন তাঁর আরশের ছায়াতলে স্থান দেবেন,

৬৬৯. সূরা আল-বাকারা : ২৮০

৬৭০. সহিহ মুসলিম : ১৫৬৩



যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না।^{৬৭১}

এ বিষয়ের ওপর অনেক আয়াত ও হাদিস বর্ণিত হয়েছে। প্রতিটি আয়াত ও হাদিস এ কথা দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করে যে, ঋণদাতা যদি অভাবী ঋণগ্রহীতাকে সময় দেয় বা ঋণ মাফ করে দেয়, তাহলে তার এ আমল আল্লাহর নিকট নিশ্চল প্রতিপন্ন হবে না। এর সাওয়াব তার আমলনামায় অবশ্যই লিপিবদ্ধ হবে। এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তাকে কিয়ামতের কষ্ট, দুর্দশা ও ভয়াবহতা থেকে মুক্তি দান করবেন। এ সম্পর্কিত কয়েকটি হাদিস এখানে উল্লেখ করা হলো।

আবু হুরাইরা রাঃ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সঃ ইরশাদ করেছেন :

كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ، فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، فَلَقِيَ اللَّهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ

‘এক ব্যক্তি মানুষকে ঋণ দিত, আর তার কর্মচারীকে বলে রাখত, কোনো অভাবী লোকের কাছে যদি ঋণ আদায় করতে যাও, তাহলে তার ঋণ মাফ করে দেবে। আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে আমাদের ক্ষমা করে দিতে পারেন। এরপর লোকটি আল্লাহর সাথে মিলিত হলো (মৃত্যুবরণ করল) এবং সত্যিই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।^{৬৭২}

আবু মাসউদ বদরি রাঃ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ সঃ ইরশাদ করেছেন :

حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ، إِلَّا أَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ، وَكَانَ مُوسِرًا، فَكَانَ يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ يَتَجَاوَزُوا عَنِ الْمُعْسِرِ، قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: نَحْنُ أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْهُ، تَجَاوَزُوا عَنْهُ

‘তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে এক লোকের হিসাব গ্রহণ করা হয়, কিন্তু তার মধ্যে কোনো ভালো আমল পাওয়া যায়নি। কিন্তু সে মানুষের সাথে লেনদেন করত এবং সে ছিল সচ্ছল। তাই

৬৭১. সুনানুত তিরমিজি : ১৩০৬

৬৭২. সহিহ মুসলিম : ১৫৬২, সহিহুল বুখারি : ৩৪৮০

দরিদ্র লোকদের ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য সে তার কর্মচারীদের নির্দেশ দিত। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহ বললেন, এ ব্যাপারে (অর্থাৎ ক্ষমা করার ব্যাপারে) আমি তার চেয়ে অধিক যোগ্য। একে ক্ষমা করে দাও।^{৬৭৩}

হুজাইফা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

أَتَى اللَّهَ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَقَالَ لَهُ: مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، قَالَ: يَا رَبِّ آتَيْتَنِي مَالَكَ، فَكُنْتُ أَبَايُعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ، فَكُنْتُ أَتَيْسِرُ عَلَى الْمُوسِرِ، وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ، فَقَالَ اللَّهُ: أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ، تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي، فَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ غَامِرٍ الْجُهَنِيُّ، وَأَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ، هَكَذَا سَمِعْنَاهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

‘আল্লাহ তাআলার বান্দাদের মধ্যে কোনো এক বান্দাকে তাঁর নিকট উপস্থিত করা হলো, যাকে তিনি ধন-সম্পদ দান করেছিলেন। আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, দুনিয়াতে তুমি কী কাজ করেছ? হুজাইফা ﷺ বলেন, অথচ লোকেরা আল্লাহর নিকট থেকে কোনো কথাই গোপন করতে পারে না। উত্তরে সে বলল, হে আমার প্রভু, আপনি আমাকে আপনার ধনভান্ডার থেকে দান করেছিলেন, আমি লোকদের সাথে কেনাবেচা করতাম। আর আমার দেনাদারদের সাথে উদার ব্যবহার করাই ছিল আমার অভ্যাস। আমি সচ্ছল ব্যক্তির সাথে উদার ব্যবহার করতাম এবং গরিব অসচ্ছল ব্যক্তিকে মাফ করে দিতাম। মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ তখন বললেন, ক্ষমা করার ব্যাপারে তোমার চেয়ে আমি অধিক হকদার। (হে ফেরেশতাগণ,) আমার এ বান্দাকে তোমরা মাফ করে দাও। উকবা বিন আমির জুহানি ﷺ ও আবু মাসউদ আনসারি ﷺ বলেন, আমরাও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মুখে এরূপই শুনেছি।^{৬৭৪}

৬৭৩. সহিহ মুসলিম : ১৫৬১

৬৭৪. সহিহ মুসলিম : ১৫৬০

যাচনা ও ভিক্ষাবৃত্তি করে না

প্রকৃত মুসলমান স্বনির্ভর ও অমুখাপেক্ষী হয়। মানুষের কাছে হাত পাতে না। অভাব-অনটনের সময় ধৈর্যধারণ করে। যতটুকু পারে নিজে চেষ্টা করে কামাই করে। কারও নিকট অনুগ্রহ ও সাহায্য প্রার্থনা করে না। কারণ, তার দ্বীন তাকে এ তুচ্ছ কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেয় এবং ধৈর্য ধরতে বলে। তা ছাড়া সে বিশ্বাস করে, মানুষের কাছে কিছু চাওয়া থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করলে এবং স্বনির্ভর ও ধৈর্যশীল থাকতে চাইলে আল্লাহ তাআলা তাওফিক দান করেন এবং সাহায্য করেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

وَمَنْ يَسْتَغْفِرْ يُعْفِهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ
اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ

‘আর যে ব্যক্তি অন্যের কাছে চাওয়া থেকে বিরত থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পরের কাছে হাত পাতার অভিশাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। আর যে ব্যক্তি স্বনির্ভর হতে চায়, আল্লাহ তাকে স্বনির্ভরতা দান করেন। আর যে ব্যক্তি ধৈর্যের পথে অগ্রসর হয়, আল্লাহ তাকে ধৈর্যধারণের ক্ষমতা দান করেন। বস্তুত, আল্লাহর দেওয়া দানসমূহের মধ্যে ধৈর্যশক্তির চেয়ে উত্তম ও প্রশস্ত দান আর কিছু নেই।’^{৬৭৫}

ইসলাম ধনীদের সম্পদে গরিবদের অধিকার রেখেছে এবং ধনীদের নিকট ইসলাম দাবি পেশ করেছে, তারা যেন কোনো ধরনের খোঁটা না দিয়ে, কষ্ট না দিয়ে এবং অমর্যাদা না করে গরিবদের সে হক ও অধিকার আদায় করে দেয়। অপরদিকে গরিবদের থেকে ইসলাম প্রত্যাশা করে, তারা যেন ধনীদের সম্পদে তাদের যে হক রয়েছে, তার প্রতি মুখাপেক্ষী না থাকে। আরও ঘোষণা দিয়েছে, ওপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম। তাই প্রকৃত মুসলমানকে সব সময় চেষ্টা করতে হবে, তার হাত যেন নিচের হাত না হয়। এটাই তার জন্য যথোপযুক্ত। এজন্য যাদের নিকট ধন-সম্পদ কম, তাদের একটু বেশি

৬৭৫. সহিহুল বুখারি : ১৪৬৯, সহিহ মুসলিম : ১০৫৩

মেহনত করে নিজের প্রয়োজনের উপকরণ জোগাড় করতে হবে। সদকা ও অনুদানের ওপর নির্ভর করে বসে থাকা যাবে না। কারণ, এতে মনুষ্যত্বের মর্যাদা ব্যাহত হয়। এজন্যই রাসুলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদের সদকা করার প্রতি ও মানুষের নিকট হাত না পাতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে গিয়ে বলেছেন :

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، فَالْيَدُ الْعُلْيَا: هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَالسُّفْلَى:
هِيَ السَّائِلَةُ

‘ওপরের হাত নিচের হাতের চেয়ে উত্তম। ওপরের হাত হলো দানকারীর হাত, আর নিচের হাত হলো ভিক্ষকের হাত।’^{৬৭৬}

সে মানুষের সাথে অন্তরঙ্গ, আর মানুষও তার সাথে অন্তরঙ্গ

ইসলামের আলোয় আলোকিত প্রকৃত মুসলমান কোমল স্বভাবের হয়। সে নিজে অন্তরঙ্গ, অন্যরাও তার সাথে অন্তরঙ্গ। মানুষের সাথে অন্তরঙ্গতা ও সম্প্রীতির সাথে মিলেমিশে থাকে। তারাও তার প্রতি অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ হয় এবং তাকে ভালোবাসে। এটি একটি উন্নত সামাজিক চরিত্র। প্রকৃত মুসলমান—যে নিজের মাঝে দ্বীনের বার্তা বহন করে চলে—এ গুণটিকে নিজের ভেতর ফিট করে নেয়। সে বিশ্বাস করে, সমাজের মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকা ও তাদের ভরসা অর্জন করা একজন মুসলমানের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য এবং তাদের নিকট সত্যের বাণী পৌঁছে দিতে অত্যন্ত সহায়ক। যে সত্য ও আদর্শ সে বহন করে চলছে, তা লোকদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হলে অবশ্যই এ গুণ অবলম্বন করতে হবে। কেননা, মানুষ এমন মানুষের কথা শুনতে চায় না, যার সাথে তারা অন্তরঙ্গ নয় এবং যার প্রতি তাদের ভরসা নেই। পক্ষান্তরে যার সাথে তাদের অন্তরঙ্গতা ও ঘনিষ্ঠতা আছে এবং যার প্রতি তাদের ভরসা আছে, তার কথা শুনতে ও মানতে তারা দ্বিধাবোধ করে না। এজন্য ইসলামের অনেক আয়াত-হাদিসে এ গুণটি অবলম্বন করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং যাদের মাঝে গুণটি বিদ্যমান, তাদের একটি বিশেষ দলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যারা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ভালোবাসা ও কিয়ামতের দিন তাঁর নিকট অবস্থান করার নিয়ামত লাভে ধন্য হবে।

হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে :

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟
فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَأَعَادَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، قَالَ الْقَوْمُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ
اللَّهِ، قَالَ: أَحْسَنُكُمْ خُلُقًا وزادت بعض الروايات : الْمُوَطَّئُونَ
أَكْنَفُهُمْ، الَّذِينَ يَأْلِفُونَ وَيُؤْلَفُونَ

‘আমি কি তোমাদের বলব, কারা আমার নিকট অধিক প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন আমার অধিক নিকটবর্তী হবে? উপস্থিত সাহাবিগণ চুপ করে রইলেন। অতঃপর আরও তিনবার অথবা দুবার বললেন। তখন সাহাবিগণ বললেন, অবশ্যই বলুন, হে আল্লাহর রাসুল। বললেন, (তারা হলো,) তোমাদের মধ্যে যাদের চরিত্র সবচেয়ে উত্তম ও সুন্দর।’ আরেকটি রিওয়াযাতে অতিরিক্ত বর্ণিত হয়েছে, ‘আর যাদের অন্তর প্রশস্ত, মানুষের সাথে তারা অন্তরঙ্গ এবং মানুষও তাদের সাথে অন্তরঙ্গ।’^{৬৭৭}

মুমিনের অন্যতম গুণ হলো, সে মানুষের সাথে অন্তরঙ্গ হবে আর মানুষও তার সাথে অন্তরঙ্গ হবে। মানুষকে সে ভালোবাসবে, তারাও তাকে ভালোবাসবে। তাদের প্রতি সে মনোযোগী হবে এবং তারাও তার প্রতি মনোযোগী হবে। মুমিনের মাঝে যদি এ গুণটি না থাকে, তাহলে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হবে না। তার নিকট থেকে কোনো কল্যাণেরও আশা করা যাবে না।

এজন্য হাদিস শরিফে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

الْمُؤْمِنُ يَأْلَفُ وَيُؤْلَفُ، وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ، وَلَا يُؤْلَفُ

‘মুমিন সে ব্যক্তি, যে মানুষের সাথে অন্তরঙ্গ এবং মানুষও তার সাথে অন্তরঙ্গ। আর যে ব্যক্তি মানুষের সাথে অন্তরঙ্গ নয় এবং মানুষও তার সাথে অন্তরঙ্গ নয়—এমন ব্যক্তির মাঝে কোনো কল্যাণ নেই।’^{৬৭৮}

৬৭৭. মুসনাদু আহমাদ : ৬৭৩৫, জামিউ মামার : ২০১৫৩

৬৭৮. আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানি : ৫৭৮৭

রাসুলুল্লাহ ﷺ মানুষের সাথে উত্তম আচরণের মাধ্যমে উম্মাহর জন্য মহান আদর্শরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। উম্মাহকে কথা, কাজ ও জীবনযাপনের ক্ষেত্রে তাঁর সে আদর্শের অনুকরণ করার দাওয়াত দিয়েছেন। তিনি উম্মাহকে শিখিয়ে দিয়েছেন, কী করে মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিতে হয়, কীভাবে তাদের ভালোবাসা অর্জন করতে হয়। রাসুলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সদা হাস্যমুখ, সহজ-সরল ও কোমল স্বভাবের অধিকারী। তিনি রূঢ় ও কঠোর ছিলেন না। কোনো সম্প্রদায়ের নিকট গেলে তাদের মজলিসের শেষে যেখানে জায়গা পেতেন, সেখানে বসতেন এবং অন্যদেরও এমন করার নির্দেশ দিতেন। তাঁর মজলিসে আগত প্রত্যেক সদস্যকে সমানভাবে জায়গা দিতেন। মজলিসে যারা বসত, তাদের কেউ এ কথা মনে করার সুযোগ পেত না যে, এ মজলিসে অন্যজন তার চেয়ে বেশি সম্মান পাচ্ছে। কেউ তাঁর নিকট কিছু চাইলে খালি হাতে ফিরতে হতো না। সবার সাথে তিনি সহজ-সরল ভাষায় কথা বলতেন। তাঁর চরিত্র ও দয়া সকল মানুষের জন্য ব্যাপক ও সমান ছিল। এভাবে তিনি হয়ে উঠেছিলেন সবার জন্য স্নেহশীল এক পিতা। অধিকারের ক্ষেত্রে সবাই তাঁর কাছে সমান ছিল। তাঁর মজলিসে যারা বসতেন, তাদের পরস্পরের মাঝে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। একমাত্র তাকওয়ার মাধ্যমে তাদের মর্যাদার তারতম্য হতো। তারা ছিলেন নম্র ও ভদ্র। তারা বড়দের সম্মান করতেন, ছোটদের স্নেহ করতেন, অভাবীদের সহায় হতেন এবং অপরিচিত ভিনদেশিদের হিফাজত করতেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে কোনো কিছুর আশা করে কখনো নিরাশ ও হতাশ হতে হয়নি কাউকে। তিনি তিনটি বিষয় থেকে নিজেকে দূরে রাখতেন। এক. অহেতুক বিতর্ক করা, দুই. বেশি কথা বলা, তিন. অপ্রয়োজনীয় কথা ও কাজ। আর মানুষের ব্যাপারে তিনটি বিষয় থেকে বিরত থাকতেন। এক. কারও নিন্দা করতেন না, দুই. কাউকে লজ্জা দিতেন না, তিন. কারও দোষ তাল্লাশ করতেন না। যখন তিনি কথা বলতেন, তখন তাঁর শ্রোতাগণ এমন তন্ময় হয়ে যেতেন, যেন তাদের মাথার ওপর পাখি বসে আছে। আর যখন তিনি চুপ হতেন, তখন তারা কথা বলতেন। তাঁর সামনে তাঁরা পরস্পর ঝগড়া করতেন না। তাঁদের হাসিতে তিনি হাসতেন এবং তাঁদের আনন্দে তিনি আনন্দিত হতেন। অপরিচিত মূর্খ ব্যক্তির অবাঞ্ছিত কথা ও প্রশ্নে তিনি

ধৈর্য ধরতেন। তিনি তাঁর সাহাবিদের বলতেন, যদি কোনো অভাবীকে তোমরা দেখো, তাহলে তার সাহায্য করবে। তিনি অতিরঞ্জিত প্রশংসা গ্রহণ করতেন না। কেউ তাঁর সাথে কথা বললে তার সম্পূর্ণ কথা শুনতেন। কথার মাঝখানে তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিতেন না।

আয়িশা   বর্ণনা করেন যে, তিনি দুষ্ট লোকদের থেকে বেঁচে থাকতেন। তাদের সাথে সুন্দর কথা ও আচরণের মাধ্যমে তাদের দমিয়ে রাখতেন।

এ ধরনের এক ব্যক্তি তাঁর নিকট আসার অনুমতি চাইলে তিনি বললেন :

اِذْنُوا لَهُ، فَلَبِئْسَ ابْنُ الْعَشِيرَةِ، أَوْ بِئْسَ رَجُلٌ الْعَشِيرَةِ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ أَلَانَ لَهُ الْقَوْلَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ لَهُ الَّذِي قُلْتَ، ثُمَّ أَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ؟ قَالَ: يَا عَائِشَةُ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مَنْ وَدَّعَهُ، أَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ

‘তাকে অনুমতি দাও। সে তার বংশের নিকৃষ্ট সন্তান। অথবা বললেন, সে তার গোত্রের নিকৃষ্টতম ভাই। যখন সে প্রবেশ করল, তখন তিনি তার সাথে নম্রভাবে কথাবার্তা বললেন। আমি (আয়িশা  ) বললাম, হে আল্লাহর রাসুল, আপনি এর সম্পর্কে যা বলার তা বলেছেন, এখন আপনি তার সাথে নম্রভাবে কথা বললেন যে! তিনি বললেন, হে আয়িশা, আল্লাহর কাছে মর্যাদার দিক দিয়ে নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তি, যার অশালীন আচরণ থেকে বেঁচে থাকার জন্য মানুষ তার সংশ্লিষ্ট ত্যাগ করে।’^{৬৭৯}

প্রকৃত মুসলমান মানুষের সাথে আচরণে রাসুলুল্লাহ  -এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে, যেন সে সবার নিকট প্রিয়, ঘনিষ্ঠ ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

ইসলামি রীতির সামনে ব্যক্তিগত স্বভাব বিসর্জন দেয়

প্রকৃত মুসলমানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, সমাজে ইসলামি রীতির সামনে ব্যক্তিগত প্রিয় অভ্যাসসমূহ সমর্পণ করে দেয়। এজন্য প্রকৃত

মুসলমানদের সমাজ সম্পূর্ণরূপে ইসলামি মূল্যবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে।

সুতরাং সে স্বর্ণের আংটি পরিধান করে না। কেননা, পুরুষদের জন্য স্বর্ণের আংটি পরিধান করা ইসলামি শরিয়তে হারাম। এক ব্যক্তির হাতে স্বর্ণের আংটি দেখে রাসুলুল্লাহ ﷺ এ ঘোষণা দিয়েছেন।

ইরশাদ করেছেন :

يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ

‘তোমাদের কেউ কি আগুনের জ্বলন্ত অঙ্গার হাতের মুঠোয় নিতে চাইবে?’^{৬৮০}

তারপর তিনি লোকটির আঙুল থেকে আংটিটি খুলে মাটিতে ফেলে দিলেন। এখানে লোকটি আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ-এর প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। কারণ, যখন তার সঙ্গীরা তাকে নিষ্কিণ্ড আংটি তুলে নিয়ে বিক্রি করে তার মূল্য দ্বারা উপকৃত হতে বলল, তখন তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আমি এমন বস্তুকে তুলে নেব না, যা রাসুলুল্লাহ ﷺ নিষ্পেক্ষ করেছেন।

প্রকৃত মুসলমান সোনা ও রূপার পাত্রে পানাহার করে না। রেশমি পোশাক পরিধান করে না। কারণ, রাসুলুল্লাহ ﷺ অনেক হাদিসে এ থেকে নিষেধ করেছেন। কয়েকটি হাদিস এখানে উল্লেখ করা হলো।

হুজাইফা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنِ الْحَرِيرِ وَالذِّيْبَاجِ، وَالشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَقَالَ: هُنَّ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ

‘নবিজি ﷺ আমাদের রেশমি পোশাক পরিধান করতে এবং সোনা ও রূপার পাত্রে পান করতে নিষেধ করেছেন। আর বলেছেন, এগুলো দুনিয়াতে তাদের (কাফিরদের) জন্য, আর আখিরাতে তোমাদের জন্য।’^{৬৮১}

৬৮০. সহিহ মুসলিম : ২০৯০

৬৮১. সহিহুল বুখারি : ৫৬৩২

উম্মে সালামা ؓ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءٍ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجْرَجُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ

‘যে ব্যক্তি রূপার পাত্রে পান করে, সে ঘড়ঘড় করে তার পেটের ভেতর জাহান্নামের আগুন ভরে।’^{৬৮২}

মুসলিম শরিফের আরেক বর্ণনায় এসেছে :

أَنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ فِي رَوَايَةٍ لَهُ : مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ، فَإِنَّمَا يُجْرَجُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ

‘নিশ্চয় যে ব্যক্তি সোনা ও রূপার পাত্রে খায় এবং পান করে, মুসলিমের আরেক বর্ণনায় এসেছে, যে ব্যক্তি সোনা বা রূপার পাত্রে পান করে, সে (এর মাধ্যমে) ঘড়ঘড় করে তার পেটের ভেতর জাহান্নামের আগুন ভরে।’^{৬৮৩}

উমর বিন খাত্তাব ؓ বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ

‘(দুনিয়াতে একমাত্র) সে ব্যক্তিই রেশমের পোশাক পরিধান করে, যার জন্য আখিরাতে কোনো অংশ নেই।’^{৬৮৪}

আলি ؓ বলেন, আমি দেখেছি, রাসুলুল্লাহ ﷺ ডান হাতে রেশমি কাপড় নিলেন এবং বাম হাতে স্বর্ণ নিলেন, তারপর বললেন :

إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي

‘এ দুটি বস্তু আমার উম্মতের পুরুষদের ওপর হারাম।’^{৬৮৫}

৬৮২. সহিহুল বুখারি : ৫৬৩৪, সহিহ মুসলিম : ২০৬৫

৬৮৩. সহিহ মুসলিম : ২০৬৫

৬৮৪. সহিহুল বুখারি : ৫৮৩৮

৬৮৫. সুনানু আবু দাউদ : ৪০৫৭

আবু মুসা আশআরি ؓ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ؐ ইরশাদ করেছেন :

حُرِّمَ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِمَرَاتِهِمْ

‘রেশমি পোশাক আর স্বর্ণ আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে, আর মহিলাদের জন্য হালাল করা হয়েছে।’^{৬৮৬}

হুজাইফা ؓ বলেন :

نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذِّيْبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ

‘নবিজি ؐ আমাদের সোনা ও রূপার পাত্রে পানাহার করতে এবং রেশমি বস্ত্র পরিধান করতে ও তার ওপর বসতে নিষেধ করেছেন।’^{৬৮৭}

প্রকৃত মুসলমান রাসুলুল্লাহ ؐ-এর কথা মেনে নিয়ে এগুলোকে নিজের জন্য হারাম করে নেয়। এ বস্তুগুলো কেন হারাম করা হলো, তার কারণ সে খুঁজে বেড়ায় না। কারণ, হালাল-হারামের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, পবিত্র কুরআনের এ আয়াত :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

‘রাসুল তোমাদের (বিধানস্বরূপ) যা দেন, তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো।’^{৬৮৮}

বর্তমান আমাদের বিয়ে-শাদিতে যেসব পাশ্চাত্য রীতি ও কুসংস্কৃতি প্রবেশ করেছে, প্রকৃত মুসলমান সেগুলো মেনে চলে না। যেমন : বাগদানের সময় ডান হাতে আংটি পরিয়ে দেওয়া, আবার বাসর রাতে তা বাম হাতে স্থানান্তর করা, বাসর রাতে নবদম্পতির ঘরে মাহরাম-গাইরে মাহরাম আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব মিলে স্মৃতির জন্য গ্রুপ ছবি তোলা ইত্যাদি অপসংস্কৃতি, যা

৬৮৬. সুনানুত তিরমিজি : ১৭২০

৬৮৭. সহিহুল বুখারি : ৫৮৩৭

৬৮৮. সূরা আল-হাশর : ৭

কাফিররা বুদ্ধিবৃত্তিক যুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের মাঝে ছড়িয়ে দিয়েছে। এগুলো সবই বিজাতীয় অপসংস্কৃতি। প্রকৃত মুসলমান এসব বিষয়কে জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যান করে।

আরও যেসব অপসংস্কৃতি সমাজে প্রচলিত আছে, প্রকৃত মুসলমান সেসবকেও প্রত্যাখ্যান করে। যেমন : দেয়ালে ছবি রাখা, ভাস্কর্যের নামে মূর্তি স্থাপন করা, ঘরে পাহারাদারির উদ্দেশ্যে ব্যতীত কুকুর পালন করা ইত্যাদি বিষয়। এসব বিষয় ইসলামে কঠিনভাবে নিষিদ্ধ। মুমিনদের জন্য কোনো অজুহাতেই এসব বিষয় বৈধ নয়। এ সম্পর্কে অসংখ্য হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এখানে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

ইবনে উমর   বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ   ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّورَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا
مَا خَلَقْتُمْ

‘যারা ছবি তৈরি করে, কিয়ামতের দিন তাদের আজাব দেওয়া হবে।
তাদের বলা হবে, যা তোমরা বানিয়েছ, তাতে প্রাণ দান করো।’^{৬৮৯}

আয়িশা   বলেন, রাসুলুল্লাহ   কোনো এক সফর থেকে ফিরলেন। তখন আমি ভেন্টিলেটারের ওপর একটি পর্দা টেনে রেখেছিলাম, যার ওপর ছবি আঁকা ছিল। রাসুলুল্লাহ  -এর দৃষ্টি যখন তার ওপর পড়ল, রাগে তাঁর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে গেল। অতঃপর বললেন :

أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهَوْنَ بِخَلْقِ اللَّهِ قَالَتْ:
فَجَعَلْنَاهُ وَسَادَةً أَوْ وَسَادَتَيْنِ

‘হে আয়িশা, কিয়ামতের দিন সেসব লোকের সবচেয়ে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে, যারা আল্লাহর সৃষ্টির সাদৃশ্য তৈরি করে। আয়িশা   বলেন, এরপর আমি পর্দাটি ছিঁড়ে তা দিয়ে একটি বা দুটি বালিশ বানিয়ে নিলাম।’^{৬৯০}

৬৮৯. সহিহুল বুখারি : ৫৯৫১

৬৯০. সহিহুল বুখারি : ৫৯৫৪, সহিহ মুসলিম : ২১০৭

ইবনে আব্বাস ؓ বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি :

كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ، يَجْعَلُ لَهُ، بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا، نَفْسًا فَتُعَذِّبُهُ فِي جَهَنَّمَ، وَقَالَ: إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَأَعِلاً، فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لَا نَفْسَ لَهُ

‘সকল ছবি অঙ্কনকারী জাহান্নামে যাবে। আর প্রত্যেক ছবির পরিবর্তে একটি জীবিত প্রাণী বানানো হবে, যে তাকে জাহান্নামে শাস্তি দেবে। ইবনে আব্বাস ؓ বলেন, যদি একান্তই তোমাদের ছবি আঁকতে হয়, তাহলে গাছ ও প্রাণহীন বস্তুর ছবি আঁকবে।’^{৬৯১}

আয়িশা ؓ বর্ণনা করেন :

وَأَعَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي سَاعَةٍ يَأْتِيهِ فِيهَا، فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ، وَفِي يَدِهِ عَصَا، فَأَلْقَاهَا مِنْ يَدِهِ، وَقَالَ: مَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَا رُسُلُهُ، ثُمَّ التَفَّتْ، فَإِذَا جِرُّوْ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ، فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، مَتَى دَخَلَ هَذَا الْكَلْبُ هَاهُنَا؟ فَقَالَتْ: وَاللَّهِ، مَا دَرَيْتُ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، فَجَاءَ جَبْرِيلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَعَدَّتْنِي فَجَلَسْتُ لَكَ فَلَمْ تَأْتِ، فَقَالَ: مَنَعَنِي الْكَلْبُ الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ، إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ

‘এক সময় জিবরাইল ؑ রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আসার ওয়াদা করলেন। কিন্তু নির্ধারিত সময় পার হওয়ার পরও তিনি আসলেন না। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাতে একটি লাঠি ছিল, তা ফেলে দিলেন এবং বললেন, আল্লাহ ও তাঁর প্রেরিত দূতগণ ওয়াদা খেলাফ করেন না। অতঃপর তিনি এদিক সেদিক তাকালেন এবং চৌকির নিচে একটা কুকুরের বাচ্চা দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, আয়িশা, এখানে কুকুর কখন ঢুকেছে? তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি জানি না। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশে তা বের করে দেওয়া হলো। তখনই জিবরাইল ؑ আসলেন। রাসুলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন,

আপনি আমার সাথে ওয়াদা করেছিলেন, আর আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম, কিন্তু আপনি আসেননি। জিবরাইল ﷺ বললেন, যে কুকুরটা আপনার ঘরে ছিল সেটাই আমাকে আসতে বাধা দিয়েছিল। কেননা, যে ঘরে কুকুর কিংবা ছবি থাকে, সে ঘরে আমরা প্রবেশ করি না।^{৬৯২}

এ সম্পর্কে আরও অনেক হাদিস রয়েছে। প্রতিটি হাদিস ঘরে ছবি রাখা ও ভাস্কর্য স্থাপন করাকে হারাম প্রমাণিত করে। পরবর্তীকালে সময়ই এ হারামকরণের হিকমত ও রহস্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে আমাদের সামনে। বিশেষ করে বর্তমান যুগে; যখন মুনাফিক, দুষ্ট ও প্রবৃত্তিপূজারি লোকেরা পাপাচারের প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে এবং তাদের পাপাচারের ওপর অটল থাকার জন্য মানুষের সামনে তা উত্তমরূপে উপস্থাপন করছে—এ যুগে ছবি ও ভাস্কর্যকে তাদের অপকর্মের সমর্থন আদায়ের মাধ্যম হিসাবে বেছে নিয়েছে তারা। জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর তাদের ছবি ও ভাস্কর্য নির্মাণ করে মানুষের সামনে তাদের মডেল হিসাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সম্মান, মর্যাদা ও উপাসনার আসনে বসানোর অপচেষ্টা চালাচ্ছে। গরিবের পেট মেরে এসব ছবি ও ভাস্কর্য নির্মাণের খরচ জোগাড় করা হয়। অর্থাৎ গরিবের করের টাকা দিয়ে অথবা গরিবদের মৌলিক অধিকার পূরণ না করে এসব ফালতু খাতে রাষ্ট্রের টাকা উড়িয়ে চলছে তারা। তাই বলা যায়, রাসুলুল্লাহ ﷺ ছবি তোলা ও ভাস্কর্য নির্মাণ করাকে কেন নিষিদ্ধ করেছিলেন, তার হিকমত ও রহস্য বর্তমান সময় সবার সামনে উন্মুক্ত করে দিয়েছে।

পনেরো শতক ধরে চলে আসা শিরক ও জাহিলিয়াত বিতাড়ন করে একত্ববাদের আকিদা নিয়ে ইসলাম আগমন করেছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে বিভিন্ন নেতা, গুণীজন, বিজ্ঞানী, কবি, সাহিত্যিক ইত্যাদি প্রভাবশালী ও মর্যাদাবান ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নামে সেই বিতাড়িত শিরক ও জাহিলিয়াত আবার আসতে শুরু করেছে মুসলমানদের জীবনে। অথচ ইসলামি সমাজ একটি একত্ববাদী সমাজ। এখানে চূড়ান্ত সম্মান, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও জন্য চূড়ান্ত শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদার আসন ইসলামি সমাজে নেই।

৬৯২. সহিহ মুসলিম : ২১০৪



কুকুর পালনের ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান হলো, শিকারের কাজে লাগানোর জন্য অথবা গবাদিপশু ও খেত-খামার পাহারা দেওয়ার জন্য কুকুর পালন করা বৈধ। যেমন ইবনে উমর রাঃ-এর হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সঃ-কে বলতে শুনেছি :

مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا، إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَّةً، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ

‘যে ব্যক্তি গবাদি পশুর রক্ষণাবেক্ষণ কিংবা শিকারের কাজে লাগানোর উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো কারণে কুকুর পোষে, প্রতিদিন তার নেক আমল থেকে দুই কিরাত করে নেকি হ্রাস পায়।’^{৬৯৩}

পশ্চাত্তরে পশ্চিমাদের মতো ঘরের ভেতর কুকুর পোষা, তাদের আলাদা যত্ন নেওয়া, তাদের জন্য বিশেষ খাবার তৈরি করা, শ্যাম্পু মাখিয়ে গোসল করিয়ে দেওয়া, তাদের জন্য আলাদা বাথরুম রাখা ইত্যাদি বিষয়, যার পেছনে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহে প্রতিবছর বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়—এভাবে কুকুর পালন ইসলামে নিষিদ্ধ। আসলে পশ্চিমা সমাজে মানুষের জীবন খুব বেশি বস্তুবাদী হয়ে ওঠায় মানুষ তার স্বজাতির মাঝে এখন আনন্দ ও বিনোদন খুঁজে পায় না। তাদের সমাজে মানুষ মানুষের কাছ থেকে ভালোবাসা ও আন্তরিকতা পায় না এখন। তাই তারা কুকুর পালন করে, তাদের যত্ন নিয়ে, আদর করে হারানো সৌহার্দ্য ও ভালোবাসার বিকল্প খোঁজার চেষ্টা করে। কিন্তু ইসলামি সমাজে মানুষের মাঝে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, ভালোবাসা, সহমর্মিতা অটুট আছে। তাই প্রকৃত মুসলমানদের এ বিষয়গুলো কুকুরের মাঝে খুঁজতে হয় না।

ইসলামি আদব ও শিষ্টাচার অনুযায়ী পানাহার করে

প্রকৃত মুসলমানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো, আদব সহকারে পানাহার করা। যখন সে খাবার খেতে বসে, তখন তার মাঝে পানাহারের সেসব আদব দেখা যায়, যা রাসুলুল্লাহ সঃ হাদিসে বর্ণনা করেছেন এবং মুসলমানদের তা অর্জন করতে উৎসাহিত করেছেন।

৬৯৩. সহিহ মুসলিম : ১৫৭৪, সহিহুল বুখারি : ৫৪৮১

সুতরাং সে বিসমিল্লাহ বলে খাওয়া শুরু করে, ডান হাত দিয়ে খায় এবং তার সামনের খাবার থেকে খায় (অর্থাৎ প্লেটের সবখানে হাত ঘোরায় না)। কারণ, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

سَمِ اللّٰهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ

‘আল্লাহর নাম নিয়ে খাবার খাও, ডান হাত দিয়ে খাও এবং তোমার সামনের অংশ থেকে খাবার খাও।’^{৬৯৪}

খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়তে ভুলে গেলে বিকল্প হিসাবে بِسْمِ اللّٰهِ أَوَّْلُهُ (অর্থ : খাবারের শুরু ও শেষ আল্লাহর নামে) এ দুআটি পড়ে। কেননা, হাদিস শরিফে এসেছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ تَعَالَى، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللّٰهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ أَوَّْلُهُ وَآخِرُهُ

‘যখন তোমাদের কেউ খাবার খাবে, তখন সে আল্লাহর নাম নিয়ে খানা শুরু করবে। যদি শুরুতে আল্লাহর নাম নিতে ভুলে যায়, তখন (স্মরণ আসলে) بِسْمِ اللّٰهِ أَوَّْلُهُ وَآخِرُهُ (অর্থ : খাবারের শুরু ও শেষ আল্লাহর নামে) পড়বে।’^{৬৯৫}

রাসুলুল্লাহ ﷺ খাবারের শুরুতে ‘বিসমিল্লাহ’ পড়ার প্রতি খুব বেশি গুরুত্বারোপ করতেন। সাহাবিগণকে এর প্রতি খুব উৎসাহিত করতেন। কেননা, এতে খাবার গ্রহণকারী লোকদের জন্য অনেক কল্যাণ রয়েছে এবং এর মাধ্যমে খাবার ও খাবার গ্রহণকারীদের থেকে শয়তানকে বিতাড়িত করা হয়।

হুজাইফা ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِينَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ يَدَهُ، وَإِنَّا حَضَرْنَا

৬৯৪. সহিহুল বুখারি : ৫৩৭৬

৬৯৫. সুনানু আবি দাউদ : ৩৭৬৭

مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفِعُ، فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهَا، ثُمَّ جَاءَ أُعْرَابِيٌّ كَأَنَّمَا يُدْفِعُ فَأَخَذَ بِيَدِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا، فَجَاءَ بِهَذَا الْأُعْرَابِيُّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا، وَفِي رَوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَيْضًا: ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ وَأَكَلَ

‘যখন আমরা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে খাবারের মজলিসে উপস্থিত হতাম, রাসুলুল্লাহ ﷺ খাবারের মধ্যে হাত রেখে তা খাওয়া শুরু না করা পর্যন্ত আমরা খাবারে হাত রাখতাম না। একদা আমরা তাঁর সঙ্গে খেতে বসলাম, এ সময় একটি মেয়ে দ্রুতবেগে আসলো, যেন কেউ তার পশ্চাদ্ধাবন করছে। সে খাবারে হাত দিতে যাচ্ছিল। তৎক্ষণাৎ রাসুলুল্লাহ ﷺ তার হাত ধরে ফেললেন। অতঃপর এক বেদুইন দ্রুতবেগে দৌড়ে আসলো, যেন কেউ তার পশ্চাদ্ধাবন করছে। সে-ও প্লেটে হাত ঢুকিয়ে দিতে উদ্যত হলো। রাসুলুল্লাহ ﷺ তার হাতও ধরে ফেললেন। অতঃপর তিনি বললেন, যে খাবারে বিসমিল্লাহ পড়া না হয়, তা শয়তানের জন্য হালাল হয়ে যায়। সে এ খাবার নিজের জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে এ মেয়েটিকে নিয়ে আসলো। তাই আমি তার হাত ধরে ফেললাম। অনুরূপভাবে সে এ খাবার নিজের জন্য বৈধ করার জন্য এ বেদুইনকে নিয়ে আসলো। তাই আমি তার হাত ধরে ফেললাম। সে সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, এ দুজনের হাতের সাথে শয়তানের হাতও আমার হাতের মুঠোর ভেতর ছিল। তারপর বিসমিল্লাহ পড়ে তিনি খানা শুরু করলেন।’^{৬৯৬}

খাওয়ার দ্বিতীয় আদব হলো, ডান হাত দিয়ে খাওয়া। ইসলামি আদবে দীক্ষিত মুসলমান ডান হাত দিয়ে খাবার খায়, বাম হাতে খায় না। কেননা, অনেক হাদিসে স্পষ্টভাবে ডান হাতে খাওয়ার নির্দেশ এবং বাম হাতে খাওয়ার নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে।

এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ

‘তোমাদের কেউ খাবার খেলে ডান হাত দিয়ে খাবে, আর পান করলে ডান হাত দিয়ে পান করবে। কেননা, শয়তান বাম হাতে খায় এবং বাম হাতে পান করে।’^{৬৯৭}

আরেক হাদিসে বলেন :

لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِهَا، قَالَ: وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا: وَلَا يَأْخُذُ بِهَا، وَلَا يُعْطِي بِهَا

‘তোমাদের কেউই বাম হাতে পানাহার করবে না। কেননা, শয়তান বাম হাতে পানাহার করে। নাবি ﷺ-এর বর্ণনায় আরও আছে, বাম হাতে কেউ যেন কাউকে কোনো কিছু না দেয় এবং গ্রহণ না করে।’^{৬৯৮}

রাসুলুল্লাহ ﷺ কাউকে বাম হাতে খেতে দেখলে নিষেধ করতেন এবং তাকে খাওয়ার আদব শিক্ষা দিতেন। আর কাউকে অহংকারবশত এরূপ করতে দেখলে আরও জোরালোভাবে নিষেধ করতেন।

সালামা বিন আকওয়া ﷺ বর্ণনা করেন :

أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ، فَقَالَ:

৬৯৭. সহিহ মুসলিম : ২০২০

৬৯৮. সহিহ মুসলিম : ২০২০

كُلِّ بِيَمِينِكَ، قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ، قَالَ: لَا اسْتَطَعْتَ، مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبَرُ،
قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ

‘এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বসে বাম হাতে খানা খাচ্ছিল। তিনি তাকে বললেন, ডান হাতে খাও। সে বলল, আমি (ডান হাতে) খেতে পারি না। তখন তিনি (বদদুআ করে) বললেন, কখনো তোমার সে সামর্থ্য না হোক! অহংকারই তাকে ডান হাতে খাওয়া থেকে বিরত রেখেছে। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর সে কখনো ডান হাত মুখ পর্যন্ত ওঠাতে সক্ষম হয়নি।’^{৬৯৯}

এর কারণ হলো, রাসুলুল্লাহ ﷺ সকল ক্ষেত্রে ডানকে পছন্দ করেন এবং অন্যদেরও এর প্রতি উৎসাহিত করতেন।

এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা ইমাম মালিক ও শাইখাইন^{৭০০} আনাস থেকে বর্ণনা করেছেন :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِلَبَنٍ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ، وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، وَعَنْ شِمَالِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ ثُمَّ أُعْطِيَ الْأَعْرَابِيَّ، وَقَالَ: الْأَيْمَنَ فَأَلْأَيْمَنَ

‘রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট পানিমিশ্রিত কিছু দুধ আনা হলো। তাঁর ডানপাশে এক বেদুইন বসা ছিল, আর বামপাশে ছিলেন আবু বকর । রাসুলুল্লাহ ﷺ পান করার পর বেদুইনকে পান করতে দিলেন এবং বললেন, ডানদিক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত।’^{৭০১}

আরেকবার তাঁর নিকট পানীয় আনা হলো। তখন তাঁর ডানপাশে একটি বালক (ইবনে আব্বাস) ছিল, আর বামপাশে কয়েকজন বয়স্ক মানুষ ছিলেন।

৬৯৯. সহিহ মুসলিম : ২০২১

৭০০. মুহাদ্দিসদের পরিভাষায় ইমাম বুখারি রহ. ও ইমাম মুসলিম রহ.-কে একসাথে শাইখাইন বলা হয়। (অনুবাদক)

৭০১. সহিহল বুখারি : ৫৬১৯, সহিহ মুসলিম : ২০২৯

তিনি পান করার পর বালককে বললেন, এবার পান করার অধিকার তোমার। তুমি কি তোমার অধিকার বড়দের জন্য ছেড়ে দেবে? বালকটি বলল, না, আল্লাহর কসম! আপনার উচ্ছিষ্টের ক্ষেত্রে আমি কাউকে অগ্রাধিকার দিতে রাজি নই, হে আল্লাহর রাসুল।

হাদিসটি সাহল বিন সাদ   বর্ণনা করেছেন। তাঁর হাদিসের ভাষ্য নিম্নরূপ :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: أَتَأْذُنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ؟ فَقَالَ الْغُلَامُ: لَا وَاللَّهِ، لَا أُؤْثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا، قَالَ: فَتَلَّهٗ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ

‘রাসুলুল্লাহ  -এর নিকট পানীয় আনা হলো। তিনি সেখান থেকে পান করলেন। তাঁর ডানপাশে একজন বালক ছিল, আর বামপাশে কয়েকজন বয়স্ক লোক ছিলেন। তিনি বালককে বললেন, তুমি কি আমাকে এদের দেওয়ার অনুমতি দেবে? বালকটি বলল, না, আল্লাহর কসম! আমি আপনার পক্ষ থেকে পাওয়া অংশের ব্যাপারে কাউকে নিজের ওপর প্রাধান্য দেবো না। তখন রাসুলুল্লাহ   তা তার হাতে দিয়ে দিলেন।’^{৭০২}

এ সম্পর্কিত আরও অনেক স্পষ্ট নস, প্রমাণ ও উদাহরণ রয়েছে। এগুলো অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, ডানদিক অবলম্বন করা ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ আদব। প্রকৃত মুসলমান সকল বিষয়ে ডানদিক অবলম্বন করার ক্ষেত্রে কোনো ধরনের অবহেলা ও শিথিলতা করে না। সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিয়ীগণের অভ্যাসও এমনই ছিল। আমিরুল মুমিনিন উমর বিন খাত্তাব   ডানদিককে অবলম্বন করার প্রতি খুব গুরুত্ব দিতেন। এ বিষয়ে কেউ অবহেলা করলে তাকে একদমই ছাড় দিতেন না।

একদিন তিনি প্রজাদের সার্বিক অবস্থা প্রত্যক্ষ করতে বের হলেন। তখন এক ব্যক্তিকে বাম হাতে খেতে দেখে বললেন, আল্লাহর বান্দা, ডান হাতে

৭০২. সহিহ মুসলিম : ২০৩০, সহিহুল বুখারি : ২৬০৫

খাও। তারপর দ্বিতীয়বার তাকে বাম হাতে খেতে দেখলে তাকে চাবুক দিয়ে একটি আঘাত করে বললেন, আল্লাহর বান্দা, ডান হাতে খাও। তৃতীয়বার তাকে বাম হাতে খেতে দেখে চাবুকের একটি বাড়ি দিয়ে গলায় তেজ দিয়ে বললেন, ওহে আল্লাহর বান্দা, ডান হাত দিয়ে খাও। তখন লোকটি উত্তর দিল, হে আমিরুল মুমিনিন, ডান হাত ব্যস্ত (অর্থাৎ কাজ করতে অক্ষম)। উমর রা বললেন, কী তার ব্যস্ততা? বলল, মুতার যুদ্ধ তাকে ব্যস্ত করে দিয়েছে (অর্থাৎ মুতার যুদ্ধে হাতটি কেটে গিয়েছে)। তখন উমর রা কঁদে দিলেন এবং তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আহ! তোমাকে অজু কে করিয়ে দেয়? তোমার প্রয়োজনগুলো কে পূরণ করে দেয়? তোমার সকল বিষয়ে কে তোমাকে সহযোগিতা করে? তারপর লোকটির প্রতি ইনসাফ করতে এবং তার বিশেষ যত্ন নিতে কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিলেন।

প্রজাদের মাঝে একজন ব্যক্তির আচরণে ইসলামি শিষ্টাচারের এই একটি অংশ (ডান অবলম্বন করা) না দেখে উমর রা যা করলেন, তা এ অংশের গুরুত্বকে আরও বেশি দৃঢ় করে। উমর রা আদব ও শিষ্টাচারের এ অংশটিকে অধিক গুরুত্ব দিতেন। এর ব্যাপারে কোনো ধরনের শিথিলতা তিনি বরদাশত করতেন না।

এ পরিচ্ছেদে সেসব মুসলমানের কথা উল্লেখ করা সমীচীন মনে করছি, যারা পশ্চিমাদের খাবার রীতি অনুসরণ করে। রীতিটা হলো, খাওয়ার সময় চামচ রাখবে বাম হাতে, আর ছুরি রাখবে ডান হাতে, যাতে ডান হাতে কেটে বাম হাতে খেতে পারে। কোনোকিছু না ভেবেই মুসলমানরা পশ্চিমাদের এ রীতির অনুসরণ করছে। এভাবে তারা যে বাম হাতে খেয়ে ধর্মের বিরোধিতা করছে, তা তাদের মাথায় আসে না। ছুরিটা বাম হাতে রেখে, চামচ ডান হাতে নেওয়ার সামান্য কষ্টটুকু তারা করতে চায় না; পাছে পশ্চিমাদের বেঁধে দেওয়া খাবার-রীতির উল্টো হয়ে না যায়! এটা বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে মুসলমানদের পরাজয়ের অন্যতম ফল। আমাদের মানসিকতাই এমন হয়ে গেছে যে, পশ্চিমা যা করে আমাদেরও তাই করতে হবে। এতে আমাদের ধর্মের রীতিনীতি গোছায় গেলে যাক। কিন্তু প্রকৃত মুসলমান এমন নয়। সে সকল বিষয়ে ইসলামি রীতিকেই অনুসরণ করে। পাশ্চাত্য রীতির এমন অঙ্ক ও পরাজিতের অনুকরণ তার মাঝে নেই।

প্রকৃত মুসলমান সর্বদা ডান হাতে খাবার গ্রহণে থাকে বন্ধপরিষ্কর। অন্যদেরও এর প্রতি দাওয়াত দেয়। এমন কোনো অনুষ্ঠানে যদি সে উপস্থিত হয়, যেখানে সবাই পশ্চিমাদের থেকে আমদানিকৃত রীতি অনুযায়ী খাবার খাচ্ছে, সেখানে সে ইসলামি রীতি অনুযায়ী ডান হাতে খাবার খেতে লজ্জাবোধ করে না। উল্টো সে দ্বীনের প্রতি উদাসীন ও অবহেলাকারী লোকদের এ ব্যাপারে সতর্ক করে। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর পানাহারের সুন্নাত ডান হাতে পানাহার করার প্রতি তাদের উৎসাহিত করে।

পানাহারের তৃতীয় আদব হলো, নিজের সামনে থেকে খাওয়া। অসংখ্য হাদিসে স্পষ্টভাবে এ নির্দেশ এসেছে।

উমর বিন আবু সালামা ؓ বর্ণনা করেন :

كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ يَدِي
تَطِيئُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا
غُلَامُ، سَمَّ اللَّهُ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ

‘আমি বালক অবস্থায় রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর তত্ত্বাবধানে ছিলাম। খাওয়ার সময় আমার হাত প্লেটের সবখানে ঘুরত। তাই রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, বালক, (খাওয়ার শুরুতে) বিসমিল্লাহ বলবে, ডান হাতে খাবে এবং তোমার সামনে থেকে খাবে।’^{৭০৩}

প্রকৃত মুসলমান যখন খাবার খায়, তখন খুবই নম্রতা ও ভদ্রতার সহিত খায়। রাসুলুল্লাহ ﷺ-ও এভাবেই খেতেন। তিনি খাবার খেতেন তিন আঙুলে। পুরো হাত খানার মাঝে ডুবিয়ে দিতেন না, যেন অন্যদের খারাপ না লাগে।

এ সম্পর্কে কাব বিন মালিক ؓ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، فَإِذَا
فَرَغَ لَعِقَهَا

‘রাসুলুল্লাহ ﷺ তিন আঙুলে খাবার খেতেন। আর খাওয়া শেষ হলে আঙুলগুলো চেটে খেতেন।’^{৭০৪}

রাসুলুল্লাহ ﷺ খাওয়ার পর আঙুল ও প্লেট চেটে খেতে নির্দেশ দিতেন। জাবির রা থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ، وَقَالَ:
إِنَّكُمْ لَا تَذُرُونَ فِي أَيِّهِ الْبَرَكَهَ

‘নবিজি রা আঙুল ও প্লেট চেটে খেতে নির্দেশ দিতেন এবং বলতেন, খাবারের কোন অংশে বরকত নিহিত রয়েছে, তা তো তোমরা জানো না (তাই খাবারের কোনো অংশই ফেলে দেওয়া উচিত নয়)।’^{৭০৫}

আনাস রা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ
الثَّلَاثَ، وَقَالَ: إِذَا مَا وَقَعَتْ لُقْمَةٌ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى
وَلْيَأْكُلْهَا، وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلِتَ الصَّحْفَةَ، وَقَالَ:
إِنَّكُمْ لَا تَذُرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمْ الْبَرَكَهَ

‘নবিজি রা খাবার শেষ করে তিনটি আঙুল চেটে খেতেন। নবিজি রা আরও বলেছেন, যখন তোমাদের কারও লুকমা নিচে পড়ে যায়, সে যেন ময়লা দূর করে তা খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য ফেলে না রাখে। তিনি আমাদের আরও নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন খাবারের থালা ভালো করে চেটে খেয়ে নিই। আর বলেছেন, কেননা, তোমাদের জানা নেই যে, তোমাদের খাবারের কোন অংশে বরকত নিহিত রয়েছে।’^{৭০৬}

৭০৪. সহিছ মুসলিম : ২০৩২

৭০৫. সহিছ মুসলিম : ২০৩৩

৭০৬. সুনানুত তিরমিজি : ১৮০৩

‘রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এ নির্দেশনায় খাবারের বরকত অনুসন্ধানের বিষয়টি তো আছেই, তার পাশাপাশি হাত ও পাত্র পরিষ্কার করার প্রতিও উৎসাহ পাওয়া যায়। তা ছাড়া খাওয়ার পর হাত ও পাত্র ভালো করে পরিষ্কার করে ফেলা পরিচ্ছন্ন ও সভ্য লোকের স্বভাবের অনুকূল। পশ্চিমা পনেরো শত বছর পর এসে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এ উত্তম অভ্যাসটি গ্রহণ করছে। ফিরিসিরাও এখন খানা শেষ হওয়ার পর প্লেট খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেয়।

প্রকৃত মুসলমান—যার ভেতর ইসলামি শিষ্টাচার আছে—খাওয়ার সময় ছপছপ শব্দ করে না। খানা চিবানোর সময় শব্দ করে না। কারণ, এগুলো দেখতে খারাপ লাগে। মুখে বড় বড় লুকমা দেয় না। কেননা, এটাও খুব বিপ্রী দেখায়।

যখন খাওয়া শেষ হয়, তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর শিথিয়ে দেওয়া বাক্য বলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে।

এ সম্পর্কে আবু উমামা ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁর দস্তুরখান উঠিয়ে ফেলতেন, তখন বলতেন :

الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدِّعٍ وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ، رَبَّنَا

‘পবিত্র বরকতময় অনেক অনেক প্রশংসা আল্লাহর জন্য। হে আমাদের রব, এ থেকে কখনো বিমুখ হতে পারব না, বিদায় নিতে পারব না এবং এ থেকে অমুখাপেক্ষীও হতে পারব না।’^{৭০৭}

মুআজ বিন আনাস ؓ বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي، وَلَا قُوَّةَ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

‘যে ব্যক্তি খাবার শেষে **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي، وَلَا قُوَّةَ** (অর্থ : সকল প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের এ খাবার খাইয়েছেন এবং আমাদের সামর্থ্য ও শক্তির

বাইরে থেকে রিজিক দান করেছেন।) এ দু'আটি পড়বে, তার পূর্বের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।^{৭০৮}

প্রকৃত মুসলমান খাবারের দোষ ধরে না, তা যেমনই হোক না কেন। কেননা, এটাই রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ।

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ، كَانَ إِذَا اشْتَهَى شَيْئًا أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ

‘রাসুলুল্লাহ ﷺ কখনো কোনো খাবারের দোষ ধরেননি। কোনো খাবার পছন্দ হলে তা খেতেন, আর পছন্দ না হলে রেখে দিতেন।’^{৭০৯}

পান করা সম্পর্কেও ইসলামের আদব রয়েছে। ইসলাম মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য উত্তম আদব প্রণয়ন করেছে।

সুতরাং প্রকৃত মুসলমান ‘বিসমিল্লাহ’ বলে দুই বা তিন নিশ্বাসে পান করে। পাত্রের ভেতর নিশ্বাস ফেলে না। যথাসম্ভব বড় পাত্রে মুখ লাগিয়ে পান করে না। পানীয়তে ফুঁক দেয় না। বসে পান করে, যদি তা সম্ভব হয়।

দুই বা তিন নিশ্বাসে পান করা রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে প্রমাণিত। যেমন আনাস রা. বলেন :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا

‘রাসুলুল্লাহ ﷺ পান করার সময় তিনবার নিশ্বাস নিতেন।’^{৭১০}

আরেক হাদিসে রাসুলুল্লাহ ﷺ এক নিশ্বাসে পান করা থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন :

لَا تَشْرَبُوا وَاحِدًا كَشْرَبِ الْبَعِيرِ، وَلَكِنْ اشْرَبُوا مِثْنَى وَثَلَاثَ، وَسَمُّوا إِذَا أَنْتُمْ شَرِبْتُمْ، وَاحْمَدُوا إِذَا أَنْتُمْ رَفَعْتُمْ

৭০৮. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৩২৮৫

৭০৯. সহিহ মুসলিম : ২০৬৪, সহিহুল বুখারি : ৫৪০৯

৭১০. সহিহ মুসলিম : ২০২৮

‘উটের মতো এক নিশ্বাসে পান করো না। দুই বা তিন নিশ্বাসে পান করো। আর পান করার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলবে এবং শেষে আল-হামদুলিল্লাহ বলবে।’^{৭১১}

রাসুলুল্লাহ ﷺ পানিতে ফুঁক দিতে নিষেধ করেছেন। আবু সাইদ খুদরি রা বর্ণনা করেন :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّفْخِ فِي الشَّرْبِ فَقَالَ رَجُلٌ:
الْقَذَاءُ أَرَاهَا فِي الْإِنَاءِ؟ قَالَ: أَهْرِقْهَا، قَالَ: فَإِنِّي لَا أَرَوِي مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدٍ؟ قَالَ: فَأَبِنِ الْقَدَحَ إِذَنْ عَنْ فَيْكِ

‘নবিজি ﷺ পানিতে ফুঁক দিতে নিষেধ করেছেন। এক ব্যক্তি বলল, পানিতে ময়লা দেখা গেলে কী করব? নবিজি ﷺ বললেন, তা ফেলে দেবে। লোকটি বলল, এক নিশ্বাসে আমার প্রাণ ভরে না। নবিজি ﷺ বললেন, পাত্রকে তোমার মুখ থেকে সরিয়ে নেবে, তারপর প্রাণভরে নিশ্বাস নেবে।’^{৭১২}

পান করার আদব-সম্পর্কিত হাদিসসমূহ থেকে স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, পান করার সুন্দর ও আদর্শ পদ্ধতি হলো, যথাসম্ভব বড় পাত্রে মুখ লাগিয়ে পান করবে না এবং যথাসম্ভব বসে পান করবে। এটাই পান করার সঠিক পদ্ধতি। যদিও বড় পাত্রে মুখ লাগিয়ে পান করা ও দাঁড়িয়ে পান করা জায়েজ। কেননা, রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে এভাবে পান করাটাও প্রমাণিত আছে।

সালামের প্রসার করে

মুসলমানের অন্যতম সামাজিক আদব হলো, সালামের প্রসার করা। সালামের প্রসার হলে সমাজের রূপ পাল্টে যায়। তবে সালাম করা নিছক একটি সামাজিক দায়িত্ব নয়; এটি ইসলামের এমন এক মৌলিক আদব, যার নির্দেশ সরাসরি আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে দিয়েছেন এবং রাসুলুল্লাহ

৭১১. সুনানুত তিরমিজি : ১৮৮৫

৭১২. সুনানুত তিরমিজি : ১৮৮৭

❁ অসংখ্য হাদিসে তার ফজিলত ও বিধিবিধান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। যার ফলে মুহাদ্দিসগণ হাদিসের কিতাবে সালামের জন্য স্বতন্ত্র একটি অধ্যায় রচনা করেছেন।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে সালামের নির্দেশ দিয়ে বলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا
وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا

‘হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্যের গৃহে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত আলাপ-পরিচয় না করো এবং গৃহবাসীদেরকে সালাম না করো।’^{৭১৩}

আরেক আয়াতে সালামের জবাব সালামের চেয়ে উত্তমভাবে অথবা সমানভাবে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। এজন্য সালাম শুনলে সালামের জবাব দেওয়া ওয়াজিব। অবহেলা করা জায়িজ নেই।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَإِذَا حُيِّئْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا

‘আর তোমাদের যদি কেউ সালাম করে, তাহলে তোমরাও তাকে সালাম দাও; তার চেয়ে উত্তম সালাম অথবা তারই মতো জবাব দাও।’^{৭১৪}

হাদিসেও সালাম দেওয়ার প্রতি খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

আমর বিন আস ❁ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَالَ:
تُطْعِمُ الطَّعَامَ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ

৭১৩. সূরা আন-নুর : ২৭

৭১৪. সূরা আন-নিসা : ৮৬

‘এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে প্রশ্ন করল, সর্বোত্তম ইসলাম কী? তিনি উত্তরে বললেন, খানা খাওয়ানো এবং পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম করা।’^{৭১৫}

সালাম করা সেই বিশেষ সাত অসিয়তের অন্তর্ভুক্ত, যে অসিয়ত সামাজিক জীবনে আবশ্যিকভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ সাহাবিগণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং সাহাবিগণ সে নির্দেশ পালনের পর তাবিয়িগণও তা নিজেদের জন্য আবশ্যিকভাবে পালন করেছিলেন।

সে সাতটি অসিয়ত বারা বিন আজিব ﷺ কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন :

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ: بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنَصْرِ الضَّعِيفِ، وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ، وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ، وَإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ

‘রাসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের সাতটি বিষয়ের নির্দেশ দিয়েছেন। যথা : এক. রোগী দেখতে যাওয়া, দুই. জানাজার অনুসরণ করা (মৃত ব্যক্তিকে জানাজা ও দাফনের জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় পেছনে চলা), তিন. হাঁচিদাতার জবাব দেওয়া (হাঁচিদাতা আল-হামদুলিল্লাহ বললে তার জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা), চার. দুর্বলের সাহায্য করা, পাঁচ. মাজলুমের সহযোগিতা করা, ছয়. সালামের প্রসার করা, সাত. প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা।’^{৭১৬}

রাসুলুল্লাহ ﷺ সালামের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। অসংখ্য হাদিসে সালামের প্রতি উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন। কারণ, সালামের কারণে মানুষের হৃদয়সমূহে ভালোবাসার ফোয়ারা প্রবাহিত হয়। সমাজে পরস্পরের মাঝে হৃদ্যতা, নৈকট্য ও নির্মল সম্পর্ক তৈরি হয়। এজন্য রাসুলুল্লাহ ﷺ সালাম করাকে ভালোবাসার উপকরণ বলেছেন, যে ভালোবাসা মানুষের মাঝে ইমানের সঞ্চার করে, যা তাদের জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়।

৭১৫. সহিহুল বুখারি : ১২, সহিহ মুসলিম : ৩৯

৭১৬. সহিহুল বুখারি : ৬২৩৫

তিনি ইরশাদ করেছেন :

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشَوْا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ

‘সেই সত্তার শপথ করে বলছি, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমাদের মাঝে ইমান থাকবে। আর তোমাদের মাঝে ততক্ষণ পর্যন্ত (পরিপূর্ণ) ইমান আসবে না, যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসবে। আমি কি তোমাদের এমন আমল বলে দেবো না, যা করলে তোমাদের পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে? (সে বিষয়টি হলো,) তোমরা নিজেদের মাঝে সালামের ব্যাপক প্রসার করো।’^{৭১৭}

সবার আগে যে সালাম দেয়, তাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মর্যাদার সর্বাধিক যোগ্য বলা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِاللَّهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بِالسَّلَامِ

‘আল্লাহর কাছে (সন্তুষ্টি, নিয়ামত ও অনুগ্রহ পাওয়ার) সর্বাধিক যোগ্য ওই ব্যক্তি, যে সবার আগে সালাম দেয়।’^{৭১৮}

এজন্য আব্দুল্লাহ বিন উমর ؓ সকালে বাজারে যেতেন এবং যার সাথেই সাক্ষাৎ হতো, তাকেই সালাম দিতেন।

‘একদিন তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, আপনি বাজারে কী করেন? আপনাকে তো কিছু বিক্রি করতে বা কোনো বস্তুর দাম জিজ্ঞেস করতে ও দরাদরি করতে দেখা যায় না। বাজারের কোনো মজলিসেও আপনি বসেন না। তিনি উত্তর দিলেন, আমি সকালে এজন্যই বাজারে যাই, যেন যাদের সাথে দেখা হবে, তাদের প্রত্যেককে সালাম করতে পারি।’^{৭১৯}

৭১৭. সহিহ মুসলিম : ৫৪, সুনানু আবি দাউদ : ৫১৯৩

৭১৮. সুনানু আবি দাউদ : ৫১৯৭

৭১৯. আল-আদাবুল মুফরাদ : ১০০৬

ইসলামি সমাজে সম্ভাষণ জানানোর জন্য একটিই বাক্য রয়েছে। প্রকৃত মুসলমান এ বাক্যটির মাধ্যমে সালাম করে। তা হলো : **السَّلَامُ عَلَيْكُمْ** (অর্থ : আপনাদের ওপর শান্তি, আল্লাহর রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক)। যে সালাম দেবে, সে এভাবেই বহুবচনের সর্বনাম ব্যবহার করে সালাম করবে, যদিও সালাম একজনকে দেওয়া হোক। আর উত্তরদাতা বলবে, **وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ** (অর্থ : আপনাদের ওপরও শান্তি, আল্লাহর রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক)।

প্রকৃত মুসলমান সম্ভাষণের এ ইসলামি বাক্যের জায়গায় পূর্বকার যুগের বাক্য- **صَبَاحٌ** (সুপ্রভাত) এবং বর্তমান সময়ে প্রচলিত সম্ভাষণ **صَبَاحٌ** (শুভ সকাল), গুড মর্নিং ইত্যাদি বাক্য বলে না।

ইসলামের সম্ভাষণ-বাক্যটি স্বয়ং আল্লাহ-ই তাঁর মাখলুকের জন্য চয়ন করেছেন। আদম عليه السلام-কে সৃষ্টি করার পর তাঁকে এ বাক্য শিখিয়ে দিলেন এবং ফেরেশতাগণকে সে বাক্যের মাধ্যমে সম্ভাষণ জানানোর নির্দেশ দিলেন। আর এটাকেই সর্বযুগে সর্বজায়গায় তাঁর সন্তানদের পরস্পর সম্ভাষণের বাক্য হিসাবে নির্ধারণ করে দিলেন। কারণ, এ বাক্যটিতে শান্তি কামনা করার কথা আছে, যা সর্বযুগে ও সকল জায়গায় মানবজাতির একান্ত কাঙ্ক্ষিত বস্তু। সম্ভাষণের এ আদি বাক্যটির ওপর এখনও অটল আছে একমাত্র মুসলিম উম্মাহ। তারা এতে কোনোরূপ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেনি।

এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

فَلَمَّا خَلَقَهُ قَالَ: اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أَوْلِيكَ النَّفَرِ، وَهُمْ نَفَرٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ، فَاسْتَمِعْ مَا يُجِيبُونَكَ، فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ، قَالَ: فَذَهَبَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالُوا: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ، قَالَ فَزَادُوهُ: وَرَحْمَةُ اللَّهِ

‘আল্লাহ তাআলা আদম عليه السلام-কে সৃষ্টি করার পর ফেরেশতাদের উপবিষ্ট একটি দল দেখিয়ে বললেন, যাও, ওদের সালাম করো। আর তারা তোমাকে কী উত্তর দেয়, তা মনোযোগ দিয়ে শুনবে।

কেননা, এটিই তোমার ও তোমার সন্তানদের সম্ভাষণ হবে। তখন আদম ﷺ বললেন, السَّلَامُ عَلَيْكُمْ (অর্থাৎ আপনাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক)। ফেরেশতারা উত্তরে বললেন, السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ (আপনার ওপর শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক)। তাঁরা (আল্লাহর রহমত) শব্দটি বাড়িয়ে উত্তর দিয়েছেন।^{৭২০}

এ হাদিস থেকে বুঝা গেল, এ বাক্যটিই পবিত্র সম্ভাষণের বাক্য। কারণ, স্বয়ং আল্লাহ এটি নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং আমাদের সম্ভাষণের জন্য তাঁর নির্ধারিত বাক্যটি ব্যবহার করতে এবং এটি ব্যতীত অন্যগুলো পরিহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি ইরশাদ করেছেন :

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَارَكَةٌ طَيِّبَةٌ

‘অতঃপর যখন তোমরা গৃহে প্রবেশ করো, তখন তোমাদের স্বজনদের প্রতি সালাম বলবে। এটা আল্লাহর কাছ থেকে কল্যাণময় ও পবিত্র সম্ভাষণ।’^{৭২১}

এ কারণে জিবরাইল ﷺ যখন আয়িশা ؓ-কে সালাম দিয়েছিলেন, তখন এ শব্দটিই ব্যবহার করেছিলেন। আর উত্তরে আয়িশা ؓ-ও এ শব্দটিই ব্যবহার করেছিলেন।

সহিহ বুখারি ও মুসলিমের বর্ণনায় ঘটনাটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهَا: يَا عَائِشَةُ هَذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ، فَقَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

‘আয়িশা ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে নবিজি ﷺ বললেন, জিবরাইল ﷺ তোমাকে সালাম দিচ্ছেন। আয়িশা ؓ বলেন, তখন

৭২০. সহিহ মুসলিম : ২৮৪১ ; সহিহল বুখারি : ৬২২৭

৭২১. সূরা আন-নুর : ৬১

আমি বললাম, وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ (তাঁর ওপরও শান্তি, আল্লাহর রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক)।^{৭২২}

ইসলাম সালাম দেওয়ার বিভিন্ন নিয়ম-কানুনও প্রণয়ন করেছে। প্রকৃত মুসলমান তার সামাজিক জীবনে সেসব নিয়ম-কানুন মেনে চলতে চেষ্টা করে। সহিহ বুখারিতে আবু হুরাইরা রা থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে সালামের নিয়ম-কানুন সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সা ইরশাদ করেছেন :

يُسَلِّمُ الرَّاَكِبُ عَلَى الْمَاشِي، وَالْمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالْقَلِيلُ عَلَى الْكَثِيرِ- وفي رواية للبخاري- يُسَلِّمُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ

‘আরোহী ব্যক্তি পদাতিক ব্যক্তিকে সালাম দেবে। চলন্ত ব্যক্তি বসে থাকা ব্যক্তিকে সালাম দেবে। কমসংখ্যক লোক বেশিসংখ্যক লোককে সালাম দেবে।’^{৭২৩} সহিহ বুখারির আরেকটি বর্ণনায় এটাও আছে, ‘ছোট বড়কে সালাম দেবে।’^{৭২৪}

পুরুষদের মতো নারীদেরও সালাম দেওয়া যায়। এর স্বপক্ষে দলিল হলো, আসমা বিনতে ইয়াজিদ রা-এর হাদিস :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمًا وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُودٌ، فَأَلَوَى بِيَدِهِ بِالتَّسْلِيمِ

‘রাসুলুল্লাহ সা একদিন মসজিদে গমন করলেন। তখন মহিলাদের একটি দল সেখানে বসা ছিল। তিনি তাদের উদ্দেশে হাত উত্তোলন করে সালাম দিলেন।’^{৭২৫}

বাচ্চাদেরও সালাম দেওয়া যায়। এর মাধ্যমে তাদের সালামের শিক্ষা দেওয়াটাও হয়ে যায়।

৭২২. সহিহুল বুখারি : ৩২১৭

৭২৩. সহিহুল বুখারি : ৬২৩২ ; সহিহ মুসলিম : ২১৬০

৭২৪. সহিহুল বুখারি : ৬২৩১

৭২৫. সুনানুত তিরমিজি : ২৬৯৭

আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত আছে :

أَنَّهُ مَرَّ عَلَى صَبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ

‘তিনি (আনাস রাঃ) বাচ্চাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের সালাম দিলেন এবং বললেন, নবিজি সাঃ এমন করতেন।’^{৭২৬}

সালাম দেওয়ার আরেকটি আদব হলো, রাতের বেলা নরম, কোমল ও নিচু স্বরে সালাম দেওয়া। যেন শুধু জাফতরা শুনতে পায়, আর ঘুমন্তরা জেগে না যায়।

মিকদাদ রাঃ থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাঃ-এর ব্যাপারে এমনটাই বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন :

‘আমরা নবিজি সাঃ-এর দুধের অংশ তাঁর জন্য তুলে রাখতাম। তিনি রাতে আসতেন এবং এমনভাবে সালাম দিতেন, যেন ঘুমন্তরা না জাগে আর জাফতরা শুনতে পায়। (সেদিনও) নবিজি সাঃ আসলেন এবং পূর্বেকার মতো সালাম দিলেন...।’^{৭২৭}

কোনো মজলিসে প্রবেশ করার সময় এবং সেখান থেকে উঠে আসার সময় মোট দুবার সালাম দিতে হয়।

এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ সাঃ ইরশাদ করেছেন :

إِذَا انْتَهَى أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَجْلِسِ، فَلْيُسَلِّمْ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ، فَلْيُسَلِّمْ فَلَيْسَتْ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ

‘যখন তোমরা কোনো মজলিসে প্রবেশ করবে, তখন সালাম করবে। আবার সেখান থেকে চলে যাওয়ার সময়েও সালাম করবে। প্রথম সালাম দ্বিতীয় সালামের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় (অর্থাৎ উভয় সালামের গুরুত্ব সমান)।’^{৭২৮}

৭২৬. সহিহুল বুখারি : ৬২৪৭

৭২৭. সহিহ মুসলিম : ২০৫৫

৭২৮. সুনানু আবি দাউদ : ৫২০৮

অনুমতি ছাড়া অন্যের গৃহে প্রবেশ করে না

প্রকৃত মুসলমান নিজের রুম ব্যতীত অন্য কারও রুমে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করে না। অনুমতি চাওয়ার এ নির্দেশ সরাসরি আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, যার নির্দেশ পালনে কোনোরূপ শিথিলতা ও অবহেলা করার অবকাশ নেই।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا
وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَإِنْ لَمْ
تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ
ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

‘হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্যগৃহে প্রবেশ কোরো না, যে পর্যন্ত আলাপ-পরিচয় না করো এবং গৃহবাসীদের সালাম না করো। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম, যাতে তোমরা সুরণ রাখো। যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তবে অনুমতি গ্রহণ না করা পর্যন্ত সেখানে প্রবেশ কোরো না। যদি তোমাদের বলা হয় ফিরে যাও, তবে ফিরে যাবে। এতে তোমাদের জন্যে অনেক পবিত্রতা আছে এবং তোমরা যা করো, আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন।’^{৭২৯}

অন্য আয়াতে তিনি বলেন :

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ

‘তোমাদের সন্তান-সন্ততিরা যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তখন তারাও যেন তাদের পূর্ববর্তীদের ন্যায় অনুমতি চায়।’^{৭৩০}

৭২৯. সূরা আন-নুর : ২৭-২৮

৭৩০. সূরা আন-নুর : ৫৯

মানুষের ঘরে প্রবেশ করা উদ্দেশ্যমূলক ও সন্দেহজনক। তা ছাড়া ঘরওয়ালা এতে খুব বিব্রতবোধ করেন। তবে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করলে সন্দেহ ও বিব্রতবোধ আর থাকে না। এজন্য চুরির উদ্দেশ্যে সিঁধ কেটে ঘরে ঢোকা, ঘরওয়ালার অবহেলার সুযোগ নিয়ে চুপিসারে ঘরে প্রবেশ করা ইত্যাদি সন্দেহমূলক অবৈধ প্রবেশের কোনো সুযোগ নেই।

ঘরওয়ালা ও আগন্তুক উভয়ের প্রাইভেসি ও মান-সম্মানের জন্য এটা খুবই জরুরি। অনুমতি নেওয়ার বিধান প্রণয়নের পেছনে আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যও এটাই। অনুমতি চাওয়ার অনেক আদব ও নিয়ম-কানুন রয়েছে। ইসলাম মুসলমানদের প্রতি এসব অর্জন করার দাবি জানায়।

প্রথম আদব : প্রবেশের অনুমতি নেওয়ার সময় দরজার সোজাসুজি সামনে দাঁড়াবে না। একটু ডানে অথবা বামে দাঁড়াবে। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অভ্যাস এমনই ছিল।

আব্দুল্লাহ বিন বুসর ﷺ বর্ণনা করেন :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتَى بَابًا يُرِيدُ أَنْ يَسْتَأْذِنَ لَمْ يَسْتَقْبِلْهُ، جَاءَ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَإِنْ أُذِنَ لَهُ وَإِلَّا انْصَرَفَ

‘নবিজি ﷺ কোনো দরজার সামনে গেলে সোজাসুজি দরজার সামনে দাঁড়াতেন না। একটু ডানদিকে অথবা বামদিকে দাঁড়াতেন। তারপর প্রবেশের অনুমতি পেলে প্রবেশ করতেন। আর অনুমতি না পেলে ফিরে যেতেন।’^{৭৩১}

কারণ, অনুমতি নেওয়ার উদ্দেশ্য হলো, দৃষ্টিকে অপ্রীতিকর ও বিব্রতকর দৃশ্য থেকে বাঁচানো।

এ সম্পর্কে সাহল বিন সাদ ﷺ থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

إِنَّمَا جُعِلَ الْإِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ

‘অনুমতি চাইতে হয় কেবল দৃষ্টির (অপপ্রয়োগ থেকে বেঁচে থাকার) কারণে।’^{৭৩২}

আর দরজার সোজাসুজি সামনে দাঁড়ালে এ উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়। এজন্য অনুমতিপ্রার্থীর জন্য দরজার সোজাসুজি সামনে দাঁড়ানো জাযিজ নয়, যাতে দরজা খুললে ভেতরে দৃষ্টি না পড়ে।

দ্বিতীয় আদব : প্রথমে সালাম করবে, তারপর অনুমতি চাইবে। সালামের পূর্বে অনুমতি চাওয়া ঠিক নয়। রিবয়ি বিন হিরাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এমন নির্দেশনাই বর্ণিত হয়েছে।

তিনি বলেন, আমাকে বনি আমিরের এক ব্যক্তি বর্ণনা করেছেন :

أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتٍ فَقَالَ: أَلَيْجُ؟
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَادِمِهِ: اخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلَّمَهُ
الِاسْتِئْذَانَ، فَقُلْ لَهُ: قُلِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَدْخُلْ؟ فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ،
فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، أَدْخُلْ؟ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ

‘সে নবিজি رضي الله عنه-এর নিকট প্রবেশ করার অনুমতি চাইল। তখন নবিজি رضي الله عنه ঘরের ভেতরে ছিলেন। অনুমতি চাওয়ার সময় সে বলল, আমি কি প্রবেশ করব? নবিজি رضي الله عنه তাঁর খাদিমকে বললেন, ওই ব্যক্তির নিকট গিয়ে অনুমতি চাওয়ার নিয়ম শিখিয়ে দিয়ে আসো। তাকে এভাবে বলতে বলো, আস-সালামু আলাইকুম, আমি কি আসতে পারি? লোকটি তা শুনে বলল, আস-সালামু আলাইকুম, আমি কি আসতে পারি? তখন নবিজি رضي الله عنه তাকে অনুমতি দিলেন এবং সে প্রবেশ করল।’^{৭৩৩}

৭৩২. সহিহুল বুখারি : ৬২৪১

৭৩৩. সুনানু আবি দাউদ : ৫১৭৭

তৃতীয় আদব : আসল নাম বা ডাকনাম—যে নামে তাকে মানুষ বেশি চেনে, সে নাম বলবে। যখন জিজ্ঞেস করা হবে, আপনি কে? তখন ‘আমি’ বা এ ধরনের কোনো অস্পষ্ট শব্দ বলবে না। রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে এক ব্যক্তি ‘আমি’ বলে পরিচয় দিলে তিনি খুব নাখোশ হন এবং পরিচিত নাম বলে পরিচয় দিতে নির্দেশ দেন।

জাবির ﷺ বলেন :

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِي، فَدَقَّقْتُ
الْبَابَ، فَقَالَ: «مَنْ ذَا» فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ: «أَنَا أَنَا» كَأَنَّهُ كَرِهَهَا

‘আমি নবিজি ﷺ-এর নিকট যাওয়ার জন্য তাঁর দরজার কড়া নাড়লাম। তিনি বললেন, কে? আমি বললাম, আমি। তখন তিনি বললেন, আমিও তো আমি! বুঝতে পারলাম, আমার অস্পষ্ট উত্তরটি তিনি অপছন্দ করেছেন।’^{৭৩৪}

রাসুলুল্লাহ ﷺ এই হাদিসের মাধ্যমে আমাদের অনুমতি চাওয়ার একটি সুন্নাত শিক্ষা দিয়েছেন যে, অনুমতি গ্রহণের সময় স্পষ্ট নাম উচ্চারণ করা। রাসুলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সাহাবিদের মাঝে এ সুন্নাত বিদ্যমান ছিল।

আবু জার ﷺ বলেন :

خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي
وَحْدَهُ، لَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ، قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ مَعَهُ
أَحَدٌ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ، فَالْتَفَتَ فَرَأَانِي، فَقَالَ: «مَنْ
هَذَا؟» فَقُلْتُ: أَبُو ذَرٍّ

‘এক রাতে আমি বের হলাম। তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে একাকী হাঁটতে দেখলাম। কেউ তাঁর সাথে ছিল না। আমি মনে মনে ভাবলাম, হয়তো এ মুহূর্তে কারও সঙ্গে তিনি চাইছেন না। (তাই

আমি তাঁর পাশে না গিয়ে) তাঁদের আলোয় হাঁটতে লাগলাম।
রাসুলুল্লাহ ﷺ পেছনে ফিরলে আমাকে দেখতে পেলেন। তখন তিনি
বললেন, কে? আমি বললাম, আমি আবু জার।’^{৭৩৫}

উম্মে হানি ﷺ বলেন :

ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ
يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ فَقَالَ: «مَنْ هَذِهِ؟» فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِيٍّ

‘আমি মক্কা বিজয়ের বছর রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম।
তখন তিনি গোসল করছিলেন, আর ফাতিমা ﷺ তাঁকে আড়াল
করছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে এসেছে? আমি বললাম,
আমি উম্মে হানি।’^{৭৩৬}

চতুর্থ আদব : যদি ফিরে যেতে বলা হয়, তাহলে বিনা সংকোচে ফিরে যাবে।
কারণ, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে এ নির্দেশ দিয়েছেন।

তিনি ইরশাদ করেছেন :

وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ
‘যদি তোমাদের বলা হয় ফিরে যাও, তবে ফিরে যাবে। এতে
তোমাদের জন্য অনেক পবিত্রতা আছে এবং তোমরা যা করো,
আল্লাহ তা ভালোভাবে জানেন।’^{৭৩৭}

রাসুলুল্লাহ ﷺ-ও এমন শিক্ষাই দিয়েছেন। আবু মুসা আশআরি ﷺ-এর
হাদিসে তা বর্ণিত হয়েছে।

তিনি ইরশাদ করেছেন :

الْإِسْتِثْذَانُ ثَلَاثٌ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ، وَإِلَّا فَارْجِعْ

৭৩৫. সহিহ মুসলিম : ৯৪

৭৩৬. সহিহুল বুখারি : ২৮০

৭৩৭. সূরা আন-নুর : ২৮

‘তিনবার পর্যন্ত অনুমতি চাইবে। এরপর অনুমতি পেলে প্রবেশ করবে, না পেলে ফিরে যাবে।’ ৭৩৮

একবার আবু মুসা আশআরি   উমর  -এর নিকট অনুমতি চেয়ে পাননি। তাই তিনি ফিরে আসলেন। তখন উমর   তাঁর নিকট ফিরে যাওয়ার কৈফিয়ত চাইলেন। এ ব্যাপারে উভয়ের মাঝে দীর্ঘ আলাপ-আলোচনা হলো। সম্পূর্ণ ঘটনাটি এখানে তুলে ধরা সমীচীন মনে করছি। যাতে পাঠক জানতে পারেন যে, রাসুলুল্লাহ  -এর নির্দেশনার যথাযথ বাস্তবায়নে সাহায্যে কিরাম কীরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

আবু মুসা আশআরি   বলেন :

اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي - ثَلَاثًا - فَأَذْبَرْتُ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، اشْتَدَّ عَلَيْكَ أَنْ تُحْتَبَسَ عَلَى بَابِي؟ اَعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ كَذَلِكَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يُحْتَبَسُوا عَلَى بَابِكَ، فَقُلْتُ: بَلِ اسْتَأْذَنْتُ عَلَيْكَ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، فَرَجَعْتُ، فَقَالَ: مِمَّنْ سَمِعْتَ هَذَا؟ فَقُلْتُ: سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَسَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ نَسْمَعْ؟ لَئِنْ لَمْ تَأْتِنِي عَلَى هَذَا بَيِّنَةٍ لَأَجْعَلَنَّكَ نَكَالًا، فَخَرَجْتُ حَتَّى أَتَيْتُ نَفَرًا مِنَ الْأَنْصَارِ جُلُوسًا فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلْتُهُمْ، فَقَالُوا: أَوْيَشُكَ فِي هَذَا أَحَدٌ؟ فَأَخْبَرْتُهُمْ مَا قَالَ عُمَرُ، فَقَالُوا: لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُنَا، فَقَامَ مَعِيَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ - أَوْ أَبُو مَسْعُودٍ - إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُرِيدُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، حَتَّى أَتَاهُ فَسَلَّمَ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، ثُمَّ سَلَّمَ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ، فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، فَقَالَ: «قَضَيْنَا مَا عَلَيْنَا»، ثُمَّ رَجَعَ، فَأَذْرَكَهُ سَعْدٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا سَلَّمْتَ مِنْ مَرَّةٍ إِلَّا وَأَنَا أَسْمَعُ، وَأَرُدُّ عَلَيْكَ، وَلَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ تُكْثِرَ مِنَ السَّلَامِ عَلَيَّ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِي،

فَقَالَ أَبُو مُوسَى: وَاللَّهِ إِنَّ كُنْتُ لَأَمِينًا عَلَى حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَجَلٌ، وَلَكِنْ أُحِبُّتُ أَنْ أُسْتَثْبِتَ

‘একদা আমি উমর রাঃ-এর নিকট প্রবেশের জন্য তিনবার অনুমতি চাইলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। তারপর আমি ফিরে আসলে তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং বললেন, হে - আল্লাহর বান্দা, আমার দরজায় অপেক্ষা করা তোমার জন্য যেমন কষ্টকর ঠেকেছে? মনে রেখো, ঠিক তেমনই তোমার দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করাও লোকদের জন্য কষ্টকর ঠেকবে। আমি বললাম, আমি তিনবার আপনার অনুমতি চেয়ে অনুমতি পাইনি বিধায় ফিরে এসেছি। কারণ, আমাদের এমনই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি বললেন, এমন বিধানের কথা তুমি কার কাছে শুনেছ? আমি বললাম, নবিজি সঃ-এর নিকট থেকে শুনেছি। তিনি বললেন, তুমি কি নবিজি সঃ থেকে এমন একটি কথা শুনেছ, যা আমি শুনিনি? যদি তুমি তার প্রমাণ দিতে না পারো, তবে তোমাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবো। তখন আমি বের হলাম এবং মসজিদে উপবিষ্ট কয়েকজন আনসার সাহাবিদের নিকট গিয়ে এ ব্যাপারে তাদের জিজ্ঞেস করলাম। তারা বললেন, এ ব্যাপারে কি কারও কোনো সন্দেহ থাকতে পারে? তখন আমি তাদের উমর রাঃ-এর ব্যাপারে জানালাম। তারা বললেন, আমাদের সর্বকনিষ্ঠজনই আপনার সঙ্গে যাবে। তখন আবু সাইদ খুদরি রাঃ অথবা আবু মাসউদ রাঃ আমার সঙ্গে উমর রাঃ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, একদা আমরা নবিজি সঃ-এর সাথে বের হলাম। তিনি সাদ বিন উবাদা রাঃ-এর বাড়ির দিকে রওনা হয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। তারপর রাসুলুল্লাহ সঃ তাকে সালাম দিলেন, কিন্তু অনুমতির সাড়া পাননি। অতঃপর তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার সালাম দিলেন, তবুও অনুমতি পাওয়া যায়নি। অবশেষে তিনি বললেন, আমাদের দায়িত্ব আমরা সম্পন্ন করলাম। অতঃপর তিনি ফিরে যেতে লাগলেন। এমন সময় সাদ রাঃ পেছন থেকে এসে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, যে পবিত্র সত্তা আপনাকে সত্য নবি বানিয়ে প্রেরণ করেছেন, তাঁর নামে

কসম করে বলছি, আপনি যতবারই সালাম করেছেন, প্রতিবারই আমি তা শুনতে পেয়েছি এবং (নিশ্চয়) প্রত্যেকটার জবাবও দিয়েছি। কিন্তু আপনার পাক জবান থেকে আমার ও আমার গৃহবাসীদের প্রতি বেশি সালাম পাওয়ার আশায় সশব্দে উত্তর দিইনি। অতঃপর আবু মুসা ؓ বললেন, আল্লাহর কসম, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর এ হাদিসের ব্যাপারে আমি অবশ্যই বিশ্বস্ত। তখন উমর ؓ বললেন, সত্য বটে, তবে আমি তার প্রমাণ সংগ্রহ করতে চেয়েছিলাম আর কি!’^{৭৩৯}

মুসলিম শরিফের বর্ণনায় এসেছে, হাদিসের প্রমাণ পাওয়ার পর উমর ؓ আফসোস করে বললেন :

خَفِيَ عَلَيَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَلْهَانِي عَنْهُ
الصَّفْقُ بِالْأَسْوَاقِ

‘হায়, রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর একটি নির্দেশনা আমার জানার বাইরে রয়ে গিয়েছিল! এটা ব্যবসার উদ্দেশ্যে আমার বাজারে বাজারে ঘোরার ফল!’^{৭৪০}

মজলিসের যেখানে জায়গা পায়, সেখানেই বসে পড়ে

প্রকৃত মুসলমানের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, কোনো মজলিসে গেলে যেখানে জায়গা পায়, সেখানেই বসে পড়ে। লোকদের ডিঙিয়ে আগে যাওয়ার চেষ্টা করে না কিংবা তাদের মাঝে গিয়ে ভিড় করে না, যেন তারা নড়েচড়ে তার বসার জায়গা করে দেয়। এটা এমন এক উন্নত সামাজিক আদব, যা রাসুলুল্লাহ ﷺ কথা ও কাজের মাধ্যমে সাহাবিদের শিক্ষা দিয়েছেন।

জাবির বিন সামুরা ؓ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন :

كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَلَسَ أَحَدُنَا حَيْثُ يَنْتَهِي

৭৩৯. আল-আদাবুল মুফরাদ : ১০৭৩

৭৪০. সহিহ মুসলিম : ২১৫৩

‘আমরা নবিজি ﷺ-এর মজলিসে গেলে মজলিসের শেষে (যেখানে জায়গা পেতাম সেখানেই) বসতাম।’^{৭৪১}

সুতরাং যে মুসলমানের মাঝে এ উন্নত আদব বিদ্যমান রয়েছে, সে দুজনের মাঝে ঢুকে তাদের মাঝে ফাটল সৃষ্টি করে না। একান্ত প্রয়োজন হলে তাদের অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করে। কেননা, এভাবে দুজন মানুষের মাঝে অপ্রত্যাশিতভাবে ঢুকে ফাটল সৃষ্টি করা থেকে রাসুলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেছেন।

তিনি ইরশাদ করেছেন :

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ، إِلَّا بِإِذْنِهِمَا

‘কোনো ব্যক্তির জন্য দুজন মানুষের মাঝে (অপ্রত্যাশিতভাবে অনুপ্রবেশ করে) ফাটল সৃষ্টি করা বৈধ নয়।’^{৭৪২}

কেননা, মজলিসে বা মজলিসের বাইরে যেখানেই হোক, দুজন মানুষের মাঝে অপ্রত্যাশিতভাবে তৃতীয় ব্যক্তির ঢুকে পড়াটা খুবই বিব্রতকর ও অভদ্রজনোচিত ব্যাপার। ইসলাম এ থেকে কঠিনভাবে নিষেধ করেছে। অসংখ্য হাদিস ও আসারে (সাহাবিদের কথা ও কাজে) এ গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সাইদ মাকবুরি رحمه বুলেন :

مَرَرْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، وَمَعَهُ رَجُلٌ يَتَحَدَّثُ، فَقُمْتُ إِلَيْهِمَا، فَلَطَمَ فِي صَدْرِي فَقَالَ: إِذَا وَجَدْتَ اثْنَيْنِ يَتَحَدَّثَانِ فَلَا تَقُمْ مَعَهُمَا، وَلَا تَجْلِسْ مَعَهُمَا، حَتَّى تَسْتَأْذِنَهُمَا، فَقُلْتُ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّمَا رَجَوْتُ أَنْ أَسْمَعَ مِنْكُمَا خَيْرًا

‘আমি ইবনে উমর رحمه-এর নিকট গেলাম। তখন এক ব্যক্তির সাথে তিনি কথা বলছিলেন। আমি দুজনের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। ইবনে

৭৪১. সুনানু আবি দাউদ : ৪৮২৫

৭৪২. আল-আদাবুল মুফরাদ : ১১৪২

উমর   আমার বৃকে একটা চড় মেরে বললেন, দুজন ব্যক্তিকে কথা বলতে দেখলে অনুমতি না নিয়ে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবে না এবং তাদের নিকট বসবে না। আমি বললাম, আল্লাহ আপনার কল্যাণ করুন, হে আবু আব্দুর রহমান। আসলে আমি আপনাদের দুজন থেকে ভালো কিছু শোনার আশায় এসেছিলাম।^{৭৪৩}

প্রকৃত মুসলমানের জন্য কেউ নিজের আসন ছেড়ে দিলে তাতে বসতে অস্বীকৃতি জানায় সে। এটা ভদ্রতা। সাহাবায়ে কিরাম   এমনই ছিলেন।

ইবনে উমর   বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ   ইরশাদ করেছেন :

لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ، ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا

‘তোমরা কোনো ব্যক্তিকে তার আসন থেকে উঠিয়ে দিয়ে সে জায়গায় বোসো না। তবে মজলিসে স্থান প্রশস্ত করতে পারবে।’^{৭৪৪}

অপর এক বর্ণনায় এসেছে :

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ عَنْ مَجْلِسِهِ، لَمْ يَجْلِسْ فِيهِ

‘ইবনে উমর  -এর জন্য কেউ নিজের আসন ছেড়ে দিলে তিনি তাতে বসতেন না।’^{৭৪৫}

রাসুলুল্লাহ   থেকে মজলিস ও মানুষের সাথে বসবাস-সংক্রান্ত যেসব আদব হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, প্রকৃত মুসলমান সেগুলোর অনুসরণ করে চলতে চেষ্টা করে। এ সংক্রান্ত রাসুলুল্লাহ  -এর কতিপয় আদব হলো, তিনি তাঁর মজলিসে আগত প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার অংশ প্রদান করতেন। তাঁর মজলিসে কেউ এটা ভাবার অবকাশ পেত না যে, এ মজলিসে অন্যজন তার চেয়ে বেশি মর্যাদা পাচ্ছে। তিনি কারও নিন্দা করতেন না। কাউকে লজ্জা দিতেন না। কারও দোষ খুঁজে বেড়াতেন না। সাওয়াব পাওয়া যায়, এমন কথা ব্যতীত

৭৪৩. আল-আদাবুল মুফরাদ : ১১৬৬

৭৪৪. আল-আদাবুল মুফরাদ : ১১৪০, সহিহ মুসলিম : ২১৭৭

৭৪৫. সহিহ মুসলিম : ২১৭৭

অন্য কোনো কথা বলতেন না। কারও সাথে কথা বলার সময় মাঝখানে কথা কেটে নিতেন না, যতক্ষণ না তার কথা পুরোপুরি শেষ হয়।^{৭৪৬}

মজলিসে যথাসম্ভব হাই তোলা থেকে বিরত থাকে

প্রকৃত ভদ্র মুসলমান মজলিসে যথাসম্ভব হাই তোলা থেকে বেঁচে থাকে। আর যদি এসেই যায়, তখন তা যেকোনো উপায়ে প্রতিরোধের চেষ্টা করে। কারণ, রাসুলুল্লাহ ﷺ এমন নির্দেশই দিয়েছেন।

তিনি বলেন :

فَإِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ

‘যদি তোমাদের কারও হাই আসে, তখন যথাসাধ্য তাকে দমন করার চেষ্টা করবে।’^{৭৪৭}

হাই যদি তীব্র হয় এবং প্রতিহত করা সম্ভব না হয়, তাহলে মুখে হাত দেবে। এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِذَا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِئِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ

‘যদি তোমাদের কারও হাই আসে, তখন মুখে হাত দিয়ে তা দমন করবে। কেননা, (হাই তোলার সময় মুখ দিয়ে) শয়তান ঢুকে যায়।’^{৭৪৮}

মজলিসে লোকসম্মুখে হাই তোলা অনেক ঘৃণিত একটি বিষয়। কোনো ভদ্র মানুষের মাঝে এটা মোটেই শোভা পায় না। এজন্য যেকোনো উপায়ে তা দমন করা উচিত এবং মুখ খুলে গেলে হাত দিয়ে ঢেকে রাখা উচিত। যেন হাই তোলার সময় খোলা মুখগহ্বর দেখে মানুষের মাঝে ঘৃণা ও অস্বস্তিবোধ সৃষ্টি না হয়। প্রকৃত মুসলমান সমাজজীবনে এ ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকে, যেন তার প্রতি মানুষের মাঝে ঘৃণাবোধ ও অনাগ্রহ পয়দা না হয়।

৭৪৬. হায়াতুস সাহাবা : ১/২১-২২

৭৪৭. সহিহ মুসলিম : ২৯৯৪

৭৪৮. সহিহ মুসলিম : ২৯৯৫

হাঁচি দেওয়ার সময় ইসলামি শিষ্টাচার মেনে চলে

ইসলামে হাই তোলার ব্যাপারে যেমন আদব ও শিষ্টাচার রয়েছে, তেমনই হাঁচি দেওয়ার ব্যাপারেও ইসলামি শিষ্টাচার রয়েছে। হাঁচি আসলে কী করতে হবে, কী পড়তে হবে, কীভাবে হাঁচিদাতার জবাব দিতে হবে, কীভাবে তার জন্য দুআ করতে হবে—সব বিষয় শিক্ষা দিয়েছে ইসলাম।

আবু হুরাইরা রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সঃ ইরশাদ করেছেন :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَّاسَ، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، وَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ. فَأَمَّا التَّثَاؤُبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُرِدِّهِ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ ضَحِكَ مِنْهُ الشَّيْطَانُ

‘হাঁচি দেওয়া আল্লাহ তাআলার নিকট পছন্দনীয়, আর হাই তোলা অপছন্দনীয়। সুতরাং তোমাদের কেউ হাঁচি দিয়ে “আল-হামদুলিল্লাহ” (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর) বললে, তখন যেসব মুসলমান তা শুনে পাবে, তাদের ওপর “ইয়ারহামুকাল্লাহ” (তোমার প্রতি আল্লাহ রহম করুন) বলা আবশ্যিক। আর হাই আসে শয়তানের পক্ষ থেকে। সুতরাং তোমাদের কারও হাই আসলে সে যথাসাধ্য তা দমনের চেষ্টা করবে। কেননা, তোমাদের কেউ যখন হাই তোলে, তখন শয়তান (খুশিতে) হাসে।’^{৭৪৯}

এ ধরনের ছোট ছোট প্রকৃতিগত সকল মানবিক বিষয়ের আদব ও শিষ্টাচার প্রণয়ন করে দিয়েছে ইসলাম। প্রকৃত মুসলমান বিশ্বাস করে, এ সকল আদব-শিষ্টাচারের মাঝেই নিহিত আছে তার সমূহ কল্যাণ। তাই সে ছোট বড় কোনো আদব ও শিষ্টাচার বাদ দেয় না।

হাঁচি সম্পর্কে ইসলামের আদব হলো, কেউ হাঁচি দিলে তার উচিত ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ (সকল প্রশংসা আল্লাহর) বলা। যে তার ‘আল-হামদুলিল্লাহ’

৭৪৯. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৯২৮

বলা শুনতে পাবে, তার উচিত ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’ (তোমার প্রতি আল্লাহ রহম করুন) বলা। এর বিনিময়ে হাঁচিদাতা ‘ইয়াহদিকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহ বা-লাকুম’ (আল্লাহ তোমাকে হিদায়াত দান করুন এবং তোমার অন্তর পরিশুদ্ধ করে দিন) বলে উত্তরদাতার জন্য দুআ করবে।

এ সম্পর্কে হাদিস শরিফে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، فَإِذَا قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، فَلْيَقُلْ لَهُ
أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ، وَلْيَقُلْ هُوَ: يَهْدِيكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحْ بَالَكُمْ

‘তোমাদের কেউ হাঁচি দিলে সে বলবে, ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ (সকল প্রশংসা আল্লাহর)। এর উত্তরে তার ভাই বা সঙ্গী বলবে, ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’ (তোমার প্রতি আল্লাহ রহম করুন)। যখন জবাবে তা বলবে, তখন সে বলবে, ‘ইয়াহদিকুমুল্লাহ ওয়া ইউসলিহ বা-লাকুম’ (আল্লাহ তোমাকে হিদায়াত দান করুন এবং তোমার অন্তর পরিশুদ্ধ করে দিন)।’^{৭৫০}

হাঁচির জবাবে যে ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’ (তোমার প্রতি আল্লাহ রহম করুন) বলা হয়, শরিয়তের পরিভাষায় এটাকে ‘তাশমিত’ বলে। হাঁচিদাতা হাঁচি দেওয়ার পর ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ বললে তার জবাবে এটা বলবে। ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ না বললে ‘তাশমিত’ করা যাবে না।

এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمَّتُوهُ، وَإِنْ لَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ فَلَا تَشَمَّتُوهُ

‘যদি তোমাদের কেউ হাঁচি দেওয়ার পর ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ বলে, তোমরা তার উত্তর দেবে। আর যদি ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ না বলে, তাহলে উত্তর দেবে না।’^{৭৫১}

৭৫০. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৯২৭, সহিহুল বুখারি : ৬২২৪

৭৫১. আল-আদাবুল মুফরাদ : ৯৪১

আনাস রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

عَظَسَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَشَمَّتْ أَحَدَهُمَا
وَلَمْ يُشَمِّتِ الْآخَرَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، شَمَّتْ هَذَا وَلَمْ
تُشَمِّتْنِي، قَالَ: إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللَّهَ، وَلَمْ تَحْمَدِ اللَّهَ

‘নবিজি সাঃ-এর সামনে দুজন ব্যক্তি হাঁচি দিল। তিনি একজনের হাঁচির উত্তর দিলেন, আরেকজনের উত্তর দিলেন না। তখন যার উত্তর দেওয়া হয়নি সে বলল, হে আল্লাহর রাসুল, অমুকের হাঁচির উত্তর দিয়েছেন, আমার হাঁচির উত্তর দেননি কেন? তিনি বললেন, সে হাঁচি দেওয়ার পর “আল-হামদুলিল্লাহ” বলেছে, কিন্তু তুমি তা বলোনি।’^{৭৫২}

হাঁচি-সংক্রান্ত যেসব দুআ রাসুলুল্লাহ সাঃ শিক্ষা দিয়েছেন, সেগুলোর শব্দ নিয়ে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এ দুআগুলোর মাঝে অনেক কল্যাণ ও উপকারিতা রয়েছে। দুআর শব্দ চয়নের যৌক্তিকতাও বিস্ময়কর। হাঁচিদাতা হাঁচি দেওয়ার পর ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ বলে। কারণ, হাঁচি দেওয়ার কারণে তার মাথার ভেতরের এক ধরনের অস্বস্তিকর অনুভূতির অবসান হয়েছে। এজন্য সে আল্লাহর প্রশংসা করে। তার জবাবে ‘ইয়ারহামুকাল্লাহ’ বলার কারণ হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে, সে আল্লাহর রহমতের যোগ্য হয়। তারপর উত্তরদাতা হাঁচিদাতার জন্য আরও বড় ও ব্যাপক অর্থবোধক বাক্যে দুআ করে। এভাবে হাঁচিকে কেন্দ্র করে মুসলমানদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালোবাসা বারবার নবায়ন হতে থাকে।

এভাবে ইসলাম মুসলমানদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এমন সব সুন্দর বিধান সাজিয়ে রেখেছে, যার কারণে প্রকৃতিগত ছোট ছোট মানবিক বিষয়গুলোও তাদের আল্লাহর স্মরণ ও প্রশংসা করার সুযোগ করে দেয় এবং মুসলমানদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার বন্ধন সুদৃঢ় করে দেয়।

হাঁচি দেওয়ার ক্ষেত্রে আরেকটি আদব হলো, হাঁচি দেওয়ার সময় মুখে হাত রাখবে এবং যথাসাধ্য শব্দকে নিচু করার চেষ্টা করবে। রাসুলুল্লাহ সাঃ এভাবেই হাঁচি দিতেন।

৭৫২. সহিহুল বুখারি : ৬২২৫ ; সহিহ মুসলিম : ২৯৯১

আবু হুরাইরা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا عَطَسَ وَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ
عَلَى فِئِهِ، وَخَفَضَ أَوْ غَضَّ بِهَا صَوْتَهُ

‘রাসুলুল্লাহ ﷺ হাঁচি দেওয়ার সময় হাত অথবা কাপড় তাঁর মুখে রাখতেন এবং আওয়াজ নিচু করতেন।’^{৭৫৩}

অন্যের ঘরে উঁকি দেয় না

মুসলমানদের জন্য আরেকটি সামাজিক আদব হলো, অন্যের ঘরে উঁকি দেবে না এবং তাদের গোপনীয় বিষয়গুলো জানার চেষ্টা করবে না। এটা প্রকৃত ভদ্র মুসলমানের স্বভাব নয়। যারা অন্যের ঘরে উঁকি মারে, তাদের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ ﷺ কঠোর হুঁশিয়ারি বাণী উচ্চারণ করেছেন। তাদের চক্ষু ফুঁড়ে দেওয়ার বৈধতা দিয়েছেন।

তিনি ইরশাদ করেছেন :

مَنْ أَطْلَعَ فِي بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَهُوا عَيْنَهُ

‘যে ব্যক্তি কোনো গোত্রের বাড়িতে তাদের অনুমতি ছাড়া উঁকি দেয়, তার চোখ উৎপাটন করা তাদের জন্য বৈধ হয়ে যায়।’^{৭৫৪}

বিপরীত লিঙ্গের সাদৃশ্য অবলম্বন করে না

বিশুদ্ধ ইসলামি সমাজে কোনো পুরুষ মহিলার সাদৃশ্য অবলম্বন করে না এবং কোনো মহিলা পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বন করে না। কারণ, বিপরীত লিঙ্গের সাদৃশ্য অবলম্বন করা পরিষ্কার হারাম। ইসলামি সমাজে পুরুষ ও নারী উভয়ের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে দুই লিঙ্গের বৈশিষ্ট্যগত ব্যবধান লঙ্ঘন করা বৈধ নয়। নারীর সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষ

৭৫৩. সুনানু আবি দাউদ : ৫০২৯

৭৫৪. সহিহ মুসলিম : ২১৫৮

এবং পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী নারী—এ দুই শ্রেণির ব্যাপারে ইসলামের অবস্থান খুবই কঠোর।

ইবনে আব্বাস ؓ বলেন :

لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ
مِنَ النِّسَاءِ

‘নবিজি ؐ নারীর সাদৃশ্য অবলম্বনকারী পুরুষ এবং পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বনকারী নারীদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন।’^{৭৫৫}

আবু হুরাইরা ؓ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ،
وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

‘রাসুলুল্লাহ ؐ এমন পুরুষের প্রতি লানত করেছেন, যে মেয়েদের পোশাকের মতো পোশাক পরিধান করে এবং এমন মেয়েদের প্রতি লানত করেছেন, যে পুরুষদের পোশাকের মতো পোশাক পরিধান করে।’^{৭৫৬}

বর্তমান সময়ে অনেক মুসলিম যুবকদের দেখা যায়, তারা মাথায় মেয়েদের মতো লম্বা চুল রাখে। অনেক সময় চিনতে কষ্ট হয়ে যায় যে, তারা ছেলে নাকি মেয়ে! বিশেষ করে যখন গলায় মেয়েদের মতো স্বর্ণের চেইন বেঁধে উন্মুক্ত বক্ষে ঝুলিয়ে দেয়। একইভাবে অনেক মুসলিম মেয়েদের দেখা যায়, তারা শরীরের অবয়ব ফুটে ওঠে, এমন টাইটফিট প্যান্ট ও শার্ট পরে। তাদের মাথা খোলা থাকে, বাহু থাকে উন্মুক্ত। দেখতে যুবকদের মতোই লাগে তাদের। বিভিন্ন ইসলামি সমাজে এসব নোংরা দৃশ্য পাশ্চাত্য কুফরি সভ্যতার প্রভাবে দৃশ্যমান হচ্ছে। এ কুফরি সভ্যতা আরও বিভিন্ন গোমরাহি মুসলমানদের সমাজে ছড়িয়ে দিচ্ছে। এ কারণে মুসলমান যুবকদের বিরাট

৭৫৫. সহিহুল বুখারি : ৫৮৮৬

৭৫৬. সুনানু আবি দাউদ : ৪০৯৮

এক অংশ হতাশার তিহ ময়দানে দিকভ্রান্তের মতো ছুটছে। তারা কখন কী করে বসতে পারে, তার কোনো ধারণা নেই। এভাবে বিনষ্ট হতে চলছে ইসলামি সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা। ইসলামি সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা ধরে রাখতে হলে রাসুলুল্লাহ ﷺ যেসব সামাজিক আদব ও শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন, প্রত্যেক মুসলমানকে সামাজিক জীবনে সেগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। আল্লাহ তাওফিক দান করুন। আমিন।



পরিশিষ্ট

পূর্বের অধ্যায়সমূহে প্রকৃত মুসলমানের গুণাবলি বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সেগুলোকে কুরআনের আয়াত ও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণিত করা হয়েছে। আল্লাহর সাথে একজন মুসলমানের সম্পর্ক কেমন হবে; তার নিজের সাথে সম্পর্ক কেমন হবে; তার শরীর, বিবেক ও আত্মার মাঝে সুষ্ঠু সমন্বয় কীভাবে হবে; পিতা-মাতা, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব এবং সমাজের সাথে তার সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত—সবগুলো সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে।

এটাও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, প্রকৃত মুসলমান তার চারিত্রিক, ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আলাদা বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে থাকে।

এটাও স্পষ্ট করা হয়েছে যে, মানবজাতির সুদীর্ঘ ইতিহাসে কোনো মানুষ মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্বের সকল উপকরণ নিজের মাঝে আনতে সক্ষম হয়নি। একমাত্র প্রকৃত মুসলমানই তা করতে সক্ষম হয়েছে। কারণ, তার পুরো জীবন যাপিত হয়েছে মানবজাতির সৃষ্টিকর্তা ও শ্রেষ্ঠত্বদানকারী মহান আল্লাহর ওহি ও দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী, যা সে পবিত্র কুরআন ও রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহর মাঝে পেয়েছে।

এর কারণ হলো, ইসলাম মানুষের বিবেককে বৈজ্ঞানিক থিউরি অনুযায়ী পরিচালিত করে না, যেমনটি গ্রিকরা করেছিল। হিন্দুদের মতো কাল্পনিক আধ্যাত্মিকতা অনুযায়ীও পরিচালিত করে না। রোমানদের মতো শুধু শরীরচর্চাও ইসলামের উদ্দেশ্য নয়। তেমনই বর্তমান সময়ের পাশ্চাত্য সভ্যতার মতো বস্তুবাদী মানসিকতাও ইসলামের কাম্য নয়। ইসলাম মানুষকে একজন পূর্ণাঙ্গ মানবে পরিণত করতে চায়—যার শরীর, বিবেক ও আত্মার মাঝে থাকবে সুষ্ঠু ভারসাম্য। কারণ, ইসলাম মানুষকে শরীর, বিবেক ও আত্মার সমন্বয়ে গঠিত একটি মাখলুক মনে করে।

এজন্য প্রকৃত মুসলমান সব বিষয়ে ভারসাম্যপূর্ণ হয়ে থাকে। কোনো বিষয়ে ছাড়াছাড়ি বা বাড়াবাড়ি তার মাঝে থাকে না। যেমন অন্যান্য জীবনব্যবস্থায় গড়ে ওঠা মানুষের মাঝে দেখা যায়।



প্রকৃত মুসলমান আল্লাহর অনুগত বান্দা হয়ে থাকে। সে জীবন পরিচালনা করে আল্লাহর দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী। আল্লাহর ফয়সালা ও তাকদিরের প্রতি থাকে পূর্ণ সন্তুষ্টি। সব কাজে তার একটাই চিন্তা, একটাই উদ্দেশ্য। তা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

প্রকৃত মুসলমান একজন ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তি হয়, যে শরীরের যত্ন নেওয়ার মাধ্যমে শরীরের হক আদায় করে। তার বাহ্যিক অবস্থাকে এমন করে রাখে না, যেন তাকে মানুষ বলতে সংকোচ হয়, যে মানুষকে আল্লাহ তাআলা সম্মানিত করেছেন, ফেরেশতাগণ সিজদা করেছেন এবং আসমান-জমিনের সবকিছু তার অনুগত করে দেওয়া হয়েছে। বরং শরীরকে সে এমনভাবে রাখে, যেন তা বিবেক, চিন্তাশক্তি ও জ্ঞানবুদ্ধির মতো উন্নত বিষয়াবলির বাহন হওয়ার উপযুক্ত মনে হয়। শরীর ও বিবেকের যত্ন নেওয়ার পাশাপাশি সে আত্মা থেকেও বিস্মৃত হয় না। তাই সে যেভাবে শরীরের যত্ন নেয়, সেভাবে আত্মারও যত্ন নেয়। এভাবেই প্রকৃত মুসলমান শরীর, বিবেক ও আত্মার মাঝে সুষ্ঠু ভারসাম্য বজায় রেখে একজন পূর্ণাঙ্গ ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত হয়।

প্রকৃত মুসলমান পিতা-মাতার সাথে সদ্যবহার, দয়া ও ভদ্রতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। স্ত্রীর কাছে একজন আদর্শ স্বামী, যে তার আবেগ-অনুভূতি, মেয়েলি মান-অভিমান সবকিছু বুঝে। সন্তানদের জন্য একজন দায়িত্ববান ও স্নেহশীল পিতা, যে তাদের সুষ্ঠু তারবিয়াত ও লালনপালনে কোনোরূপ ত্রুটি ও অবহেলা করে না। আত্মীয়-স্বজনদের কাছে আত্মীয়তা-সম্পর্ক রক্ষাকারী একজন প্রিয় আত্মীয়, যে সর্বাবস্থায় সকল পরিস্থিতিতে ইসলামের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে চলে। প্রতিবেশীদের জন্য একজন উত্তম প্রতিবেশী, যে তাদের সাথে ভালো আচরণ করে, তাদের কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকে, তাদের আবেগ-অনুভূতিকে সম্মান করে, সর্বোপরি ইসলাম-নির্দেশিত পন্থায় প্রতিবেশীদের সকল হক আদায় করে দেয়। এজন্য সে কোনো ধরনের বিনিময় বা প্রশংসার আশাও করে না। আর বন্ধুদের জন্য সে একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। একমাত্র আল্লাহর জন্যই তাদের ভালোবাসে সে। তাদের সাথে কৃত অঙ্গীকার পালন করে, বিশ্বাসঘাতকতা করে না। তাদের কল্যাণ কামনা করে, ধোঁকা দেয় না। তাদের প্রতি উদার, ক্ষমাশীল, হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করে না। নিজের ওপর তাদের প্রাধান্য দেয় এবং

তাদের অগোচরে তাদের জন্য দুআ করে ।

অনুরূপভাবে সমাজে তার পরিচয় একজন উত্তম চরিত্রধারী ভদ্র মানুষ হিসাবে, যে সামাজিক জীবনে কুরআন-হাদিসের দিক-নির্দেশনা অনুযায়ী চলে এবং এভাবে চলাকে ইবাদত মনে করে । ফলে সে সকল মানুষের সাথে সত্য কথা বলে । কারও সাথে প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি করে না । কারও প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করে না । লজ্জাশীল, ক্ষমাশীল, উদারমনস্ক ও সদা হাস্যমুখ থাকে । সমাজের মানুষের সাথে বৈধ হাসি-কৌতুক করে তাদের বিনোদন দেয় । গালিগালাজ ও অশ্লীল কথা তার মুখ থেকে বের হয় না । কোনো মুসলমানকে ফাসিক বা কাফির বলে না । বেহুদা ও অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকে । কারও গিবত ও চোগলখোরি করে না । মিথ্যা কথা ও নেতিবাচক ধারণা থেকে দূরে থাকে । কেউ তার কাছে গোপনীয় কিছু বললে তা অন্যদের নিকট ফাঁস করে দেয় না । নম্র ও বিনয়ী, অহংকারী নয় । কাউকে বিদ্রূপ করে না । বড়জন ও মর্যাদাবান ব্যক্তিদের সমীহ করে । নেককার ও আল্লাহওয়ালা লোকদের সাথে সম্পর্ক রাখে । সর্বদা মানুষের উপকার করার চেষ্টা করে, তাদের ক্ষতি করা থেকে বেঁচে থাকে । মুসলমানদের মধ্যে মনোমালিন্য বা ঝগড়াঝাঁটি হলে আপস ও মীমাংসা করে দেওয়াকে দায়িত্ব মনে করে । হিকমত ও উত্তম নসিহতের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান করে । কেউ অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যায় । কেউ মারা গেলে তার দাফন-কাফন, গোসল ও জানাজায় শরিক হয় । উপকারের বিনিময় প্রদান করে এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে । মানুষের সাথে মিলেমিশে থাকে এবং তাদের থেকে পাওয়া কষ্টগুলোর ওপর ধৈর্যধারণ করে । যথাসাধ্য মানুষকে আনন্দ দিতে ও খুশি রাখতে চেষ্টা করে । বিচার-ফয়সালায় ন্যায়পরায়ণ; কারও প্রতি অবিচার ও অন্যায় করে না । দৃঢ় ও অবিচল থাকে, ক্ষণে ক্ষণে রং বদলায় না । গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ব্যতীত তুচ্ছ কোনো বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় না, সময় নষ্ট করে না । অতিরঞ্জিত গুহু উচ্চারণ ও উচ্চাঙ্গ আলংকারিক ভাষায় কথা বলে না । উদার ও বদান্য, কেউ সাহায্য চাইলে তাকে নিরাশ করে না । অতিথিপরায়ণ, ঘরে মেহমান এলে বিরক্তিবোধ করে না । নিজের ওপর যথাসাধ্য অন্যদের অগ্রাধিকার দেয় । অসহায়ের সহায় হয় । দারিদ্র্য আসলে সবর করে, ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘোরে না; কারও কাছে হাত পাতে

না। লোকজনের সাথে অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ হয়ে মিশে, তারাও তার সাথে অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ হয়। পানাহার, পোশাক-আশাক, সালাম-কালাম, ওঠা-বসা, দেখা-সাক্ষাৎ সবকিছুতে ইসলামের রীতি অনুসরণ করে। একবাক্যে বললে, সে নিজেকে ইসলামের হাতে সঁপে দেয়।

উল্লিখিত সকল গুণ ও চরিত্র যার ভেতর আছে, ইসলামের দৃষ্টিতে সেই প্রকৃত ও আদর্শ মুসলমান।

সবচেয়ে উন্নত মানবসভ্যতা হলো, যে সভ্যতায় মানবজাতির মাঝে উল্লিখিত গুণাবলি প্রতিষ্ঠিত থাকে। কারণ, এ গুণগুলো মানবজাতির মাঝে সে মানবিকতা সৃষ্টি করে, যা মানবজাতিকে শ্রেষ্ঠ মাখলুকের আসনে বসিয়েছে। পক্ষান্তরে যেসব সভ্যতা মানবজাতির অভ্যন্তরীণ মানবিকতাকে এড়িয়ে তার বাহ্যিক বিষয়াবলির প্রতি মনোযোগী হয়েছে; মানবজাতিকে বৈজ্ঞানিক উন্নয়নের শিখরে পৌঁছিয়েছে; টিভি, রেডিও, কম্পিউটার, ইন্টারনেটসহ বিভিন্ন আধুনিক আবিষ্কার হাতে তুলে দিয়ে পৃথিবীকে মানবজাতির হাতের মুঠোয় ধরিয়ে দিয়েছে—এগুলো উন্নত মানবসভ্যতা নয়। বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাধন ও জীবনমান সহজীকরণ মানবজাতির শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় নয়। মানবজাতি তখনই শ্রেষ্ঠ মাখলুক, যখন তার ভেতর মানবিকতা থাকবে এবং তার অন্তর্লোক স্বচ্ছ ও পরিশুদ্ধ হবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۝ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا
۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۝ ১০

‘শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন তাঁর। অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়। আর যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।’^{৭৫৭}

অনুরূপভাবে সমাজকে তখনই উন্নত সমাজ বলা হবে, যখন তার প্রত্যেক সদস্যের মাঝে পারস্পরিক ভালোবাসা, হৃদয়তা, সহানুভূতি ও সহমর্মিতা থাকবে এবং পারস্পরিক লেনদেনে ছাড় দেওয়া ও নিজের ওপর অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার মানসিকতা থাকবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে উৎকর্ষ সাধন ও জীবন সহজ করার আধুনিক উপকরণের উপস্থিতি সমাজের উন্নতির কারণ হতে পারে না, যদি সমাজের লোকদের মাঝে মানবতা ও মানবিকতা না থাকে।

যেসব গুণ সম্পর্কে এ গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে, কোনো সমাজের প্রতিজন সদস্য যদি এসবে গুণান্বিত হয়, তখন সমাজে শুধু কল্যাণ আর কল্যাণ থাকবে। সমাজে মারামারি, হানাহানি ও অনৈক্য থাকবে না। এজন্যই বলা হয়, ‘ব্যক্তি ঠিক হলে সমাজ ঠিক’, অর্থাৎ গুণবান ও সৎকর্মশীল লোকদের নিয়েই গড়ে ওঠে একটি আদর্শ সমাজ।

এ ধরনের সমাজকেই বলা হয় ইসলামি সমাজ। সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য মুসলমান হলেই তা ইসলামি সমাজ হয়ে যায় না। প্রকৃত ইসলামি সমাজ তখনই হবে, যখন তার সকল সদস্যের মাঝে প্রকৃত মুসলমানের গুণাবলি থাকবে। বর্তমান সময়ে কথিত মুসলমানদের সমাজে অনৈক্য, দলাদলি, ফিরকাবাজি, তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মারামারি আমরা দেখতে পাই। আরও দেখতে পাই জাতীয়তাবাদী চেতনা, স্বাধীনতার চেতনা, ভাষাগত চেতনা ইত্যাদির নামে মুসলমানদের মাঝে বিরাজ করছে চরম অনৈক্য। এসবের কারণ হলো, মুসলমানরা ইসলামের মৌলিক চরিত্র থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। তাদের পারস্পরিক ইসলামি সম্পর্ক ও ইমানি ভ্রাতৃত্ব তারা ছিন্ন করে ফেলেছে। নিজেদের পরিচয় ভুলে গিয়ে মুসলমানরা আজ দিশেহারা। এ সুযোগে বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদের ধ্বজাধারীরা সুন্দর ভাষায় তাদের ভ্রান্তির পথে দাওয়াত দিয়ে চলেছে মুসলমানদের সমাজে।

মুসলমানদের আকাশে বিপদের ঘনঘটা। পায়ের নিচে ধ্বংসে তলিয়ে যাওয়ার ভয়ংকর চোরাবালি। চারিদিকে তিমির অন্ধকার। ভীষণ রকমের ভয়ংকর সে আঁধার। এমন অবস্থায় মুসলমানদের সে একটাই আশ্রয়। ফিরে আসতে হবে ইসলামের মৌলিকত্বে। সবাইকে হয়ে উঠতে হবে প্রকৃত মুসলমান। জানতে হবে প্রকৃত মুসলমানের পরিচয়।

প্রকৃত মুসলমানদের হাত ধরেই ইসলাম আবার বিজয়ী হবে—এ কথা শত্রুরাও জানে। তাই তাদের মূল টার্গেট হলো প্রকৃত মুসলমানিত্ব। অর্থাৎ মুসলমানদের মাঝে আসল ইসলাম যেন আসতে না পারে, সেজন্যই তাদের যত চেষ্টা। উদ্দেশ্য সাধনের পথে দুই পদক্ষেপে তারা এগোয়। প্রথম পদক্ষেপ হলো, মুসলমানদের ভেতর থেকে প্রকৃত মুসলমানিত্ব বের করে আনা। দ্বিতীয় পদক্ষেপে তাদের মাঝে ইসলামের নামে ভ্রান্ত চিন্তাধারা ঢুকিয়ে দেয় অথবা একদম অনৈসলামিক কোনো চিন্তাধারা তার অন্তরে বসিয়ে দেয়। মুসলমানদের মধ্য থেকে প্রকৃত মুসলমানিত্ব বের করে নেওয়ার এ ঘৃণ্য অপচেষ্টা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। এভাবে কাফিররা বিভিন্ন ইসলামি দেশে ভৌগলিকভাবে কোনো ধরনের আগ্রাসন না চালিয়ে, বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই করে মুসলমানদের কাছ থেকে চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকার করিয়ে নিয়েছে। ফলে তারা এখন নিজেদের অজান্তেই পরাধীনতার লাঞ্ছনার শিকার। মানসিক লড়াইয়ে পরাজিত হয়ে মুসলমানরা এতটাই বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে যে, শারীরিক যুদ্ধ করার ইচ্ছাও আর অবশিষ্ট নেই তাদের মাঝে।

এ লাঞ্ছনা ও পরাধীনতা থেকে মুক্তি পেতে হলে মুসলমানদের জানতে হবে প্রকৃত মুসলমানের পরিচয়। অর্জন করতে হবে প্রকৃত মুসলমানিত্ব। তখন কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানদের অস্ত্র ভেঙে যাবে না, পতাকা ভুলুঠিত হবে না এবং ইসলামি বাহিনী কখনো পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ আশ্বাদন করবে না। তখন মুসলমানরা হয়ে উঠবে সত্যিকার মুসলিম উম্মাহ, প্রকৃত মুমিনদল, মহান আল্লাহ তাআলা যাদের সাহায্য করার জিম্মাদারি নিজের হাতে রেখেছেন।

তিনি বলেন :

وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

‘মুমিনদের সাহায্য করা আমারই দায়িত্ব।’^{৭৫৮}

আমার অনুভূতি

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slightly textured appearance and is set against a dark background.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



সমাজে আজ চারিদিকে কেবলই হাহাকার ধ্বনি। অশান্তি আর কষ্টের ধোঁয়ায় আঁধার এ ধরণি। মারামারি, হানাহানি আর কোন্দলে পর্যুদস্ত মানবজীবন। সাম্য, উদারতা ও ক্ষমা—এসব তো কবেই বিদায় নিয়েছে সমাজ থেকে! স্বার্থ আর সুবিধাভোগই হয়ে গেছে মানুষের মূললক্ষ্য। সহযোগিতা, পরোপকারিতা ও উত্তম আচরণের আশা সুদূর পরাহত। চারিদিকে কেবল জুলুম, অত্যাচার, অনাচার আর অশ্লীলতার চিত্র দৃশ্যমান। কোথাও নেই এক ফোঁটা শান্তির ছোঁয়া। এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার পেছনে মূলত সকল দায়ভার আমাদেরই। আমরা যদি ইসলামের পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান মেনে চলতাম, আল্লাহর ইবাদত যথাযথভাবে পালন করতাম, নিজের সাথে সৎ থাকার চেষ্টা করতাম, পরিবারের হক আদায় করতাম, প্রতিবেশীর সাথে সদ্যবহার ও সদাচরণ করতাম, তাহলে এ দুনিয়াই হয়ে উঠত আমাদের কাছে এক টুকরো জান্নাতসদৃশ।

ইসলামের সব বিধান মেনে চলার মধ্যেই রয়েছে একমাত্র শান্তির গ্যারান্টি—এ কথাটি সবাই মুখে স্বীকার করলেও অনেকেই জানে না, কীভাবে চলতে হবে ইসলামের পথে, কীভাবে আসতে হবে শান্তির পথে। পরিবেশের কুপ্রভাবে অনেকে ভুলের জগতে থাকলেও অন্তরের গভীর থেকে চায় সত্য ও আলোর পথে চলতে। এমন মুসলিমদের পথনির্দেশিকা তৈরি করতেই এগিয়ে এসেছেন সিরিয়ার প্রখ্যাত শাইখ ড. মুহাম্মাদ আলি হাশিমি রহ.। কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফের আমলের আলোকে রচনা করেছেন কালজয়ী গ্রন্থ ‘শাখসিয়াতুল মুসলিম’ বা ‘আদর্শ মুসলিম’। গ্রন্থটির প্রতিটি বাক্যে রয়েছে ইসলামি জীবনযাপনের সরল দিকনির্দেশনা।

